ID: 18

Context: অ্যাজমা বা হাঁপানি

Question: অ্যাজমা বা হাঁপানি রোগ কি?

Answer:

অ্যাজমা বা হাঁপানি একটি শ্বাসকস্ত জনিত রোগ ।

ID: 19

Context: অ্যাজমা বা হাঁপানি রোগের লক্ষণগুলো

Question: অ্যাজমা বা হাঁপানি রোগের লক্ষণগুলো কী কী?

Answer:

অ্যাজমা বা হাঁপানি রোগের প্রধান লক্ষণগুলো হল:

\* শ্বাসকষ্ট

\* শ্বাসপ্রশ্বাসের সময় শিস্ দেওয়ার মত শোঁ শোঁ শব্দ হওয়া (wheezing)।

\* বুকে চাপ লাগা – মনে হতে পারে যেন কোন বেল্ট বুকের চারপাশে আঁটসাঁট হয়ে আছে।

\* কাশিলক্ষণগুলো ক্ষণস্থায়ীভাবে খারাপ হয়ে যেতে পারে। তখন এটাকে বলা হয় অ্যাজমা অ্যাটাক।

ID: 20

Context: অ্যাজমা হলে যখন ডাক্তারের কাছে যেতে হবে

Question: অ্যাজমা হলে কখন আপনি ডাক্তারের কাছে যাবেন?

Answer:

হাঁপানি ছাড়াও অন্যান্য রোগের একই রকম লক্ষণ থাকতে পারে। তাই সঠিকভাবে রোগ নির্ণয় করে উপযুক্ত চিকিৎসা নেয়াটা খুব গুরুত্বপূর্ণ। যদি মনে হয় আপনার বা আপনার বাচ্চার হাঁপানি রোগ আছে, তাহলে আপনি একজন ডাক্তারের সহায়তা নিবেন। ডাক্তার সাধারণত লক্ষণগুলো শুনে নিয়ে এবং কিছু সহজ পরীক্ষার মাধ্যমে হাঁপানি রোগ নির্ণয় করতে পারবেন।

ID: 21

Context: হাঁপানি রোগের কারণসমূহ

Question: হাঁপানি রোগের কারণসমূহ কী কী?

Answer:

ফুসফুসে বাতাস আনা নেওয়া করে যে শ্বাসনালীগুলো, সেগুলোর (প্রদাহের কারণে) ফুলে ওঠার কারণে হাঁপানি হয়। শ্বাসনালীগুলো অতিরিক্ত সংবেদনশীল হয়ে পরে এবং সাময়িকভাবে সরু হয়ে যায়।কিছু কিছু জিনিস হাঁপানি উদ্রেক করতে পারে। সচরাচর দেখা যায় এমন কিছু কারণ হল:

\* অ্যালার্জি যেমন- পশুর লোম, ফুলের রেণু, ধূলিকণার পোকা ইত্যাদির প্রতি অ্যালার্জি।

\* ধোঁয়া বা পরিবেশ দূষণ।

\* ঠাণ্ডা হাওয়া।

\* শারীরিক ব্যায়াম।

সর্দিকাশির মতো অসুস্থতা বা ভাইরাস সংক্রমণহাঁপানি উদ্রেকের এই কারণগুলোকে চিহ্নিত করে সেগুলো এড়িয়ে চললে লক্ষণগুলোকে নিয়ন্ত্রণে রাখা সম্ভব।হাঁপানি রোগ কতদিন থাকে?হাঁপানি অনেকের জন্যই একটি দীর্ঘমেয়াদী রোগ, বিশেষ করে যাদের এই রোগ প্রাপ্তবয়স্ক হবার পরে শুরু হয়। বাচ্চাদের ক্ষেত্রে হাঁপানি অনেকসময় ভালো হয়ে যায় বা বয়ঃসন্ধিকালে অবস্থার উন্নতি হয়। তবে জীবনের পরবর্তী সময়ে রোগটি আবার ফিরে আসতে পারে।উপসর্গুলো সাধারণত চিকিৎসার মাধ্যমে নিয়ন্ত্রণে রাখা যায়। বেশিরভাগ মানুষই স্বাভাবিক জীবনযাপন করতে পারে। তবে যারা তুলনামূলকভাবে গুরুতর হাঁপানির রোগী, তাদের দৈনন্দিন কাজকর্মে রোগটি ব্যঘাত ঘটাতে পারে।

ID: 22

Context: হাঁপানি রোগের কারণসমূহ

Question: হাঁপানি রোগের কারণসমূহ কী কী?

Answer:

যদিও হাঁপানি সাধারণত নিয়ন্ত্রণ এর মধ্যে রাখা যায়, তবুও মনে রাখতে হবে এটি একটি জটিল রোগ যা নানা ধরনের সমস্যা সৃষ্টি করতে পারে। যেমন:

\* সবসময় ক্লান্ত লাগা।

\* মানসিক চাপ, উদ্বেগ ও বিষন্নতা।

\* ফুসফুসের সংক্রমণ (নিউমোনিয়া)।

\* বাচ্চাদের বেড়ে ওঠা বা বয়ঃসন্ধিতে দেরি হওয়া।

\* কর্মক্ষেত্র বা স্কুলে অনুপস্থিতি বা আগের চেয়ে কর্মক্ষমতা কমে যাওয়া।

\* হঠাৎ করে হাসপাতাল বা ডাক্তারের কাছে যাওয়ার প্রয়োজন পড়ায় দৈনন্দিন কাজ ও অবসর ব্যহত হওয়া।

ID: 23

Context: অ্যাজমা অ্যাটাক

Question: অ্যাজমা অ্যাটাক কি?

Answer:

প্রতি বছর বিশ্বব্যাপী অনেক মানুষ অ্যাজমা অ্যাটাকের কারণে মৃত্যুবরণ করেন। কিছু সাবধানতা অবলম্বন করলে এর অনেকগুলো মৃত্যুই ঠেকানো সম্ভব হত।প্রতি বছর বিশ্বব্যাপী অনেক মানুষ অ্যাজমা অ্যাটাকের কারণে মৃত্যুবরণ করেন। কিছু সাবধানতা অবলম্বন করলে এর অনেকগুলো মৃত্যুই ঠেকানো সম্ভব হত।আপনি যদি হাঁপানিরোগের সঠিক চিকিৎসা গ্রহণ করেন, তবে অ্যাজমা অ্যাটাকে আক্রান্ত হওয়ার আশংকা অনেকটাই কমে আসে। বছরে কমপক্ষে একবার ডাক্তারের কাছে গিয়ে হাঁপানির পরীক্ষা করিয়ে নিন এবং আপনার চিকিৎসা সম্পর্কে পরামর্শ নিন। হঠাৎ শ্বাসকষ্ট শুরু হলে কি করবেন সে সম্পর্কে পরিষ্কার ধারণা নিয়ে রাখুন। সম্ভব হলে লিখিত আকারে পরামর্শ নেবার চেষ্টা করবেন, যাতে অ্যাজমা অ্যাটাক হলে সেই লেখা অনুযায়ী আপনি চিকিৎসা নিতে পারেন।

ID: 24

Context: অ্যাজমা অ্যাটাকের লক্ষণগুলো

Question: অ্যাজমা অ্যাটাকের লক্ষণগুলো কী কী?

Answer:

\* আপনার অ্যাজমার লক্ষণগুলো ক্রমশ খারাপের দিকে যাচ্ছে (কাশি, শ্বাসকষ্ট, বুকে চাপ চাপ অনুভব বা শ্বাসপ্রশ্বাসে শোঁ শোঁ আওয়াজ হওয়া)।

\* ইনহেলার ব্যবহার করেও কাজ হচ্ছে না।

\* শ্বাসকষ্ট এতই বেড়ে গেছে যে কথা বলা, খাওয়া বা ঘুমানো সম্ভব হচ্ছে না।

\* আপনার শ্বাসপ্রশ্বাস দ্রুত হচ্ছে এবং মনে হচ্ছে যে আপনি দম ফেলতে পারছেন না।

\* আপনার পিক-ফ্লো স্কোর স্বাভাবিকের চেয়ে কমে গেছে। এটা এক ধরনের পরীক্ষা যাতে মেপে দেখা হয় আপনি ফুসফুস হতে কত দ্রুত বাতাস বের করে দিতে পারেন। (আমরা পিক ফ্লো নিয়ে আর্টিকেল তৈরি করছি। তার আগ পর্যন্ত এই সম্পর্কে অন্য উৎস থেকে জানার চেষ্টা করুন।)

\* শিশুদের ক্ষেত্রে বুকে বা পেটে ব্যথার সমস্যাও দেখা দিতে পারেএই লক্ষণগুলো যে হঠাৎ করেই শুরু হতে হবে, এমন না। বরং প্রায়ই লক্ষণগুলো ধীরে ধীরে কয়েক ঘন্টা বা কয়েকদিন ধরে খারাপের দিকে যেতে থাকে।

ID: 25

Context: অ্যাজমা অ্যাটাক হলে করণীয়

Question: অ্যাজমা অ্যাটাক হলে করণীয় কী?

Answer:

আপনার যদি মনে হয় আপনার অ্যাজমা আটাক হচ্ছে তবে নিম্নোক্ত বিষয়গুলো খেয়াল করুন।

\* সোজা হয়ে বসুন। শুয়ে পরবেন না।

\* ধীরে ধীরে শ্বাস নেওয়া আর ছাড়ার চেষ্টা করুন৷

\* শান্ত থাকুন। ঘাবড়ে গেলে বা প্যানিক করলে অবস্থা আরো খারাপ হতে পারে৷

\* লক্ষণ খারাপ হলে যেই ইনহেলার নেয়ার কথা, সেটাকে সাধারণত রিলিভার ইনহেলার বলা হয়। আপনার রিলিভার ইনহেলার থেকে ৩০ থেকে ৬০ সেকেন্ড পরপর ১ বার করে পাফ (দম) নিন। সর্বাধিক ১০ বার পর্যন্ত পাফ নিতে পারবেন।

ID: 26

Context: অ্যাজমা অ্যাটাক হলে যখন ডাক্তারের কাছে যেতে হবে

Question: অ্যাজমা অ্যাটাক হলে কখন দ্রুত হাসপাতালে যেতে হবে?

Answer:

\* যদি আপনার সাথে ইনহেলার না থাকে।

\* যদি ইনহেলার ব্যবহারের পরেও আপনার অবস্থা খারাপ হতে থাকে।

\* ইনহেলারের ১০টি পাফ নেয়ার পরও যদি ভালো বোধ না ...

\* যে কোন পর্যায়ে আপনি যদি দুশ্চিন্তা বোধ করেনযেকোন জরুরি অবস্থায় সাহায্য চাইতে ভয় পাবেন না। যদি সম্ভব হয়, হাসপাতালে যাওয়ার সময় আপনার ব্যবহৃত ওষুধগুলো সম্পর্কে বিস্তারিত তথ্য নিয়ে যান। যদি ১৫ মিনিটের মধ্যে হাসপাতালে যাওয়া সম্ভব না হয়, তাহলে ধাপটি (ইনহেলার পাফ নেয়া) পুনরায় অবলম্বন করুন।যদি আপনার লক্ষণসমূহের উন্নতি হয় এবং আপনার তাৎক্ষণিক সাহায্যের প্রয়োজন না হয়, তবে চেষ্টা করুন অন্ততপক্ষে ঐদিন একবার ডাক্তার দেখিয়ে নিতে।

ID: 27

Context: অ্যাজমা অ্যাটাকের পরে করণীয়

Question: অ্যাজমা অ্যাটাকের পরে কী করণীয়?

Answer:

\* যদি হাসপাতালে ভর্তি হতে হয়, তবে হাসপাতাল থেকে ছাড়া পাওয়ার ৪৮ ঘন্টার মধ্যে পুনরায় ডাক্তার দেখিয়ে নেয়া উচিত।

\* যদি হাসপাতালের চিকিৎসার প্রয়োজন না হয়ে থাকে, তবে সেদিনই ডাক্তার দেখিয়ে নেয়ার চেষ্টা করবেন।

\* অ্যাজমা অ্যাটাকের জন্য যাদের হাসপাতালে ভর্তি হতে হয়, তাদের অনেকেরই আবার ২ সপ্তাহের মধ্যে একই কারণে হাসপাতালে ভর্তির প্রয়োজন হয়।

\* তাই পরবর্তী অ্যাটাক ঠেকাতে আপনার করণীয় সম্পর্কে আলোচনা করা জরুরি৷

\* আপনার চিকিৎসাপদ্ধতি বা জীবনধারায় কোন ধরনের পরিবর্তনের প্রয়োজন আছে কিনা সে বিষয়ে আপনার ডাক্তারের সাথে আলোচনা করুন। যেমন, আপনার ওষুধের ডোজ পরিবর্তনের প্রয়োজন হতে পারে বা সঠিকভাবে ইনহেলার ব্যবহারের পদ্ধতি আবার ঝালাই করে নিতে হতে পারে।

ID: 28

Context: অ্যাজমা অ্যাটাক প্রতিরোধ

Question: কীভাবে অ্যাজমা অ্যাটাক প্রতিরোধ করা যায়?

Answer:

নিম্নোক্ত উপায়গুলো অবলম্বন করলে আপনার অ্যাজমা অ্যাটাকে আক্রান্ত হওয়ার সম্ভাবনা কমে আসতে পারে।

\* আপনার অ্যাজমার চিকিৎসা নিয়ম মত মেনে চলুন এবং প্রেসক্রিপশন অনুযায়ী ওষুধগুলো সময়মত সেবন করুন।

\* বছরে কমপক্ষে একবার আপনার হাঁপানি চিকিৎসা বিষয়ে ডাক্তারের সাথে আলোচনা করে নিন৷

\* আপনার ডাক্তারের কাছ থেকে নিশ্চিত হয়ে নিন যে আপনি ইনহেলার সঠিক কায়দায় ব্যবহার করতে পারছেন।

\* যে সমস্ত বিষয় আপনার লক্ষণগুলো বাড়িয়ে দেয়, সেগুলো যথাসম্ভব এড়িয়ে চলুন।যদি আপনার লক্ষণসমূহ খারাপ হতে থাকে বা আপনার ঘন ঘন ইনহেলার ব্যবহারের প্রয়োজন হয়, তবে এ বিষয়ে সতর্ক হোন। আপনার নির্ধারিত চিকিৎসা পদ্ধতি সঠিকভাবে মেনে চলুন এবং লক্ষণগুলো খারাপ হতে থাকলে জরুরি ভিত্তিতে ডাক্তারের শরণাপন্ন হন৷

ID: 29

Context: অ্যাপেন্ডিসাইটিস

Question: অ্যাপেন্ডিসাইটিস কি?

Answer:

অ্যাপেন্ডিসাইটিস হলো আমাদের দেহের ‘অ্যাপেন্ডিক্স’ নামক একটি অংশের রোগ। অ্যাপেন্ডিসাইটিস হলো আমাদের দেহের ‘অ্যাপেন্ডিক্স’ নামক একটি অংশের রোগ। অ্যাপেন্ডিক্স একটি ছোটো সরু থলের মত অংশ। আকারে দুই থেকে চার ইঞ্চি লম্বা হয়ে থাকে। এটি সাধারণত তলপেটের ডানদিকে থাকে। আমাদের নাড়িভুঁড়ির যে অংশে পায়খানা তৈরি হয়, তার সাথে এটি সংযুক্ত থাকে।কখনো কখনো এই থলেতে জ্বালাপোড়া/প্রদাহ হয়ে তা ফুলে ওঠে এবং ব্যথা হয়। তখন সেই অবস্থাকে অ্যাপেন্ডিসাইটিস বলা হয়৷আমাদের শরীরে ‘অ্যাপেন্ডিক্স’ এর সুনির্দিষ্ট ভূমিকা সম্পর্কে এখনো জানা যায়নি। তবে কোনো অসুস্থতার জন্য অপারেশনের মাধ্যমে অ্যাপেন্ডিক্স ফেলে দেওয়া ক্ষতিকর নয়।

ID: 30

Context: অ্যাপেন্ডিসাইটিস এর লক্ষণ

Question: অ্যাপেন্ডিসাইটিস এর লক্ষণ সমূহ কি?

Answer:

অ্যাপেন্ডিসাইটিস এর লক্ষণ সমূহ ঃ\* অ্যাপেন্ডিসাইটিস হলে শুরুতে সাধারণত পেট ব্যথা হয়। পেটের মাঝখানের দিকে (নাভির আশেপাশে) এই ব্যথা শুরু হয়ে থাকে।প্রথমে ব্যথাটি আসা-যাওয়া করতে থাকে। কয়েক ঘণ্টার মধ্যে এই ব্যথা তলপেটের ডানদিকে গিয়ে স্থির হয়, যেখানে সাধারণত অ্যাপেন্ডিক্স অবস্থিত থাকে। তখন অনবরত তীব্র ব্যথা দেখা দেয়। এই পর্যায়ে ব্যথা আর আগের মতো আসা-যাওয়া করে না।যেখানে ব্যথা হচ্ছে সেখানে চাপ দিলে অথবা কাশি দিলে কিংবা হাঁটাচলা করলে ব্যথা আরও বেড়ে যেতে পারে।

\* খাবারে অরুচি।

\* বমি বমি ভাব অথবা বমি হওয়া।

\* কোষ্ঠকাঠিন্য অথবা ডায়রিয়া।

ID: 31

Context: অ্যাপেন্ডিসাইটিস যাদের হয়

Question: অ্যাপেন্ডিসাইটিস কাদের হয়?

Answer:

অ্যাপেন্ডিসাইটিস একটি কমন রোগ। যেকোনো বয়সেই মানুষ অ্যাপেন্ডিসাইটিসে আক্রান্ত হতে পারে। তবে সাধারণত ১০ থেকে ২০ বছর বয়সীদের এই রোগে আক্রান্ত হতে দেখা যায়।

ID: 32

Context: অ্যাপেন্ডিসাইটিস হওয়ার কারণ

Question: অ্যাপেন্ডিসাইটিস হওয়ার কারণ কি?

Answer:

ঠিক কী কারণে অ্যাপেন্ডিসাইটিস হয়ে থাকে তা পরিষ্কার নয়। তবে অনেক সময় অ্যাপেন্ডিক্সের মুখে কোনো কিছু আটকে গেলে সেখান থেকে এই সমস্যার সূত্রপাত হতে পারে।‘অ্যাপেন্ডিক্স’ থলেটি নাড়িভুঁড়ির সাথে যুক্ত একটি অংশ। থলেটি যেখানে সংযুক্ত থাকে সেই পথে কোনোকিছু জমে থলের মুখটি আটকে যেতে পারে। যেমন—নাড়িভুঁড়িতে তৈরি হওয়া পায়খানার ছোটো একটি দলা জমে থলের মুখটি আটকে যেতে পারে নাড়িভুঁড়ির দেয়ালে সাধারণত কিছু গ্রন্থি থাকে যেগুলো রোগ প্রতিরোধে ভূমিকা রাখে। কোনো ইনফেকশন (যেমন: শ্বাসনালীর ইনফেকশন) এর কারণে এসব গ্রন্থি ফুলে উঠতে পারে। এ কারণেও অ্যাপেন্ডিক্সের মুখ বন্ধ হয়ে যেতে পারে। অ্যাপেন্ডিক্সের মুখ আটকে গেলে এতে প্রদাহ হতে পারে এবং ফুলে যেতে পারে। ফলে অ্যাপেন্ডিক্সের ভেতরে চাপ বাড়তে পারে এবং এক পর্যায়ে অ্যাপেন্ডিক্স ফেটে যেতে পারে।যেহেতু এখনো অ্যাপেন্ডিসাইটিস এর পেছনের সুনির্দিষ্ট কারণ জানা যায়নি তাই ঠিক কী উপায়ে এই রোগ প্রতিরোধ করা যায় তা নিশ্চিতভাবে এখনো বলা সম্ভব নয়।

ID: 33

Context: অ্যাপেন্ডিসাইটিস হলে যখন ডাক্তারের কাছে যেতে হবে

Question: অ্যাপেন্ডিসাইটিস হলে কখন ডাক্তারের কাছে যাবেন?

Answer:

পেটের ব্যথা যদি ধীরে ধীরে বাড়তে থাকে তবে দেরি না করে ডাক্তার দেখানো উচিত। নিচের দুটি ক্ষেত্রে জরুরি ভিত্তিতে রোগীকে হাসপাতালে নিয়ে যেতে হবে—

\* পেটের ব্যথা যদি হঠাৎ করেই অনেক বেড়ে গিয়ে পুরো পেটে ছড়িয়ে পড়ে।

\* পেটের ব্যথা কিছুক্ষণের জন্য কমে গিয়ে এরপর আবার বেড়ে যায়ব্যথা যদি কিছুক্ষণের জন্য কমে গিয়ে এরপর আবার বেড়ে যায়, তাহলে সেটি অ্যাপেন্ডিক্স ফেটে যাওয়ার লক্ষণ হতে পারে। অ্যাপেন্ডিক্স ফেটে গেলে বিভিন্ন মারাত্মক জটিলতা দেখা দিতে পারে। এমনকি রোগীর মৃত্যু হতে পারে। তাই এসব লক্ষণ দেখা দিলে যত দ্রুত সম্ভব রোগীকে হাসপাতালে নিয়ে যেতে হবে।

ID: 34

Context: অ্যাপেন্ডিসাইটিস এর চিকিৎসা

Question: অ্যাপেন্ডিসাইটিস এর চিকিৎসা কিভাবে করা হয়?

Answer:

অ্যাপেন্ডিসাইটিস হলে সাধারণত অপারেশনের মাধ্যমে দ্রুত রোগীর অ্যাপেন্ডিক্স কেটে ফেলে দেওয়া প্রয়োজন। অ্যাপেন্ডিক্স কেটে বা সরিয়ে ফেলার অপারেশনের নাম ‘অ্যাপেন্ডিসেকটোমি’ বা ‘অ্যাপেন্ডেকটোমি’। এটি বেশ কমন একটি অপারেশন। এই অপারেশনটি দুটি পদ্ধতিতে করা যায়—

\* ওপেন সার্জারি: সাধারণত অ্যাপেন্ডিক্স ফেটে গেলে বা অন্য কোনো জটিলতা থাকলে সরাসরি পেট কেটে অপারেশন করার প্রয়োজন হয়। এই পদ্ধতিকে বলা হয় ওপেন সার্জারি।

\* ল্যাপারোস্কোপি: এই পদ্ধতিতে সরাসরি পেট কাটার পরিবর্তে পেটে তিন-চারটি ছোটো ফুটো করা হয়। এসব ছিদ্র দিয়ে প্রয়োজনীয় যন্ত্র ঢুকিয়ে অপারেশন করা হয়।অপারেশনের পর পুরোপুরি সুস্থ হতে সাধারণত কয়েক সপ্তাহ সময় লাগে। তবে ওপেন সার্জারির পরে কমপক্ষে ৬ সপ্তাহ ভারী কাজ এড়িয়ে চলার পরামর্শ দেওয়া হয়ে থাকে।

ID: 35

Context: ইউরিন ইনফেকশন বা প্রস্রাবের সংক্রমণ

Question: ইউরিন ইনফেকশন বা প্রস্রাবের সংক্রমণ কী?

Answer:

ইউরিন ইনফেকশন খুবই পরিচিত একটি রোগ। এই রোগে প্রস্রাবের রাস্তায় জ্বালাপোড়া অথবা ঘনঘন প্রস্রাব হওয়াসহ নানান রকম লক্ষণ দেখা দিতে পারে। কিছু নিয়মকানুন মেনে চললে এবং সঠিক সময়ে সঠিক চিকিৎসা নিলে এই রোগ থেকে সহজেই পরিত্রাণ পাওয়া সম্ভব।

ID: 36

Context: ইউরিন ইনফেকশন বা প্রস্রাবের সংক্রমণ

Question: ইউরিন ইনফেকশন কী?

Answer:

আমাদের শরীর থেকে বর্জ্য ও অতিরিক্ত পানি প্রস্রাব হিসেবে বেরিয়ে যায়। প্রস্রাব বেরিয়ে যাওয়ার এই ব্যবস্থার সাথে সম্পর্কিত অঙ্গগুলো নিয়ে আমাদের মূত্রতন্ত্র গঠিত। মূত্রতন্ত্রের মধ্যে থাকে দুটি কিডনি, দুটি ইউরেটার, একটি মূত্রথলি বা ব্লাডার ও একটি মূত্রনালী।মূত্রতন্ত্রের কোনো অংশে জীবাণুর সংক্ৰমণ হলে সেটিকে ইউরিন ইনফেকশন বা প্রস্রাবের সংক্ৰমণ বলে। ডাক্তারি ভাষায় একে ‘ইউরিনারি ট্র্যাক্ট ইনফেকশন’ বা ‘ইউটিআই’ বলা হয়।

ID: 37

Context: ইউরিন ইনফেকশনের লক্ষণ

Question: ইউরিন ইনফেকশনের লক্ষণ কী কী?

Answer:

ইউরিন ইনফেকশনের সবচেয়ে কমন লক্ষণগুলোর মধ্যে রয়েছে—

\* প্রস্রাবের সময়ে ব্যথা অথবা জ্বালাপোড়া হওয়া।

\* স্বাভাবিকের চেয়ে ঘন ঘন প্রস্রাব হওয়া।

\* রাতে বারবার প্রস্রাবের বেগ আসা।

\* অস্বাভাবিক গন্ধযুক্ত অথবা ঘোলাটে প্রস্রাব হওয়া।

\* হঠাৎ প্রস্রাবের বেগ আসা অথবা বেগ ধরে রাখতে সমস্যা হওয়া।

\* তলপেটে ব্যথা হও।

\* প্রস্রাবের সাথে রক্ত যাওয়া।

\* কোমরের পেছনে পাঁজরের ঠিক নিচের অংশে ব্যথা হওয়া।

\* জ্বর আসা কিংবা গা গরম লাগা এবং শরীরে কাঁপুনি হওয়া।

\* শরীরের তাপমাত্রা ৩৬° সেলসিয়াস বা ৯৬.৮° ফারেনহাইট এর চেয়ে কমে যাওয়া।

ID: 38

Context: ইউরিন ইনফেকশনের কারণ

Question: ইউরিন ইনফেকশনের কারণ কী?

Answer:

সাধারণত পায়খানায় থাকা বিভিন্ন জীবাণু মূত্রতন্ত্রে প্রবেশ করে ইউরিন ইনফেকশন ঘটায়। প্রস্রাবের রাস্তা বা মূত্রনালী দিয়ে এসব জীবাণু মূত্রতন্ত্রে প্রবেশ করে।নারী-পুরুষভেদে সবারই প্রস্রাবের ইনফেকশন হতে পারে। তবে নারীদের মধ্যে এই রোগের সংক্ৰমণ হওয়ার প্রবণতা বেশি। এর কারণ হলো, নারীদের মূত্রনালী পুরুষদের মূত্রনালীর তুলনায় দৈর্ঘ্যে অনেক ছোটো।এ ছাড়া নারীদের মূত্রনালী পায়ুপথের খুব কাছাকাছি অবস্থিত। ফলে ব্যাকটেরিয়া পায়ুপথ থেকে মূত্রনালীতে প্রবেশ করে প্রস্রাবের সংক্ৰমণ ঘটানোর সম্ভাবনা বেড়ে যায়।যেসব কারণে ইউরিন ইনফেকশনের সম্ভাবনা বেড়ে যায়—

\* পর্যাপ্ত পানি পান না করলে।

\* মূত্রতন্ত্রের স্বাভাবিক প্রবাহে বাধা সৃষ্টি করে এমন রোগ হলে। যেমন: কিডনিতে পাথর হওয়া।

\* যৌনাঙ্গ পরিষ্কার ও শুকনো না রাখলে।

\* যেকোনো কারণে রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা কমে গেলে। যেমন—

\* টাইপ ২ ডায়াবেটিস অথবা এইচআইভি আক্রান্ত হলে

\* কেমোথেরাপি অথবা দীর্ঘদিন ধরে স্টেরয়েড জাতীয় ঔষধ সেবনকালে

\* গর্ভবতী হলে

\* মূত্রথলি পুরোপুরি খালি করতে বাধা সৃষ্টি করে এমন রোগ হলে। যেমন: পুরুষদের ‘প্রস্টেট গ্রন্থি’ বড় হয়ে যাওয়া, শিশুদের কোষ্ঠকাঠিন্য অথবা স্নায়ুতন্ত্রের কোনো অসুখ

\* মাসিক চিরতরে বন্ধ হয়ে গেলে। এই ঘটনাকে ‘মেনোপজ’ বলা হয়। এক্ষেত্রে ইস্ট্রোজেন নামক হরমোন কমে যাওয়ায় সংক্ৰমণ প্রবণতা বেড়ে যায়

\* যৌন সহবাস করলে

\* প্রস্রাবের রাস্তায় নল বা ক্যাথেটার পরানো থাকলে

\* ইতঃপূর্বে প্রস্রাবের ইনফেকশন হয়ে থাকলে উল্লেখ্য, ইউরিন ইনফেকশন ছোঁয়াচে নয়। এটি যৌন সহবাসের মাধ্যমে ছড়ায় না। কিন্তু সহবাসের সময়ে ঘর্ষণের কারণে জীবাণু মূত্রনালীতে প্রবেশ করতে পারে কিংবা ইতোমধ্যে মূত্রনালীতে থাকা জীবাণু আরও ভেতরে চলে যেতে পারে।

ID: 39

Context: ইউরিন ইনফেকশনের চিকিৎসা

Question: ইউরিন ইনফেকশনের চিকিৎসা কী?

Answer:

ইউরিন ইনফেকশনের লক্ষণ দেখা দিলে সেগুলো উপেক্ষা না করে একজন ডাক্তারের পরামর্শ নিন। ডাক্তার প্রস্রাব পরীক্ষা করানোর পাশাপাশি প্রয়োজনবোধে উপযুক্ত অ্যান্টিবায়োটিক সেবনের পরামর্শ দিতে পারেন।অ্যান্টিবায়োটিকের সম্পূর্ণ কোর্স শেষ করা গুরুত্বপূর্ণ। লক্ষণগুলো কমে আসতে শুরু করলেও প্রেসক্রিপশন অনুযায়ী ঔষধের কোর্স সম্পন্ন করতে হবে।সাধারণত ঔষধ খাওয়া শুরু করার দুই-তিন দিনের মধ্যে লক্ষণগুলো কমতে শুরু করে। যদি ঔষধের কোর্স সম্পন্ন করার পরেও লক্ষণের উন্নতি না হয় তাহলে দ্রুত ডাক্তারের পরামর্শ নেওয়া জরুরি।বিশেষ দ্রষ্টব্য: গর্ভাবস্থায় চিকিৎসা নেওয়ার ক্ষেত্রে যথেষ্ট সতর্কতা অবলম্বন করতে হবে এবং ডাক্তারের সকল পরামর্শ মেনে চলতে হবে।কতদিন ঔষধ সেবন করতে হয়?সাধারণ ইউরিন ইনফেকশন হলে বেশিরভাগ ক্ষেত্রে তিন দিন থেকে এক সপ্তাহ অ্যান্টিবায়োটিক সেবনের পরামর্শ দেওয়া হয়। তবে ইনফেকশনের কারণ ও ধরনের ওপর ভিত্তি করে আরও বেশি সময় ধরে চিকিৎসা চালিয়ে যাওয়া প্রয়োজন হতে পারে। ক্ষেত্রবিশেষে কয়েক মাস ধরে অ্যান্টিবায়োটিক সেবন করতে হতে পারে।গুরুতর ইউরিন ইনফেকশন হলে রোগীকে পরীক্ষা-নিরীক্ষা ও চিকিৎসার জন্য হাসপাতালে পাঠানো হয়। এক্ষেত্রে কিছুদিন হাসপাতালে ভর্তি থেকে চিকিৎসা নেওয়ার প্রয়োজন হতে পারে।ইউরিন ইনফেকশন উপেক্ষা করলে সেটি খুব সহজেই গুরুতর রূপ ধারণ করতে পারে। তাই লক্ষণগুলোর ব্যাপারে সচেতন থাকা উচিত।ইউরিন ইনফেকশনের ঘরোয়া চিকিৎসাইউরিন ইনফেকশন তেমন গুরুতর না হলে রোগী কয়েকদিনের মধ্যেই সুস্থ হয়ে ওঠে। ডাক্তারের পরামর্শ মেনে চলার পাশাপাশি ঘরোয়াভাবে নিচের উপদেশগুলো মেনে চলতে পারেন—ব্যথা ও জ্বর কমাতে প্যারাসিটামল খাওয়া যায়। প্রস্রাবের ইনফেকশনের ব্যথা কমাতে অন্যান্য ঔষধের তুলনায় প্যারাসিটামল অধিক কার্যকর।

\* শিশুদের প্যারাসিটামল সিরাপ খাওয়ানো যেতে পারে। শিশুকে প্যারাসিটামল খাওয়ানোর নিয়ম জানতে শিশুদের জন্য প্যারাসিটামল আর্টিকেলটি পড়ুন।

\* পর্যাপ্ত বিশ্রাম নিতে হবে এবং প্রচুর পানি পান করতে হবে। এমন পরিমাণে পানি পান করা উচিত যেন নিয়মিত স্বচ্ছ ও হালকা হলুদ রঙের প্রস্রাব হয়। নিয়মিত প্রস্রাব করলে সেটি শরীর থেকে ব্যাকটেরিয়া বের করে দিতে সাহায্য করে।

\* পেটে, পিঠে ও দুই উরুর মাঝে গরম সেঁক নেওয়া যায়। এটি অস্বস্তি উপশমে সাহায্য করতে পারে।

\* সুস্থ না হওয়া পর্যন্ত যৌন সহবাস থেকে বিরত থাকা ভালো। ইউরিন ইনফেকশন ছোঁয়াচে না হলেও ইনফেকশন থাকা অবস্থায় যৌন সহবাস অস্বস্তিকর হতে পারে।কিডনি রোগ, হৃদরোগ অথবা প্রস্রাব ধরে রাখতে না পারার মতো বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে দৈনিক কতটুকু পানি পান করা নিরাপদ সেটি ডাক্তারের কাছ থেকে জেনে নিতে হবে।বারবার ইউরিন ইনফেকশন হওয়াচিকিৎসা নেওয়ার পরে আবারও ইউরিন ইনফেকশন হলে বিভিন্ন ধরনের পরীক্ষা-নিরীক্ষা করানোর প্রয়োজন হয়। এক্ষেত্রে বিশেষ অ্যান্টিবায়োটিক সেবনের পরামর্শ দেওয়া হতে পারে।মেনোপজের কারণে প্রস্রাবে জ্বালাপোড়া হলে মাসিকের রাস্তায় ইস্ট্রোজেন ক্রিম ব্যবহারের পরামর্শ দেওয়া হতে পারে।

ID: 40

Context: ইউরিন ইনফেকশনের জন্য কী কী জটিলতা

Question: ইউরিন ইনফেকশনের জন্য কী কী জটিলতা হয়?

Answer:

ইউরিনের ইনফেকশনের চিকিৎসা না করা হলে বিভিন্ন জটিলতা সৃষ্টি হতে পারে। যেমন-

\* ইনফেকশন কিডনিতে পৌঁছে গেলে কিডনির স্থায়ী ক্ষতি হতে পারে।

\* ইনফেকশন রক্তে ছড়িয়ে পড়লে ‘সেপসিস’ নামক মারাত্মক জটিলতা দেখা দিতে পারে। রোগীর জীবন বিপন্ন হতে পারে।

\* পুরুষদের ক্ষেত্রে বারবার সংক্ৰমণ হলে মূত্রনালি সরু হয়ে যেতে পারে। এতে মূত্রতন্ত্রের জটিলতার পাশাপাশি যৌন ও প্রজনন সংক্রান্ত সমস্যা হতে পারে।

\* গর্ভবতী মায়েদের ক্ষেত্রে কিডনির ইনফেকশনসহ নানান জটিলতা দেখা দিতে পারে। যেমন: জন্মের সময়ে শিশুর ওজন কম হওয়া ও নির্ধারিত সময়ের অনেক আগেই বাচ্চা প্রসব (প্রিম্যাচুর বেবি) হয়ে যাওয়া।

ID: 41

Context: ইউরিন ইনফেকশন প্রতিরোধ

Question: ইউরিন ইনফেকশন প্রতিরোধ কীভাবে করা যায়?

Answer:

প্রস্রাবের ইনফেকশন সবসময় প্রতিরোধ করা সম্ভব না হলেও কিছু নিয়ম মেনে চললে ইনফেকশন হওয়ার প্রবণতা কমিয়ে আনা যায়।যা করবেন-

\* টয়লেটে টিস্যু ব্যবহারের সময়ে সামনে থেকে পেছনে পরিষ্কার করুন।

\* যৌনাঙ্গ শুকনো ও পরিষ্কার রাখুন।

\* প্রচুর পানি পান করুন। দৈনিক কমপক্ষে ছয় থেকে আট গ্লাস পানি পান করা উচিত।

\* বাথটাব বা পুকুরে গোসল করার পরিবর্তে শাওয়ার কিংবা বালতির সাহায্যে গোসল করুন।

\* প্রস্রাব করার সময়ে মূত্রথলি সম্পূর্ণ খালি করার চেষ্টা করুন।

\* সহবাসের আগে ও পরে যৌনাঙ্গ পানি দিয়ে ধুয়ে ফেলুন।

\* সহবাসের পরে যত তাড়াতাড়ি সম্ভব প্রস্রাব করুন।

\* সুতি কাপড়ের ঢিলেঢালা অন্তর্বাস ব্যবহার করুন।

\* এক থেকে তিন বছর বয়সী বাচ্চার ডায়পার বা কাপড়ের ন্যাপি নিয়মিত পরিবর্তন করুন।

ID: 42

Context: উচ্চ রক্তচাপ

Question: উচ্চ রক্তচাপ কি?

Answer:

উচ্চ রক্তচাপ বা হাই ব্লাড প্রেসার বা হাইপারটেনশন একটি অতি পরিচিত রোগ। সময়মত রোগ নির্ণয় ও চিকিৎসা না করা হলে, উচ্চ রক্তচাপ হার্ট অ্যাটাক ও স্ট্রোকের মত মারাত্মক স্বাস্থ্য সমস্যা সৃষ্টি করতে পারে। অনেক প্রাপ্তবয়স্ক ব্যক্তি উচ্চ রক্তচাপে ভুগলেও তারা সেই সম্পর্কে অবগত থাকেন না। গবেষণায় দেখা গিয়েছে, উচ্চ রক্তচাপে আক্রান্ত প্রায় অর্ধেক রোগীই জানেন না যে তারা এ রোগে ভুগছেন। উচ্চ রক্তচাপ থাকা সত্ত্বেও, একজন ব্যক্তি প্রয়োজনীয় চিকিৎসা নিয়ে ঝুঁকিমুক্ত স্বাভাবিক জীবনযাপন করতে পারে। এ ছাড়াও সুস্থ ব্যক্তির ক্ষেত্রে জীবনধারায় কিছু পরিবর্তন আনার মাধ্যমে সহজেই উচ্চ রক্তচাপে আক্রান্ত হওয়ার ঝুঁকি কমানো যায়।

ID: 43

Context: উচ্চ রক্তচাপের লক্ষণসমূহ

Question: উচ্চ রক্তচাপের লক্ষণসমূহ কি কি?

Answer:

সাধারণত হাই প্রেসার এর বিশেষ কোনো লক্ষণ থাকে না। রক্তচাপ নিয়ন্ত্রণে আছে কি না তা বোঝার উপায় হলো নিয়মিত রক্তচাপ মাপা। রক্তচাপ মাপার ক্ষেত্রে রক্ত মাপার যন্ত্র দ্বারা দুইটি সংখ্যা রেকর্ড করা হয়—

\* সিস্টোলিক প্রেসার বা চাপ: দুটি রিডিং এর মধ্যে বড় সংখ্যা বা ওপরের মানটি হলো সিস্টোলিক চাপ। হৃৎপিণ্ড থেকে প্রতি স্পন্দনে সারা শরীরে রক্ত সঞ্চালনের সময়ে এই চাপ সৃষ্টি হয়।

\* ডায়াস্টোলিক প্রেসার বা চাপ: রিডিং দুটির মধ্যে ছোট সংখ্যা বা নিচের মানটি হলো ডায়াস্টোলিক চাপ। রক্ত সঞ্চালনের বিরুদ্ধে রক্তনালীর বাধা থেকে এই চাপের সৃষ্টি।

রক্তচাপকে মিলিমিটার (পারদ) বা mmHg এককে মাপা হয়। ধরে নেওয়া যাক আপনার রক্তচাপ ১২০/৮০ মিলিমিটার (পারদ)। তাহলে সিস্টোলিক চাপ হবে ১২০ এবং ডায়াস্টোলিক চাপ হবে ৮০।মানুষের রক্তচাপ একে অপরের থেকে কিছুটা ভিন্ন হয়ে থাকে। একজনের জন্য যেই রক্তচাপ বেশি বা কম, তা অন্যজনের ক্ষেত্রে স্বাভাবিক হতে পারে।

রক্তচাপ যদি ৯০/৬০ থেকে ১২০/৮০—এই সীমার মধ্যে থাকে তাহলে তা স্বাভাবিক রক্তচাপ হিসেবে বিবেচনা করা হয়।সাধারণত উচ্চ রক্তচাপ বলা হয় যদি—রক্তচাপ সবসময় ১৪০/৯০ বা এর বেশি থাকে। ৮০ বছর বা তার অধিক বয়সীদের ক্ষেত্রে রক্তচাপ যদি ১৫০/৯০ বা এর বেশি থাকে।

ID: 44

Context: রক্তচাপ বেড়ে যাওয়ার কারণ

Question: রক্তচাপ বেড়ে যাওয়ার কারণ কি কি হতে পারে?

Answer:

উচ্চ রক্তচাপের নির্দিষ্ট কারণটি সবসময় চিহ্নিত করা যায় না। তবে বিভিন্ন কারণে এই সমস্যার ঝুঁকি বেড়ে যেতে পারে। উচ্চ রক্তচাপের ঝুঁকিগুলোর মধ্যে রয়েছে—

\* ওজন স্বাভাবিকের চেয়ে বেশি হওয়া।

\* অতিরিক্ত লবণ খাওয়া।

\* খাবারের তালিকায় যথেষ্ট পরিমাণে শাকসবজি ও ফলমূল না থাকা।

\* অতিরিক্ত পরিমাণে মদপান করা।

\* অতিরিক্ত চা-কফি, কোমল পানীয় ও অন্যান্য ক্যাফেইন-জাতীয় পানীয় খাওয়ার অভ্যাস থাকা।

\* পর্যাপ্ত শারীরিক পরিশ্রম না করা।

\* ধূমপান করা।

\* রাতে একটানা ৬-৮ ঘণ্টার চেয়ে কম ঘুমানো।

\* বয়স পঁয়ষট্টি বছরের ঊর্ধ্বে হওয়া।

\* পরিবারে বাবা, মা, ভাই-বোনের মত নিকট আত্মীয়দের হাই ব্লাড প্রেশার থাকা।

ID: 45

Context: উচ্চ রক্তচাপের ঝুঁকি

Question: উচ্চ রক্তচাপের ঝুঁকি কি কি হতে পারে?

Answer:

রক্তচাপ ১২০/৮০ থেকে ১৪০/৯০ এর মাঝে থাকলে ভবিষ্যতে উচ্চ রক্তচাপ হওয়ার ঝুঁকি অনেক বেড়ে যায়। তাই রক্তচাপ নিয়ন্ত্রণে রাখার জন্য সময়মতো যথাযথ পদক্ষেপ নেওয়া প্রয়োজন। তা না হলে এই ঝুঁকি রয়ে যায়, এমনকি তা দিন দিন বাড়তে থাকে।রক্তচাপ স্বাভাবিকের তুলনায় অত্যধিক বেড়ে গেলে তা রোগীর রক্তনালী, হৃৎপিণ্ড, মস্তিষ্ক, কিডনি ও চোখের মত অঙ্গে অতিরিক্ত চাপ সৃষ্টি করে। রক্তচাপ একটানা অনিয়ন্ত্রিত থাকলে মারাত্মক ও প্রাণঘাতী কিছু রোগের ঝুঁকি বেড়ে যায়। যেমন—

\* হৃদরোগ।

\* হার্ট অ্যাটাক।

\* স্ট্রোক।

\* হার্ট ফেইলিউর (Heart Failure)।

\* কিডনির সমস্যা।

\* পায়ে রক্ত চলাচল কমে যাওয়া (Peripheral Artery Disease)। ফলস্বরূপ গ্যাংগ্রিন বা পচা ঘা হতে পারে।

\* অ্যাওর্টা নামক দেহের বৃহত্তম ধমনীর রোগ (Aortic Aneurysms)।

\* মস্তিষ্কে রক্ত সরবরাহ কমে যাওয়ার কারণে সৃষ্ট ডিমেনশিয়া (Vascular Dementia) রক্তচাপ যৎসামান্য কমানোর মাধ্যমেও এসব ঝুঁকি কমিয়ে আনা সম্ভব।

ID: 46

Context: উচ্চ রক্তচাপ কমানোর উপায়

Question: উচ্চ রক্তচাপ কমানোর উপায় কি কি?

Answer:

নিয়মিত উচ্চ রক্তচাপ দেখা দিলে রক্তচাপ নিয়ন্ত্রণে রাখার জন্য সময়মতো যথাযথ পদক্ষেপ নেওয়া প্রয়োজন। তা না হলে এই ঝুঁকি রয়ে যায়, এমনকি তা দিন দিন বাড়তে থাকে।রক্তচাপ নিয়ন্ত্রণে রাখতে ডাক্তাররা দুটি পথ অবলম্বনের পরামর্শ দেন। প্রথমে জীবনধারায় স্বাস্থ্যকর পরিবর্তন আনার উপদেশ দেওয়া হয়। এভাবে রক্তচাপ নিয়ন্ত্রণে না আসলে সুস্থ জীবনধারা মেনে চলার পাশাপাশি ঔষধ সেবনের পরামর্শ দেওয়া হয়। তবে রোগ নির্ণয়ের সময়ে যদি প্রেসার অনেক বেশি থাকে তাহলে শুরুতেই জীবনধারা পরিবর্তনের পাশাপাশি ঔষধ সেবনের পরামর্শ দেওয়া হয়।জীবনধারায় স্বাস্থ্যকর পরিবর্তন আনলে তা উচ্চ রক্তচাপে আক্রান্ত হওয়ার সম্ভাবনা কমায়। এছাড়া ইতোমধ্যে উচ্চ রক্তচাপ হয়ে থাকলে সেটিও নিয়ন্ত্রণেও সহায়তা করে।বিভিন্ন রোগীর রক্তচাপ নিয়ন্ত্রণে ভিন্ন ভিন্ন পদ্ধতি কার্যকর হতে পারে। আপনার জন্য কোন পদ্ধতিটি সবচেয়ে উপযুক্ত তা জানতে একজন বিশেষজ্ঞ ডাক্তারের পরামর্শ নিন। জীবনধারার কিছু স্বাস্থ্যকর পরিবর্তন উচ্চ রক্তচাপ প্রতিরোধ করতে এবং বেড়ে যাওয়া রক্তচাপ কমিয়ে আনতে সাহায্য করে। এমন কিছু পরিবর্তন হলো—

\* খাবারে লবণের পরিমাণ কমানো।

\* স্বাস্থ্যকর খাবারের অভ্যাস তৈরি করা।

\* মদপান কমিয়ে ফেলা।

\* অতিরিক্ত ওজন কমানো।

\* নিয়মিত ব্যায়াম করা।

\* অতিরিক্ত ক্যাফেইনযুক্ত পানীয় পান করা থেকে বিরত থাকা।

\* ধূমপান ছেড়ে দেওয়া।

উচ্চ রক্তচাপ সনাক্ত হলে রক্তচাপ নিয়ন্ত্রণে রাখতে ডাক্তার রোগীকে এক বা একাধিক ঔষধ সেবনের পরামর্শ দিতে পারেন। সঠিক ঔষধ বেছে নিতে রোগীর রক্তচাপ, বয়স, বর্ণ ও অন্যান্য স্বাস্থ্য সমস্যার ঝুঁকির বিষয়গুলো বিবেচনা করা হয়।ঔষধগুলো সাধারণত ট্যাবলেট আকারে পাওয়া যায় এবং দিনে একবার সেবন করতে পরামর্শ দেওয়া হয়। তবে প্রয়োজনবোধে দিনে দুইবার করে সেবনের পরামর্শও দেওয়া হতে পারে।রক্তচাপ অত্যধিক বেড়ে গেলে তা নিয়ন্ত্রণে আনতে অনেক রোগীকে একাধিক ঔষধ সমন্বয় করে সেবন করতে হতে পারে।যে কাজটি কখনই করবেন না।

শারীরিকভাবে সুস্থ বোধ করলে অনেকে ঔষধ খাওয়া ছেড়ে দেন, বা নিজে নিজে ডোজ কমিয়ে ফেলেন। এই কাজটি একেবারেই অনুচিত। এর ফলে প্রেসার বেড়ে গিয়ে স্ট্রোক, কিডনির রোগ, অন্ধত্বসহ বিভিন্ন জটিল ও জীবনঘাতী স্বাস্থ্য সমস্যা হতে পারে।তাই নিয়মিত সঠিক ডোজে ঔষধ সেবন করা উচিত। ঔষধ সেবনের পাশাপাশি জীবনধারায় সুষম ও পরিমিত খাবার, ব্যায়ামের অভ্যাস, ধূমপান ত্যাগ—এসব স্বাস্থ্যকর পরিবর্তন আনলে রক্তচাপ নিয়ন্ত্রণে রাখা অনেকটাই সহজ হয়ে আসবে।

ID: 55

Context: এক্টোপিক প্রেগন্যান্সি

Question: এক্টোপিক প্রেগন্যান্সি হলে কখন ডাক্তারের কাছে যাবেন?

Answer:

আপনি যদি গর্ভবতী হন আর আপনার এক্টোপিক প্রেগন্যান্সির উপসর্গগুলোর যেকোনটি থাকে, তাহলে প্রেগন্যান্সি টেস্ট পজিটিভ না আসলেও অবশ্যই ডাক্তারের কাছে যেতে হবে। ডাক্তারের কাছে আপনার উপসর্গগুলো খুলে বলুন। এরপরে সাধারণত আপনাকে একটি প্রেগন্যান্সি টেস্ট করতে দেওয়া হবে। ভ্রূণটি জরায়ুর বাইরে বেড়ে উঠছে কিনা তা নিশ্চিত করতে এবং আপনার অবস্থা সঠিকভাবে মূল্যায়ন করতে আপনাকে বিশেষজ্ঞ ডাক্তারের কাছে পাঠানো হতে পারে, ইনি আপনাকে আল্ট্রাসাউন্ড ও রক্ত পরীক্ষা করার পরামর্শ দেবেন, যার মাধ্যমে এক্টোপিক প্রেগন্যান্সি সুনিশ্চিত করা যাবে।

ID: 61

Context: এনাল ফিসার

Question: এনাল ফিসার বা গেজ রোগ কি?

Answer:

এনাল ফিসার একধরণের পায়ুপথের রোগ। পায়খানা করার সময় খুব বেশি জ্বালাপোড়া হওয়া অথবা ছুরির ধারের মত ব্যথা করা। এটি একটি পরিচিত সমস্যা। কারো কারো ক্ষেত্রে এই ব্যথা এতই তীব্র হয় যে নিয়মিত মলত্যাগ করাই তাদের জন্য অসহনীয় হয়ে দাঁড়ায়। এই লক্ষণগুলো সাধারণত এনাল ফিসার রোগের লক্ষণ। বাংলায় এটি গেজ রোগ নামেও পরিচিত। পায়ুপথের রোগ বলে অনেকেই এই সমস্যায় দীর্ঘদিন ভোগা সত্ত্বেও সহজে ডাক্তার দেখাতে চান না। ফলে দিন দিন গেজ রোগ জটিল আকার ধারণ করে। একপর্যায় অপারেশন করা ছাড়া এই রোগ প্রতিকারের উপায় থাকে না। অথচ প্রাথমিক গেজ রোগ সম্পর্কে সচেতন হওয়া গেলে খুব সহজেই এই জটিল পরিস্থিতি এড়ানো সম্ভব।

ID: 62

Context: এনাল ফিসার

Question: এনাল ফিসার কী?

Answer:

পায়ুপথের পেছনের যেই অংশে মল জমা থাকে তার নাম রেক্টাম বা মলাশয়। মলাশয় থেকে মল বা পায়খানা মলদ্বার দিয়ে বের হয়ে আসে। মলদ্বারের মুখের চারপাশে যেই মাংসপেশি থাকে তাতে চাপ প্রয়োগ করে পায়খানার রাস্তার মুখ বন্ধ করা এবং খোলা যায়।মলত্যাগের সময় খুব জোরে চাপ দিলে বা পায়খানা শক্ত হলে মলদ্বারের মুখের চারপাশের চামড়া অনেকসময় ফেটে বা চিড়ে যায়৷ মলদ্বারের এই ক্ষতকে এনাল ফিসার বা গেজ রোগ বলে।গেজ রোগ হলে মলত্যাগের সময় এই ফাটা বা চিড়ে যাওয়া অংশে প্রচণ্ড জ্বালাপোড়া বা তীক্ষ্ণ ব্যথা অনুভব হয়। সেই সাথে পায়ুপথের মাংসপেশি টানটান হয়ে যায়। মাংসপেশি টানটান হলে পায়ুপথের মুখটাও সরু হয়ে আসে বা টাইট হয়ে থাকে। ফলে মলত্যাগের প্রক্রিয়াটি ভীষণ কষ্টকর হয়ে দাঁড়ায়।চিড়ে যাওয়া স্থানে রক্ত প্রবাহ কমে গেলে ফাটল সারতে দীর্ঘদিন সময় লাগতে পারে। এভাবে অনেকের দীর্ঘমেয়াদি বা ক্রনিক এনাল ফিসারের সমস্যা দেখা দেয়।

ID: 63

Context: এনাল ফিসারের লক্ষণগুলো

Question: এনাল ফিসারের লক্ষণগুলো কী কী?

Answer:

\* পায়খানার রাস্তায় তীব্র ও ধারালো ব্যথা হওয়াএনাল ফিসার বা গেজ রোগের সবচেয়ে সাধারণ লক্ষণ হলো মলত্যাগের সময় মলদ্বারে তীব্র ও ধারালো ব্যথা হওয়া। অনেক সময় রোগীদের মনে হয় যেন পায়ুপথ দিয়ে ধারালো কাঁচের টুকরো বের হচ্ছে। এনাল ফিসারের রোগীদের জন্য এই ব্যথাটাই সবচেয়ে যন্ত্রণাদায়ক। সাধারণত পায়খানার পর মলদ্বারে এই জ্বালা কয়েক ঘণ্টা পর্যন্ত থাকতে পারে।

\* পায়খানার সাথে উজ্জ্বল লাল রঙের রক্ত যাওয়াপায়খানার গায়ে বা ব্যবহৃত টয়লেট পেপারে তাজা লাল রক্তের ছোপ দেখা যেতে পারে। শুধুমাত্র চামড়ার কিছু অংশ ছিঁড়ে রক্ত যায় বলে এক্ষেত্রে সাধারণত বেশি রক্তপাত হয় না। যেহেতু পায়ুপথের মুখের কাছাকাছিই এই রক্তক্ষরণ হয়, তাই রক্তের রঙ উজ্জ্বল লাল হয়ে থাকে। আরও ভেতর থেকে রক্তক্ষরণ হলে রক্তের রঙ গাঢ় বা কালচে লাল হতো।

\* পায়ুপথে চুলকানি হওয়াএনাল ফিসার রোগে পায়খানার রাস্তার মুখে চুলকানি হতে পারে।

ID: 64

Context: এনাল ফিসার এর কারন

Question: এনাল ফিসার কেন হয়?

Answer:

গেজ রোগের সবচেয়ে সাধারণ কারণ হলো কষা পায়খানা বা কোষ্ঠকাঠিন্য। পায়খানা শক্ত হলে অনেকে টয়লেটে যেতে চায় না, কারণ তখন মলত্যাগ করতে কিছুটা কষ্ট হয়। কিন্তু পেটের ভেতর পায়খানা জমিয়ে রাখলে সেটা দিন দিন আরও শক্ত থাকে। একসময় সেই শক্ত পায়খানা বের করতে গেলে পায়ুপথের চামড়া ছিঁড়ে গিয়ে দেখা দেয় এনাল ফিসার।গর্ভবতী অবস্থায়, বিশেষ করে শেষ তিন মাসে ও নরমাল ডেলিভারির মাধ্যমে বাচ্চা হওয়ার পরে এনাল ফিসার দেখা দিতে পারে। তবে সেক্ষেত্রে গেজ রোগ হওয়ার পদ্ধতি একটু ভিন্ন।কখনও কখনও ডায়রিয়ার কারণেও গেজ রোগ হতে পারে। আরও কিছু অসুখ বা ওষুধের কারণেও এনাল ফিসার হতে পারে। যে সব রোগের কারণে এনাল ফিসার দেখা দিতে পারে—

\* পরিপাকতন্ত্রের প্রদাহজনিত রোগ বা ইনফ্ল্যামেটরি বাওয়েল ডিজিজ (IBD)

\* কোলোরেক্টাল বা পায়ুপথের ক্যান্সার

\* যৌনরোগ, যেমন, এইচআইভি, সিফিলিস ও হার্পিস সিমপ্লেক্স

\* সোরিয়াসিস নামক ত্বকের প্রদাহজনিত রোগ

\* Pruritus ani নামের পায়ুপথের মুখের চুলকানি রোগ

\* ভাইরাস, ব্যাকটেরিয়া বা ফাঙ্গাস সংঘটিত চর্মরোগযেসব ওষুধ সেবন করলে পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া হিসেবে এনাল ফিসার দেখা দিতে পারে—Angina-জাতীয় বুকের ব্যথায় ব্যবহৃত নিকোর‍ান্ডিল

\* কেমোথেরাপিতে ব্যবহৃত কিছু ওষুধ

\* আফিমজাতীয় ব্যথার ওষুধ (Opioids), যেমন ট্রামাডল, টাপেন্টাডল, মরফিন ও পেথিডিন

ID: 65

Context: মলদ্বারের ব্যথা কমানোর উপায়

Question: মলদ্বারের ব্যথা কমানোর উপায় কি?

Answer:

\* মলত্যাগের পর গরম পানির সেঁক নেয়াএকটি বোলে বা ডিশে কুসুম গরম পানি নিয়ে সেটাতে কিছুক্ষণ বসতে পারেন, যাতে কোমর থেকে মলদ্বার পর্যন্ত পানির নিচে থাকে। কুসুম গরম পানি মলদ্বারের মাংসপেশিকে রিল্যাক্স বা শিথিল করতে সাহায্য করে, ফলে ব্যথা কমে আসে। একে ইংরেজিতে সিটজ ব্যাথ (Sitz bath) বলে।শুধু মলত্যাগ করার পরেই এটি নেওয়া করা যাবে, বিষয়টা এমন নয়। দিনে ২ থেকে ৩ বার গরম পানির সেঁক নেওয়া যায়। একটি গবেষণায় দেখা গেছে, যারা এই পদ্ধতি অবলম্বন করেছে গেজ রোগে তারা বেশ স্বস্তি পেয়েছে।

\* প্যারাসিটামল সেবন করাএনাল ফিসার এর ব্যথা কমানোর ঔষধ হিসেব প্যারাসিটামল খাওয়া যেতে পারে। প্যারাসিটামল সাধারণত ৫০০ মিলিগ্রামের ট্যাবলেট হিসেবে পাওয়া যায়। ব্যথা হলে ২টি ট্যাবলেট, অর্থাৎ, ১০০০ মিলিগ্রাম প্যারাসিটামল একেবারে সেবন করতে পারেন। এভাবে ৪ থেকে ৬ ঘণ্টা পরপর ঔষধ খাওয়া যায়।তবে দিনে যাতে ৮টা ট্যাবলেট, অর্থাৎ, ঔষধের পরিমাণ ৪০০০ মিলিগ্রামের বেশি না হয় সেই বিষয়ে সতর্ক থাকতে হবে। উল্লেখ্য, এই হিসাবটি একজন অন্যথায় সুস্থ, প্রাপ্তবয়স্ক মানুষের জন্য, যার ওজন ৫০ কেজির বেশি। আপনার শারীরিক অবস্থা এমনটা না হলে চিকিৎসকের পরামর্শ নিয়ে প্যারাসিটামলের সঠিক ডোজ জেনে নিতে হবে।প্রয়োজন পড়লে ব্যথার জন্য আইবুপ্রোফেন খাওয়া যায়। তবে রক্তক্ষরণ হলে আইবুপ্রফেন এড়িয়ে চলাই ভালো, কারণ এটি রক্তক্ষরণের ঝুঁকি বাড়ায়।তবে ট্রামাডল ও টাপেন্টাডল জাতীয় ব্যথানাশক এড়িয়ে চলতে হবে। ট্রামাডল-টাপেন্টাডল সেবন করলে কোষ্ঠকাঠিন্য হতে পারে। ইতোমধ্যে কোষ্ঠকাঠিন্যের সমস্যা থাকলে এই জাতীয় ব্যথানাশক সেবনে এই সমস্যা গুরুতর আকার ধারণ করতে পারে৷

\* মলদ্বারের মুখে পেট্রোলিয়াম জেলি-জাতীয় পিচ্ছিল করার পদার্থ প্রয়োগপেট্রোলিয়াম জেলি বা অন্যান্য পিচ্ছিলকারী পদার্থ মলদ্বারের মুখে ব্যবহার করা যায়। এতে মলত্যাগের সময় ছেঁড়া জায়গায় ঘর্ষণের মাধ্যমে ব্যথা অনুভব হওয়ার তীব্রতা কমবে।

\* মলত্যাগের সময় জোরে চাপ দেয়া থেকে বিরত থাকাপায়খানা করার সময় জোরে চাপাচাপি করলে গেজ রোগের জায়গাটি আরও ক্ষতিগ্রস্ত হয়ে ব্যথা তীব্র হয়ে যেতে পারে।

ID: 66

Context: গেজ রোগের ঘরোয়া চিকিৎসা

Question: গেজ রোগের ঘরোয়া চিকিৎসা কি কি?

Answer:

কিছু সাধারণ নিয়ম মেনে চললে এনাল ফিসার প্রতিরোধ করা সম্ভব। এগুলো হলো—

\* পায়খানার বেগ আসলে তা আটকে রাখা যাবে না। এতে পায়খানা শক্ত হয়ে কোষ্ঠকাঠিন্য দেখা দিতে পারে। পরবর্তীতে চাপ দিয়ে পায়খানা করতে গেলে সেখান থেকে এনাল ফিসার দেখা দিতে পারে। পায়খানা খুব শক্ত হলে এনাল ফিসার সারতেও দেরি হয়। তাই পায়খানার চাপ আসলে দেরি না করে টয়লেটে চলে যেতে হবে।তবে এনাল ফিসারের রোগীদের জন্য পায়খানা করার সময় হওয়া প্রচণ্ড ব্যথাটাই সবচেয়ে কষ্টদায়ক। তাই যথাসময়ে মলত্যাগ করার উপদেশ দেওয়া হলেও তা মেনে চলা কঠিন হয়ে পড়ে। এজন্য পায়খানা নরম রাখতে হবে, এবং উপরের ব্যথা কমানোর উপদেশগুলো মেনে চলতে হবে।

\* এনাল ফিসার প্রতিরোধে কোষ্ঠকাঠিন্য দূর করার কোনো বিকল্প নেই৷ এজন্য কিছু বিষয় মেনে চলা জরুরি। যেমন—

\* পর্যাপ্ত পরিমাণে ফাইবার বা আঁশ আছে এমন খাবার খেতে হবে। যেমন – সবুজ শাকসবজি, ফলমূল, ডাল, লাল আটা, লাল চাল ইত্যাদি। কোষ্ঠকাঠিন্য এড়াতে দৈনিক প্রায় ৩০ গ্রাম ফাইবার খাওয়ার পরামর্শ দেয়া হয়। তবে খাবারের তালিকায় ফাইবারের পরিমাণ হুট করে না বাড়িয়ে ধীরে ধীরে বাড়াতে হবে।

\* পর্যাপ্ত পরিমাণে পানি পান করতে হবে। বেশি বেশি ফাইবার এর সাথে পরিমাণ মত পানি না খেলে নানান স্বাস্থ্য সমস্যা দেখা দিতে পারে।

\* কোষ্ঠকাঠিন্য দেখা দিলে ইসবগুলের ভুসি খেতে পারেন। ভুসি খাওয়ার উপকারিতা ও নিয়ম সম্পর্কে জানতে কোষ্ঠকাঠিন্য দূর করতে ইসবগুলের ভুসি লেখাটি পড়তে পারেন।

\* নিয়মিত শরীরচর্চা বা হালকা ব্যায়াম করতে পারেন।পড়ুন: কোষ্ঠকাঠিন্য দূর করার উপায়৩. পায়ুপথ সবসময় পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন ও শুকনো রাখতে হবে। মলত্যাগের পর জোরে ঘষাঘষি না করে আলতোভাবে জায়গাটি পরিষ্কার করে নিতে হবে। এর ফলে গেজ রোগ হলেও তা দ্রুত সেরে উঠবে, এবং ইনফেকশন বা পুঁজ জমে ঘা হওয়ার মতো জটিলতা এড়িয়ে চলা সম্ভব হবে। কখন ডাক্তারের পরামর্শ নিবেন?

\* যদি মনে হয় আপনার পায়ুপথে কোনো ফাটল রয়েছে, বা গেজ রোগের কোনো লক্ষণ রয়েছে, তাহলে দেরি না করে ডাক্তার দেখানো উচিত। অনেকে কবিরাজি বা ভেষজ ওষুধ কিংবা এনাল ফিসার এর হোমিও চিকিৎসা দিয়ে এগুলো সারানোর চেষ্টা করতে করতে অনেক দেরি করে ফেলেন, ফলে রোগটি আরও জটিল আকার ধারণ করে। তাই এগুলোর পেছনে সময় ও অর্থ নষ্ট করে নিজের ক্ষতি করবেন না।

\* বিব্রত বা সংকোচ বোধ করে ডাক্তার দেখানো থেকে বিরত থাকবেন না। এনাল ফিসার একটি কমন সমস্যা৷ ডাক্তাররা প্রতিনিয়তই এমন অসংখ্য রোগীর চিকিৎসা করেন। অধিকাংশ ক্ষেত্রে এনাল ফিসার চিকিৎসা ছাড়াই ভালো হয়ে যায়। তবে ডাক্তারের কাছে গেলে তিনি একই ধরনের উপসর্গযুক্ত অন্য কোনো সমস্যা (যেমন: পাইলস) আছে কিনা তা খতিয়ে দেখতে পারবেন।

\* এছাড়াও যেসব নিয়ম মেনে চললে আপনার এনাল ফিসারের লক্ষণগুলো উপশম হবে এবং পুনরায় গেজ রোগ হওয়া থেকে রক্ষা পাওয়া যাবে, সে ব্যাপারেও তিনি পরামর্শ দিবেন। আমাদের আর্টিকেলে তুলে ধরা পরামর্শগুলোর পাশাপাশি ডাক্তারের পরামর্শ মেনে চললে দ্রুত গেজ রোগ থেকে মুক্তি পাওয়া যাবে।

ID: 67

Context: এনাল ফিসার ও পাইলস-এর পার্থক্য

Question: এনাল ফিসার ও পাইলস-এর মধ্যে কিভাবে পার্থক্য করবেন?

Answer:

এনাল ফিসার ও পাইলসের লক্ষণগুলোর মধ্যে কিছুটা মিল থাকলেও এই দুইটি পৃথক দুইটি রোগ। দুটি রোগেই পায়ুপথে চুলকানি হতে পারে এবং টাটকা লাল রক্ত যেতে পারে। তবে এনাল ফিসারে রক্ত খুব অল্প পরিমাণে যায়। পাইলস এবং এনাল ফিসার এই দুইটির মধ্যে মূল পার্থক্য হচ্ছে—পাইলস হলে পায়ুপথে নরম গোটার মত দেখা দেয়। গোটাগুলো সাধারণত মলত্যাগের পরে বের হয়ে আসে, আবার কিছু সময় পর নিজে নিজেই ভেতরে ঢুকে যায় অথবা আঙ্গুল দিয়ে ভেতরে ঢোকাতে হয়। এছাড়া পাইলস হলে পায়ুপথে শ্লেষ্মার মতো দেখতে পিচ্ছিল কিছু পদার্থ বের হতে পারে।এনাল ফিসার বা গেজ রোগের ক্ষেত্রে সাধারণত এসব লক্ষণ দেখা যায় না। আর এক্ষেত্রে প্রতিবার মলত্যাগের সময়ই তীব্র ব্যথা হয়। পাইলসে সাধারণত ব্যথা হয় না। পাইলস বা অর্শ রোগ সম্পর্কে বিস্তারিত জানতে চাইলে আমাদের আর্টিকেলটি পড়তে পারেন।

ID: 68

Context: গেজ রোগের চিকিৎসা

Question: গেজ রোগের অন্যান্য চিকিৎসা কি কি?

Answer:

ঘরোয়া চিকিৎসা নিয়ে এনাল ফিসার প্রতিরোধের পরামর্শগুলো মেনে চললে প্রায় অর্ধেক রোগীর এনাল ফিসার ভালো হয়ে যায়। বাকিদের আরও চিকিৎসা প্রয়োজন হয়। প্রথমে কিছু ওষুধ সেবন এবং মলম লাগানোর পরামর্শ দেওয়া হয়। এতেও কাজ না হলে এনাল ফিসার অপারেশনের প্রয়োজন হয়।গেজ রোগ প্রতিরোধের পরামর্শগুলো সঠিকভাবে মেনে চললে বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই অপারেশনের প্রয়োজন পড়বে না। অভ্যাসে স্বাস্থ্যকর পরিবর্তন আনা কঠিন মনে হতে পারে। যেমন প্রতিবার খাওয়ার সময়ে চিন্তা করতে হবে খাবারে ফাইবার কতটুকু আছে, তার চেয়ে একটি ওষুধ খেয়ে বা অপারেশন করে সমস্যা দূর হয়ে যাওয়া অনেকের কাছেই সহজতর মনে হতে পারে। কিন্তু এই রোগ যাতে আবার না হয়, সেজন্য স্বাস্থ্যকর অভ্যাসগুলো গড়ে তোলা জরুরী। অপারেশন করার পরেও ডাক্তার আপনাকে ফাইবারযুক্ত খাবার খাওয়া চালিয়ে যাওয়ার পরামর্শ দিবে। অন্যথায় কোষ্ঠকাঠিন্য হয়ে আবারও গেজ রোগ দেখা দিতে পারে। অর্থাৎ, ঔষধ সেবন ও অপারেশন করলেও, গেজ রোগ বা এনাল ফিসারের স্থায়ী সমাধানে, অভ্যাস পাল্টে সুস্থ জীবনধারা বেছে নেওয়ার বিকল্প নেই।এনাল ফিসারের ঔষধএনাল ফিসারের চিকিৎসায় ডাক্তার অনেক ধরনের ওষুধ সেবনের এবং মলম ব্যবহারের পরামর্শ দিতে পারেন। ওষুধগুলো কেবল চিকিৎসকের পরামর্শক্রমেই সেবন করা উচিত, তা না হলে হিতে বিপরীত হতে পারে।

গেজ রোগের চিকিৎসায় সবচেয়ে কার্যকর ওষুধগুলোর মধ্যে রয়েছে—

\* জোলাপ বা ল্যাক্সেটিভ: এগুলো সিরাপ, ট্যাবলেট বা বড়ি হিসেবে পাওয়া যায়। এই ওষুধগুলো পায়খানায় পানির পরিমাণ ধরে রেখে তা নরম রাখে ও পায়খানা শক্ত হওয়া প্রতিরোধ করে। একেক বয়সের মানুষের বিভিন্ন সমস্যার জন্য ভিন্ন ভিন্ন ওষুধ ব্যবহার করতে হয়। আপনার জন্য উপযুক্ত ওষুধটি বেছে নিতে ডাক্তারের পরামর্শ নিন।

\* গ্লিসারাইল ট্রাইনাইট্রেট ও ক্যালসিয়াম চ্যানেল ব্লকার মলম: এগুলো মলদ্বারের ভেতরের ও আশেপাশের পেশি ও রক্তনালীগুলোকে প্রসারিত করে। এর ফলে ফাটলের স্থানে রক্ত সরবরাহ বাড়ে ও তা দ্রুত সেরে ওঠে। সেই সাথে পায়ুপথের ভেতরে চাপ কমে যাওয়ার ফলে ব্যথাও কমে যায়। মলম দুটি বেশ কার্যকর। সঠিক উপায়ে ব্যবহার করলে প্রতি ১০ জন ক্রনিক ফিসারের রোগীর মধ্যে ৭ জনের ফাটল দেরে যায়। এগুলো সাধারণত কমপক্ষে ৬ সপ্তাহ বা ফাটল সম্পূর্ণরূপে সেরে না ওঠা পর্যন্ত ব্যবহার করতে হয়। তবে মলমগুলোর বেশ কয়েকটি পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া আছে। তাই ডাক্তারের পরামর্শ ছাড়া ব্যবহার করা একেবারেই ঠিক নয়। এছাড়া শিশু, গর্ভবতী মা বা মাথাব্যথার সমস্যা আছে এমন কারও ক্ষেত্রে বিশেষজ্ঞের পরামর্শ ছাড়া এসব মলম ব্যবহার করা ঠিক নয়।

\* টপিক্যাল অ্যানেস্থেটিকএগুলো শরীরের বহির্ভাগে ব্যবহার করার চেতনানাশক মলম বা জেল হিসেবে পাওয়া যায়। অসহনীয় ব্যথা হলে এটি ব্যবহার করা হয়। এতে ফাটল সারে না, তবে ব্যথা উপশম হয়।এনাল ফিসারের চিকিৎসায় ডাক্তারের সাথে নিয়মিত ফলো-আপে থাকতে হয়। ৮ সপ্তাহের মধ্যে অবস্থার উন্নতি না হলে সবকিছু বিবেচনা করে ডাক্তার আপনাকে পরবর্তী চিকিৎসার জন্য একজন বিশেষজ্ঞ কোলোরেক্টাল সার্জনের কাছে রেফার করতে পারেন।এনাল ফিসার অপারেশন গেজ রোগ অন্য কোনো চিকিৎসায় সারানো না গেলে অপারেশনের পরামর্শ দেয়া হয়। সার্জারিকে সাধারণত এনাল ফিসারের সবচেয়ে কার্যকরী চিকিৎসা হিসেবে গণ্য হয়। এক্ষেত্রে ৯০%-এর বেশি রোগী দীর্ঘমেয়াদি সুফল লাভ করে থাকেন। তবে এর থেকে নানান জটিলতা সৃষ্টিরও ঝুঁকি থাকে।এনাল ফিসারের চিকিৎসায় অনেক ধরনের অপারেশন করা যায়। এগুলো খুব জটিল অপারেশন না, সাধারণত রোগী সেদিনই বাড়ি ফিরে যেতে পারে।

এনাল ফিসার অপারেশন এর মধ্যে বহুল প্রচলিত দুটি পদ্ধতি হলো—

\* ল্যাটারাল স্ফিংকটারেকটোমিএ পদ্ধতিতে পায়ুপথের ভেতরের দিকের মাংসপেশি অপারেশনের ছুরি দিয়ে একটু ছাড়িয়ে দেয়া হয়। এতে করে মাংসপেশি রিলাক্স হয় আর পায়ুপথের ভেতরের চাপ কমে আসে। এটি এনাল ফিসার সারাতে সাহায্য করে এবং নতুন ফাটল সৃষ্টি প্রতিরোধ করে।

\* অ্যাডভান্সমেন্ট অ্যানাল ফ্ল্যাপ

ID: 69

Context: এনাল ফিস্টুলা

Question: এনাল ফিস্টুলা কি?

Answer:

এনাল ফিস্টুলা এক প্রকার পায়ুপথের রোগ। খাবার পেটে গিয়ে হজম হওয়ার পর অবশিষ্ট অংশ পায়খানা হিসেবে আমাদের মলাশয়ে জমা হতে থাকে। মলাশয় ভরে গেলে পায়খানার চাপ তৈরি হয় এবং মলত্যাগের সময়ে পায়ুপথের মাধ্যমে পায়খানা মলদ্বার দিয়ে শরীর থেকে বের হয়ে আসে।এনাল ফিস্টুলা এক প্রকার পায়ুপথের রোগ। খাবার পেটে গিয়ে হজম হওয়ার পর অবশিষ্ট অংশ পায়খানা হিসেবে আমাদের মলাশয়ে জমা হতে থাকে। মলাশয় ভরে গেলে পায়খানার চাপ তৈরি হয় এবং মলত্যাগের সময়ে পায়ুপথের মাধ্যমে পায়খানা মলদ্বার দিয়ে শরীর থেকে বের হয়ে আসে।মলদ্বারের আশেপাশের চামড়ায় কখনো কখনো জীবাণুর আক্রমণে ইনফেকশন বা ফোঁড়া হতে পারে। অনেক সময় এসব ফোঁড়া থেকে পুঁজ বের হয়ে গভীর ক্ষত সৃষ্টি হয়, যা পায়ুপথের সাথে একধরণের রাস্তা তৈরি করে। ফোঁড়া বা অন্য কোনো কারণে মলদ্বার ছাড়া পায়ুপথের সাথে এই ধরণের অস্বাভাবিক রাস্তা তৈরি হলে সেটিকে এনাল ফিস্টুলা বা মলদ্বারের ফিস্টুলা বলে। অনেকের কাছে এটি ভগন্দর নামেও পরিচিত।এধরণের ফিস্টুলা বা ভগন্দর হলে মলদ্বারের আশেপাশে চুলকানি ও জ্বালাপোড়া সহ নানান রকম লক্ষণ দেখা দিতে পারে। এই ফিস্টুলাগুলো সাধারণত চিকিৎসা ছাড়া নিজে থেকে ভালো হয় না। বেশিরভাগ ক্ষেত্রে ফিস্টুলা সারাতে অপারেশন করার প্রয়োজন হয়।

ID: 70

Context: এনাল ফিস্টুলার লক্ষণ

Question: এনাল ফিস্টুলার লক্ষণ কি?

Answer:

মলদ্বারের ফিস্টুলা বা ভগন্দর হলে বেশ কিছু লক্ষণ দেখা দেয়। যেমন—

\* মলদ্বারের আশেপাশের চামড়ায় জ্বালা পোড়া বা চুলকানি হওয়া

\* মলদ্বারের আশেপাশে ব্যথা হওয়া। সাধারণত সারাক্ষণ একটি টনটনে ব্যথা থাকে যা বসলে, হাঁটাচলা করলে, কাশি দিলে বা পায়খানা করার সময়ে আরও বেড়ে যায়

\* মলদ্বারের আশেপাশের জায়গা থেকে দুর্গন্ধযুক্ত পুঁজ বের হওয়া

\* মলদ্বারের আশেপাশের জায়গাটি ফুলে লাল হয়ে যাওয়া। সাথে ফোঁড়া থাকলে জ্বরও আসতে পারে

\* পায়খানার সাথে রক্ত ও পুঁজ বেরিয়ে আসা

\* কিছু ক্ষেত্রে পায়খানার উপর নিয়ন্ত্রণ চলে যেতে পারে। অর্থাৎ, পায়খানার চাপ আসলে রোগী তা আর চেপে রাখতে পারে না অথবা পায়খানার চাপ এসেছে তা বুঝার আগেই পায়খানা হয়ে যেতে পারে।অনেক ক্ষেত্রে মলদ্বারের আশেপাশের চামড়ায় ছিদ্রের মত ফিস্টুলার রাস্তাটি বাহির থেকে দেখা যেতে পারে। তবে সাধারণত রোগীর নিজের পক্ষে এটি দেখা কষ্টকর।

ID: 71

Context: এনাল ফিস্টুলা হওয়ার কারণ

Question: এনাল ফিস্টুলা হওয়ার কারণ কি?

Answer:

বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই মলদ্বারের আশেপাশের ফোঁড়া থেকে ফিস্টুলা তৈরি হয়। সাধারণত পুঁজ বের হয়ে যাওয়ার পরে ফোঁড়াটি ঠিকমতো না শুকালে এমনটা হয়।এছাড়া আরও কিছু কারণে এনাল ফিস্টুলা হতে পারে। যেমন—

\* টিবি (যক্ষ্মা) / এইচআইভি (এইডস): এসব রোগে আক্রান্ত রোগীর ক্ষেত্রে এনাল ফিস্টুলা দেখা দিতে পারে।

\* মলদ্বারের অপারেশন: পায়খানার ছিদ্রপথের আশেপাশে কোনো অপারেশন হয়ে থাকলে এরপর সেখান থেকে নতুন রাস্তা তৈরি হয়ে এনাল ফিস্টুলা দেখা দিতে পারে৷

\* ক্রন’স ডিজিজ: এটি একধরনের অসুখ যেখানে পরিপাক নালীতে জ্বালাপোড়া হয়ে থাকে। এতে ডায়রিয়া, পেটে ব্যথা হওয়া কিংবা পায়খানার সাথে রক্ত যাওয়া সহ নানান লক্ষণ দেখা দেয়।

\* ডাইভারটিকুলাইটিস: এই অসুখটি হলে পরিপাক নালীর শেষ অংশ (বৃহদান্ত্রের) গায়ে কিছু অংশ ফুলে থলির মত হয়ে যায় ও সেখানে ইনফেকশন হয়।

\* হাইড্রাডেনাইটিস সাপুরাটিভা: এটি এক ধরনের অসুখ যেখানে শরীরের যে অংশগুলোতে ঘাম বেশি হয় সেখানের চামড়ায় ফোঁড়া হয় এবং চামড়া মোটা হয়ে দাগের মত হয়ে যায়।

ID: 72

Context: এনাল ফিস্টুলা হলে করণীয়

Question: এনাল ফিস্টুলা হলে করণীয় কি?

Answer:

এনাল ফিস্টুলার লক্ষণগুলো অনেকদিন ধরে থাকলে দেরি না করে ডাক্তার দেখাতে হবে। ডাক্তার লক্ষণগুলো সম্পর্কে বিস্তারিত জানতে চাইবেন। এছাড়া নাড়িভুঁড়ি বা পেটে অন্য কোনো ধরণের সমস্যা আছে কি না তাও জানতে চাইবেন।এ সময় ডাক্তার প্রয়োজনে মলদ্বারের আশেপাশের জায়গাটি পরীক্ষা করে দেখবেন। ফিস্টুলার অবস্থা বুঝার জন্য প্রয়োজনে মলদ্বার দিয়ে আলতোভাবে এক আঙুল প্রবেশ করিয়েও পরীক্ষা করে দেখতে পারেন। এই পদ্ধতিকে ডিআরই (ডিজিটাল রেকটাল এক্সামিনেশন) বলা হয়।পরীক্ষা করে এনাল ফিস্টুলা আছে এমন মনে হলে ডাক্তার প্রয়োজনে রোগীকে এই রোগের বিশেষজ্ঞ ডাক্তার (কোলোরেক্টাল সার্জন) এর কাছে যাওয়ার পরামর্শ দিবেন। বিশেষজ্ঞ ডাক্তার আরও কিছু পরীক্ষা নিরীক্ষা করে ফিস্টুলা সম্পর্কে নিশ্চিত হবেন এবং উপযুক্ত চিকিৎসা অথবা অপারেশনের সিদ্ধান্ত নিবেন।এক্ষেত্রে যে পরীক্ষাগুলো করা হতে পারে সেগুলো হলো—

\* পুনরায় ডিআরই বা পায়ুপথে আঙুল ঢুকিয়ে পরীক্ষা করে দেখা হতে পারে

\* প্রোক্টোস্কোপি করা হতে পারে—যেখানে মলদ্বার দিয়ে একটি নলের মত বিশেষ যন্ত্র ঢুকানো হয়। এটির সাহায্যে ফিস্টুলার রাস্তা আছে কি না তা ভালোভাবে দেখা যায়

\* এছাড়া আলট্রাসাউন্ড স্ক্যান, এমআরআই অথবা সিটি স্ক্যান ইত্যাদি পরীক্ষাও করা হতে পারে

ID: 73

Context: এনাল ফিস্টুলার চিকিৎসা

Question: এনাল ফিস্টুলার চিকিৎসা কি?

Answer:

বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই এনাল ফিস্টুলার চিকিৎসা হিসেবে অপারেশন করা হয়। কারণ এটি সাধারণত অপারেশন ছাড়া পুরোপুরি ভালো হয় না। এক্ষেত্রে যেসব অপারেশন করা হতে পারে সেগুলো হলো—

\* ফিস্টুলোটোমি: এই পদ্ধতিতে পুরো ফিস্টুলার নালী বা রাস্তাটিকে কেটে বাকি পুঁজগুলো বের করে দেয়া হয়। এরপর প্রয়োজন অনুযায়ী সেলাই করে কিংবা সেলাই ছাড়া এটিকে শুকাতে দেয়া হয়। শুকানোর পর জায়গাটা আগের মত সুস্থ হয়ে যায়৷

\* সেটন পদ্ধতি: এই পদ্ধতিতে ফিস্টুলার ভেতরে কয়েক সপ্তাহের জন্য সেটন নামক এক ধরণের বিশেষ সুতা ঢুকিয়ে রাখা হয়। এই সুতা পুঁজগুলো শুষে নিয়ে ফিস্টুলা শুকাতে সহায়তা করে। এরপর আরও কয়েক ধাপে ফিস্টুলাটি পুরোপুরি সারিয়ে তোলা হয়৷

\* অ্যাডভান্সমেন্ট এনাল ফ্ল্যাপ: এই পদ্ধতিতে শরীরের অন্য একটি অংশ থেকে (সাধারণত পায়ুপথের শেষভাগ থেকে) এক টুকরো টিস্যু বা মাংস এনে ফিস্টুলার রাস্তাটিতে যোগ করা হয়। এভাবে নতুন অংশ যোগ করলে ফিস্টুলাতে রক্ত চলাচল বাড়ে। ফলে এটি দ্রুত সুস্থ হয়ে যায় ও ফিস্টুলার পুরো রাস্তাটি কেটে ফেলার আর প্রয়োজন হয় না।

\* ‘লিফট’ পদ্ধতি: পায়খানার রাস্তায় যেসব মাংসপেশি পায়খানার চলাচল নিয়ন্ত্রণ করে সেসব পেশির ভেতরে কোনো ফিস্টুলা হলে সেক্ষেত্রে এই পদ্ধতি অনুসরণ করা হয়৷ এ পদ্ধতিতে পেশিগুলো না কেটে শুধু ফিস্টুলাটি সরানোর ব্যবস্থা করা হয়।এসকল পদ্ধতি ছাড়াও আজকাল লেজার, ফাইব্রিন গ্লু এসব পদ্ধতি ব্যবহার করে সরাসরি অপারেশন ছাড়াও এনাল ফিস্টুলার চিকিৎসা করা হয়। ফিস্টুলার চিকিৎসার পরে সাধারণত সারাদিন হাসপাতালে থাকার প্রয়োজন পড়ে না। তবে কিছু কিছু ক্ষেত্রে অপারেশনের পর কয়েকদিন হাসপাতালে থাকার দরকার হতে পারে।ফিস্টুলার চিকিৎসার সবগুলো পদ্ধতিতেই কিছু সুবিধা ও কিছু অসুবিধা রয়েছে। সার্বিক অবস্থা বিবেচনা করে ডাক্তার রোগীর জন্য যেই পদ্ধতিটি ভালো হবে সেটি বেছে নিবেন।

ID: 74

Context: এনাল ফিস্টুলার অপারেশ

Question: এনাল ফিস্টুলার অপারেশনের পর সাধারণত কি কি অসুবিধা দেখা দিতে পারে?

Answer:

এনাল ফিস্টুলার অপারেশনের পর সাধারণত যেসব অসুবিধা দেখা দিতে পারে সেগুলো হলো—

\* ইনফেকশন: সাধারণত অ্যান্টিবায়োটিক সেবনে এটি সেরে যায়। তবে অনেক বেশি ইনফেকশন হলে হাসপাতালে ভর্তি থেকে চিকিৎসা নেয়ার প্রয়োজন হতে পারে।

\* পুনরায় ফিস্টুলা ফিরে আসা: অপারেশন করে অপসারনে পরও অনেক সময় একই জায়গায় আবার ফিস্টুলা দেখা দিতে পারে।

\* পায়খানার চাপ নিয়ন্ত্রণ করতে না পারা: ফিস্টুলার সবধরনের চিকিৎসাতেই এই অসুবিধাটি দেখা দিতে পারে। তবে সাধারণত এতে খুব বেশি সমস্যা হয় না এবং এটি নিজে থেকেই ভালো হয়ে যায়।

ID: 81

Context: এলার্জি

Question: এলার্জি কি?

Answer:

এলার্জি খুব সাধারণ একটা সমস্যা। শিশুদের এলার্জি হওয়ার প্রবণতা বেশি থাকে। তবে বয়স বাড়ার সাথে সাথে লক্ষণগুলো কমে যেতে পারে। আবার অনেকের ছোটোবেলায় এলার্জির সমস্যা না থাকলেও, পরবর্তীতে নতুন করে এলার্জি দেখা দিতে পারে। কিছু বিধিনিষেধ মেনে চললে এলার্জি অনেকাংশেই নিয়ন্ত্রণে রাখা সম্ভব।

ID: 82

Context: এলার্জির কারণসমূহ

Question: এলার্জির কারণসমূহ কি কি ?

Answer:

দেহের রোগ প্রতিরোধ ব্যবস্থা ক্ষতিকর জিনিস থেকে আমাদেরকে সুরক্ষা দেয়। তবে কখনো কখনো কিছু জিনিসকে এটি ভুলে ক্ষতিকর ভেবে বসে, যা আসলে ক্ষতিকর নয়। এসব জিনিসের বিরুদ্ধে আমাদের রোগ প্রতিরোধ ব্যবস্থার প্রতিক্রিয়ায় এলার্জির লক্ষণ দেখা দেয়। যেমন: চামড়া লাল হয়ে যাওয়া ও চুলকানি।সাধারণত যেসব জিনিসের সংস্পর্শে আসলে শরীরে এলার্জি দেখা দেয় তার মধ্যে রয়েছে—নির্দিষ্ট কিছু খাবার, ধুলাবালি, গরম অথবা ঠান্ডা আবহাওয়া, ঘাম, গৃহপালিত পশু-পাখি, পরাগ রেণু ও ফুলের রেণু, সূর্যরশ্মি, ডাস্ট মাইট, মোল্ড বা ছত্রাক, বিভিন্ন ঔষধ, কীটনাশক, ডিটারজেন্ট ও বিভিন্ন রাসায়নিক পদার্থ, ল্যাটেক্স বা বিশেষ ধরনের রাবারের তৈরি গ্লাভস ও কনডম, স্ট্রেস বা মানসিক চাপ ইত্যাদি। এলার্জি জাতীয় খাবারের তালিকাঃ সচরাচর যেসব খাবারে এলার্জি হতে দেখা যায় তার মধ্যে রয়েছে—চিংড়ি, বেগুন, ইলিশ মাছ, গরুর মাংস, বাদাম। এ ছাড়া শিশুদের ক্ষেত্রে ডিম ও দুধেও এলার্জি হতে পারে। একেকজন মানুষের একেক ধরনের জিনিস অথবা খাবারে এলার্জি থাকতে পারে। তাই কোন ধরনের জিনিসের সংস্পর্শে আসলে অথবা খাবার খেলে এলার্জির লক্ষণ দেখা দিচ্ছে সেই বিষয়ে লক্ষ রাখা প্রয়োজন। এটি খুঁজে বের করতে পারলে এলার্জি নিয়ন্ত্রণে রাখা অনেক সহজ হয়ে যায়।

ID: 83

Context: এলার্জির লক্ষণসমূহ

Question: এলার্জির লক্ষণসমূহ কি কি?

Answer:

শরীর এলার্জিক উপাদানের সংস্পর্শে আসার পর খুব কম সময়ের মধ্যে এর প্রতিক্রিয়া দেখা যায়।

\* এলার্জির লক্ষণগুলো হলো—চামড়ায় চুলকানি, র‍্যাশ বা ফুসকুড়ি হওয়া।

\* শরীরের কিছু অংশ চাকা চাকা হয়ে যাওয়া বা ফুলে যাওয়া, ফোস্কা পড়া ও চামড়া ঝরে যাওয়া

ঠোঁট, জিহ্বা, চোখ ও মুখ ফুলে যাওয়া।

\* চোখে চুলকানি, চোখ থেকে পানি পড়া, লাল হওয়া ও ফুলে যাওয়া।

\* শুকনো কাশি, হাঁচি, নাকে ও গলায় চুলকানি ও নাক বন্ধ হওয়া।

\* শ্বাসকষ্ট, বুকে চাপ চাপ লাগা ও শ্বাস নেওয়ার সময়ে শোঁ শোঁ শব্দ হওয়া।

\* বমি বমি ভাব, বমি, পেট ব্যথা, পেট কামড়ানো ও ডায়রিয়া।

ID: 84

Context: এলার্জির জন্য যখন ডাক্তারের কাছে যেতে হবে

Question: এলার্জির জন্যে কখন ডাক্তারের কাছে যেতে হবে?

Answer:

নিচের তিনটি ক্ষেত্রে ডাক্তারের কাছে যাওয়া গুরুত্বপূর্ণ—ঔষধ খাওয়ার পরেও লক্ষণ দূর না হলে, ডাক্তারের দেওয়া ঔষধ খাওয়ার পর নতুন লক্ষণ দেখা দিলে কিংবা সমস্যা আরও বেড়ে গেলে, কিছু ক্ষেত্রে অ্যানাফিল্যাক্সিস নামক একটি জরুরি অবস্থা তৈরি হতে পারে। এ অবস্থায় দ্রুত পদক্ষেপ না নিলে রোগীর মৃত্যু হতে পারে। এমন রোগীকে যত দ্রুত সম্ভব নিকটস্থ হাসপাতালে নিতে হবে। সময়মতো একটি ইনজেকশন দিলেই রোগীর জীবন বাঁচানো সম্ভব।

অ্যানাফিল্যাক্সিস হচ্ছে কি না যেভাবে বুঝবেন—

শ্বাসকষ্ট অথবা শ্বাস নেওয়ার সময়ে শোঁ শোঁ শব্দ হওয়া

বুক-গলা আঁটসাঁট হয়ে আসছে বা আটকে আসছে বলে মনে হওয়া

মুখ, ঠোঁট, জিহ্বা অথবা গলা ফুলে যাওয়া

ঠোঁট ও ত্বক নীল হয়ে যাওয়া

জ্ঞান হারানোর মতো অনুভূতি হওয়া অথবা পুরোপুরি অজ্ঞান হয়ে যাওয়া

বিভ্রান্তি ও দুশ্চিন্তা

মাথা ঘুরানো অথবা ভারসাম্য হারিয়ে ফেলা

বুক ধড়ফড় করা কিংবা শরীর ঘামে ভিজে যাওয়া

চামড়ায় চুলকানিসহ লাল লাল ফুসকুড়ি বা র‍্যাশ হওয়া অথবা চামড়া ফুলে ওঠা

শরীরের কিছু জায়গা থেকে চামড়া উঠে আসা কিংবা ফোস্কা পড়া

এলার্জি আছে এমন খাবার ও ঔষধ, ডাক্তারি পরীক্ষা-নিরীক্ষায় ব্যবহৃত কন্ট্রাস্ট বা ডাই অথবা পোকামাকড়ের কামড় থেকে অ্যানাফিল্যাক্সিস হতে পারে।

ID: 85

Context: এলার্জির চিকিৎসা

Question: এলার্জির চিকিৎসা কি ?

Answer:

খাদ্যাভ্যাস ও জীবনযাত্রায় কিছু বিধিনিষেধ মেনে চললে এলার্জি অনেকাংশেই নিয়ন্ত্রণে রাখা সম্ভব।ঘরোয়া প্রতিকার ও জীবনযাত্রা - যেসব খাবার ও ঔষধে এলার্জি হয় সেগুলো এড়িয়ে চলবেন। হাঁপানি অথবা শ্বাসনালীর অন্য কোনো রোগ থাকলে চিকিৎসকের পরামর্শ অনুযায়ী চলবেন। স্ট্রেস বা মানসিক চাপ মোকাবেলায় শারীরিক ব্যায়াম, যোগব্যায়াম ও শ্বাসের ব্যায়াম করা যেতে পারে। এলার্জির চিকিৎসায় প্রধানত অ্যান্টিহিস্টামিন জাতীয় ঔষধ ব্যবহার করা হয়। এগুলো এলার্জির লক্ষণ দেখা দেওয়ার সাথে সাথে—এমনকি লক্ষণ দেখা দেওয়ার পূর্বেও সেবন করা যায়। যেমন, কারও যদি ধুলাবালিতে এলার্জি থাকে এবং বিশেষ প্রয়োজনে তার ধুলাবালি পরিষ্কার করতে হয়, সেক্ষেত্রে আগেই অ্যান্টিহিস্টামিন জাতীয় ঔষধ সেবন করা যায়। এসব ঔষধ বিভিন্ন রূপে পাওয়া যায়। যেমন: ট্যাবলেট, সিরাপ ও ড্রপ। উল্লেখ্য, এলার্জির কিছু ঔষধ সেবনের পরে ঘুম ঘুম লাগা ও মাথা ঝিম ঝিম করার মতো পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া হতে পারে। তাই ডাক্তারের সাথে আলোচনা করে আপনার জন্য উপযুক্ত ঔষধটি বেছে নিন। নাক বন্ধের সমস্যায় ডাক্তারের প্রেসক্রিপশন অনুযায়ী নাক বন্ধের ড্রপ ও স্প্রে ব্যবহার করা যেতে পারে। তবে এই ড্রপ ও স্প্রেগুলো এক সপ্তাহের বেশি সময় ধরে ব্যবহার করবেন না। দীর্ঘ সময় ব্যবহারে এলার্জির লক্ষণ আবার ফিরে আসতে পারে। ত্বকের এলার্জিতে বিভিন্ন ময়েশ্চারাইজিং ক্রিম ও মলম ব্যবহার করা যেতে পারে। চুলকানির সমস্যায় ক্যালামাইন লোশন ও ১% মেন্থল ক্রিম খুব ভালো কাজ করে। এ ছাড়াও তোয়ালে তে বরফ পেঁচিয়ে চুলকানির স্থানে ঠান্ডা সেঁক দিলে আরাম পাওয়া যায়। গুরুতর এলার্জিতে স্টেরয়েড জাতীয় ঔষধ ভালো কাজ করে। স্টেরয়েড খুবই শক্তিশালী ঔষধ, পার্শ্বপ্রতিক্রিয়াও বেশি। তাই ইন্টারনেট দেখে কিংবা ফার্মেসি থেকে নিজে নিজে এসব ঔষধ কিনে খাওয়া একেবারেই উচিত নয়। কেবল ডাক্তারের পরামর্শক্রমেই নিয়ম মেনে এই ধরনের ঔষধ সেবন করা উচিত। ইমিউনোথেরাপিগুরুত্বর এলার্জির জন্য ইমিউনোথেরাপি একটি কার্যকরী চিকিৎসা। এই চিকিৎসায় রোগীকে দীর্ঘদিন ধরে নির্দিষ্ট অ্যালার্জেনের উপস্থিতিতে অভ্যস্ত করে তোলা হয়। এর ফলে পরবর্তীতে আক্রান্ত ব্যক্তির শরীরে সেই অ্যালার্জেনের প্রতি পূর্বের মতো তীব্র প্রতিক্রিয়া হয় না। ফলে লক্ষণগুলো নিয়ন্ত্রণে রাখা অনেকটাই সহজ হয়ে আসে। ওপরে আলোচিত মারাত্মক এলার্জিক প্রতিক্রিয়া বা অ্যানাফিল্যাক্সিস হলে আক্রান্ত ব্যক্তিকে দ্রুত নিকটস্থ হাসপাতালে নিয়ে যেতে হবে। অ্যানাফিল্যাক্সিস এর লক্ষণ দেখা দিলে রোগীর ঊরুর বাইরের দিকে তাৎক্ষণিক একটি ইনজেকশন দিতে হয়। এই ইনজেকশনে অ্যাড্রেনালিন নামক জীবন রক্ষাকারী একটা হরমোন থাকে। এটি মৃত্যুঝুঁকি কমাতে সাহায্য করে।

ID: 86

Context: এলার্জি প্রতিরোধ উপায়গুলো

Question: এলার্জি প্রতিরোধ উপায়গুলো কি কি?

Answer:

এলার্জি থেকে মুক্ত থাকার সবচেয়ে ভালো উপায় হলো যেসব বস্তুতে এলার্জি রয়েছে সেগুলো এড়িয়ে চলা। এলার্জি প্রতিরোধে নিচের পরামর্শগুলো মেনে চলুন—এলার্জি ঘটায় এমন খাবারগুলো এড়িয়ে চলুন।

গৃহপালিত পশু-পাখির বাসস্থান বাড়ির বাইরে তৈরি করুন এবং তাদের নিয়মিত পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রাখুন।

ডাস্ট মাইট নামক এক প্রকার অতিক্ষুদ্র পোকা থেকে এলার্জি প্রতিরোধ করতে বাড়ির যে জায়গাগুলোতে বেশি সময় কাটানো হয় সেগুলো ধুলামুক্ত ও পরিষ্কার রাখুন। বিছানার চাদর, কাঁথা, বালিশ ও লেপের কভার, জানালার পর্দা—এগুলো সপ্তাহে অন্তত একবার গরম পানি দিয়ে ধুয়ে নিন। যেসব জিনিস নিয়মিত ধোয়া যায় না সেগুলো বাসায় যত কম ব্যবহার করা যায়, ততই ভালো। যেমন: কার্পেট। এ ছাড়া বিছানা গোছানো ও ঝাড়া-মোছা করার সময়ে ভালো একটা মাস্ক পড়ুন। যেসব জিনিস ভেজা কাপড় দিয়ে মোছা যায় সেগুলো ভেজা কাপড় দিয়ে মুছুন। এতে ধুলা ছড়াবে না।

ডাস্ট মাইট এক ধরনের ছোটো ছোটো পোকা। এগুলো খালি চোখে দেখা যায় না। মাইক্রোস্কোপের নিচে দেখলে সাদা রঙের আট পা-ওয়ালা পোকার মতো দেখা যায়। আমাদের চামড়া থেকে যে মৃত কোষগুলো প্রতিদিন বিছানায়, কার্পেটে কিংবা সোফায় ঝরে পরে, এরা সেগুলো খেয়ে বেঁচে থাকে। দেয়ালে ছত্রাক বা মোল্ডছত্রাক বা মোল্ড থেকে সুরক্ষার জন্য বাড়ির পরিবেশ শুষ্ক রাখুন। পাশাপাশি বাতাস চলাচলের ভালো ব্যবস্থা রাখুন। ঘরের ভেতর কাপড় শুকানো থেকে বিরত থাকুন এবং গাছ থাকলে সেটি সরিয়ে ফেলুন।

গরম বা ঘাম থেকে এলার্জি হতে পারে। তাই খুব পরিশ্রম করার পর শরীর গরম হলে বা ঘেমে গেলে বাতাস চলাচল করছে এমন স্থানে থাকুন এবং ঢিলেঢালা কাপড় পরুন। ঠান্ডা থেকেও এলার্জির সমস্যা হতে পারে। এমন হলে বৃষ্টিতে ভেজা ও পুকুরে গোসল করা থেকে বিরত থাকুন। গোসলের সময়ে কুসুম গরম পানি ব্যবহার করা যেতে পারে।

নির্দিষ্ট কিছু ধাতুতে কারোর এলার্জি থাকতে পারে। এসব ধাতুর তৈরি আংটি, গয়না ও ঘড়ি পরলে এলার্জি হতে পারে। নির্দিষ্ট কোনো ধাতুতে আপনার এলার্জি থাকলে দৈনন্দিন জীবনে সেই ধাতুর তৈরি জিনিস ব্যবহার এড়িয়ে চলুন। ফুলের পরাগ রেণু হতে এলার্জি প্রতিরোধের জন্য ঋতু পরিবর্তনের সময়ে যতটা সম্ভব ঘরের ভেতরে থাকুন। বাইরে গেলেও ঘরে ফিরে কাপড় পাল্টে গোসল করে ফেলুন, যেন পরাগ রেণু ধুয়ে চলে যায়। সম্ভব হলে ঘরের ভেতরে জামা-কাপড় শুকোতে দিন। তবে ছত্রাক যেন না জন্মে যায় সেই বিষয়েও খেয়াল রাখবেন। এ ছাড়া যে স্থানে ঘাসের পরিমাণ বেশি সেখানে হাঁটা-চলা করা থেকে বিরত থাকুন।

বিভিন্ন প্রসাধনীতে থাকা কেমিক্যালে এলার্জি থাকতে পারে। যেমন: সাবান, শ্যাম্পু, ফেইসওয়াশ ও সুগন্ধিতে থাকা কেমিক্যাল। যেসব পণ্যে এলার্জি হয় সেগুলো ব্যবহার করা থেকে বিরত থাকুন।বিশেষ তথ্য: এলার্জি প্রতিরোধে ছোটো শিশুদের বুকের দুধ খাওয়ানোর অনেক সুফল রয়েছে। বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা ছয় মাস বয়স পর্যন্ত শিশুকে কেবল বুকের দুধ খাওয়ানোর পরামর্শ দেয়। কিছু গবেষণায় দেখা গেছে, জন্মের পর অন্তত প্রথম চার মাস শিশুকে কোনো শক্ত খাবার না দিয়ে কেবল বুকের দুধ খাওয়ালে সেটি এলার্জি প্রতিরোধে কার্যকর হতে পারে।

ID: 87

Context: এলার্জি নির্ণয়

Question: এলার্জি কিভাবে রোগনির্ণয় করবো এবং নির্ণয়ের পরীক্ষাসমূহ ও ?

Answer:

এলার্জির কারণ খুঁজে বের করার জন্য আক্রান্ত ব্যক্তিকে চিকিৎসক বিভিন্ন প্রশ্ন ও শারীরিক পরীক্ষা করেন। তা ছাড়া অন্য কোনো রোগের কারণে এলার্জির মতো লক্ষণ দেখা দিচ্ছে কি না সেটিও খতিয়ে দেখেন। এলার্জি শনাক্ত করার গুরুত্বপূর্ণ পরীক্ষাগুলো হলো—খাদ্যাভ্যাস পরিবর্তন। যেসব খাবারে সাধারণত এলার্জি হয় সেগুলো খাদ্যাভ্যাস থেকে বাদ দিয়ে দেখা হয় যে এলার্জি নিয়ন্ত্রণে আসে কি না। পরবর্তীতে আবার খাবারগুলো খেতে শুরু করলে এলার্জি ফিরে আসে কি না তাও দেখার চেষ্টা করা হয়। সাধারণত রোগীর কোন ধরনের খাবার খাওয়ায় এলার্জির লক্ষণ দেখা দেয় সেটি একটি ডায়েরিতে লিখে রাখার পরামর্শ দেওয়া হয়। এতে করে কোন কোন খাবারে রোগীর এলার্জি হয় তা নির্ণয় করা সম্ভব হয়।ত্বকের পরীক্ষা - যেসব পদার্থে এলার্জি হয় সেসবকে অ্যালার্জেন বলে। ত্বকের পরীক্ষাতে অ্যালার্জেন যুক্ত অল্প একটু তরল বাহুর ওপরে দেওয়া হয়। এরপর সুঁই দিয়ে সেই জায়গায় সামান্য একটু ছিদ্র করা হয়। এলার্জি থাকলে ১৫ মিনিটের মধ্যে ঐ স্থানটি চুলকাতে শুরু করে এবং লাল হয়ে যায়। উল্লেখ্য, পরীক্ষার আগে অ্যান্টিহিস্টামিন জাতীয় ঔষধ সেবন করলে সঠিক ফলাফল পাওয়া যায় না।রক্তের পরীক্ষা - এই পরীক্ষাতে রক্তের নমুনা নিয়ে নির্দিষ্ট অ্যালার্জেন এর বিপক্ষে অ্যান্টিবডি তৈরি হয়েছে কি না সেটি পরীক্ষা করে দেখা হয়।প্যাচ পরীক্ষা - এই পরীক্ষাতে শরীরে ‘কন্টাক্ট ডার্মাটাইটিস’ নামক এক ধরনের একজিমা বা এলার্জিজনিত চর্মরোগের উপস্থিতি পরীক্ষা করে দেখা হয়। চ্যালেঞ্জ পরীক্ষা - এই পরীক্ষাটি অল্প কিছু ক্ষেত্রে করা হয়ে থাকে। এমন জায়গায় পরীক্ষাটি করতে হয় যেখানে গুরুতর এলার্জিক প্রতিক্রিয়া দেখা গেলে জরুরি চিকিৎসা করানো সম্ভব। এই পরীক্ষায় নির্দিষ্ট কোনো খাবারে এলার্জি থাকলে সেই খাবারটি রোগীকে খাওয়ানোর মাধ্যমে এলার্জির প্রতিক্রিয়া দেখা হয়। খাবারের পরিমাণ ধীরে ধীরে বাড়ানোর মাধ্যমে এলার্জিক প্রতিক্রিয়া বেড়ে যাচ্ছে কি না সেটিও দেখা হয়।বিশেষ দ্রষ্টব্যঃ এলার্জি পরীক্ষায় এলার্জি কিট এর ব্যবহার নির্ভরযোগ্য নয়। তাই এই কিটের মাধ্যমে পরীক্ষা এড়িয়ে চলাই ভালো।

ID: 89

Context: এলার্জিক রাইনাইটিস

Question: এলার্জিক রাইনাইটিস কি?

Answer:

\* এলার্জিক রাইনাইটিসে নাক বন্ধ হওয়া, নাক দিয়ে পানি পড়া, হাঁচি ও চুলকানির মতো লক্ষণ দেখা দেয়।

\* এলার্জিজনিত কারণে নাকের ভেতরে প্রদাহ হয়ে এই লক্ষণগুলো সৃষ্টি হয়।এলার্জিক রাইনাইটিসে নাক বন্ধ হওয়া, নাক দিয়ে পানি পড়া, হাঁচি ও চুলকানির মতো লক্ষণ দেখা দেয়।

\* এলার্জিজনিত কারণে নাকের ভেতরে প্রদাহ হয়ে এই লক্ষণগুলো সৃষ্টি হয়।

\* বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই এই সমস্যার চিকিৎসায় মূল লক্ষ্য হলো এসব লক্ষণ থেকে মুক্তি পাওয়া।

\* লক্ষণ তেমন মারাত্মক না হলে আপনি সাধারণত নিজে নিজেই সেগুলোর চিকিৎসা করতে পারবেন।

\* তবে ঘরোয়া চিকিৎসায় কাজ না হলে কিংবা লক্ষণগুলো আরও বেড়ে গিয়ে স্বাভাবিক জীবনযাপনে বাধা সৃষ্টি করলে ডাক্তারের পরামর্শ নিতে হয়।

ID: 90

Context: এলার্জিক রাইনাইটিসের লক্ষণসমূহ

Question: এলার্জিক রাইনাইটিসের লক্ষণসমূহ কি কি?

Answer:

\* এলার্জিক রাইনাইটিসের লক্ষণগুলো অনেকাংশেই সাধারণ সর্দি-কাশির মতো। লক্ষণগুলোর মধ্যে রয়েছে—হাঁচি হওয়া

\* নাকের ভেতর চুলকানি অনুভূত হওয়া

\* নাক থেকে পানি পড়া, নাক বন্ধ হয়ে যাওয়া অথবা সর্দি হওয়া। সাধারণত এলার্জি আছে এমন কোনো জিনিসের সংস্পর্শে আসার কিছুক্ষণের মধ্যেই এসব লক্ষণ দেখা দিতে শুরু করে।

\* বেশিরভাগ রোগীদেরই লক্ষণসমূহ মৃদু হয়ে থাকে এবং কার্যকর চিকিৎসায় তা সহজেই সেরে যায়। তবে কিছু রোগীর ক্ষেত্রে লক্ষণসমূহ তীব্র হতে পারে এবং কয়েক বছর স্থায়ী হতে পারে যা স্বাভাবিক জীবনযাত্রাকে কষ্টদায়ক করে দেয় এবং নানান সমস্যা তৈরি করে। যেমন: ঘুমের সমস্যা হওয়া। ব্যক্তি বিশেষে লক্ষণ দেখা দেওয়ার সময়কাল ভিন্ন ভিন্ন হতে পারে। যেমন, কারও কারও নির্দিষ্ট ঋতুতে এলার্জিক রাইনাইটিস দেখা দেয়, কারণ তাদের ঋতুভিত্তিক গাছ ও ঘাসের পরাগে এলার্জি থাকে এবং ঋতু পরিবর্তনের সাথে লক্ষণগুলোও দূর হয়ে যায়। আবার অন্যরা প্রায় সারা বছরই ভোগান্তিতে থাকেন।

ID: 91

Context: এলার্জিক রাইনাইটিসের কারণ সমূহ

Question: এলার্জিক রাইনাইটিসের কারণ সমূহ কি কি?

Answer:

এলার্জিক রাইনাইটিস এর মূলে রয়েছে বিভিন্ন জিনিসের প্রতি এলার্জি। এলার্জির প্রতিক্রিয়ায় আমাদের দেহে হিস্টামিন নামক একটি রাসায়নিক পদার্থ বের হয়ে আসে।হিস্টামিন নাকের ভেতরের চামড়ায় প্রদাহ সৃষ্টি করে। তখন নাকের ভেতরে প্রচুর পরিমাণে শ্লেষ্মা জাতীয় পিচ্ছিল তরল পদার্থ তৈরি হয়। এরপর হাঁচি এবং নাক থেকে পানি পড়াসহ এলার্জিক রাইনাইটিসের বিভিন্ন লক্ষণ প্রকাশ পায়।একেকজন মানুষের একেক জিনিসে এলার্জি হয়। পরিবারে কেউ এলার্জিতে ভুগলে জেনেটিক কারণে অন্যান্য সদস্যের এলার্জি হওয়ার সম্ভাবনা বেড়ে যায়। সচরাচর যেসব জিনিসে এলার্জি হতে দেখা যায় তার মধ্যে রয়েছে—ডাস্ট মাইট, পরাগ রেণু, গৃহপালিত পশু-পাখি, ছত্রাক।

কর্মক্ষেত্রের পরিবেশে থাকা নানান এলার্জিক উপাদান। যেমন— কাঠের গুঁড়া, আটা ও ময়দার গুঁড়া, ল্যাটেক্স বা বিশেষ ধরনের রাবারের গ্লাভস। উল্লেখ্য, কিছু পরিবেশগত কারণেও এলার্জি হতে পারে। গবেষণায় দেখা গেছে, পরিবারের সদস্যদের ধূমপানের অভ্যাস থাকলে কিংবা বাড়িতে ডাস্ট মাইট থাকলে সেখানে বেড়ে ওঠা শিশুদের এলার্জির ঝুঁকি বেড়ে যেতে পারে। ডাস্ট মাইট এক ধরনের ছোটো ছোটো পোকা। এগুলো খালি চোখে দেখা যায় না। মাইক্রোস্কোপের নিচে দেখলে সাদা রঙের আট পা-ওয়ালা পোকার মতো দেখা যায়। আমাদের চামড়া থেকে যে মৃত কোষগুলো প্রতিদিন বিছানায়, কার্পেটে কিংবা সোফায় ঝরে পরে, ডাস্ট মাইট সেগুলো খেয়ে বেঁচে থাকে।

ID: 92

Context: এলার্জিক রাইনাইটিসের চিকিৎসা

Question: এলার্জিক রাইনাইটিসের চিকিৎসা কি?

Answer:

এলার্জিক রাইনাইটিসের লক্ষণগুলো মৃদু হলে ঘরোয়াভাবেই তার চিকিৎসা করা যায়। এক্ষেত্রে চিকিৎসার লক্ষ্য হলো নাক বন্ধ, নাক দিয়ে পানি পড়া ও হাঁচি—এসব লক্ষণগুলো উপশম করা। এলার্জিক রাইনাইটিস এর ঘরোয়া চিকিৎসা - এলার্জিক রাইনাইটিস উপশমে ঘরোয়া পদ্ধতিগুলো হলো—এলার্জি উদ্রেককারী জিনিসগুলো এড়িয়ে চলা। নিচের প্রতিরোধ অংশে এই ব্যাপারে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে।

যেসব ঔষধ খেলে ঘুম ঘুম ভাব আসে না এমন অ্যান্টিহিস্টামিন জাতীয় ঔষধ খাওয়া। যেমন: সেটিরিজিন ও লোরাটাডিন। এগুলো দেহে এলার্জির প্রতিক্রিয়ায় বের হওয়া হিস্টামিন এর বিরুদ্ধে কাজ করে।

উল্লেখ্য, একেকজনের ক্ষেত্রে একেক ধরনের অ্যান্টিহিস্টামিন ঔষধ ভালো কাজ করে। তাই আপনার জন্য সবচেয়ে কার্যকর ঔষধটি খুঁজে পাওয়ার আগে কয়েক ধরনের অ্যান্টিহিস্টামিন ব্যবহার করে দেখার প্রয়োজন হতে পারে।স্যালাইন বা ০.৯ % সোডিয়াম ক্লোরাইড সমৃদ্ধ নাকের ড্রপ দিয়ে নাক পরিষ্কার করা। ফার্মেসিতে এগুলো সলো, স্যালোরাইড ইডি, এন-সল ও হ্যাপিসল-সহ বিভিন্ন নামে পাওয়া যায়। এগুলো নাকে থাকা এলার্জি উদ্রেককারী জিনিসগুলো পরিষ্কার করতে সাহায্য করে।যে তিনটি ক্ষেত্রে ডাক্তারের পরামর্শ নিতে হবে—

ঘরোয়া চিকিৎসায় কাজ না হলে

লক্ষণগুলো তীব্র হলে

গুরুতর লক্ষণের কারণে স্বাভাবিক জীবনযাপনে বাধা সৃষ্টি হলে। যেমন: ঘুমের সমস্যা হওয়া, দৈনন্দিন কাজে ব্যাঘাত ঘটাএলার্জিক রাইনাইটিস এর ঔষধঔষধের মাধ্যমে এলার্জিক রাইনাইটিসের সাধারণ লক্ষণগুলো উপশম করা যায়। তবে এলার্জি পুরোপুরি সারিয়ে তোলা যায় না।ঋতু পরিবর্তনের সময় এলার্জির সমস্যা দেখা দিলে নির্দিষ্ট সময়ের জন্য ঔষধ সেবন করতে পারেন। লক্ষণ দূর হয়ে গেলে আর ঔষধ খাওয়ার প্রয়োজন নেই। এলার্জিক রাইনাইটিসের কার্যকর ঔষধগুলোর মধ্যে রয়েছে—অ্যান্টিহিস্টামিনঅ্যান্টিহিস্টামিন জাতীয় ঔষধ ট্যাবলেট, স্প্রে, ড্রপ, সিরাপ ও ক্রিম হিসেবে ফার্মেসিতে কিনতে পাওয়া যায়।অ্যান্টিহিস্টামিন ট্যাবলেট কেনার জন্য সাধারণত ডাক্তারের প্রেসক্রিপশনের প্রয়োজন হয় না। তবে কিডনি অথবা লিভারের সমস্যা থাকলে অথবা খিঁচুনি রোগীদের ক্ষেত্রে কিংবা ২ বছরের কম বয়সী শিশুদের ক্ষেত্রে এসব ঔষধ ব্যবহারের পূর্বে ডাক্তারের পরামর্শ নিতে হবে।উল্লেখ্য, কিছু অ্যান্টিহিস্টামিন ঔষধ সেবনে ঘুম ঘুম ভাব হওয়ার মতো পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া দেখা দিতে পারে। তাই গাড়ি ড্রাইভিং ও মেশিন চালনার কাজ করার পূর্বে ঔষধ সেবন করা উচিত নয়। ঝুঁকি এড়াতে রাতে ঘুমানোর পূর্বে ঔষধ খান।অ্যান্টিহিস্টামিন ঔষধ নাকের স্প্রে হিসেবে ট্যাবলেট কিংবা সিরাপের চেয়ে দ্রুত কাজ শুরু করে। এগুলো এলার্জিক রাইনাইটিসের চিকিৎসায় তুলনামূলক অধিক কার্যকর। তবে ডাক্তারের পরামর্শ ছাড়া এসব স্প্রে ব্যবহার করা ঠিক নয়।স্টেরয়েডএলার্জিক রাইনাইটিসের চিকিৎসায় কিছু ক্ষেত্রে কর্টিকোস্টেরয়েড বা স্টেরয়েডযুক্ত নাকের ড্রপ কিংবা স্প্রে ব্যবহারের পরামর্শ দেওয়া হয়। যেমন—কিছুদিন পর পরই লক্ষণ দেখা দিলে, লক্ষণগুলো লম্বা সময় ধরে স্থায়ী হলে, নাক বন্ধ থাকলে অথবা নাকে পলিপ হলে।

ঘরোয়া চিকিৎসা ও অ্যান্টিহিস্টামিন ব্যবহার করেও লক্ষণের কোনো উন্নতি না হলেএই জাতীয় ঔষধ নাকের ভেতরের প্রদাহ কমিয়ে লক্ষণ উপশমে সাহায্য করে। অ্যান্টিহিস্টামিনের তুলনায় এগুলো কাজ করতে বেশি সময় নিলেও এসবের প্রভাব থাকে দীর্ঘদিন। বিশেষ কিছু ক্ষেত্রে গুরুতর লক্ষণের চিকিৎসায় ডাক্তার ৫–১০ দিনের জন্য স্টেরয়েড ট্যাবলেট সেবনের পরামর্শ দিতে পারেন।স্টেরয়েড ন্যাজাল স্প্রে ও ড্রপ ব্যবহারকারীদের মধ্যে পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া দেখা দেওয়ার ঘটনা বিরল। তবে কিছু ক্ষেত্রে নাক শুষ্ক হওয়া, নাকের ভেতরে জ্বালাপোড়া অথবা রক্ত পড়ার মতো পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া দেখা দিতে পারে। গুরুত্বপূর্ণ তথ্যঃ

ডাক্তারের পরামর্শ ছাড়া স্টেরয়েড ট্যাবলেট সেবন করা একেবারেই উচিত নয়। বেশিদিন ধরে কিংবা উচ্চ ডোজে স্টেরয়েড সেবন করলে বিভিন্ন পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া দেখা দিতে পারে। তাই ইন্টারনেট দেখে কিংবা ফার্মেসি থেকে নিজে নিজে এসব ঔষধ কিনে খাবেন না।উল্লেখ্য, ওপরের চিকিৎসাগুলোয় কাজ না হলে ডাক্তার স্টেরয়েড স্প্রে বা ড্রপের ডোজ বাড়িয়ে দিতে পারেন। এ ছাড়া রোগীকে ভিন্ন ঔষধ ব্যবহার কিংবা একাধিক প্রকারের ঔষধ একত্রে ব্যবহারের পরামর্শ দেওয়া হতে পারে।ইমিউনোথেরাপিএই চিকিৎসায় রোগীকে একটি লম্বা সময় ধরে এলার্জিক উপাদানের সাথে অভ্যস্ত করে তোলা হয়। এতে শরীরে আগের মতো এলার্জিক প্রতিক্রিয়া দেখা দেয় না। এই পদ্ধতিতে মারাত্মক এলার্জিক প্রতিক্রিয়ার সম্ভাবনা থাকে। তাই চিকিৎসাটি বিশেষজ্ঞ ডাক্তারের তত্ত্বাবধানে করা হয়ে থাকে।ইমিউনোথেরাপির ব্যবহার সীমিত। গুটিকয়েক নির্দিষ্ট প্রকারের এলার্জি গুরুতর রূপ ধারণ করলে কেবল তখনই এই চিকিৎসা পদ্ধতি ব্যবহৃত হয়। যেমন: পরাগ রেণুতে এলার্জি বা হে ফিভার। বাংলাদেশে এই চিকিৎসা পদ্ধতিটি তেমন প্রচলিত নয়।

ID: 93

Context: এলার্জিক রাইনাইটিস প্রতিরোধ

Question: এলার্জিক রাইনাইটিস প্রতিরোধ কিভাবে করা যায়?

Answer:

এলার্জিক রাইনাইটিস প্রতিরোধের সবচেয়ে ভালো উপায় হলো এলার্জি উদ্রেক করে বা করতে পারে এমন জিনিস এড়িয়ে চলা। এলার্জি উদ্রেককারী জিনিসগুলো পুরোপুরি এড়িয়ে চলা কঠিন হতে পারে। যেমন, বাড়িতে ডাস্ট মাইট আছে কি না সেই বিষয়ে নিশ্চিত হওয়া কঠিন হতে পারে। কারণ বেশ পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন বাসা-বাড়িতেও এগুলো বংশবিস্তার করতে পারে। আবার নিজের কিংবা কোনো নিকটাত্মীয়ের বাড়িতে পোষা প্রাণী থাকলে সেগুলোর সংস্পর্শ এড়িয়ে চলাটাও কঠিন হওয়া স্বাভাবিক। তবে এলার্জি উদ্রেককারী জিনিসের সংস্পর্শ যথাসম্ভব কমিয়ে আনার জন্য বেশ কিছু পদক্ষেপ নেওয়া যায়। এগুলো এলার্জিক রাইনাইটিসের লক্ষণ উপশমে বেশ কার্যকর হবে। কমন এলার্জিক উপাদানগুলো এড়িয়ে চলার কিছু কার্যকর পরামর্শ নিচে তুলে ধরা হয়েছে—ডাস্ট মাইটডাস্ট মাইট নামের ছোটো ছোটো পোকা এলার্জি উদ্রেকের সবচেয়ে বড় কারণগুলোর মধ্যে একটি। এরা বাসায় থাকা ধুলাবালিতে বংশবিস্তার করে। আকারে খুব ছোটো হওয়ায় এগুলোকে খালি চোখে দেখা যায় না। তাই শনাক্ত করা বেশ কঠিন।ডাস্ট মাইট থেকে এলার্জি প্রতিরোধে নিচের উপদেশগুলো মেনে চলুন—বিছানার চাদর, কাঁথা, পর্দা, ছোটো বাচ্চাদের নরম খেলনা, বালিশ ও লেপের কভার—এগুলো সপ্তাহে অন্তত একবার গরম পানি দিয়ে ধুয়ে নিন।

বাড়িতে ব্যবহৃত যেসব জিনিস সহজে ধোয়া যায় না সেগুলো বাসায় যত কম ব্যবহার করা যায়, ততই ভালো। যেমন: কার্পেট ও উলের কম্বল। কার্পেটের পরিবর্তে শক্ত ভিনাইল এর ফ্লোরম্যাট ব্যবহার করতে পারেন। কম্বলের ক্ষেত্রে সহজে ধুয়ে দেওয়া যায় এমন সিনথেটিক কাপড়ের কাভার ব্যবহার করা যেতে পারে।

বাড়ির যে জায়গাগুলোতে বেশি সময় কাটানো হয় সেগুলো সবসময় ধুলামুক্ত ও পরিষ্কার রাখুন। যেমন: বসার ও শোবার ঘর।

বিছানা গোছানো ও ঝাড়া-মোছা করার সময়ে ভালো একটা মাস্ক পড়ুন।

যেসব জিনিস ভেজা কাপড় দিয়ে মোছা যায় সেগুলো ভেজা কাপড় দিয়েই মুছুন। যেমন: বাড়ির মেঝে ও আসবাবপত্র। এতে ধুলোবালি বাতাসে কম উড়বে, ছড়িয়ে যাবে না।

কেউ কেউ বাড়িতে ভ্যাকুয়াম ক্লিনার ব্যবহার করেন। সেক্ষেত্রে সম্ভব হলে ‘হেপা ফিল্টার’ যুক্ত ক্লিনার ব্যবহার করতে পারেন। এগুলো ধুলাবালি দূর করতে অধিক কার্যকর।পোষা প্রাণীঅনেকেই মনে করেন যে পশু-পাখির পালক অথবা পশমেই এলার্জিক প্রতিক্রিয়া হয়। এটি একটি ভুল ধারণা। মূলত পশু-পাখির শরীর থেকে ঝরে পড়া মৃত কোষ, মুখের লালা ও শুষ্ক প্রস্রাবের কণা এলার্জি উদ্রেক করে।এলার্জিক রাইনাইটিসের সমস্যা থাকলে পোষা প্রাণী এড়িয়ে চলাই ভালো। সেটি সম্ভব না হলে নিচের পরামর্শগুলো মেনে চলতে পারেন—পোষা প্রাণীকে যথাসম্ভব বাড়ির বাইরে রাখার চেষ্টা করুন। বাইরে লালন-পালন করা সম্ভব না হলে বাড়িতে একটি আলাদা ঘরে তাদের থাকার ব্যবস্থা করুন এবং সেখানে কার্পেটের ব্যবহার এড়িয়ে চলুন।

শোবার ঘরে পোষা প্রাণীকে প্রবেশ করতে দিবেন না।

পোষা প্রাণীকে প্রতি দুই সপ্তাহে অন্তত একবার গোসল করান।

পোষা কুকুরকে নিয়মিত বাড়ির বাইরে নিয়ে পশম আঁচড়ানো, ব্রাশ করানোসহ ত্বকের সার্বিক যত্ন নিন।

পশু-পাখির ব্যবহৃত বিছানা, নরম কুশন ও ব্যবহার্য জিনিসপত্র নিয়মিত ধুয়ে দিন।নিজের বাড়িতে পোষা প্রাণী নেই, কিন্তু যেই বন্ধু অথবা আত্মীয়ের বাসায় যাচ্ছেন তাদের পোষা প্রাণী আছে—এমন ক্ষেত্রে তাদের বাড়িতে ঢোকার এক ঘণ্টা আগে অ্যান্টিহিস্টামিন খেয়ে নিন।পরাগ রেণু বা পোলেনছবি: ফুলের পরাগ রেণু

একেক ধরনের গাছপালার পরাগায়ন বছরের একেক সময়ে হয়। তাই বছরের কোন সময়ে এলার্জিক রাইনাইটিসের প্রকোপ বাড়বে সেটি কোন ধরনের পরাগে এলার্জি আছে তার ওপরে নির্ভর করবে। তবে বসন্ত ও গ্রীষ্মকালে বাতাসে পরাগ রেণুর পরিমাণ বেড়ে যায় বলে সাধারণত এ সময়েই বেশিরভাগ মানুষকে এলার্জিক রাইনাইটিসে আক্রান্ত হতে দেখা যায়।পরাগ রেণুর মাধ্যমে এলার্জিক রাইনাইটিস প্রতিরোধে নিচের উপদেশগুলো কার্যকর হতে পারে—ঋতু পরিবর্তনের সময়ে, বিশেষ করে গ্রীষ্ম ও বসন্তকালে যতটা সম্ভব ঘরের ভেতরে থাকুন।

মাঝ-সকালে এবং সন্ধ্যার আগে আগে ঘরের দরজা-জানালা বন্ধ রাখুন। এই সময়ে বাতাসে পরাগরেণুর সংখ্যা সবচেয়ে বেশি থাকে।

বাতাসে পরাগ রেণুর পরিমাণ বাড়লে জরুরি প্রয়োজন ছাড়া বাড়ির বাইরে যাওয়া এড়িয়ে চলুন। একান্তই বাইরে যেতে হলে বাড়িতে ফেরার পর গোসল করে নিন। যেসব জামা-কাপড় পরে বাইরে গিয়েছিলেন সেগুলো ধুয়ে ফেলুন।

সম্ভব হলে জামা-কাপড় ঘরের ভেতরে শুকোতে দিন। তবে বাড়িতে যেন ছত্রাক না জন্মায় সে ব্যাপারেও সতর্ক থাকতে হবে।

যে স্থানে ঘাসের পরিমাণ বেশি সেখানে হাঁটাচলা করা থেকে বিরত থাকুন।মোল্ড বা ছত্রাকছবি: দেয়ালে ছত্রাক বা মোল্ডউষ্ণ ও স্যাঁতস্যাঁতে পরিবেশ এধরনের এলার্জির উপদ্রব বাড়িয়ে দিতে পারে। এটি প্রতিরোধে নিচের পরামর্শগুলো মেনে চলুন—বাড়ির পরিবেশকে শুষ্ক রাখার পাশাপাশি আলো-বাতাস চলাচলের ভালো ব্যবস্থা রাখুন।

বাড়ির ভেতরের স্যাঁতস্যাঁতে ও আর্দ্র স্থানগুলো মেরামত করুন।

গোসল ও রান্নার সময়ে জানালা খুলে দিন। তবে এসময়ে রান্নাঘর ও বাথরুমের দরজা বন্ধ রাখুন যেন বাষ্প বাড়ির ভেতর না ছড়ায়। তাছাড়া বাষ্প বাড়ির বাইরে বের করে দিতে এক্সস্ট ফ্যান ব্যবহার করুন।

বাড়ির ভেতরে ভেজা কাপড় শুকোতে দেওয়া থেকে বিরত থাকুন। স্যাঁতস্যাঁতে স্থানে কাপড় রাখা ও আলমারিতে নির্দিষ্ট স্থানে অনেক কাপড় আঁটসাঁট করে রাখা এড়িয়ে চলুন।

ঘরে গাছ থাকলে সেটি সরিয়ে ফেলুন।

ID: 94

Context: এলার্জিক রাইনাইটিস নির্ণয়

Question: এলার্জিক রাইনাইটিস নির্ণয় কি?

Answer:

\* এলার্জিক রাইনাইটিস আছে কি না সেটি নিশ্চিত হতে ডাক্তার রোগীকে বিভিন্ন প্রশ্ন করে থাকেন। যেমন—নির্দিষ্ট কোনো এলার্জিক উপাদানের প্রভাবে লক্ষণ প্রকাশ পাচ্ছে কি না

\* লক্ষণগুলো কোনো নির্দিষ্ট স্থানে অথবা সময়ে দেখা দেয় কি না।

\* পরিবারের কেউ এমন সমস্যায় ভুগছেন কি না এসবের পাশাপাশি ডাক্তার নাকে ‘পলিপ’ আছে কি না সেটিও খতিয়ে দেখতে পারেন। পলিপকে অনেকে ‘নাকের ভেতরে মাংস বেড়ে যাওয়ার সমস্যা’ হিসেবে চিনে থাকেন।

\* এলার্জিক রাইনাইটিসে নাকের ভেতরের প্রদাহ হওয়ার কারণে নাকে পলিপ হতে পারে।

\* অ্যান্টিহিস্টামিন ব্যবহারে রোগীর লক্ষণ উপশম হলে প্রায় নিশ্চিতভাবে বলা যায় যে হাঁচি, নাক দিয়ে পানি পড়া ও সর্দির মতো \*লক্ষণগুলো এলার্জিক প্রতিক্রিয়ার কারণেই ঘটেছে। তবে এলার্জিক রাইনাইটিসের প্রকৃত কারণ সম্পর্কে নিশ্চিত না হলে ডাক্তার কিছু বিশেষ এলার্জি পরীক্ষা করানোর পরামর্শ দিতে পারেন।

ID: 95

Context: এলার্জিক রাইনাইটিসের জটিলতাগুলো

Question: এলার্জিক রাইনাইটিসের জটিলতাগুলো কি কি?

Answer:

\* এলার্জিক রাইনাইটিস থেকে কিছু জটিলতা তৈরি হতে পারে। নাক দিয়ে পানি পড়া ও নাক বন্ধের সমস্যা থেকে আরও কিছু সমস্যা হতে পারে। যেমন—ঘুমের সমস্যা বা নিদ্রাহীনতা

\* দিনের বেলাতেও ঘুম ঘুম লাগা

\* মেজাজ খিটখিটে হয়ে থাকা

\* কাজে মনোযোগ দিতে সমস্যা হওয়া উল্লেখ্যযোগ্য। রোগী এলার্জিক রাইনাইটিসের পাশাপাশি হাঁপানিতে ভুগলে হাঁপানির লক্ষণগুলো খারাপের দিকে যেতে পারে।

ID: 96

Context: কানে ব্যথা

Question: কানে ব্যথা কি?

Answer:

কানে ব্যথা খুব কমন একটা সমস্যা। শিশুদের সমস্যাটি বেশি হয়ে থাকে। সাময়িকভাবে যন্ত্রনাদায়ক হলেও, অধিকাংশ ক্ষেত্রে এটি কোনো গুরুতর রোগের লক্ষণ নয়। সময়মত সঠিক চিকিৎসা নিলে কানে ব্যথা থেকে প্রতিকার পাওয়া যায়।

ID: 97

Context: কানে ব্যথার কারণ

Question: কানে ব্যথার কি কি কারণ হতে পারে?

Answer:

নানান কারণে কানে ব্যথা হতে পারে। বিভিন্ন কারণে ব্যথার স্থায়িত্ব বিভিন্ন রকম হয়ে থাকে। নিচে কানে ব্যথার খুব পরিচিত কিছু ধরন ও সেসবের সম্ভাব্য কারণগুলোর একটা তালিকা দেওয়া হলো—

কানে ব্যথার সাথে সম্ভাব্য কারণঃ

দাঁতে ব্যথা অনুভুত হওয়া – শিশুদের দাঁত ওঠা

– দাঁত ও দাঁতের মাড়িতে ইনফেকশনের জন্য ফোঁড়া হওয়া

শুনতে সমস্যা হওয়া – গ্লু ইয়ার বা কানে পানি জমা

– কানে খইল বা ময়লা তৈরি হওয়া

– কানের ভেতরে কিছু আটকে যাওয়া। যেমন: শিশু কোনো খেলনা, বাদাম অথবা মটরশুঁটি কানে ঢুকিয়ে ফেললে যদি তা আটকে যায়

– কানের পর্দা ছিদ্র হওয়া

খাবার গিলার সময় ব্যথা অনুভুত হওয়া – গলা ব্যথা

– টনসিলের ইনফেকশন

– টনসিলের বিভিন্ন জটিলতা। যেমন: টনসিলের চারপাশে গুরুতর ইনফেকশন থেকে ফোঁড়া হওয়া

জ্বর আসা – কানের ইনফেকশন

– কানের ভিতর কিছু আটকে গেলে তা নিজে নিজে বের করার চেষ্টা না করে দ্রুত ডাক্তারের কাছে যান।

ID: 98

Context: কানের ব্যথা কমানোর উপায়

Question: কানের ব্যথা কমানোর উপায় কি ?

Answer:

কানের ব্যথা কমাতে নিচে উল্লেখিত বিষয়গুলো মেনে চলুন—নরম কাপড় দিয়ে উষ্ণ অথবা ঠাণ্ডা সেক দিতে পারেন

প্যারাসিটামল অথবা আইবুপ্রোফেন জাতীয় ব্যথানাশক ঔষধ খেতে পারেন। উল্লেখ্য, যাদের বয়স ১৬ বছরের কম তাদের অ্যাসপিরিন জাতীয় ঔষধ সেবন করা উচিৎ নয়। ব্যথা প্রতিকারে যা করবেন না—কানে কিছু প্রবেশ করাবেন না। যেমন: কটন বাড জাতীয় বস্তু

ইয়ার ওয়াক্স বা কানের ময়লা বের করার চেষ্টা করবেন না

কানে পানি প্রবেশ করতে দেবেন না। যখন জরুরিভাবে ডাক্তারের পরামর্শ নেবেন

কানে ব্যথার সাথে সাথে যে সমস্যাগুলো দেখা দিলে দ্রুত ডাক্তারের পরামর্শ নিবেন—

৩ দিনের বেশি সময় কানে ব্যথা থাকলে

বার বার কান ব্যথা হলে

ব্যথা বেড়ে গেলে এবং অবস্থার অবনতি হলে

অনেক জ্বর আসলে অথবা গা গরম লাগলে এবং কাঁপুনি হলে

কান ও কানের চারপাশ ফুলে গেলে

কান থেকে পানি কিংবা তরল পদার্থ বের হতে থাকলে

কানে শুনতে সমস্যা হলে অথবা শুনতে না পেলে

কানে কিছু আটকে গেলে

শিশুর বয়স ২ বছরের চেয়ে কম হলে এবং একইসাথে দুই কানে ব্যথা থাকলে।

ID: 99

Context: শিশুর কানে ব্যথা

Question: কিভাবে বুঝবেন আপনার শিশুর কানে ব্যথা হচ্ছে?

Answer:

শিশু ও ছোটো বাচ্চাদের এক কানে অথবা একই সাথে দুই কানে ব্যথা হতে পারে। বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই ইনফেকশনের জন্য ব্যথা হয়—যা অল্প কিছুদিনেই সেরে যায়। শিশুর কানে ব্যথা হচ্ছে কি না তা বোঝার কিছু উপায় হলো— \* বাচ্চারা কান ঘষলে বা টানলে

\* আওয়াজে সাড়া না দিলে

\* শরীরের তাপমাত্রা ১০০.৪ ডিগ্রি ফারেনহাইট বা তার বেশি হলে

\* খিটখিটে কিংবা খুব অস্থির হয়ে উঠলে

\* খাবার খেতে না চাইলে

\* শরীরের ভারসাম্য বা ব্যালেন্স হারিয়ে ফেললে

ID: 100

Context: কানের খইল

Question: কানের খইল বা ময়লা তৈরি হলে করণীয় কি?

Answer:

কানের খইল জমলে সেটিকে আমরা কানের ময়লাও বলে থাকি। এটিকে ইংরেজিতে ইয়ার ওয়াক্স বলা হয়। এটি একটি স্বাভাবিক বিষয়।সাধারণভাবে ময়লা ভাবা হলেও কানের খইল আমাদের জন্য উপকারি। এটি কানের ভেতরের পরিবেশকে জীবাণু থেকে সুরক্ষা দেয়। এটি সাধারণত নিজ থেকেই নিয়মিতভাবে বেরিয়ে আসে।যদি কানে বেশি পরিমাণে খইল জমা হয় এবং শক্ত হয়ে আটকে থাকে তাহলে কানে নানান সমস্যা দেখা দেয়। তখন ডাক্তারের পরামর্শ নিতে হয়।কানে খইল আটকে থাকলে যে লক্ষণগুলো দেখা দেয় তা হলো—কানে শুনতে না পাওয়া

কানে ব্যথা হওয়া এবং কান বন্ধ হয়ে আছে বলে মনে হওয়া

বাইরে কোনো শব্দ না হলেও কানের ভেতর গুঞ্জন হচ্ছে বলে মনে হওয়া

মাথা ঘুরানো, শরীরের ভারসাম্য হারিয়ে ফেলা

বমি বমি লাগাগুরুত্বপূর্ণ তথ্য

আঙুল ও অন্য কোনো বস্তু (যেমন: কটন বাড) দিয়ে কখনোই কানের ময়লা বের করার চেষ্টা করবেন না। কারণ এতে ময়লা উল্টো কানের ভেতরে ঢুকে যায়। ফলে খইলের সমস্যা আরও বেড়ে যায় এবং ভোগান্তি পোহাতে হয়। আমাদের অনেকেরই এই অভ্যাস আছে। তাই এখন থেকে এই কাজটি একেবারেই বন্ধ করে দিতে হবে।কানের খইল বা ময়লা বের করতে হলে মেডিকেল গ্রেড অলিভ ওয়েল ব্যবহার করবেন। এই তেল তুলনামূলক বেশি কার্যকর এবং কানের ময়লা সহজে নরম করে। ফলে সেটি আপনা-আপনি কান থেকে বেরিয়ে আসে।কানে তেল ব্যবহারের নিয়মকানের ময়লা নিজ থেকেই বের হয়ে পড়ে যায়। কিন্তু যদি তা কানে আটকে থাকে এবং কান বন্ধ করে রাখে তাহলে দিনে তিন বার অথবা চার বার কানে দুই থেকে তিন ফোঁটা মেডিকেল গ্রেড অলিভ ওয়েল অথবা অ্যামন্ড ওয়েল দিন। টানা তিন থেকে পাঁচ দিন এই পদ্ধতি অনুসরণ করুন।কানে তেল দেওয়ার সুবিধার্থে ড্রপার ব্যবহার করুন। তেল যেন সহজে কানের নালিতে প্রবেশ করে তাই কিছুক্ষণের জন্য মাথা এক পাশে কাত করে রাখুন। সকালে ঘুম থেকে উঠে ও রাতের ঘুমানোর আগে কানে তেল দিলে পদ্ধতিটি মেনে চলা সহজতর হবে। এর ফলে দুই সপ্তাহের মধ্যে ময়লা দলা হয়ে কান থেকে বেরিয়ে আসবে।জরুরি তথ্যঃ

কানের পর্দায় ছিদ্র থাকলে ড্রপ ও তেল ব্যবহার করবেন না।যখন ডাক্তারের কাছে যাবেনঘরোয়া পদ্ধতিতে সমস্যার সমাধান না হলে একজন নাক-কান-গলা বিশেষজ্ঞের পরামর্শ নেবেন।

ID: 105

Context: কোষ্ঠকাঠিন্য

Question: কোষ্ঠকাঠিন্য কি ?

Answer:

পায়খানা কষা বা শক্ত হওয়াকেই মূলত কোষ্ঠকাঠিন্য বলা হয়। এটি খুব পরিচিত একটি স্বাস্থ্য সমস্যা। অনেকেরই মাঝে মাঝে পায়খানা খুব শক্ত হয়ে যায়, মলত্যাগের সময় অনেকক্ষণ কসরত করতে হয়। এ ছাড়া পায়খানার পর মনে হয় পেট ঠিকমতো পরিষ্কার হয়নি।পায়খানা কষা বা শক্ত হওয়াকেই মূলত কোষ্ঠকাঠিন্য বলা হয়। এটি খুব পরিচিত একটি স্বাস্থ্য সমস্যা। অনেকেরই মাঝে মাঝে পায়খানা খুব শক্ত হয়ে যায়, মলত্যাগের সময় অনেকক্ষণ কসরত করতে হয়। এ ছাড়া পায়খানার পর মনে হয় পেট ঠিকমতো পরিষ্কার হয়নি।কোষ্ঠকাঠিন্য হলে পায়খানা শক্ত হয়, যার কারণে অনেকে মলত্যাগের সময় ব্যথা অনুভব করেন। কারও কারও ক্ষেত্রে একটানা তিন–চারদিন পায়খানা নাও হতে পারে। এগুলো সবই সাধারণত কোষ্ঠকাঠিন্যের লক্ষণ। দীর্ঘদিন কোষ্ঠকাঠিন্য হলে পাইলস বা অর্শ রোগ কিংবা এনাল ফিসার বা গেজ রোগ এর মতো পায়ুপথের রোগ তৈরি হতে পারে। পায়খানা কষা কেন হয় তা জেনে কিছু সাধারণ নিয়ম মেনে চললে কোনো প্রকার ঔষধ ছাড়াই সম্পূর্ণ ঘরোয়া উপায়েই এই সমস্যা এড়িয়ে চলা সম্ভব।

ID: 106

Context: কোষ্ঠকাঠিন্যের লক্ষণগুলো

Question: কোষ্ঠকাঠিন্যের লক্ষণগুলো কী কী?

Answer:

সাধারণত সপ্তাহে যদি তিন বারের কম পায়খানা হয়, তবে সেটাকে কোষ্ঠকাঠিন্য বলা হয়। এ ছাড়াও কোষ্ঠকাঠিন্য হলে যেসব লক্ষণ থাকতে পারে সেগুলো হলো—

\* পায়খানা শুকনো, শক্ত চাকার মত হওয়া

\* পায়খানার আকৃতি স্বাভাবিকের চেয়ে বড় হওয়া

\* পায়খানা করতে কষ্ট হওয়া

\* পেট পরিষ্কার হচ্ছে না এমন মনে হওয়া

\* পেটে ব্যথা হওয়া, পেট ফাঁপা লাগা, বা বমি বমি ভাব হওয়া

ID: 107

Context: কোষ্ঠকাঠিন্য

Question: কোষ্ঠকাঠিন্য কেন হয়?

Answer:

নানাবিধ কারণে কোষ্ঠকাঠিন্য হতে পারে। এগুলোর মধ্যে সবচেয়ে কমন ও গুরুত্বপূর্ণ ৬টি কারণ হলো

\* খাবারের তালিকায় যথেষ্ট পরিমাণে ফাইবার বা আঁশ না থাকা , পর্যাপ্ত পরিমাণে পানি পান না করা ,শুয়ে-বসে থাকা ও শারীরিক পরিশ্রমের অভাব,পায়খানার বেগ আসলে তা চেপে রাখা ,মানসিক চাপ, উদ্বেগ বা বিষণ্ণতা ,ঔষধের পার্শ্ব প্রতিক্রিয়াএই কারণগুলো কিভাবে কোষ্ঠকাঠিন্যের সমস্যা সৃষ্টি করে তা জানা গুরুত্বপূর্ণ। এর মাধ্যমে এগুলো সমাধান করা সহজ হবে।

\* যথেষ্ট ফাইবার বা আঁশযুক্ত খাবার না খাওয়াফাইবার বা আঁশ হলো এক ধরনের শর্করা। পেট পরিষ্কার হওয়ার জন্য ফাইবার খুবই গুরুত্বপূর্ণ। আমাদের পরিপাকতন্ত্রের যে জায়গায় পায়খানা তৈরি হয় ও জমা থাকে, সেখানে ফাইবার অনেকটা স্পঞ্জের মত কাজ করে।পানি শোষণ ও ধারণ করার মাধ্যমে ফাইবার পায়খানায় পানি ধরে রাখতে সাহায্য করে। ফলে পায়খানা নরম ও ভারী হয়, সহজেই শরীর থেকে বের হয়ে আসে। কিন্তু খাবারে পর্যাপ্ত পরিমাণে ফাইবার না থাকলে পায়খানা শক্ত হয়ে যায়, ফলে কোষ্ঠকাঠিন্য দেখা দিতে পারে।\* পর্যাপ্ত পরিমাণে পানি পান না করাপানি খাবারের ফাইবারের সাথে মিলে পায়খানাকে ভারী ও নরম করে। এর ফলে পরিপাকতন্ত্রের ভেতর দিয়ে পায়খানা চলাচল সহজ হয়। তাই পর্যাপ্ত পরিমাণে পানি পান না করলে কোষ্ঠকাঠিন্য হতে পারে।

\* শুয়ে-বসে থাকা ও শারীরিক পরিশ্রমের অভাবনিয়মিত ব্যায়াম ও শারীরিক পরিশ্রম করলে আমাদের পরিপাকতন্ত্র অর্থাৎ পেটের ভেতরে থাকা নাড়িভুঁড়ি সচল হয়। এতে স্বাভাবিকভাবে পায়খানা বেরিয়ে আসে। নিয়মিত শারীরিক পরিশ্রমের অভাব হলে তাই কোষ্ঠকাঠিন্য দেখা দিতে পারে।

\* পায়খানার বেগ আসলে তা চেপে রাখা পায়খানা শক্ত হলে অনেকে টয়লেটে যেতে চায় না, কারণ তখন মলত্যাগ করতে কিছুটা কষ্ট হয়। কিন্তু পায়খানার বেগ আসলে তা যদি আটকে রাখা হয়, তাহলে শরীর ক্রমশ সেখান থেকে পানি শুষে নিতে থাকে। পেটের ভেতর পায়খানা জমিয়ে রাখলে সেটা দিন দিন আরও শক্ত হতে থাকে, ফলে কোষ্ঠকাঠিন্য দেখা দেয়।

\* মানসিক চাপ, উদ্বেগ বা বিষণ্ণতা অনেক সময় মানসিক চাপ, কোনো কিছু নিয়ে উদ্বিগ্ন থাকা বা বিষণ্ণতায় ভোগার ফলে শরীরের স্বাভাবিক গতিপ্রকৃতির ছন্দপতন হয়, শারীরবৃত্তীয় কাজকর্মে ব্যাঘাত ঘটে। এতে কোষ্ঠকাঠিন্য দেখা দিতে পারে।

\* ঔষধের পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া নির্দিষ্ট কিছু ঔষধের পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া হিসেবে কোষ্ঠকাঠিন্য দেখা দিতে পারে। এর মধ্যে রয়েছে —ট্রামাডল বা ওপিয়েট জাতীয় ব্যথার ঔষধ ,আইবুপ্রোফেন , আয়রন ট্যাবলেট,ক্যালসিয়াম সাপ্লিমেন্ট ,কেমোথেরাপিতে ব্যবহৃত কিছু ঔষধ এছাড়া একসাথে পাঁচটার বেশি ঔষধ খেলেও কোষ্ঠকাঠিন্য হওয়ার সম্ভাবনা বাড়তে পারে।

ID: 108

Context: কোষ্ঠকাঠিন্য দূর করার উপায়

Question: কোষ্ঠকাঠিন্য দূর করার উপায় কী?

Answer:

যেসব কারণে কোষ্ঠকাঠিন্য হতে পারে সেগুলো এড়িয়ে চলার মাধ্যমে সহজেই কোষ্ঠকাঠিন্য থেকে পরিত্রাণ পাওয়া সম্ভব। নিচে ঘরোয়া উপায়ে কিভাবে কোষ্ঠকাঠিন্যের চিকিৎসা করা যায় তা তুলে ধরা হয়েছে।১. খাবারের তালিকায় ফাইবারের পরিমাণ বাড়াতে হবেপর্যাপ্ত পরিমাণে ফাইবার বা আঁশ আছে এমন খাবার খেতে হবে। সবুজ শাকসবজি, ফলমূল, ডাল, লাল আটা ও লাল চালের মতো গোটা শস্যদানা বেশি করে খাওয়া উচিত। কোষ্ঠকাঠিন্য এড়াতে দৈনিক প্রায় ৩০ গ্রাম ফাইবার খাওয়ার পরামর্শ দেয়া হয়।

কোষ্ঠকাঠিন্য দূর করতে প্রতিদিনের খাবার তালিকায় কীভাবে ফাইবার যোগ করবেন? জেনে নিন আমাদের সহজ ৫টি টিপস—

\* ভাত বা রুটি খাওয়ার ক্ষেত্রে লাল চাল ও লাল আটা ব্যবহার করতে পারেন। এগুলোতে ফাইবারের পরিমাণ বেশি থাকে।

\* প্রতিবেলার খাবারে ডাল রাখতে পারেন। ডালে যথেষ্ট পরিমাণে ফাইবার থাকে।

\* প্রতিবেলার খাবারে কয়েক ধরনের বা সম্ভব না হলে কমপক্ষে এক ধরনের সবজি রাখতে হবে।

\* যেসব ফল বা সবজি খোসাসহ খাওয়া যায় সেগুলো খোসা না ফেলে খাওয়ার চেষ্টা করুন। কারণ খোসায় উচ্চ পরিমাণে ফাইবার থাকে। টমেটো, আপেল ও আলুর মতো খাবারগুলো খোসাসহ খেতে পারেন। তবে খাওয়ার আগে অবশ্যই ভালোমতো পরিষ্কার করে ধুয়ে নিতে হবে।

\* যেকোনো ফল বা সবজি গোটা বা আস্ত খেলে ভালো ফাইবার পাওয়া যায়। জুস বা ভর্তা বানিয়ে খেলে আঁশের পরিমাণ কমে যায়।

তবে খাবারের তালিকায় ফাইবারের পরিমাণ হুট করে বাড়ানো উচিত নয়। কারণ হঠাৎ ডায়েটে ফাইবারের পরিমাণ বাড়িয়ে ফেললে বায়ুর সমস্যা হতে পারে। এ ছাড়া পেট ফাঁপা, তলপেটে তীব্র ব্যথাসহ নানা ধরনের জটিলতা দেখা দিতে পারে।তাই খাদ্য তালিকায় ফাইবারের পরিমাণ ধীরে ধীরে বাড়াতে হবে। গতকাল যদি শুধু একটি ফল খেয়ে থাকেন, তাহলে আজ দুটো খাওয়ার সিদ্ধান্ত নিন। সাথে কিছু বাদাম খান। রান্না করা সবজি খেতে না চাইলে ভাতের সাথে টমেটো, শসা, গাজর কেটে সালাদ খাওয়া শুরু করতে পারেন।পড়ুন: ফাইবার জাতীয় খাবার তালিকাকোষ্ঠকাঠিন্য দূর করার ঔষধ: ইসবগুলের ভুসি

ইতোমধ্যে কোষ্ঠকাঠিন্য দেখা দিলে ইসবগুলের ভুসি খেতে পারেন। কোষ্ঠকাঠিন্য দূর করতে ইসবগুলের ভুসি একটি চমৎকার ঘরোয়া ঔষধ। এতে প্রচুর পরিমাণে ফাইবার থাকে। ভুসি পানি শোষণ ও ধারণ করার মাধ্যমে পায়খানা নরম করে, ফলে কোষ্ঠকাঠিন্য দূর হয়। সাধারণত দিনে দুইবার ইসবগুলের ভুসি খাওয়ার পরামর্শ দেয়া হয়। তবে এটি খাবার নির্দিষ্ট কিছু নিয়ম আছে, যা বেশিরভাগ মানুষেরই অজানা। আমাদের কোষ্ঠকাঠিন্য দূর করতে ইসবগুলের ভুসি খাওয়া সম্পর্কিত আর্টিকেল থেকে বিস্তারিত জেনে নিন। ভুসি খেলে সারাদিনে অন্তত দুই লিটার পানি পান করার বিষয়টি ভুলে যাওয়া যাবে না।

২. দিনে অন্তত দুই লিটার পানি পান করতে হবেপানি পায়খানা নরম করে কোষ্ঠকাঠিন্য দূর কর‍তে সহায়তা করে। এ ছাড়া ফাইবারজাতীয় খাবার প্রচুর পানি শোষণ করে। তাই ডায়েটে ফাইবার বাড়ানোর সাথে সাথে পানি পান করার পরিমাণও বাড়াতে হবে। যথেষ্ট পরিমাণে ফাইবার ও পানি খেলে সাধারণত কয়েকদিনের মধ্যে কোষ্ঠকাঠিন্য দূর হয়।ফাইবারের সাথে পর্যাপ্ত পানি পান করা না হলে পেটের ভেতরে থাকা নাড়িভুঁড়ির মুখ আটকে যেতে পারে। এমন অবস্থায় জরুরী ভিত্তিতে হাসপাতালে যেতে হয়। এই পরিস্থিতি এড়াতে দিনে কমপক্ষে ২ লিটার পানি পান করতে হবে।

৩. প্রতিদিন কিছুক্ষণ ব্যায়াম বা শরীরচর্চা করতে হবেনিয়মিত শরীরচর্চা বা হালকা ব্যায়াম করতে হবে। শরীর সচল রাখলে তা পায়খানা নরম রাখতে সাহায্য করে। প্রতিদিন কিছু সময়ের জন্য ব্যায়াম করার চেষ্টা করুন।আপনার বয়স যদি ১৯ থেকে ৬৪ এর মধ্যে হলে সপ্তাহে অন্তত আড়াই ঘণ্টা মাঝারি ধরনের ব্যায়াম, যেমন দ্রুত হাঁটা বা সাইকেল চালানো উচিত। যদি আরেকটু বেশি পরিশ্রমের ব্যায়াম করতে চান তাহলে দৌড়ানো, ফুটবল খেলা, দড়ি লাফ, সাঁতার কাটা — এগুলো বেছে নিতে পারেন। ভারী ব্যায়ামের ক্ষেত্রে সপ্তাহে অন্তত সোয়া ১ ঘণ্টা বা ৭৫ মিনিট ব্যায়াম করার চেষ্টা করতে হবে।ব্যায়ামের মধ্যে ভারী ব্যায়াম বা প্রতিদিন দৌড়ানো বেছে নিতে হবে, তা নয়। শরীরকে চলমান রাখতে হাঁটাচলা, হালকা স্ট্রেচিং, যোগব্যায়াম ইত্যাদির মধ্যে যেকোনোটাই বেছে নেওয়া যায়। গবেষণায় দেখা গেছে, কোষ্ঠকাঠিন্য কমাতে হাঁটাহাঁটি বা হালকা শরীরচর্চাও কার্যকরী ভূমিকা রাখে।অন্যকিছু করার সুযোগ না হলে প্রতিদিন অন্তত ১৫-২০ মিনিট হাঁটার চেষ্টা করুন। প্রয়োজনে অল্প অল্প করে শুরু করতে পারেন। এক বেলা দিয়ে শুরু করুন, এরপর সকাল-সন্ধ্যা দুই বেলা করে হাঁটুন। প্রথমে সপ্তাহে তিন দিন এভাবে হেঁটে আস্তে আস্তে সেটা পাঁচ দিনে নিয়ে আসুন। এরপর ধীরে ধীরে সময় বাড়াতে থাকুন। এতে কিছুটা হলেও কোষ্ঠকাঠিন্য প্রতিরোধ করা সম্ভব হবে।আপনি যদি নিয়মিত দৌড়ানোর অভ্যাস ঘড়ে তুলতে চান, সেক্ষেত্রে ৯ সপ্তাহে দৌড়ানোর অভ্যাস তৈরির গাইডলাইনটি ফলো করুন।

৪. পায়খানার বেগ আসলে তা চেপে রাখা যাবে নাপায়খানা চেপে রাখলে কোষ্ঠকাঠিন্যের সমস্যা গুরুতর হতে থাকে। এর ফলে পাইলস ও এনাল ফিসার বা গেজ রোগ সহ বিভিন্ন ধরনের স্বাস্থ্য সমস্যা দেখা দিতে পারে। তাই পায়খানার বেগ আসলে যত দ্রুত সম্ভব টয়লেটে চলে যেতে হবে।যাদের কোষ্ঠকাঠিন্য আছে তাদের জন্য মলত্যাগের সবচেয়ে ভালো উপায় হলো প্যান বা লো কমোডে বসা। তাই সম্ভব হলে লো কমোড ব্যবহার করতে পারেন।বাম: প্যান বা লো কমোড | ডান: হাই কমোডআর যদি হাই কমোড ব্যবহার করতে হয় সেক্ষেত্রে পায়ের নিচে ছোট টুল দিয়ে পা উঁচু করে বসতে পারেন, যাতে হাঁটু দুটি কোমরের উপরে থাকে। এতে মলত্যাগ সহজ হবে। নিচে বোঝার সুবিধার জন্য আমরা একটি ছবি সংযুক্ত করে দিয়েছি।হাই কমোড ব্যবহারের ক্ষেত্রে পায়ের নিচে ছোট টুল দিয়ে পা উঁচু করে বসতে পারেন

৫. মানসিক স্বাস্থ্য উন্নত করার ব্যবস্থা নিতে হবেমন ভালো হয় এমন প্রশান্তিমূলক কাজ করতে পারেন। এটা হতে পারে কোথাও ঘুরতে যাওয়া, গান শোনা, প্রার্থনা করা বা আপনজনের সাথে সময় কাটানো। যদি আপনি ডিপ্রেশন কিংবা উদ্বিগ্নতা (Anxiety) রোগে ভুগে থাকেন, তাহলে সেই রোগের চিকিৎসা নিন। আপনার মানসিক অবস্থার উন্নতির সাথে সাথে কোষ্ঠকাঠিন্যও আস্তে আস্তে সেরে উঠবে।৬. ঔষধের পার্শ্বপ্রতিক্রিয়ার বিষয়ে সচেতন থাকতে হবেঔষধের পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া এড়াতে নতুন ঔষধ শুরু করার পরে যদি মনে হয় কোষ্ঠকাঠিন্যের সমস্যা বেড়ে গেছে, তাহলে আপনার ডাক্তারকে জানান। তিনি প্রয়োজনে ঔষধ বদলে দিতে পারেন, বা কোষ্ঠকাঠিন্যের চিকিৎসার জন্য অন্য আরেকটি ঔষধ যোগ করতে পারেন।

ID: 109

Context: কোষ্ঠকাঠিন্য ও ডাক্তারের পরামর্শ

Question: কোষ্ঠকাঠিন্য হলে কখন ডাক্তারের পরামর্শ নিতে হবে?

Answer:

নিচের ৯টি অবস্থায় দেরি না করে ডাক্তারের পরামর্শ নিন

\* ঘরোয়া উপায়ে কোষ্ঠকাঠিন্যের সমাধান না হলে

\* দীর্ঘদিন যাবত নিয়মিত কোষ্ঠকাঠিন্য রোগে ভোগা বা পেট ফাঁপা লাগলে

\* অনেকদিন কোষ্ঠকাঠিন্য থাকার পর ডায়রিয়া শুরু হলে

\* পায়খানার সাথে রক্ত যাওয়া বা আলকাতরার মতো কালো পায়খানা হলে

\* পায়খানার রাস্তায় ব্যথা হলে

\* কোষ্ঠকাঠিন্যের সাথে পেট ব্যথা বা জ্বর আসলে

\* সারাক্ষণ ক্লান্ত লাগলে

\* কোনো কারণ বা চেষ্টা ছাড়াই ওজন অনেক কমে গেলে কিংবা শুকিয়ে গেলে \* রক্তশূন্যতায় ভুগলে

ID: 110

Context: কোষ্ঠকাঠিন্য

Question: দীর্ঘদিন ধরে কোষ্ঠকাঠিন্য হলে কী সমস্যা হয়?

Answer:

অনেকদিন ধরে কোষ্ঠকাঠিন্য থাকলে ‘ফিকাল ইম্প্যাকশান’ হতে পারে। এর অর্থ আপনার মলদ্বারে পায়খানা জমা হয়ে আটকে থাকতে পারে। ফিকাল ইম্প্যাকশান এর প্রধান লক্ষণ হচ্ছে অনেকদিন ধরে কোষ্ঠকাঠিন্য থাকার পরে ডায়রিয়া হওয়া।

ID: 116

Context: খাদ্যে অসহনীয়তা

Question: খাদ্যে অসহনীয়তা কি ?

Answer:

নির্দিষ্ট কিছু খাবারে হজমে সমস্যা হওয়া এবং সেগুলো খাওয়ার পর শরীরে বিরূপ প্রতিক্রিয়া দেখা দেওয়ার ঘটনাকে খাদ্যে অসহনীয়তা বলা হয়। নির্দিষ্ট কিছু খাবারে হজমে সমস্যা হওয়া এবং সেগুলো খাওয়ার পর শরীরে বিরূপ প্রতিক্রিয়া দেখা দেওয়ার ঘটনাকে খাদ্যে অসহনীয়তা বলা হয়। খাদ্যে অসহনীয়তার কারণে বিভিন্ন লক্ষণ দেখা দিতে পারে। যেমন: পেট ফাঁপা ভাব ও পেট ব্যথা। এসব লক্ষণ সাধারণত খাবার খাওয়ার কয়েক ঘন্টা পরে দেখা দেয়। খাদ্যে অসহনীয়তায় ভুগছেন এমন মনে করা মানুষের সংখ্যা বিগত বছরগুলোতে অনেকখানি বেড়ে গিয়েছে। তবে কতজন মানুষ প্রকৃতপক্ষেই এই সমস্যায় ভুগছেন সেটি নির্ধারণ করা কঠিন। অনেকেই খাদ্যে অসহনীয়তায় ভুগছেন বলে মনে করলেও দেখা যায় যে তাদের লক্ষণগুলোর পেছনে আসলে ভিন্ন কোনো কারণ দায়ী।

ID: 117

Context: খাদ্যে অসহনীয়তার

Question: খাদ্যে অসহনীয়তার ক্ষেত্রে কীধরনের লক্ষণ দেখা যেতে পারে ?

Answer:

সাধারণত যেসব খাবারে রোগীর অসহনীয়তা রয়েছে সেগুলো খাওয়ার কয়েক ঘন্টা পর কিছু লক্ষণ দেখা দেয়। তবে এই সাধারণ লক্ষণগুলো যে কেবল খাদ্যে অসহনীয়তার জন্যই নির্দিষ্ট—তা নয়। বিভিন্ন ধরনের রোগেও এই জাতীয় লক্ষণগুলো দেখা যায়।একারণে রোগীর সত্যিই কোনো খাবারে অসহনীয়তা আছে কি না সেটি নির্ধারণ করা কঠিন হয়ে পড়ে।নির্দিষ্ট কোনো খাবার সহ্য না হলে রোগীর মধ্যে সাধারণত নিচের লক্ষণগুলো দেখা দেয়—হজম সংক্রান্ত সমস্যা

পেট ব্যথা

পেট ফাঁপা ভাব

বায়ুর সমস্যা

পাতলা পায়খানা

অন্যান্য সমস্যা

ত্বকে ফুসকুড়ি বা র‍্যাশ দেখা দেওয়া

চুলকানি হওয়া

ID: 118

Context: খাদ্যে অসহনীয়তার লক্ষণ

Question: খাদ্যে অসহনীয়তার মতো লক্ষণ দেখা দিতে পারে যেসব রোগে

Answer:

\* নিয়মিতভাবে নিচের চারটি লক্ষণ দেখা দিলে এবং লক্ষণগুলোর কারণ সম্পর্কে নিশ্চিত না হতে পারলে ডাক্তারের পরামর্শ নিতে হবে

\* ডায়রিয়া , পেট ফাঁপা ভাব , পেট ব্যথা

\* ত্বকে ফুসকুড়ি বা র‍্যাশ হওয়াডাক্তার রোগীর সাথে কথা বলে লক্ষণগুলোর ভিত্তিতে রোগ নির্ণয় করবেন। প্রয়োজনে তিনি রক্ত পরীক্ষাসহ অন্যান্য পরীক্ষা করানোর পরামর্শ দিতে পারেন।সাধারণত নিচের রোগগুলোর ক্ষেত্রে খাদ্যে অসহনীয়তার মতো লক্ষণ দেখা দেয়—ইরিটেবল বাওয়েল সিন্ড্রোম (Irritable Bowel Syndrome)

\* মানসিক চাপ ও দুশ্চিন্তা , ল্যাকটোজ ইনটলারেন্স

\* সিলিয়াক ডিজিজ ,ইনফ্ল্যামেটরি বাওয়েল ডিজিজ

বিভিন্ন খাবারে অ্যালার্জিপরিপাকতন্ত্র একটি স্পর্শকাতর অঙ্গ। তাই অসুস্থ হলে অথবা মানসিক চাপের মধ্যে থাকলে প্রায়ই পেটের বিভিন্ন সমস্যা দেখা দিতে পারে।পড়ুন: পেট সুস্থ রাখার ঘরোয়া উপায়

ID: 119

Context: খাদ্যে অসহনীয়তা ও খাদ্যে অ্যালার্জি মধ্যেকার পার্থক্য

Question: খাদ্যে অসহনীয়তা বনাম খাদ্যে অ্যালার্জি মধ্যেকার পার্থক্য গুলো কি কি?

Answer:

\* খাদ্যে অসহনীয়তা ও খাদ্যে অ্যালার্জি দুটি ভিন্ন রোগ। এই দুটি রোগকে কীভাবে একে অপরের থেকে আলাদা করা যায় সেটি নিচের ছকে তুলে ধরা হয়েছে—খাদ্যে অ্যালার্জি খাদ্যে অসহনীয়তা

প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা বা ইমিউন সিস্টেমের সাথে সম্পর্ক খাদ্যে অ্যালার্জি শরীরের প্রতিরক্ষা ব্যবস্থার একটি প্রতিক্রিয়া। শরীরের প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা ভুলবশত কোনো কোনো খাদ্যের প্রোটিনকে শরীরের জন্য হুমকিস্বরুপ মনে করে সেসবের বিরুদ্ধে প্রতিক্রিয়া দেখায়। যাকে আমরা অ্যালার্জি বলি। খাদ্যে অসহনীয়তার সাথে শরীরের প্রতিরক্ষা ব্যবস্থার কোনো সংশ্লিষ্টতা নেই। এতে কোনো অ্যালার্জিক রিঅ্যাকশন হয় না।

রোগের লক্ষণ

\* ত্বকে র‍্যাশ বা ফুসকুড়ি হওয়া ও চুলকানি মুখ, ঠোঁট ও গলা ফুলে যাওয়া

\* শ্বাসপ্রশ্বাসের সময়ে হাঁপানির মতো শোঁ শোঁ শব্দ হওয়া

\* ত্বকে ফুসকুড়ি বা র‍্যাশ দেখা দেওয়া ও চুলকানি- পেট ব্যথা, পেট ফাঁপা ভাব, বায়ুর সমস্যা- পাতলা পায়খানা

\* লক্ষণ দেখা দেওয়ার সময় সাধারণত নির্দিষ্ট খাবার খাওয়ার পরপরই খুব দ্রুত লক্ষণগুলো দেখা দেয়।

\* সাধারণত যেসব খাবার খেলে অসুবিধা হয় সেগুলো খাওয়ার কয়েক ঘন্টা পর ধীরে ধীরে লক্ষণগুলো দেখা দেয়।

\* খাবারের পরিমাণ খুব সামান্য পরিমাণে খাবার খাওয়ার পরই রিঅ্যাকশন শুরু হয়ে যায়। সাধারণত একটি নির্দিষ্ট পরিমাণের বেশি, অর্থাৎ বেশ খানিকটা খাবার খাওয়ার পরে লক্ষণগুলো দেখা দেয়।

\* মৃত্যুঝুঁকি খাদ্যে অ্যালার্জি কখনো কখনো প্রাণঘাতী হতে পারে। খাদ্যে অসহনীয়তা কখনও প্রাণঘাতী হয় না।

\* নির্দিষ্ট খাবারের উদাহরণ প্রাপ্তবয়স্কদের সাধারণত বিশেষ কিছু খাবারে অ্যালার্জি হয়। যেমন , চিংড়ি, স্কুইড ও অন্যান্য শেলফিস-সহ বিভিন্ন বাদাম

শিশুদের ক্ষেত্রে সাধারণত নিচের খাবারগুলোতে অ্যালার্জি হয়

\* দুধ, ডিম, মাছ, চিনাবাদাম ও অন্যান্য বাদাম খাদ্যে অসহনীয়তার রোগীদের অনেক ধরনের খাবারে অসহনীয়তা থাকতে পারে। যেমন—

\* দুধ ও দুগ্ধজাত খাবার, গমের তৈরি খাবার এবং বিভিন্ন ধরনের অ্যাডিটিভ ও প্রিজারভেটিভ যুক্ত খাবার

ID: 120

Context: খাদ্যে অসহনীয়তার কারণ

Question: কি কি কারনে খাদ্যে অসহনীয়তার দেখা দিতে পারে?

Answer:

একজন মানুষ ঠিক কী কারণে নির্দিষ্ট কিছু খাবার সহ্য করতে পারে না সেটি সবসময় সহজে বোঝা যায় না। কিছু কিছু ক্ষেত্রে খাবার ও লক্ষণের সম্পর্ক থেকে অসহনীয়তার কারণ সম্পর্কে ধারণা পাওয়া যায়।যেমন, দুধ, দই ও নরম পনিরে ‘ল্যাকটোজ’ নামের এক ধরনের শর্করা থাকে। অনেকের শরীর এই ল্যাকটোজ হজম করতে পারে না।তাই দুধ ও দুগ্ধজাত খাবার খাওয়ার পরে অসহনীয়তার লক্ষণ দেখা দিলে রোগীর ‘ল্যাকটোজ ইনটলারেন্স’ আছে বলে ধারণা করা হতে পারে।এক্ষেত্রে ডাক্তারের পরামর্শ নিয়ে এই রোগের ব্যাপারে নিশ্চিত হয়ে সঠিক চিকিৎসা নিতে হবে।আবার কিছু মানুষের গম অথবা গমের তৈরি খাবার হজমে সমস্যা হয়। এক্ষেত্রে সাধারণত গমের তৈরি রুটি কিংবা পাউরুটি খাওয়ার পর পেট ফাঁপা ভাব, পেট ব্যথা, বায়ুর সমস্যা, ডায়রিয়া ও বমি বমি ভাব— এমন নানান লক্ষণ দেখা দেয়।এ ছাড়াও অনেকসময় খাবারে যোগ করা বিভিন্ন প্রিজারভেটিভ, অ্যাডিটিভ ও অন্যান্য রাসায়নিক উপাদানের কারণে অসহনীয়তা হতে পারে। এই ধরনের উপাদানের মধ্যে রয়েছে—টেস্টিং সল্ট বা এমএসজি (মনোসোডিয়াম গ্লুটামেট)

খাদ্যে ব্যবহৃত কৃত্রিম রং, ফ্লেভার, এসেন্স ও প্রিজারভেটিভ

চিনির বিকল্প হিসেবে ব্যবহৃত কৃত্রিম সুইটনার। যেমন: জিরোক্যাল, সুগার ফ্রি, ইক্যুয়াল ও হাক্সল

ক্যাফেইন

অ্যালকোহল

বিভিন্ন জীবাণু কিংবা সেগুলোর থেকে তৈরি বিষাক্ত পদার্থ—এগুলো খাবারকে দূষিত করে

হিস্টামিন নামক একটি রাসায়নিক। এটি মাশরুম, প্রক্রিয়াজাত করা খাবার ও অ্যালকোহলযুক্ত পানীয়তে থাকতে পারে

ID: 121

Context: খাদ্যে অসহনীয়তা শনাক্ত করার উপায়

Question: খাদ্যে অসহনীয়তা শনাক্ত করার উপায় গুলো কি কি ?

Answer:

নির্দিষ্ট কোনো খাবারে অসহনীয়তা আছে কি না সেটি নির্ণয়ের সবচেয়ে ভালো উপায় হলো

\* রোগীর লক্ষণ ও খাবারের অভ্যাস পর্যবেক্ষণ করা

\*নির্দিষ্ট কোনো খাবারের সাথে রোগীর লক্ষণের কোনো যোগসূত্র আছে কি না তা খুঁজে বের করাকোনো খাবার নিয়ে সন্দেহ থাকলে সেটি কিছুদিনের জন্য খাবারের তালিকা থেকে বাদ দিয়ে ফলাফল কী হয় তা দেখুন। এরপর ধীরে ধীরে খাবারটি আবার ডায়েটে যোগ করতে পারেন। এ ছাড়া একটি ডায়েরিতে এসব তথ্য লিখে রাখতে পারেন।

\* খাবারের ডায়েরিডায়েরিতে নিচের ৬টি তথ্য লিখে রাখতে হবে

\* কী ধরনের খাবার খাওয়া হচ্ছে

\* সেসব খাবার খাওয়ার পরে কোনো লক্ষণ দেখা দিচ্ছে কি না

\* কী ধরনের লক্ষণ দেখা দিচ্ছে

\* লক্ষণগুলো কোন সময়ে দেখা দিচ্ছে

\* খাবারটি বাদ দেওয়ার পরে লক্ষণের উন্নতি হচ্ছে কি না

\* বাদ দেওয়া খাবারটি পুনরায় ডায়েটে যোগ করার পরে লক্ষণ ফিরে আসছে কি নাট্রায়াল এলিমিনেশন ডায়েটকোন কোন খাবার খাওয়ার কারণে শরীরে লক্ষণ দেখা দিচ্ছে সেই সম্পর্কে একটা ধারণা তৈরি হওয়ার পরে খাবারগুলো এক এক করে ডায়েট থেকে বাদ দেওয়া যেতে পারে। এই পদ্ধতিকে ‘ট্রায়াল এলিমিনেশন ডায়েট’ বলা হয়।

\* যেই খাবারটি সহ্য হয় না বলে ধারণা করা হচ্ছে সেটি খাবারের তালিকা থেকে ২ থেকে ৬ সপ্তাহের জন্য বাদ দিয়ে লক্ষণের কোনো উন্নতি হয় কি না সেটি পর্যবেক্ষণ করতে হবে।

\*এরপর খাবারটি আবার ডায়েটে যোগ করে লক্ষণগুলো ফিরে আসে কি না সেটি দেখতে হবে। এমনও হতে পারে যে একটি নির্দিষ্ট পরিমাণ পর্যন্ত খাবারটি খেলে কোনো সমস্যা হয় না।

\* কিন্তু সেই পরিমাণের চেয়ে বেশি খেয়ে ফেললেই লক্ষণগুলো দেখা দেয়।এই পদ্ধতি চলাকালে শরীরে সব পুষ্টি উপাদানের প্রাপ্তি নিশ্চিত করতে একজন পুষ্টিবিদ বা ডায়েটিশিয়ান এর পরামর্শ নিন।

\* বিশেষ দ্রষ্টব্য: শিশুদের ক্ষেত্রে ডাক্তার অথবা ডায়েটিশিয়ান এর পরামর্শ ছাড়া কখনও কোনো নির্দিষ্ট খাবার খাওয়ানো বন্ধ করবেন না

ID: 122

Context: খাদ্যে অসহনীয়তার ঘরোয়া চিকিৎসা

Question: খাদ্যে অসহনীয়তার ঘরোয়া চিকিৎসা কি ?

Answer:

কোনো নির্দিষ্ট খাবারে অসহনীয়তার ব্যাপারে নিশ্চিত হলে এটি নিয়ন্ত্রণের একমাত্র উপায় হলো কিছুদিনের জন্য সেই খাবার খাওয়া বন্ধ করে দেওয়া। এরপর একটু একটু করে খাবারটি আবারও ডায়েটে যোগ করতে হবে।আবার লক্ষণ দেখা দেওয়ার আগ পর্যন্ত সর্বোচ্চ কতটুকু খাবার খাওয়া যায় সেটি পর্যবেক্ষণ করতে হবে। এরপর খাবারটি পুনরায় খাদ্য তালিকায় যোগ করতে হবে।কী ধরনের খাবার এড়িয়ে চলতে হবে সেটি বোঝার জন্য খাবারের প্যাকেটের লেবেল ভালোভাবে পড়ে দেখার অভ্যাস করতে হবে।শিশুর খাদ্যে অসহনীয়তার সমস্যা আছে বলে ধারণা করলে শিশুর খাবারের তালিকা থেকে যেকোনো খাবার বাদ দেওয়ার আগে অবশ্যই ডাক্তার অথবা ডায়েটিশিয়ান এর পরামর্শ নিতে হবে।যেমন, অনেকে শিশুর খাবারের তালিকা থেকে গরুর দুধ বাদ দিয়ে ফেলেন। গরুর দুধ ক্যালসিয়াম, ভিটামিন ডি ও প্রোটিনের খুব ভালো উৎস। তাই শিশুর শরীরে গরুর দুধ সহ্য না হলে ডাক্তারের পরামর্শ নিয়ে বিকল্প উপায়ে প্রয়োজনীয় পুষ্টি উপাদান প্রাপ্তি নিশ্চিত করার পরেই কেবল তা শিশুর খাবারের তালিকা থেকে বাদ দেওয়া যেতে পারে।

ID: 173

Context: নাক দিয়ে রক্ত পড়া তাৎক্ষণিক থামানোর উপায়

Question: নাক দিয়ে রক্ত পড়া তাৎক্ষণিক থামানোর উপায় কি ?

Answer:

সহজ কিছু ঘরোয়া পদ্ধতি অবলম্বন করে আপনি নাক থেকে রক্ত পড়া দ্রুত বন্ধ করতে পারেন। নাক থেকে রক্ত পড়লে করণীয়—শুয়ে না থেকে উঠে সোজা হয়ে বসুন অথবা দাঁড়ান। এতে করে নাকের রক্তনালীতে রক্তের চাপ কিছুটা কমে আসে, যা রক্তপাত কমাতে সাহায্য করে।

বসা অবস্থায় নাকের নরম অংশ, অর্থাৎ নাকের হাড়ের ঠিক নিচে ও নাকের ছিদ্রের ঠিক উপরের অংশটি নিচের ভালোমতো চেপে ধরুন। নাকে ব্যথা না দিয়ে সর্বোচ্চ যতটুকু চাপ দেওয়া সম্ভব ততটুকুই চাপ দিবেন। এভাবে একটানা চাপ দিয়ে ১০–১৫ মিনিট ধরে থাকুন।নাক চেপে ধরামাথা কিছুটা সামনে ঝুঁকান এবং মুখ দিয়ে শ্বাস নিন। এতে করে রক্ত গলার ভেতর দিয়ে না নেমে নাক দিয়ে বের হয়ে যাবে। এভাবে রক্ত গিলে ফেলার সম্ভাবনা কমানো যাবে।

একটা রুমালে ফ্রোজেন মটরশুঁটি, কোনো সবজির প্যাকেট কিংবা আইস প্যাক পেঁচিয়ে নাকের ওপর ধরে রাখতে পারেন। এটি নাকের রক্ত প্রবাহ কমিয়ে রক্ত পড়া থামাতে সাহায্য করতে পারে।

যদি এসব উপায়ে রক্ত পড়া বন্ধ না হয় তাহলে জরুরি ভিত্তিতে ডাক্তারের পরামর্শ নিন।নাক থেকে রক্ত পড়া থেমে যাওয়ার পর কমপক্ষে ২৪ ঘণ্টা নাক ঝাড়া, নিচে ঝুঁকে কিছু করা ভারী কাজ করা ও গরম পানীয় পান করা থেকে বিরত থাকার চেষ্টা করবেন।

ID: 215

Context: জার্নি বা সফর-জনিত ডিভিটি

Question: জার্নি বা সফর-জনিত ডিভিটি প্রতিরোধ কি ?

Answer:

লম্বা সময় ধরে জার্নি করলে ডিভিটি হওয়ার ঝুঁকি বেড়ে যায়। জার্নিতে যে কাজগুলো করলে আপনার ডিভিটি এর ঝুঁকি কমতে পারে—প্রচুর পানি পান করা

ঢিলেঢালা ও আরামদায়ক পোশাক পরা

সম্ভব হলে মাঝে মাঝে একটু হাঁটাচলা করা

বসা অবস্থায় সাধারণ কিছু পায়ের ব্যায়াম করা। যেমন: কিছুক্ষণ পর পর গোড়ালি নাড়ানো

ID: 231

Context: গ্যাস্ট্রিকের সমস্যা

Question: গ্যাস্ট্রিকের সমস্যা কি ?

Answer:

যখন পাকস্থলীর আস্তরণ কোন কারণে ক্ষতিগ্রস্ত হয়ে তাতে প্রদাহের (inflammation) সৃষ্টি হয়, সেই রোগকে চিকিৎসাবিজ্ঞানের ভাষায় বলা হয় গ্যাস্ট্রাইটিস (gastritis)। আমরা অনেকেই এই রোগকে গ্যাস্ট্রিক বা গ্যাস্ট্রিকের সমস্যা বলে থাকি। এই রোগটি অনেকগুলো কারণেই হতে পারে।যখন পাকস্থলীর আস্তরণ কোন কারণে ক্ষতিগ্রস্ত হয়ে তাতে প্রদাহের (inflammation) সৃষ্টি হয়, সেই রোগকে চিকিৎসাবিজ্ঞানের ভাষায় বলা হয় গ্যাস্ট্রাইটিস (gastritis)। আমরা অনেকেই এই রোগকে গ্যাস্ট্রিক বা গ্যাস্ট্রিকের সমস্যা বলে থাকি। এই রোগটি অনেকগুলো কারণেই হতে পারে।বেশিরভাগ মানুষের ক্ষেত্রে এই সমস্যা মারাত্মক হয় না। চিকিৎসা নিলে দ্রুত সেরে ওঠে। কিন্তু চিকিৎসা না করালে এটি বছরের পর বছর ভোগাতে পারে।

ID: 232

Context: গ্যাস্ট্রিক রোগের লক্ষণ

Question: গ্যাস্ট্রিক রোগের লক্ষণগুলো কী?

Answer:

ব্যাকটেরিয়ার সংক্রমণের কারণে এই রোগ হলে অনেকেরই কোন লক্ষণ দেখা যায় না। আবার কারো কারো নিচের লক্ষণগুলো দেখা যেতে পারে:

\* বদহজম

\* পেট কামড়ানো বা পেটে জ্বালাপোড়া করা

\* বমি বমি ভাব বা বমি হওয়া

\* খাওয়ার পর পেট ভরা ভরা মনে হওয়াপাকস্থলীর আস্তরণ ক্ষয় হয়ে (erosive gastritis) যদি তা পাকস্থলীতে থাকা অ্যাসিডের সংস্পর্শে চলে আসে, তখন উপরের লক্ষণগুলোর সাথে ব্যথা, রক্তপাত, বা পাকস্থলীর আলসারের মত লক্ষণ দেখা দিতে পারে।এই লক্ষণগুলো হঠাৎ করেই তীব্রভাবে শুরু হতে পারে (acute gastritis) বা অনেকদিন ধরে ধীরে ধীরে হতে পারে (chronic gastritis)।

ID: 233

Context: গ্যাস্ট্রিক হলে ডাক্তারের পরামর্শ

Question: গ্যাস্ট্রিক হলে কখন ডাক্তারের কাছে যাবেন?

Answer:

আপনার যদি বদহজম থাকে, তাহলে আপনি নিজে নিজেই খাদ্যাভ্যাস ও জীবনযাত্রার পরিবর্তন করে অথবা অ্যান্টাসিড (antacid) এর মত ওষুধ সেবন করে এর সমাধানের করার চেষ্টা করতে পারেন। তবে নিজে নিজে অ্যান্টাসিড খাওয়ার আগে এই ওষুধ আপনার জন্য নিরাপদ কি না, কিভাবে সেবন করবেন আর পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া গুলো অবশ্যই জেনে নিবেন। বদহজমের কারণ ও ঘরোয়া সামাধান একজন ডাক্তারের পরামর্শ নিন যদি আপনার বদহজমের লক্ষণগুলো এক সপ্তাহ বা তার বেশি সময় ধরে থাকে, অথবা বহজমের কারণে পেটে তীব্র ব্যথা বা অস্বস্তি বোধ হয় বা

কোন ওষুধের কারণে সমস্যাগুলো হচ্ছে বলে মনে হয় বা

বমি বা পায়খানার সাথে রক্ত যায়, পায়খানা কালচে হয় বা বমির সাথে কফি দানার মত কিছু আসে পেটে ব্যথা হওয়া মানেই যে সেটা গ্যাস্ট্রিকের সমস্যার লক্ষণ, তা নয়। অনেক কারণেই পেট ব্যথা হতে পারে, যেমন আটকে থাকা বায়ু, ইরিটেবল বাওয়েল সিনড্রোম (Irritable Bowel Syndrome) ইত্যাদি।

কী কী পরীক্ষা করা হয়? ডাক্তার আপনাকে নিচের পরীক্ষাগুলো থেকে এক বা একাধিক পরীক্ষা করানোর পরামর্শ দিতে পারেন।

\* পায়খানা পরীক্ষা (stool test) – এই পরীক্ষার মাধ্যমে পাকস্থলীতে কোন জীবাণুর সংক্রমণ (infection) আছে কি না বা পাকস্থলী থেকে রক্ত যাচ্ছে কি না, তা দেখা হয়।

\* নিঃশ্বাস পরীক্ষা (breath test) – Helicobacter pylori নামক ব্যাকটেরিয়ার সংক্রমণ আছে কি না দেখার জন্য এই পরীক্ষাটি করা হয়। স্বচ্ছ, স্বাদহীন, তেজস্ক্রিয় কার্বনযুক্ত এক গ্লাস তরল পদার্থ পান করে একটি ব্যাগে ফুঁ দিতে বলা হয়।

\* এন্ডোস্কোপি (endoscopy) – একটি নমনীয় নল গলার ভেতর দিয়ে প্রবেশ করিয়ে খাদ্যনালীর মধ্য দিয়ে পাকস্থলীতে নিয়ে গিয়ে প্রদাহের কোন চিহ্ন আছে কি না, তা দেখা হয়।

\* বেরিয়াম সোয়ালো (Barium swallow)– বেরিয়াম নামক একটা রাসায়নিক পদার্থের দ্রবণ খেতে দেওয়া হবে। সেই দ্রবণ পরিপাকতন্ত্রের ভেতর দিয়ে যাওয়ার সময় এক্স-রে তে পরিষ্কারভাবে দেখা যায় এবং তা রোগ নির্ণয়ে সাহায্য করে।

ID: 234

Context: গ্যাস্ট্রিক রোগের কারণগুলো

Question: গ্যাস্ট্রিক রোগের কারণগুলো কী?

Answer:

সাধারণত যেসব কারণে এই রোগ দেখা দেয়, সেগুলো হল:

\* Helicobacter pylori নামক ব্যাকটেরিয়ার সংক্রমণ

\* ধূমপান

\* নিয়মিত অ্যাসপিরিন (aspirin), আইবুপ্রোফেন (ibuprofen) বা নন–স্টেরয়েডাল অ্যান্টি–ইনফ্লামেটরি (non-steroidal anti-inflammatory) জাতীয় কোন ব্যথার ওষুধ সেবন

\* শরীরের ওপর চাপ সৃষ্টিকারী ঘটনা, যেমন বড় অপারেশন, গুরুতর আঘাত বা কোন জটিল রোগ

\* অতিরিক্ত কোকেইন বা অ্যালকোহল সেবন

\* কিছু ক্ষেত্রে শরীরের রোগ প্রতিরোধ ব্যবস্থা ভুলবশত নিজের শরীরকেই আক্রমণ করে। পাকস্থলীর আস্তরণকে আক্রমণ করলে এই রোগ দেখা দেয়।

ID: 235

Context: গ্যাস্ট্রিক রোগের চিকিৎসা

Question: গ্যাস্ট্রিক রোগের চিকিৎসা কী?

Answer:

চিকিৎসার মূল ৩টি লক্ষ্য হল:

\* পাকস্থলীতে থাকা এসিডের পরিমাণ কমিয়ে লক্ষণগুলো নিরসন করা

\* পাকস্থলীর আস্তরণ সেরে তোলা

\* রোগের অন্তর্নিহিত কারণ আছে কি না তা খুঁজে বের করে চিকিৎসা করাযেসব ওষুধ ব্যবহার করা হয়:অ্যান্টাসিড (antacids) – এই সহজলভ্য ওষুধ পাকস্থলীর এসিড প্রশমিত করে দ্রুত ব্যথা কমায়।

হিস্টামিন ২ ব্লকার (Histamine 2 blockers) – এই ওষুধগুলো পাকস্থলীতে অ্যাসিড তৈরির পরিমাণ কমায়।

প্রোটন পাম্প ইনহিবিটর (proton pump inhibitors) – এই ওষুধগুলিও পাকস্থলীর অ্যাসিড তৈরি কমায়। তবে এরা হিস্টামিন ২ ব্লকারদের থেকেও বেশি কার্যকর। উদাহরণ: ওমেপ্রাজল।Helicobacter pylori নামক ব্যাকটেরিয়ার কারণে হওয়া গ্যাস্ট্রিকের সমস্যা (H. pylori gastritis)অনেকেই এই ব্যাকটেরিয়া দিয়ে সংক্রমিত হলেও বুঝতে পারেন না। বহু মানুষের পাকস্থলীতে এই ব্যাকটেরিয়ার সংক্রমণ থাকে, কিন্তু সাধারণত কোন লক্ষণ প্রকাশ পায় না। তবে এই ব্যাকটেরিয়ার কারণে পাকস্থলীর আবরণীতে প্রদাহ হয়ে বারবার বদহজম সৃষ্টি করতে পারে।এই সমস্যা বয়স্কদের মধ্যে বেশি দেখা যায় এবং সাধারণত পাকস্থলীর আবরণী ক্ষয় করে না এমন দীর্ঘমেয়াদী রোগের (chronic (persistent) non-erosive cases) পেছনে দায়ী। ব্যাকটেরিয়া নির্মূল করার চিকিৎসা না পেলে এই সংক্রমণ সাধারণত সারাজীবন থেকে যায়।ব্যাকটেরিয়া নির্মূল করতে প্রোটন পাম্প ইনহিবিটর এর সাথে কিছু এন্টিবায়োটিক একটি নির্দিষ্ট সময়ের জন্য সেবন করতে হবে।লক্ষণ উপশমের জন্য আপনি কী করতে পারেন?

আপনার যদি মনে হয় বারবার ব্যথার ওষুধ (NSAIDs) সেবন করার কারণে আপনার গ্যাস্ট্রিকের সমস্যার হচ্ছে, তাহলে ‘NSAIDs-দলভুক্ত নয়’ এমন কোন ব্যথার ওষুধ সেবন করা যেতে পারে, যেমন প্যারাসিটামল। এ বিষয়ে একজন ডাক্তারের পরামর্শ নিন।এছাড়াও নিচের এই ৫টি কাজ করতে পারেন:

\* বারবার, অল্প অল্প করে খাবার খাওয়া

\* মশলাদার ও ভাজাপোড়ার মত যেসব খাবার পাকস্থলীর ক্ষতি করে সেগুলো পারতপক্ষে এড়িয়ে চলা

\* মদ পান থেকে বিরত থাকা বা তা যথাসম্ভব এড়িয়ে চলা

\* ধূমপানের অভ্যাস থাকলে তা ছেড়ে দেওয়া

\* মানসিক চাপ মোকাবেলা করা

ID: 236

Context: গ্যাস্ট্রিক রোগের সম্ভাব্য জটিলতাগুলো

Question: গ্যাস্ট্রিক রোগের সম্ভাব্য জটিলতাগুলো কী?

Answer:

দীর্ঘদিন ধরে এই রোগে ভুগতে থাকলে নিচে উল্লেখিত রোগলোর ঝুঁকি বাড়তে পারে:

\* পাকস্থলীর আলসার বা ক্ষত

\* পাকস্থলীর পলিপ (পাকস্থলীর আস্তরণ থেকে সৃষ্ট ছোটছোট পিণ্ড)

\* পাকস্থলীর টিউমার, যা ক্যান্সারও হতে পারে।

ID: 242

Context: চোখ ওঠা

Question: চোখ ওঠা কি ?

Answer:

চোখ ওঠা খুব পরিচিত একটি সমস্যা। একে ডাক্তারি ভাষায় কনজাঙ্কটিভাইটিস বলা হয়। চোখ ওঠার সমস্যা সাধারণত বিশেষ কোনো চিকিৎসা ছাড়াই কয়েক সপ্তাহের মধ্যে ভালো হয়ে যায়। চোখ ওঠার সমস্যা একজন থেকে আরেকজনে দ্রুত ছড়িয়ে যেতে পারে। তাই চোখ ওঠা প্রতিরোধের সহজ ও কার্যকর উপায়গুলো জেনে রাখা গুরুত্বপূর্ণ।

ID: 243

Context: চোখ ওঠার লক্ষণ

Question: চোখ ওঠার লক্ষণ কি কি ?

Answer:

চোখ ওঠার কারণের ওপর নির্ভর করে ভিন্ন ভিন্ন লক্ষণ দেখা দিতে পারে।চোখ উঠলে সাধারণত দুই চোখই আক্রান্ত হয়। চোখ ওঠার প্রধান লক্ষণ হলো চোখের সাদা অংশ লাল অথবা গোলাপি রঙের হয়ে যাওয়া। অন্যান্য লক্ষণের মধ্যে রয়েছে—

\* চোখের পাতা ফুলে যাওয়া

\* চোখের সাদা অংশের ওপরের পাতলা স্বচ্ছ পর্দা ফুলে যাওয়া

\* চোখ চুলকানো, খচখচ করা কিংবা জ্বালাপোড়া করা। চোখ ওঠার কারণে চোখ লাল হয়ে খচখচ করলে সেটা সাধারণত ছোঁয়াচে হয়

\* চোখের মধ্যে কিছু ঢুকেছে এমন মনে হওয়া অথবা চোখ চুলকানোর তাড়না হওয়া

\* চোখ দিয়ে পানি পড়া

\* চোখে মিউকাস জাতীয় তরল অথবা পুঁজ জমা। পুঁজ শুকিয়ে চটচটে হয়ে চোখের পাতা অথবা পাপড়ি সাময়িকভাবে জোড়া লেগে যেতে পারে। বিশেষ করে সকালে ঘুম থেকে ওঠার পরে এমন হয়। এই লক্ষণ থাকলে চোখ ওঠা ছোঁয়াচে হয়

\* কনট্যাক্ট লেন্স পড়লে অস্বস্তি হওয়া অথবা লেন্স চোখে ঠিকমতো না বসা

ID: 244

Context: চোখ ওঠার কারণ শনাক্ত

Question: চোখ ওঠার কারণ শনাক্ত করা যায় কিভাবে ?

Answer:

চোখ ওঠার পেছনের প্রকৃত কারণটি খুঁজে বের করা বেশ কঠিন। বিভিন্ন কারণে চোখ উঠলেও বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই লক্ষণগুলো প্রায় একই ধরনের হয়। তবে কিছু ক্ষেত্রে নির্দিষ্ট লক্ষণের ওপরে ভিত্তি করে চোখ ওঠার কারণ সম্পর্কে ধারণা পাওয়া যায়। চোখ ওঠার পেছনে মূলত দুটি কারণ দায়ী—

\* ভাইরাস অথবা ব্যাকটেরিয়া ইনফেকশনসাধারণত ভাইরাস ও ব্যাকটেরিয়া জাতীয় জীবাণু দিয়ে ইনফেকশন হলে চোখ ওঠে।এর মধ্যে কিছু ভাইরাস ও ব্যাকটেরিয়া একজন থেকে আরেকজনে দ্রুত ছড়িয়ে পড়তে পারে। এমন ইনফেকশনের কারণে চোখ উঠলে সেটি সাধারণত খুব ছোঁয়াচে হয়। ভাইরাস জনিত চোখ ওঠার লক্ষণএক্ষেত্রে সর্দি-কাশি অথবা ফ্লুর মতো লক্ষণ থাকতে পারে

প্রথমে সাধারণত এক চোখে লক্ষণ দেখা দেয়। কয়েকদিনের মধ্যে অপর চোখও আক্রান্ত হতে পারে

চোখ দিয়ে সাধারণত পাতলা ধরনের তরল বা পানি বের হয়ব্যাকটেরিয়া জনিত চোখ ওঠার লক্ষণএক্ষেত্রে সাধারণত চোখে পুঁজ জমে। ফলে চোখের পাতা একে অপরের সাথে সাময়িকভাবে জোড়া লেগে যেতে পারে[৭]

এটি কখনো কখনো কানের ইনফেকশনের সাথে একই সময়ে দেখা দিতে পারে

\* এলার্জির কারণে সর্দি ও চুলকানির পাশাপাশি চোখ ওঠার মতো সমস্যাও দেখা দিতে পারে।তবে এলার্জিজনিত চোখ ওঠা ছোঁয়াচে নয়। এলার্জি জনিত চোখ ওঠার লক্ষণএক্ষেত্রে সাধারণত দুই চোখেই লক্ষণ দেখা দেয়

চোখে প্রচণ্ড চুলকানি হতে পারে। সেই সাথে পানি পড়া ও চোখ ফুলে যাওয়ার মতো লক্ষণ দেখা দিতে পারে

এলার্জিজনিত অন্যান্য রোগ-লক্ষণ থাকতে পারে। যেমন: নাকের ভেতরে চুলকানো, হাঁচি, গলা খুসখুস করা, এলার্জিক রাইনাইটিস, একজিমা নামক চর্মরোগ অথবা অ্যাজমা/হাঁপানি৩. অন্যান্য কারণএসব ছাড়া অন্যান্য যে কারণে চোখ উঠতে পারে—

\* কেমিক্যাল বা রাসায়নিক পদার্থ

\* কনট্যাক্ট লেন্স

\* বাইরে থেকে চোখের ভেতরে কিছু ঢুকে যাওয়া। যেমন: ঝরে পড়া চোখের পাপড়ি[১২]

\* বাড়ির ভেতর ও বাইরের বায়ু দূষক। যেমন: ধোঁয়া, ধুলাবালি ও রাসায়নিক বাষ্প[১৩]

\* যৌনবাহিত সংক্রমণ। যেমন: গনোরিয়া ও ক্ল্যামিডিয়া ইনফেকশন

\* ছত্রাক বা ফাঙ্গাস, অ্যামিবা ও অন্যান্য পরজীবীছবি : বিভিন্ন কারণে চোখ ওঠা

ID: 245

Context: চোখ ওঠার চিকিৎসা

Question: চোখ ওঠার চিকিৎসা কি ?

Answer:

চোখ ওঠার জন্য সাধারণত ডাক্তার দেখানোর প্রয়োজন হয় না। এটি বিশেষ কোনো চিকিৎসা ছাড়া কয়েক সপ্তাহের মধ্যে নিজে নিজেই সেরে ওঠে। সহজ কিছু ঘরোয়া পরামর্শ মেনেই আপনি সাধারণত চোখ ওঠার লক্ষণ উপশম করতে পারবেন। তবে ক্ষেত্রবিশেষে ডাক্তারের পরামর্শ নেওয়া জরুরি হয়ে পড়তে পারে।উল্লেখ্য, চোখ ওঠা অনেক ক্ষেত্রেই খুব ছোঁয়াচে হতে পারে। তাই এটি ছড়িয়ে পড়া ঠেকাতে সতর্কতা অবলম্বন করা খুব গুরুত্বপূর্ণ। আর্টিকেলের পরের অংশে চোখ ওঠা প্রতিরোধ সম্পর্কে বিস্তারিত তুলে ধরা হয়েছে।চোখ ওঠার ঘরোয়া চিকিৎসাচোখে ঠান্ডা পানির সেঁক নিতে পারেন। এতে চোখ ফোলা ও জ্বালাপোড়া কমে আসতে পারে। এজন্য একটা হালকা ঠান্ডা ফ্লানেলের কাপড় কয়েক মিনিট চোখে আলতোভাবে ধরে রাখবেন। এটি চোখ ঠান্ডা করে, ফলে আরাম লাগতে পারে।

চোখ পরিষ্কার করার জন্য পানি ফুটিয়ে জীবাণুমুক্ত করে ঠান্ডা করে নিন। এবার এক টুকরো পরিষ্কার সুতি কাপড় সেই পানিতে ভিজিয়ে নিয়ে আলতোভাবে চোখের পাপড়িগুলো মুছে নিন। এভাবে চোখে জমে শক্ত হয়ে যাওয়া পুঁজ ও ময়লা সহজে পরিষ্কার করা যায়। এক্ষেত্রে অবশ্যই প্রতি চোখের জন্য আলাদা আলাদা কাপড় ব্যবহার করবেন। যাতে এক চোখের জীবাণু অন্য চোখে না ছড়িয়ে পড়ে। কাপড়ের টুকরোর বদলে কটন প্যাডও ব্যবহার করতে পারেন।চোখ পুরোপুরি সেরে ওঠার আগ পর্যন্ত চোখের ভেতরে কোনো ধরনের কনট্যাক্ট লেন্স ব্যবহার করবেন না। এক্ষেত্রে প্রয়োজনে ডাক্তারের পরামর্শ নিন।চোখ ওঠার ঔষধচোখ উঠলে বিভিন্ন চোখ ওঠার ড্রপের সাহায্যে চিকিৎসা করা যায়। যেমন—আর্টিফিশিয়াল টিয়ার: এটি চোখের শুষ্ক ও খচখচে ভাব কমাতে সাহায্য করে। যেকোনো ধরনের চোখ ওঠায় এই ধরনের ড্রপ ব্যবহার করা যায়। ফার্মেসিতে এগুলো লুবজেল, ড্রাইলাইফ, অ্যাকুয়াফ্রেশ ও টিয়ারফ্রেশসহ বিভিন্ন নামে পাওয়া যায়। ব্যবহারের আগে সাথে থাকা নির্দেশিকা ভালোমতো পড়ে সেই অনুযায়ী ব্যবহার করবেন।অ্যান্টিবায়োটিক ড্রপ: ব্যাকটেরিয়ার কারণে চোখ উঠলে এই ধরনের ড্রপ ব্যবহারের পরামর্শ দেওয়া হয়। অ্যান্টিবায়োটিক দ্রুত ইনফেকশন সারাতে, জটিলতা কমাতে ও চোখ ওঠা ছড়িয়ে পড়া ঠেকাতে সাহায্য করতে পারে।[১৪]ব্যাকটেরিয়াজনিত চোখ ওঠার চিকিৎসায় সাধারণত নিচের ক্ষেত্রগুলোতে চোখে অ্যান্টিবায়োটিক ব্যবহারের পরামর্শ দেওয়া হয়—

\* চোখে পুঁজের মতো তরল জমলে

\* রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা দুর্বল এমন কারও চোখ উঠলে

\* কিছু বিশেষ ব্যাকটেরিয়া দিয়ে ইনফেকশন হয়েছে ধারণা করলে। যেমন: গনোরিয়া ও ক্ল্যামিডিয়াব্যাকটেরিয়া ছাড়া অন্য কোনো কারণে (যেমন: ভাইরাস ও এলার্জি) চোখ উঠলে এই ধরনের ড্রপ কোনো কাজে আসে না।ব্যাকটেরিয়াজনিত চোখ ওঠার চিকিৎসায় অনেকসময় ‘ক্লোরামফেনিকল’ নামক অ্যান্টিবায়োটিক ড্রপ অথবা অয়েন্টমেন্ট ব্যবহারের পরামর্শ দেওয়া হয়। এগুলো দুই বছরের বেশি বয়সী শিশু ও প্রাপ্তবয়স্কদের জন্য প্রযোজ্য। তবে ব্যবহারের আগে একজন ডাক্তারের পরামর্শ নিতে হবে।দুই বছরের কম বয়সী শিশুদের ক্ষেত্রে ডাক্তারের পরামর্শ ছাড়া এই ঔষধ ব্যবহার করা নিষেধ।অ্যান্টিহিস্টামিন ড্রপ: সাধারণত এলার্জির কারণে চোখ উঠলে কিংবা অতিরিক্ত চুলকানি হলে চোখে এই ধরনের ড্রপ ব্যবহারের পরামর্শ দেওয়া হয়।চোখের ড্রপ ও অয়েন্টমেন্টের পাশাপাশি ডাক্তার কখনো কখনো মুখে খাওয়ার ঔষধ সেবনের পরামর্শ দিতে পারেন।

আপনি অথবা আপনার শিশু খুব অসুস্থ বোধ না করলে স্কুলে কিংবা কর্মক্ষেত্রে যেতে পারেন। তবে জ্বর কিংবা অন্যান্য লক্ষণ থাকলে অথবা বাইরের কাজের মাধ্যমে সুস্থ ব্যক্তির নিকট সংস্পর্শে আসার সম্ভাবনা থাকলে সেই ধরনের কাজ থেকে বিরত থাকা উচিত।

ID: 246

Context: চোখ উঠলে ডাক্তারের পরামর্শ

Question: চোখ উঠলে কখন দ্রুত ডাক্তারের কাছে যাবেন ?

Answer:

চোখ ওঠার সমস্যা সাধারণত ঘরোয়া চিকিৎসায় ভালো হয়ে যায়। তবে চোখ ওঠার সাথে নিচের যেকোনো লক্ষণ দেখা দিলে দ্রুত ডাক্তারের পরামর্শ নিতে হবে—

\* চোখে ব্যথা হওয়া

\* চোখ আলোর প্রতি সংবেদনশীল হয়ে পড়া। যেমন, লাইট অথবা রোদের আলোতে চোখে কোনো সমস্যা হওয়া

\* চোখে আলোর ঝলকানি, কাঁপা কাঁপা দৃষ্টি অথবা আঁকাবাঁকা রেখা দেখতে পাওয়া

\* দৃষ্টি ঝাপসা হয়ে যাওয়া এবং চোখ পরিষ্কার করার পরেও ঝাপসা ভাব থেকে যাওয়া

\* শরীরে র‍্যাশ বা ফুসকুড়ি ওঠা

\* এক অথবা উভয় চোখ তীব্র লাল হয়ে যাওয়া

\* রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা দুর্বল হওয়া। যেমন: ডায়াবেটিস অথবা এইচআইভি আক্রান্ত রোগী, ক্যান্সারের চিকিৎসা নিচ্ছেন এমন, অর্থাৎ কেমোথেরাপি অথবা রেডিওথেরাপির রোগী ও স্টেরয়েড সেবনকারী ব্যক্তি

ব্যাকটেরিয়াজনিত চোখ ওঠার ক্ষেত্রে অ্যান্টিবায়োটিক ব্যবহারের ২৪ ঘণ্টা পরেও অবস্থার উন্নতি না হওয়া

\* সময়ের সাথে চোখ ওঠার লক্ষণের অবনতি হওয়া কিংবা কোনো ধরনের উন্নতি না হওয়া। বিশেষ করে দুই সপ্তাহ পরেও লক্ষণগুলো পুরোপুরি সেরে না ওঠা

\* কনট্যাক্ট লেন্স পরার পর পরই চোখ ওঠার লক্ষণ প্রকাশ পাওয়া। পাশাপাশি চোখের পাতায় কোনো দাগ দেখা দেওয়া। লেন্সের প্রতি এলার্জিক প্রতিক্রিয়ার কারণে এমন হতে পারেএগুলো চোখের কোনো গুরুতর সমস্যার লক্ষণ হতে পারে। তাই দেরি না করে দ্রুত ডাক্তারের কাছে যাওয়া প্রয়োজন। বিশেষ করে রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা দুর্বল এমন ব্যক্তিদের সাধারণ চোখ ওঠার ক্ষেত্রেও ডাক্তারের পরামর্শ নেওয়া উচিত।বাচ্চাদের চোখ ওঠায় করণীয়শিশুদের ক্ষেত্রে নিচের কোনো লক্ষণ দেখা দিলে ডাক্তারের পরামর্শ নেওয়া প্রয়োজন—দুই দিনের বেশি সময় ধরে এক অথবা উভয় চোখ লাল হয়ে থাকা

\* দুই দিনের বেশি সময় ধরে চোখে ব্যথা কিংবা অস্বস্তি হওয়া

\* দুই সপ্তাহ বা তার বেশি সময় ধরে চোখ দিয়ে আঠালো তরল বের হওয়া কিংবা চোখ আটকে আটকে থাকা

\* চোখ ওঠার লক্ষণের কারণে কষ্ট হওয়া২৮ দিনের কম বয়সী নবজাতকের চোখ ওঠার যেকোনো লক্ষণ দেখা দিলে সাথে সাথে ডাক্তার দেখানো জরুরি।

ID: 247

Context: চোখ ওঠা সংক্রমন

Question: চোখ ওঠা কিভাবে ছড়ায় ?

Answer:

চোখ ওঠা কীভাবে ছড়িয়ে পড়ে সেটা জেনে রাখলে চোখ ওঠা প্রতিরোধ করা সহজ হয়। অনেক ধরনের ব্যাকটেরিয়া ও ভাইরাসের আক্রমণে চোখ উঠতে পারে। এদের মধ্যে কিছু কিছু ব্যাকটেরিয়া ও ভাইরাসজনিত চোখ ওঠা খুবই ছোঁয়াচে। এসব জীবাণু সাধারণত যেসব উপায়ে সুস্থ ব্যক্তিতে ছড়ায়—

\* আক্রান্ত ব্যক্তির সরাসরি সংস্পর্শ থেকে। যেমন: স্পর্শ ও হ্যান্ডশেকের মাধ্যমে

\* আক্রান্ত ব্যক্তির হাঁচি-কাশি থেকে বাতাসের মাধ্যমে

\* আক্রান্ত ব্যক্তির অনেক কাছাকাছি অবস্থান করলে।

\* জীবাণু সংক্রমিত যেকোনো জিনিস হাত দিয়ে ধরার পরে সেই হাত না ধুয়েই চোখে লাগালে। যেমন: দরজার হাতল, বই, টিস্যু কিংবা চোখ মোছার কাপড়ভ্রান্ত ধারণা: চোখ ওঠা রোগে আক্রান্ত ব্যক্তির দিকে তাকালে সুস্থ ব্যক্তির চোখও আক্রান্ত হয়

\* আক্রান্ত ব্যক্তির চোখের দিকে তাকালেই কোনো সুস্থ ব্যক্তির চোখ আক্রান্ত হয় না। এটি সম্পূর্ণ অবৈজ্ঞানিক ধারণা। তবে কিছু কিছু ব্যাকটেরিয়া ও ভাইরাসজনিত চোখ ওঠা খুবই ছোঁয়াচে। সেক্ষেত্রে আক্রান্ত ব্যক্তির স্পর্শ অথবা হাঁচি-কাশির মাধ্যমে কিংবা খুব কাছাকাছি অবস্থান করলে আক্রান্ত ব্যক্তি থেকে একজন সুস্থ ব্যক্তি আক্রান্ত হতে পারেন।

ID: 248

Context: চোখ ওঠা প্রতিরোধ করার উপায়

Question: চোখ ওঠা প্রতিরোধ করার উপায় কি কি ?

Answer:

চোখ ওঠা আক্রান্ত ব্যক্তি থেকে সুস্থ ব্যক্তিতে সহজেই ছড়াতে পারে। তবে কিছু সহজ উপায় মেনে চললেই চোখ ওঠা ছড়িয়ে পড়া প্রতিরোধ করা যায়।যা করবেন

\* নিয়মিত হাত ধোয়া

নিয়মিত কুসুম গরম পানি এবং সাবান দিয়ে কমপক্ষে ২০ সেকেন্ড ধরে হাত ধোবেন। বিশেষ করে খাওয়ার আগে, চোখে ড্রপ অথবা মলম লাগানোর আগে ও পরে এবং চোখ পরিষ্কার করার পরে হাত ধোয়া খুবই গুরুত্বপূর্ণ।

যদি হাতের কাছে সাবান না থাকে তাহলে হ্যান্ড স্যানিটাইজার দিয়ে হাত পরিষ্কার করে নিতে পারেন। এক্ষেত্রে কমপক্ষে ৬০% অ্যালকোহলযুক্ত স্যানিটাইজার বেছে নিবেন।[১৮] তবে হ্যান্ড স্যানিটাইজার পুরোপুরি শুকিয়ে যাওয়ার আগে চোখে হাত দিবেন না। নাহলে চোখে জ্বালাপোড়া হতে পারে।

এ ছাড়া আক্রান্ত ব্যক্তির ব্যবহৃত জিনিস (যেমন: রুমাল, কাপড় অথবা বিছানার চাদর) হাত দিয়ে ধরলে এবং আক্রান্ত ব্যক্তি অথবা শিশুর চোখে ঔষধ দিয়ে দেওয়ার পরে অবশ্যই সাবান ও কুসুম গরম পানি দিয়ে হাত ধুয়ে ফেলবেন।

\* হাঁচি-কাশির সময়ে মুখ ঢেকে রাখা

হাঁচি-কাশির সময়ে টিস্যু অথবা রুমাল দিয়ে মুখ ঢাকবেন। ব্যবহারের পর টিস্যুটি ময়লা ফেলার ঝুড়িতে ফেলে দিবেন। রুমাল ব্যবহার করলে সেটি সাবান অথবা ডিটারজেন্ট দিয়ে ধুয়ে ফেলবেন। এরপর হাত সাবান-পানি দিয়ে ধুয়ে নিবেন।

\* চোখ পরিষ্কার করা

চোখ থেকে কোনো পানি অথবা পুঁজ বের হলে দিনে কয়েকবার করে তা পরিষ্কার ভেজা কাপড় অথবা তুলা দিয়ে তা মুছে ফেলবেন।[১৯] চোখে হাত দেওয়ার আগে অবশ্যই হাত পরিষ্কার করে নিবেন। চোখ পরিষ্কার করা হয়ে গেলে ব্যবহৃত তুলা ফেলে দিতে হবে। তবে কাপড় ব্যবহার করলে গরম পানি ও ডিটারজেন্ট দিয়ে কাপড় ধুয়ে ফেলবেন। সবশেষে আবার নিজের হাত সাবান ও গরম পানি দিয়ে ধুয়ে ফেলবেন।

\* ব্যবহৃত কাপড় পরিষ্কার করা

বালিশের কভার, বিছানার চাদর, গামছা, তোয়ালে ও মুখে ব্যবহার করা কোনো কাপড় (যেমন: নিকাব, রুমাল ও মাস্ক) সাবান অথবা ডিটারজেন্ট ও গরম পানি দিয়ে নিয়মিত ধুয়ে ফেলবেন। এসব ধরার পরে, অর্থাৎ কাজ শেষে ভালো করে হাত ধুয়ে ফেলবেন।

\* চশমা ও ব্যবহার্য জিনিস পরিষ্কার রাখা

চশমা ব্যবহারের প্রয়োজন হলে তা পরিষ্কার করে ব্যবহার করবেন। নিজের ব্যবহৃত চশমা, চশমার বক্স অথবা অন্য যেকোনো জিনিস (যেমন: তোয়ালে ও রুমাল) পরিষ্কার করে এবং সতর্কতার সাথে ব্যবহার করতে হবে, যাতে অন্য কেউ একই জিনিস ব্যবহার না করে।

\* কনট্যাক্ট লেন্স পরিষ্কার রাখা

ডাক্তার কনট্যাক্ট লেন্স পড়া চালিয়ে দেওয়ার পরামর্শ দিলে চোখের ডাক্তারের পরামর্শ অনুযায়ী কনট্যাক্ট লেন্স পরিষ্কার ও সংরক্ষণ করবেন।[২০] এ ছাড়া নির্দেশিত সময় পর পর পুরনো লেন্স পাল্টে নতুন লেন্স ব্যবহার করবেন।যা করবেন না

চোখ পুরোপুরি সেরে ওঠার আগে নিচের কাজগুলো করা যাবে না—

\* চোখে হাত দেওয়া, চুলকানো অথবা ঘষাঘষি করা যাবে না। এসব কাজ চোখের অবস্থা আরও খারাপ করে ফেলতে পারে। এ ছাড়া এক চোখ থেকে আরেক চোখে ইনফেকশন ছড়িয়ে পড়তে পারে[২১]

\* হাত না ধুয়ে কখনোই চোখে হাত দেওয়া যাবে না

\* আক্রান্ত ও সুস্থ চোখের জন্য একই চোখের ড্রপের বোতল ব্যবহার করা যাবে না। আলাদা আলাদা ড্রপ ব্যবহার করতে হবে। নাহলে সুস্থ চোখও সংক্রমিত হতে পারে

\* আক্রান্ত ব্যক্তির ব্যবহার্য জিনিস অন্যদের সাথে ভাগাভাগি করে ব্যবহার করা যাবে না। যেমন: তোয়ালে, গামছা, রুমাল, বালিশের কাভার, চোখের ড্রপ, মেকআপ সামগ্রী ও মেকআপ ব্রাশ, চশমা, কনট্যাক্ট লেন্স ও এগুলোর বক্স

\* চোখ সেরে না ওঠা পর্যন্ত কনট্যাক্ট লেন্স ব্যবহার করা যাবে না। তবে চোখের অবস্থা ভালো হয়ে গেলে ডাক্তারের পরামর্শ নিয়ে পুনরায় কনট্যাক্ট লেন্স ব্যবহার করা যেতে পারে

\* সুইমিং পুল ব্যবহার করা যাবে না

এ ছাড়া চোখ ওঠা সেরে যাওয়ার পরে পুনরায় চোখ ওঠা প্রতিরোধে—

\* আক্রান্ত অবস্থায় ব্যবহৃত মেকআপ ব্রাশসহ সব ধরনের মেকআপ সামগ্রী ফেলে দিন

\* আক্রান্ত অবস্থায় ব্যবহৃত কনট্যাক্ট লেন্স, লেন্সের বক্স ও সলিউশন ফেলে দিন

ID: 249

Context: জ্বর ঠোসা

Question: জ্বর ঠোসা কি ?

Answer:

প্রতি বছর সারাবিশ্বে যত মানুষ অন্ধ হয়ে যান, তার একটা বড় অংশ ঘটে জ্বর ঠোসার ভাইরাস এর কারণে।

\* এ ছাড়াও জ্বর ঠোসা থেকে যৌনাঙ্গের হার্পিস হতে পারে, যা একবার হলে পুরোপুরি নির্মূল করার উপায় এখনো আবিষ্কৃত হয়নি।

\* নবজাতকের মাঝে ভাইরাসটি ছড়ালে তার মৃত্যু পর্যন্ত হতে পারে।

ID: 250

Context: জ্বর ঠোসার কারণ

Question: জ্বর ঠোসা কেন হয়?

Answer:

জ্বর ঠোসা একটি ছোঁয়াচে রোগ। এটি ‘হার্পিস সিমপ্লেক্স’ নামের একটি ভাইরাসের কারণে হয়। এই ভাইরাস শরীরে বিভিন্নভাবে প্রবেশ করতে পারে। যেমন—

\* জ্বর ঠোসায় আক্রান্ত ব্যক্তির মুখ কিংবা মুখের লালার সংস্পর্শে আসলে জ্বর ঠোসা ছড়াতে পারে

\* জ্বর ঠোসা স্পর্শ করে সেই হাত অন্য কারও মুখের সংস্পর্শে নিলে জ্বর ঠোসা ছড়াতে পারে

\* জ্বর ঠোসায় আক্রান্ত ব্যক্তির মুখ কারও যৌনাঙ্গের সংস্পর্শে আসলে যৌনাঙ্গে ইনফেকশন ছড়িয়ে পড়তে পারেশরীরে একবার জ্বর ঠোসার ভাইরাস প্রবেশ করলে সেটি সারাজীবন থেকে যায়।

\* বেশিরভাগ সময়ে ভাইরাস শরীরে নিষ্ক্রিয় অবস্থায় থাকে, তবে মাঝেমাঝে জেগে উঠে জ্বর ঠোসা তৈরি করে। একারণে অনেকের বারবার জ্বর ঠোসা হয়।ভাইরাস জেগে ওঠার অন্যতম কারণ হলো শরীরের রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা দুর্বল হয়ে পড়া। যেমন: ঠাণ্ডা লাগা অথবা জ্বর আসা। তবে রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা দুর্বল হয়ে পড়া ছাড়াও আরও কিছু কারণে ভাইরাস জেগে উঠে জ্বর ঠোসা তৈরি হতে পারে। যেমন: কোনো কারণে অসুস্থ হলে, খুব ক্লান্ত থাকলে, মানসিক চাপে থাকলে, রোদে গেলে ও মেয়েদের মাসিকের সময়ে।

ID: 251

Context: জ্বর ঠোসার লক্ষন

Question: কীভাবে বুঝবেন জ্বর ঠোসা হয়েছে কি না?

Answer:

মুখমণ্ডলের যেকোনো স্থানেই জ্বর ঠোসা উঠতে পারে। যেখানে জ্বর ঠোসা উঠবে, সেখানে সাধারণত জ্বর ঠোসা হওয়ার আগেই জ্বালাপোড়া, ঝিম ঝিম করা অথবা চুলকানি শুরু হয়। পরবর্তী ৬–৪৮ ঘণ্টায়—১. ছোটো ছোটো ফোস্কা বা ঠোসা ওঠে। এগুলোর ভেতরে পানির মতো তরল থাকে।২. ফোস্কাগুলো ফেটে গিয়ে সেগুলোর ওপরে আস্তে আস্তে চলটা পড়ে। ১০ দিনের মধ্যে জ্বর ঠোসা সেরে উঠতে শুরু করে। সেরে ওঠার আগ পর্যন্ত এটি ছোঁয়াচে থাকে। এই সময়ে ব্যথা অথবা জ্বালাপোড়া হতে পারে।

ID: 252

Context: জ্বর ঠোসা সংক্রমন

Question: জ্বর ঠোসা কতদিন ছোঁয়াচে থাকে?

Answer:

যেখানে জ্বর ঠোসা উঠবে সেখানে যখন থেকে জ্বালাপোড়া, ঝিম ঝিম করা অথবা চুলকানি শুরু হয়, তখন থেকেই এটা ছোঁয়াচে। যতদিন পর্যন্ত আপনার জ্বর ঠোসা পুরোপুরি সেরে না ওঠে ততদিন এটা ছোঁয়াচে থাকে। বিশেষ করে যখন জ্বর ঠোসা কাঁচা থাকে কিংবা ফেটে যায়, তখন এটা সবচেয়ে বেশি ছোঁয়াচে থাকে।তাই জ্বালাপোড়া, ঝিম ঝিম করা অথবা চুলকানি শুরু হওয়া থেকে ঠোসা পুরোপুরি সেরে ওঠা পর্যন্ত এই পুরোটা সময় জুড়েই নিচের সতর্কতাগুলো মেনে চলবেন।উল্লেখ্য, জ্বর ঠোসা হওয়ার আগে ত্বকে যখন জ্বালাপোড়া, ঝিম ঝিম করা অথবা চুলকানি শুরু হয়, তখন থেকেই জ্বর ঠোসার অ্যান্টিভাইরাল ক্রিম ব্যবহার করলে সবচেয়ে ভালো হয়। এতে জ্বর ঠোসা দ্রুত সেরে উঠতে পারে। এই সম্পর্কে আরও জানতে নিচে ‘জ্বর ঠোসার ঔষধ’ অংশটি পড়ুন।

ID: 253

Context: জ্বর ঠোসা হলে সতর্কতা

Question: জ্বর ঠোসা হলে কী সতর্কতা মেনে চলতে হবে?

Answer:

চোখের সুরক্ষা আমাদের চোখের সামনে ‘কর্নিয়া’ নামের স্বচ্ছ একটা আবরণ থাকে। এটা চোখের জানালা হিসেবে কাজ করে। এই কর্নিয়ার সমস্যার কারণে পৃথিবীতে যত মানুষ অন্ধ হয়ে যায়, তার মধ্যে সবচেয়ে কমন কারণ হলো জ্বর ঠোসার হার্পিস ভাইরাসের ইনফেকশন।অর্থাৎ মুখের জ্বর ঠোসা থেকে ভাইরাসটা যদি চোখে চলে যায়, তাহলে এই মারাত্মক বিপত্তি ঘটার একটা সম্ভাবনা তৈরি হয়।

জ্বর ঠোসা থেকে অন্ধত্ব হওয়া প্রতিরোধে চারটি পরামর্শ মেনে চলবেন—

\* জ্বর ঠোসায় হাত লাগাবেন না

\* জ্বর ঠোসায় হাত চলে গেলে ভালো করে সাবান পানি দিয়ে হাত ধুয়ে নিবেন

\* জ্বর ঠোসা থাকা অবস্থায় চোখে হাত লাগাবেন না

\* কোনো কারণে চোখে হাত দিতে হলে আগে ভালো করে হাত সাবান-পানি দিয়ে ধুয়ে নিবেন উল্লেখ্য, চোখে হার্পিস ভাইরাস দিয়ে ইনফেকশন হলেই যে মানুষ অন্ধ হয়ে যায়, তা নয়।

অনেকেরই এই ইনফেকশন হয় এবং সেরেও যায়। তাই এটা নিয়ে বেশি ভয় পাবেন না। তবে অল্প সংখ্যক মানুষের ক্ষেত্রে এটা চোখের জটিল ইনফেকশনে রূপ নিতে পারে। তাই সতর্ক থাকাই শ্রেয়। যৌনাঙ্গের হার্পিস থেকে সুরক্ষাকারও যৌনাঙ্গ জ্বর ঠোসার সংস্পর্শে আসলে যৌনাঙ্গের হার্পিস হতে পারে। জ্বর ঠোসার মতোই একবার যৌনাঙ্গের হার্পিস হলে সেটিকে পুরোপুরি সারিয়ে তোলা সম্ভব হয় না। তা ছাড়া নারীদের যৌনাঙ্গের হার্পিস হলে সেটি ডেলিভারির সময়ে নবজাতকের মাঝে ছড়িয়ে পড়ার সম্ভাবনা থাকে।তাই জ্বর ঠোসা পুরোপুরি সেরে ওঠার আগ পর্যন্ত ওরাল সেক্স থেকে একেবারে বিরত থাকবেন, অর্থাৎ সঙ্গীর যৌনাঙ্গে মুখ লাগাবেন না। নাহলে আপনার সঙ্গীর যৌনাঙ্গে হার্পিস ইনফেকশন ছড়িয়ে পড়তে পারে। নবজাতক ও দুর্বল রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতার মানুষের সুরক্ষাযাদের রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা দুর্বল, তাদের জন্য হার্পিস ভাইরাস মারাত্মক হতে পারে। যেমন, জ্বর ঠোসা থাকা অবস্থায় নবজাতককে চুমু দিলে শিশুর মারাত্মক ইনফেকশন হতে পারে, এমনকি তার মৃত্যু পর্যন্ত হতে পারে। এ ছাড়া মায়ের স্তনে যদি জ্বর ঠোসা হয়ে থাকে, তাহলে শিশুকে সেই স্তন থেকে বুকের দুধ খাওয়ানোর সময়েও শিশুর দেহে ইনফেকশন ছড়িয়ে যেতে পারে। তাই নবজাতকদের ব্যাপারে বিশেষভাবে সতর্ক থাকবেন।কারও একজিমা নামের চর্মরোগ থাকলে জ্বর ঠোসার ব্যাপারে সতর্ক থাকতে হবে। কেননা এক্ষেত্রে চামড়ার ক্ষত দিয়ে জ্বর ঠোসার ভাইরাস শরীরের ভেতরে প্রবেশ করে জীবনঘাতী ইনফেকশনে রূপ নিতে পারে। ছোটো শিশুদের ক্ষেত্রে বিশেষভাবে সতর্ক থাকতে হবে, কারণ তাদের এই গুরুতর ইনফেকশনে আক্রান্ত হওয়ার সম্ভাবনা বেশি।এ ছাড়া যাদের রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা দুর্বল—যেমন: গর্ভবতী নারী, ডায়াবেটিস আক্রান্ত ব্যক্তি, কেমোথেরাপি নিচ্ছেন কিংবা স্টেরয়েড জাতীয় ঔষধ খাচ্ছেন এমন রোগী—তাদের আশেপাশে বিশেষভাবে সাবধান থাকবেন। কারণ সাধারণ জ্বর ঠোসাও তাদের শরীরে মারাত্মক ইনফেকশন ঘটিয়ে বিশেষ ক্ষতি করতে পারে।‘আলঝেইমার’ নামক স্মৃতিশক্তি সংক্রান্ত রোগ থেকে সুরক্ষাস্মৃতিশক্তি কমে গিয়েছে, কথা মনে রাখতে পারেন না, একই প্রশ্ন বারবার জিজ্ঞেস করেন অথবা কিছু বলতে গেলে কথা খুঁজে পান না—এমন বয়স্ক মানুষ হয়তো দেখে থাকবেন। এগুলো সবই ‘আলঝেইমার’ রোগের লক্ষণ। সাম্প্রতিক কিছু গবেষণায় জ্বর ঠোসা সৃষ্টিকারী হার্পিস ভাইরাসের সাথে আলঝেইমার রোগের সম্পর্ক খুঁজে পাওয়া গিয়েছে।যদিও এই ভাইরাসের কারণেই রোগটা হয় কি না সেটি এখনো নিশ্চিত নয়, তবে অনেকগুলো গবেষণা সেই দিকে ইঙ্গিত দিচ্ছে।তাই আপনার যদি জ্বর ঠোসা হয়, তাহলে খুব সতর্কতার সাথে খেয়াল রাখবেন যেন আপনার কাছ থেকে আরেকজনের কাছে এই ভাইরাস না ছড়ায়। কারণ একবার এই ভাইরাস শরীরে ঢুকলে সারাজীবন থেকে যায়, আর আলঝেইমারের মতো জটিল রোগের সাথে এর একটা যোগসূত্র পাওয়া যাচ্ছে।কীভাবে এই ভাইরাস ছড়িয়ে পড়া প্রতিরোধ করতে পারেন? এই সংক্রান্ত পরামর্শগুলো আমরা ‘জ্বর ঠোসা হলে কী করা উচিত?’ অংশে তুলে ধরেছি।

ID: 254

Context: জ্বর ঠোসা হলে করনীয়

Question: জ্বর ঠোসা হলে কী করা উচিত?

Answer:

সাধারণত জ্বর ঠোসা নিজে নিজেই সেরে যায়। সেরে যাওয়ার পরে সাধারণত কোনো দাগও থাকে না। তবে লক্ষণ উপশমে আপনি কিছু কার্যকর পরামর্শ মেনে চলতে পারেন।জ্বর ঠোসার ঘরোয়া চিকিৎসা নিলে জ্বর ঠোসা দ্রুত সারাতে সক্ষম হয়

\* দ্রুত সারাতে অ্যান্টিভাইরাল ক্রিম বা মলম: জ্বর ঠোসা হবে বুঝতে পারার সাথে সাথেই অ্যান্টিভাইরাল ক্রিম লাগাতে পারেন। এটা জ্বর ঠোসা দ্রুত সারিয়ে তুলতে সাহায্য করতে পারে। ক্রিম লাগানোর সময়ে জ্বর ঠোসায় ঘষে ঘষে না লাগিয়ে আঙ্গুল দিয়ে আলতো করে চেপে চেপে লাগাবেন। ক্রিম লাগানোর আগে ও পরে ভালো করে সাবান ও পানি দিয়ে হাত ধুয়ে নিবেন। কোন ক্রিম লাগাবেন, তা জানতে নিচে ‘জ্বর ঠোসার ঔষধ’ অংশটি পড়ুন।

\* দ্রুত সারাতে মধু: কিছু গবেষণায় জ্বর ঠোসা সারাতে অ্যান্টিভাইরাল ক্রিমের পরিবর্তে মেডিকেল গ্রেড কানুকা মধু ব্যবহার করে দেখা গিয়েছে যে, মধু অ্যান্টিভাইরাল ক্রিমের মতোই কার্যকর। ভালো মানের কানুকা অথবা অন্য কোনো বিশুদ্ধ মধু ব্যবহার করে দেখতে পারেন আপনার জন্য কাজ করে কি না। জ্বর ঠোসা হবে বুঝতে পারার সাথে সাথেই সেখানে মধু লাগাবেন। দিনে পাঁচ বার করে জ্বর ঠোসা পুরোপুরি সেরে ওঠা পর্যন্ত এভাবে ব্যবহার করবেন।

\* ব্যথা কমানোর উপায়: জ্বর ঠোসার ব্যথা কমানোর কয়েকটা উপায় আছে। আপনার সুবিধামতো নিচের উপায়গুলো ব্যবহার করতে পারেন—

\* বরফ: জ্বর ঠোসার ওপরে বরফ লাগাতে পারেন।[১৩] এ ছাড়া বরফের ছোটো ছোটো টুকরা চুষতে পারেন। এসবের মাধ্যমে ব্যথা কমার পাশাপাশি জ্বালাপোড়া ও চুলকানিও কমতে পারে।

\* ঠাণ্ডা সেঁক: দিনে কয়েকবার ঠাণ্ডা সেঁক দিতে পারেন। একটা পরিষ্কার ছোটো তোয়ালে ঠাণ্ডা পানিতে ভিজিয়ে ৫–১০ মিনিট জ্বর ঠোসার ওপরে দিয়ে রাখুন। এটি জ্বালাপোড়া ও লালচে ভাব কমাতে সাহায্য করতে পারে।

\* মলম: জ্বর ঠোসার ব্যথা কমাতে লিডোকেইন জাতীয় জেল অথবা মলম ব্যবহার করতে পারেন। ফার্মেসিতে কোন নামে কিনতে পাওয়া যায়, তা জানতে নিচে ‘জ্বর ঠোসার ঔষধ’ অংশটি পড়ুন।

\* ঔষধ: ব্যথা, জ্বর ও ফোলা কমাতে প্যারাসিটামল অথবা আইবুপ্রোফেন খেতে পারেন। শিশুদের প্যারাসিটামল সিরাপ খাওয়াতে পারেন।

\* পানিশূন্যতা এড়ানো: জ্বর ঠোসা হলে ব্যথার কারণে অনেকেই খাবার ও পানি খাওয়া কমিয়ে দেয়। একারণে পানিশূন্যতা দেখা দেয়। তাই পর্যাপ্ত পানি পান করছেন কি না সেদিকে খেয়াল রাখবেন।

\* ত্বক ফাটা এড়াতে পেট্রোলিয়াম জেলি: ত্বক শুষ্ক হয়ে ফেটে যাওয়া এড়াতে জ্বর ঠোসার ওপরে ও এর আশেপাশের ত্বকে আলতো করে পেট্রোলিয়াম জেলি লাগাবেন। এর আগে ও পরে অবশ্যই সাবান-পানি দিয়ে ভালোমতো হাত ধুয়ে ফেলবেন।

\* রোদ থেকে সুরক্ষা: রোদে বের হলে সানস্ক্রিন, বিশেষ করে ঠোঁটে সানব্লক লিপ বাম (এসপিএফ ১৫ বা তার বেশি শক্তির) ব্যবহার করবেন।

\* বারবার জ্বর ঠোসা হওয়া ঠেকানো: যেসব কাজ জ্বর ঠোসার ভাইরাসকে জাগিয়ে দিতে পারে সেগুলো এড়িয়ে চলবেন। যেমন: রোদ, মানসিক চাপ ও অতিরিক্ত ক্লান্তি। এতে পরবর্তীতে জ্বর ঠোসা হওয়ার সম্ভাবনা কমতে পারে।যা করবেন না

\* জ্বর ঠোসা হাত দিয়ে স্পর্শ করবেন না। কোনো কারণে স্পর্শ করতে হলে (যেমন: ঔষধ লাগানোর সময়ে) তার আগে ও পরে অবশ্যই সাবান ও পানি দিয়ে ভালোমতো হাত ধুয়ে ফেলবেন।

\* আক্রান্ত অবস্থায় কাউকে চুমু দিবেন না। বিশেষ করে ছোটো শিশুদের চুমু দেওয়া থেকে একেবারেই বিরত থাকবেন।

\* জ্বর ঠোসা থাকা অবস্থায় আপনার খাবার অথবা পানি আরেকজনের সাথে শেয়ার করবেন না।

\* জ্বর ঠোসায় ছোঁয়া লাগে এমন জিনিসপত্র—যেমন: আপনার ব্যবহার করা চামচ, গ্লাস, তোয়ালে, রেজার, লিপজেল ও লিপস্টিক—এগুলো আলাদা রাখবেন। অন্য কেউ যেন ব্যবহার না করে সেই বিষয়ে সতর্ক থাকবেন।

\* জ্বর ঠোসা থাকলেও সহবাস করা যাবে। তবে জ্বর ঠোসা পুরোপুরি সেরে ওঠার আগ পর্যন্ত ওরাল সেক্স বা যৌনাঙ্গে মুখ স্পর্শ করা থেকে একেবারে বিরত থাকবেন। নাহলে আপনার সঙ্গীর যৌনাঙ্গে হার্পিস ইনফেকশন ছড়িয়ে পড়তে পারে।

\* জ্বর ঠোসা থাকা অবস্থায় চোখে হাত লাগাবেন না। কোনো কারণে চোখে হাত দিতে হলে আগে ভালো করে হাত সাবান-পানি দিয়ে ধুয়ে নিবেন।

\* কারও কারও ক্ষেত্রে কিছু খাবার জ্বর ঠোসার সংস্পর্শে আসলে জ্বালাপোড়া সৃষ্টি করতে পারে। যেমন: টমেটো, কমলা, মাল্টা, জাম্বুরা, অতিরিক্ত মসলাদার ও লবণযুক্ত খাবার। আপনার এমন সমস্যা হলে এসব খাবার এড়িয়ে চলতে পারেন।

\* জরুরি প্রয়োজন না হলে জ্বর ঠোসা পুরোপুরি সেরে ওঠার আগ পর্যন্ত দাঁতের কোনো প্রসিডিউর না করানোই ভালো।জ্বর ঠোসার ঔষধজ্বর ঠোসা সারানোর জন্য নিচের ‘ওভার দা কাউন্টার’ ঔষধগুলো ব্যবহার করতে পারেন। ওভার দা কাউন্টার ঔষধগুলো ফার্মেসি থেকে কিনে সাথে থাকা নির্দেশিকা অনুযায়ী ব্যবহার করা নিরাপদ। তবে আপনার জন্য উপযুক্ত ডোজ সম্পর্কে নিশ্চিত না হলে কিংবা ঔষধের বিষয়ে আপনার কোনো প্রশ্ন থাকলে ডাক্তারের সাথে কথা বলে নিন।১. জ্বর ঠোসার ক্রিম বা মলম: জ্বর ঠোসার চিকিৎসায় অ্যান্টিভাইরাল ক্রিম (যেমন: এসাইক্লোভির) ব্যবহার করতে পারেন। এগুলো জ্বর ঠোসা দ্রুত সারিয়ে তুলতে সাহায্য করতে পারে। অন্তত ৪ দিন ব্যবহার করবেন। সাধারণত দিনে ৫ বার ব্যবহার করতে হয়। ব্যবহারের আগে ঔষধের সাথে থাকা নির্দেশিকা ভালোমতো পড়ে সেই অনুযায়ী ব্যবহার করবেন। ফার্মেসিতে এই ক্রিম যেসব নামে পাওয়া যায়—

\* ব্র্যান্ড নাম কোম্পানি

\* ভাইরাক্স স্কয়ার ফার্মাসিউটিক্যালস লিমিটেড

\* ভাইরক্সি এসকেএফ ফার্মাসিউটিক্যালস লিমিটেড

\* অ্যাসেরাক্স অপসনিন ফার্মা লিমিটেড

\* নোভাইরাক্স ড্রাগ ইন্টারন্যাশনাল লিমিটেড

\* সিমপ্লোভির ইনসেপ্টা ফার্মাসিউটিক্যালস লিমিটেড

\* ভাইরুনিল গ্লোব ফার্মাসিউটিক্যালস লিমিটেড

\* জ্বর ঠোসার ক্রিম বা মলম২. ব্যথা কমানোর মলম: জ্বর ঠোসার ব্যথা কমাতে লিডোকেইন জাতীয় জেল অথবা মলম ব্যবহার করতে পারেন। ব্যবহারের আগে ঔষধের সাথে থাকা নির্দেশিকা ভালোমতো পড়ে সেই অনুযায়ী ব্যবহার করবেন। তবে শিশুদের ক্ষেত্রে এসব ঔষধ ব্যবহারের আগে অবশ্যই ডাক্তারের পরামর্শ নিতে হবে। ফার্মেসিতে এই মলম যেসব নামে পাওয়া যায়—ব্র্যান্ড নাম কোম্পানি

\* জেসোকেইন জেসন ফার্মাসিউটিক্যালস লিমিটেড

\* জাইলোজেল ইউনিমেড ইউনিহেলথ ফার্মাসিউটিক্যালস লিমিটেড

\* জেড-লিডোকেইন জিসকা ফার্মাসিউটিক্যালস লিমিটেড

\* জ্বর ঠোসার ব্যথা কমানোর মলম৩. প্যারাসিটামল অথবা আইবুপ্রোফেন: জ্বর ঠোসার ব্যথা, ফোলা ও জ্বর কমাতে প্যারাসিটামল অথবা আইবুপ্রোফেন খেতে পারেন। শিশুদের প্যারাসিটামল সিরাপ খাওয়াতে পারেন। কোন ডোজে খাওয়াবেন সেটি জানতে আমাদের আর্টিকেল থেকে দেখে নিন অথবা ঔষধের সাথে থাকা নির্দেশিকা থেকে পড়ে নিন।কখন ডাক্তারের কাছে যেতে হবে

\* শরীরের রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা দুর্বল হলে। যেমন: গর্ভবতী নারী, ডায়াবেটিস বা ক্যান্সার আক্রান্ত ব্যক্তি, কেমোথেরাপি নিচ্ছেন কিংবা স্টেরয়েড জাতীয় ঔষধ খাচ্ছেন এমন রোগী

\* চোখের কাছাকাছি স্থানে জ্বর ঠোসা হলে

\* অনেকখানি জায়গা জুড়ে জ্বর ঠোসা হলে কিংবা ঠোসা ছড়িয়ে পড়লে

\* জ্বর ঠোসা শরীরের অন্য কোথাও যেমন হাতে অথবা যৌনাঙ্গে ছড়িয়ে পড়লে

\* খুব বেশি ব্যথা হলে, খাওয়াদাওয়ায় অনেক সমস্যা হলে অথবা জ্বর না কমলে

\* মুখের ভেতরে ঘা হলে এবং মাড়ি ফুলে গিয়ে ব্যথা হলে। এগুলো মুখ ও মাড়ির ইনফেকশনের লক্ষণ হতে পারে

\* ১০ দিন পরেও জ্বর ঠোসা সেরে উঠতে শুরু না করলে

\* কিছুদিন পরপরই (যেমন: বছরে ছয় বারের বেশি) জ্বর ঠোসা হলে

\* জ্বর ঠোসা নিয়ে দুশ্চিন্তা হলে

\* জ্বর ঠোসার মতো দেখতে হলেও অন্য কোনো রোগ হয়েছে মনে হলে

\* কিছু ক্ষেত্রে ডাক্তার আপনাকে অ্যান্টিভাইরাল ট্যাবলেট সেবনের পরামর্শ দিতে পারেন।উল্লেখ্য, নবজাতক শিশু, গর্ভবতী নারী ও রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা দুর্বল কিংবা গুরুতর জ্বর ঠোসা হয়েছে এমন ব্যক্তিদের ক্ষেত্রে হাসপাতালে চিকিৎসা নেওয়ার প্রয়োজন হতে পারে। সঠিক চিকিৎসা জ্বর ঠোসা থেকে সৃষ্ট জটিলতা প্রতিরোধে সাহায্য করে।

ID: 255

Context: ডায়রিয়া বা পাতলা পায়খানা

Question: ডায়রিয়া বা পাতলা পায়খানা কি ?

Answer:

সাধারণত জীবাণু পেটে ঢোকার কারণে ডায়রিয়া বা পাতলা পায়খানা হয়ে থাকে। আর সেটা অধিকাংশ ক্ষেত্রে কয়েকদিনের মাঝেই সেরে যায়। তবে ডায়রিয়া থেকে যদি মারাত্মক পানিশূন্যতা হয়, তবে তা মৃত্যুর কারণও হতে পারে। পানিশূন্যতা প্রতিরোধ করার উপায় ও পাতলা পায়খানা হলে কী করণীয় তা এই লেখায় থাকছে।সাধারণত জীবাণু পেটে ঢোকার কারণে ডায়রিয়া বা পাতলা পায়খানা হয়ে থাকে। আর সেটা অধিকাংশ ক্ষেত্রে কয়েকদিনের মাঝেই সেরে যায়। তবে ডায়রিয়া থেকে যদি মারাত্মক পানিশূন্যতা হয়, তবে তা মৃত্যুর কারণও হতে পারে। পানিশূন্যতা প্রতিরোধ করার উপায় ও পাতলা পায়খানা হলে কী করণীয় তা এই লেখায় থাকছে।

ID: 256

Context: ডায়রিয়ার লক্ষণ

Question: ডায়রিয়ার লক্ষণ কি কি ?

Answer:

আমরা সাধারণত ‘ডায়রিয়া’ ও ‘পাতলা পায়খানা’ শব্দ দুটি একই অর্থে ব্যবহার করি। তবে চিকিৎসাবিজ্ঞানের ভাষায় আপনার পায়খানা নরম বা পাতলা হওয়া মানেই যে আপনার ডায়রিয়া হয়েছে, এমনটি নয়। সারাদিনে তিনবার বা তার বেশি নরম বা পাতলা পায়খানা হলে তাকেই সাধারণত ডায়রিয়া বলা হয়। এছাড়া কারও যদি স্বাভাবিকের তুলনায় ঘনঘন পাতলা পায়খানা হয় সেটাকেও ডায়রিয়া হিসেবে ধরে নেওয়া হয়।যে শিশুরা বুকের দুধ পান করে, তাদের পায়খানা স্বাভাবিকভাবেই কিছুটা নরম আর আঠালো হয়। সেটা ডায়রিয়া নয়।

ID: 257

Context: পানিশূন্যতার লক্ষণ

Question: পানিশূন্যতার লক্ষণ কি কি ?

Answer:

ডায়রিয়া হলে শরীর থেকে প্রচুর পানি ও প্রয়োজনীয় বিভিন্ন লবণ বেরিয়ে যায়। যখন এই ঘাটতি পূরণ করা হয় না, তখনই পানিশূন্যতা দেখা দেয়। আর এই পানিশূন্যতা মাত্রাতিরিক্ত পর্যায়ে চলে গেলে তা থেকে মৃত্যু পর্যন্ত হতে পারে। তাই ডায়রিয়ার প্রথম চিকিৎসা হলো পানিশূন্যতা পূরণ করা। পানিশূন্যতার প্রধান লক্ষণগুলো হচ্ছে—

\* মুখ শুকিয়ে আসা

\* পিপাসা লাগা

\* চোখ শুকনো লাগা বা খচখচ করা

\* গাঢ়, তীব্র দুর্গন্ধযুক্ত প্রস্রাব হওয়া

\* প্রস্রাবের পরিমাণ কমে যাওয়া

ID: 258

Context: পাতলা পায়খানার ঘরোয়া চিকিৎসা

Question: পাতলা পায়খানার ঘরোয়া চিকিৎসা কি ?

Answer:

সাধারণত আপনি ঘরোয়াভাবেই পাতলা পায়খানার চিকিৎসা করতে পারবেন। এক্ষেত্রে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয়টি হলো পানিশূণ্যতা এড়াতে প্রচুর পরিমাণে তরল পানীয় ও খাবার খাওয়া।১. পাতলা পায়খানা হলে কী খাবার খেতে হবে?ডায়রিয়া চিকিৎসায় মূল করণীয় হলো শরীরের পানি ও লবনের ঘাটতি মেটানো। এজন্য ডায়রিয়া হলে প্রচুর পরিমাণে খাবার স্যালাইন, তরল পানীয় ও পুষ্টিকর খাবার খাওয়া উচিত। সাধারণত প্রতিবার পাতলা পায়খানা হওয়ার পর এক প্যাকেট বা আধা লিটার করে খাবার স্যালাইন খাওয়ার উপদেশ দেয়া হয়। তরল পানীয়ের মধ্যে চিড়ার পানি, ভাতের মাড়, কিংবা ডাবের পানি খাওয়া যেতে পারে। ভাতের মাড়ে সামান্য লবণ দিতে পারেন।যখনই মনে হবে খেতে পারবেন, তখনই খেয়ে নিবেন। শিশুদের ক্ষেত্রে অবশ্যই বুকের দুধ খাওয়ানো চালিয়ে যেতে হবে।ডায়রিয়া হলে যা খাবেন না নির্দিষ্ট কোন খাবার খেলেই ডায়রিয়া সেরে যাবে, এমন কথার ভিত্তি নেই। যেমন, এমন ধারণা প্রচলিত আছে যে ডায়রিয়ার রোগী সাদা ভাত আর কাঁচকলা ছাড়া আর কিছুই খেতে পারবে না। এই ধারণা টা সঠিক নয়। পাতলা পায়খানা হলেও পরিচ্ছন্ন পরিবেশে তৈরি সব ধরনের পুষ্টিকর খাবারই খাওয়া উচিত। তবে ডায়রিয়া হলে বাজার থেকে কেনা ফলের জুস, কোমল পানীয়, কফি, চিনি দেয়া চা পরিহার করবেন। কারণ এসব খেলে ডায়রিয়া আরো খারাপ হয়ে যেতে পারে।২. ডায়রিয়ার ঔষধডায়রিয়া সাধারণত ৫-৭ দিনের মধ্যে স্বাভাবিকভাবে বন্ধ হয়ে যায়, তবে ডায়রিয়ার কারণে সৃষ্ট পানিশূন্যতার দ্রুত চিকিৎসা প্রয়োজন। বেশিরভাগ ক্ষেত্রে বাড়িতে বসেই চিকিৎসার মাধ্যমে ডায়রিয়া থেকে মুক্তি পাওয়া সম্ভব। নিচে ডায়রিয়ার ওষুধগুলো উল্লেখ করা হলো—

\* খাবার স্যালাইন: সাধারণত প্রতিবার পাতলা পায়খানা হওয়ার পর এক প্যাকেট বা আধা লিটার করে খাবার স্যালাইন খাওয়ার উপদেশ দেয়া হয়। ঘরে খাবার স্যালাইন না থাকলেও ঘরোয়া উপায়ে খাবার স্যালাইন তৈরি করে নিতে পারেন। এছাড়া চিড়ার পানি, ভাতের মাড়, কিংবা ডাবের পানিও খাওয়া যেতে পারে। ভাতের মাড়ে সামান্য লবণ দিতে পারেন। বমি ভাব হলে ছোট ছোট চুমুকে খাওয়ার চেষ্টা করবেন।

\* জিংক ট্যাবলেট: গবেষণায় দেখা গেছে, জিংক ট্যাবলেট ওষুধটি পাতলা পায়খানা হবার সময়কাল এক-চতুর্থাংশ কমিয়ে আনতে পারে। ডাক্তারের পরামর্শ অনুযায়ী ১০-১৪ দিনের জন্য ২০ মিলিগ্রাম করে জিংক ট্যাবলেট কিংবা সিরাপ খাওয়াতে পারেন।

\* প্যারাসিটামল: পেটে অস্বস্তি বোধ করলে প্যারাসিটামল খাওয়া যেতে পারে। শিশুকে ওষুধ দেওয়ার আগে ওষুধের সাথে থাকা নির্দেশিকা ভালো মত পড়ে নিবেন, আর অবশ্যই বয়স অনুযায়ী সঠিক পরিমাণে ওষুধ খাওয়াতে হবে।

\* লোপেরামাইড-জাতীয় ওষুধ: জরুরি প্রয়োজনে কয়েক ঘণ্টার জন্য পাতলা পায়খানা বন্ধ করতে ডাক্তার আপনাকে লোপেরামাইড-জাতীয় ওষুধ সেবনের পরামর্শ দিতে পারে। তবে ওষুধটি কখনই ডাক্তারের পরামর্শ ছাড়া এবং ১২ বছরের কম বয়সী শিশুদের ক্ষেত্রে ব্যবহার করা যাবে না। এতে স্বাস্থ্যের ক্ষতি হতে পারে।ডায়রিয়ার ওষুধের সাথে পুষ্টিকর খাবারও খেতে হবে। পুষ্টিহীনতা থেকে ডায়রিয়া হয়, আবার ডায়রিয়ার কারণে বিভিন্ন পুষ্টি উপাদান শরীর থেকে বেরিয়ে যায়। তাই ছয় মাসের কম বয়সী শিশুদের বুকের দুধ এবং সবার জন্য পুষ্টিকর খাবার খাওয়া চালিয়ে যেতে হবে। তবে মনে রাখতে হবে, মারাত্মক পানিশূন্যতা হলে হাসপাতালে ভর্তি করে ইনজেকশনের মাধ্যমে শিরায় স্যালাইন দিতে হতে পারে।ডায়রিয়া হলে যেসব ওষুধ খাওয়া যাবে না ১২ বছরের কম বয়সী শিশুদের ডায়রিয়া বন্ধ করার ওষুধ খাওয়া যাবে না।

১৬ বছরের কম বয়সী শিশুদের অ্যাস্পিরিন আছে এমন ওষুধ দিবেন না। খেয়াল করে দেখবেন ওষুধের নামের নিচে ছোট করে ASPIRIN শব্দটি লেখা আছে কি না।

চিকিৎসকের পরামর্শ ছাড়া কোন অ্যান্টিবায়োটিক বা দ্রুত পাতলা পায়খানা বন্ধ করার ওষুধ খাবেন না। পরিবারে ডায়রিয়ার বিস্তার রোধে করণীয় পাতলা পায়খানা বা ডায়রিয়া হলে রোগীর পর্যাপ্ত পরিমাণে বিশ্রাম নেওয়া প্রয়োজন। এটি একদিকে আপনাকে দ্রুত সুস্থ হয়ে উঠতে সাহায্য করবে, অন্যদিকে ডায়রিয়া ছড়িয়ে পড়া বন্ধ করতেও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে। ডায়রিয়া সেরে যাওয়ার পরেও কমপক্ষে দুই দিন বাসায় থাকবেন। বাচ্চাকে স্কুলে পাঠাবেন না বা নিজে কর্মক্ষেত্রে ফিরে যাবেন না। নাহলে অন্যদের মাঝেও এই পাতলা পায়খানা বা ডায়রিয়া ছড়িয়ে যেতে পারে।ডায়রিয়া বিস্তার ঠেকাতে যা করবেন

\* বারবার সাবান ও পানি দিয়ে হাত ধুবেন।

\* পায়খানা কিংবা বমির সংস্পর্শে এসেছে এমন কাপড় বা বিছানার চাদর গরম পানি দিয়ে আলাদাভাবে ধুয়ে ফেলবেন।

\* পানির কল, দরজার হাতল, টয়লেট সিট, ফ্লাশের হাতল, জীবাণুর সংস্পর্শে আসতে পারে এমন জায়গা প্রতিদিন পরিষ্কার করবেন।ডায়রিয়া হলে যা যা করবেন নাযদি সম্ভব হয়, অন্যদের জন্য রান্না করা থেকে বিরত থাকুন।

\* আপনার থালা-বাসন, ছুরি-চামচ, গামছা-তোয়ালে, জামা-কাপড় কারো সাথে ভাগাভাগি করে ব্যবহার করবেন না।

\* লক্ষণগুলো চলে যাবার পর ২ সপ্তাহ পার হওয়ার আগে পুকুর বা সুইমিং পুলে নামবেন না।

ID: 259

Context: ডায়রিয়ার চিকিৎসা

Question: ডায়রিয়ার চিকিৎসায় কখন দ্রুত ডাক্তারের কাছে যাবেন?

Answer:

ডায়রিয়া হলে যদি নিচের লক্ষণগুলোর কোনটি দেখা দেয়, তাহলে দ্রুত ডাক্তারের পরামর্শ নিবেন। ডায়রিয়ার গুরুতর লক্ষণগুলো হলো—পায়খানার সাথে রক্ত বা আঠালো মিউকাস যাওয়া

\* প্রচণ্ড পেটব্যথা

\* ডায়রিয়ার অবস্থার উন্নতি না হওয়া

\* পানিশূন্যতা পূরণ না হওয়া

\* ডায়রিয়ার সাথে ৪৮ ঘণ্টার বেশি সময় ধরে জ্বর, অর্থাৎ শরীরের তাপমাত্রা ১০১ ডিগ্রি ফারেনহাইটের বেশি থাকাএগুলো গুরুতর অবস্থা নির্দেশ করে, তাই ঘরোয়া চিকিৎসার সাথে সাথে ডাক্তারের পরামর্শ অনুযায়ী চিকিৎসা শুরু করাটা খুব গুরুত্বপূর্ণ।

ID: 260

Context: ডায়রিয়ার কারণ

Question: ডায়রিয়ার কারণ কি কি ?

Answer:

যে সকল কারণে সবচেয়ে বেশি ডায়রিয়া বা পাতলা পায়খানার দেখা যায়, তার মধ্যে রয়েছে—

\* পেটে জীবাণুর আক্রমণ বা ইনফেকশন হওয়া। একে গ্যাস্ট্রোএন্টেরাইটিস ও বলা হয়। এটি বেশিরভাগ ক্ষেত্রে কয়েকদিনের মাঝে সেরে ওঠে।

\* নরোভাইরাস নামের ভাইরাসের আক্রমণ।

\* ফুড পয়জোনিং বা খাদ্যে বিষক্রিয়াও পাতলা পায়খানা বা ডায়রিয়ার একটি কমন কারণ। এ নিয়ে বিস্তারিত জানতে আমাদের খাদ্যে বিষক্রিয়া সংক্রান্ত আর্টিকেলটি পড়ুন

ID: 261

Context: শিশুদের ডায়রিয়া হওয়ার কারন

Question: শিশুদের ডায়রিয়া কেন হয় ?

Answer:

সাধারণত জীবাণু পেটে ঢোকার কারণে শিশুদের ডায়রিয়া বা পাতলা পায়খানা হয়ে থাকে। শিশুদের ক্ষেত্রে ডায়রিয়া একটি চিন্তার কারণ। কেননা, প্রাপ্তবয়স্কদের তুলনায় শিশুদের ডায়রিয়া থেকে সৃষ্ট পানিশূন্যতায় আক্রান্ত হওয়ার ঝুঁকি অনেক বেশি। দ্রুত চিকিৎসা শুরু করা না হলে এই পানিশূন্যতা মারাত্মক রূপ ধারণ করতে পারে। এখানে শিশুদের ডায়রিয়া ও ডায়রিয়াজনিত পানিশূন্যতা প্রতিরোধ করার উপায় ও করণীয় নিয়ে আলোচনা করা হচ্ছে।সাধারণত জীবাণু পেটে ঢোকার কারণে শিশুদের ডায়রিয়া বা পাতলা পায়খানা হয়ে থাকে।

ID: 262

Context: শিশুদের ডায়রিয়ার লক্ষণ

Question: শিশুদের ডায়রিয়ার লক্ষণ কি ?

Answer:

আমরা সাধারণত ‘ডায়রিয়া’ ও ‘পাতলা পায়খানা’ শব্দ দুটি একই অর্থে ব্যবহার করি। তবে চিকিৎসাবিজ্ঞানের ভাষায়, পায়খানা নরম বা পাতলা হওয়া মানেই যে ডায়রিয়া হয়েছে, বিষয়টি এমন নয়। সারাদিনে তিনবার বা তার বেশি নরম বা পাতলা পায়খানা হলে তাকেই সাধারণত ডায়রিয়া বলা হয়। যে শিশুরা বুকের দুধ পান করে, তাদের পায়খানা স্বাভাবিকভাবেই কিছুটা নরম আর আঠালো হয়। সেটা ডায়রিয়া নয়। তবে আপনার বাচ্চার যদি স্বাভাবিকের তুলনায় ঘনঘন পাতলা পায়খানা হয় সেটাকেও ডায়রিয়া হিসেবে ধরে নেওয়া হয়।

ID: 263

Context: শিশুদের পানিশূন্যতার লক্ষণ

Question: শিশুদের পানিশূন্যতার লক্ষণ কি কি ?

Answer:

ডায়রিয়া হলে শরীর থেকে প্রচুর পানি ও প্রয়োজনীয় বিভিন্ন লবণ বেরিয়ে যায়। যখন এই ঘাটতি পূরণ করা হয় না, তখনই পানিশূন্যতা দেখা দেয়। আর এই পানিশূন্যতা মাত্রাতিরিক্ত পর্যায়ে চলে গেলে তা থেকে মৃত্যু পর্যন্ত হতে পারে। তাই ডায়রিয়ার প্রথম চিকিৎসা হলো পানিশূন্যতা পূরণ করা। পানিশূন্যতার প্রধান লক্ষণগুলো হচ্ছে—

\* মুখ শুকিয়ে আসা

\* পিপাসা লাগা

\* চোখ শুকনো লাগা বা খচখচ করা

\* মুখ ও ঠোঁট শুকিয়ে আসা

\* গাঢ় হলুদ, তীব্র দুর্গন্ধযুক্ত প্রস্রাব হওয়া

\* প্রস্রাবের পরিমাণ কমে যাওয়া (২৪ ঘণ্টায় ৪ বারের চেয়েও কম প্রস্রাব হওয়া )

\* মাথা ঘুরানো বা ঝিমঝিম করা

\* ক্লান্ত লাগা৫ বছরের কম বয়সী শিশুদের ক্ষেত্রে আরও কিছু লক্ষণ দেখা যায়। এসব লক্ষণ তুলনামূলকভাবে মারাত্মক, তাই শিশুকে দ্রুত ডাক্তারের কাছে নিয়ে যাওয়া জরুরি। লক্ষণগুলোর মধ্যে রয়েছে:শ্বাসপ্রশ্বাস ও হৃৎস্পন্দন বেড়ে যাওয়া,

\* কান্না করলেও চোখ থেকে পানি না পড়া,

\* মাথার তালুর সামনের দিকের নরম অংশটি বসে যাওয়া, এবং

\* ঝিমিয়ে পড়া।

ID: 264

Context: শিশুদের ডায়রিয়া হওয়ার কারণ

Question: শিশুদের ডায়রিয়া হওয়ার কারণ কি কি ?

Answer:

যেসব কারণে সবচেয়ে বেশি ডায়রিয়া বা পাতলা পায়খানার দেখা যায়, তার মধ্যে রয়েছে —

\* পেটে জীবাণুর আক্রমণ বা ইনফেকশন হওয়া। একে গ্যাস্ট্রোএন্টেরাইটিস ও বলা হয়। এটি বেশিরভাগ ক্ষেত্রে কয়েকদিনের মাঝে সেরে ওঠে।

\* নরোভাইরাস নামের ভাইরাসের আক্রমণ।

\* ফুড পয়জোনিং বা খাদ্যে বিষক্রিয়াও পাতলা পায়খানা বা ডায়রিয়ার একটি কমন কারণ। এ নিয়ে বিস্তারিত জানতে আমাদের খাদ্যে বিষক্রিয়া সংক্রান্ত আর্টিকেলটি পড়ুন।এছাড়াও যেসব কারণে ডায়রিয়া বা পাতলা পায়খানা হতে পারে সেগুলো হলো—ঔষধের পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া – যে কোন ঔষধের সাথে দেওয়া নির্দেশিকা পড়ে দেখবেন ঔষধের পার্শ্বপ্রতিক্রিয়াগুলো কী

\* নির্দিষ্ট কোন খাবারে এলার্জি বা বিশেষ কোন খাবার সহ্য না হওয়া

\* সিলিয়াক ডিজিজ

\* কোভিড-১৯

ID: 265

Context: শিশুদের পাতলা পায়খানার ঘরোয়া চিকিৎসা

Question: শিশুদের পাতলা পায়খানার ঘরোয়া চিকিৎসা কি ?

Answer:

সাধারণত আপনি ঘরোয়াভাবেই শিশুর পাতলা পায়খানার চিকিৎসা করতে পারবেন। এক্ষেত্রে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয়টি হলো পানিশূণ্যতা এড়াতে প্রচুর পরিমাণে তরল পানীয় ও খাবার খাওয়া।১. ডায়রিয়ায় শিশুদের পানিশূন্যতার চিকিৎসাডায়রিয়া চিকিৎসায় মূল করণীয় হলো শরীরের পানি ও লবণের ঘাটতি মেটানো। এজন্য ডায়রিয়া হলে শিশুকে পর্যাপ্ত পরিমাণে খাবার স্যালাইনের পাশাপাশি, প্রচুর পরিমাণে তরল পানীয় ও পুষ্টিকর খাবার খাওয়ানো উচিত।প্রতিবার পাতলা পায়খানার পর ২ বছরের কম বয়সী শিশুদের ৫০-১০০ মিলি তরল পানীয় খাওয়াবেন, ২ থেকে ১০ বছর বয়সী শিশুদের ১০০-২০০ মিলি তরল পানীয় খাওয়াবেন আর ১০ বছরের বেশী বয়সী শিশুদের তরল পানীয় খাওয়াবেন যতটুকু তারা খেতে পারে। ২. বাচ্চাদের ডায়রিয়া হলে কি খাওয়া উচিত?

\* শিশুকে বুকের দুধ বা বোতলের দুধ খাওয়ানো চালিয়ে যাবেন। শিশু বমি করলে অল্প অল্প করে বারবার খাওয়াতে পারেন।

\* তরল পানীয়ের মধ্যে চিড়ার পানি, ভাতের মাড়, কিংবা ডাবের পানি খাওয়া যেতে পারে। ভাতের মাড়ে সামান্য লবণ দিতে পারেন।

\* ফর্মুলা বা শক্ত খাবার খাচ্ছে এমন শিশুদের দুই বেলা খাবারের মাঝে ছোট ছোট চুমুকে পানি খাওয়াবেন।

\* শিশুকে প্রতি তিন-চার ঘণ্টা পর পর খাওয়াবেন। একবারে অনেক বেশী খাবার না দিয়ে বার বার অল্প অল্প করে খাওয়ানো শ্রেয়।

\* শিশুদের ফর্মুলা যে পরিমাণে নির্দেশনা দেওয়া আছে, সেভাবেই বানিয়ে খাওয়াবেন। তার চেয়ে পাতলা ফর্মুলা বানিয়ে বাচ্চাকে খাওয়াবেন না।ডায়রিয়া হলে যা খাওয়াবেন না

\* নির্দিষ্ট কোন খাবার দিলেই শিশুর ডায়রিয়া সেরে যাবে, এমন কথার ভিত্তি নেই। যেমন, এমন ধারণা প্রচলিত আছে যে ডায়রিয়ার রোগী সাদা ভাত আর কাঁচকলা ছাড়া আর কিছুই খেতে পারবে না। এই ধারণা টা সঠিক নয়। পাতলা পায়খানা হলেও পরিচ্ছন্ন পরিবেশে তৈরি সব ধরনের পুষ্টিকর খাবারই খাওয়া উচিত। তবে ডায়রিয়া হলে শিশুকে বাজার থেকে কেনা ফলের জুস, কোমল পানীয় ইত্যাদি খাওয়ানো থেকে বিরত থাকবেন। কারণ এসব খাওয়ানোর ফলে ডায়রিয়া আরো খারাপ হয়ে যেতে পারে।৩. ডায়রিয়ার ঔষধ দিলে সাধারণত ৫-৭ দিনের মধ্যে স্বাভাবিকভাবে বন্ধ হয়ে যায়, তবে ডায়রিয়ার কারণে সৃষ্ট পানিশূন্যতার দ্রুত চিকিৎসা প্রয়োজন। বেশিরভাগ ক্ষেত্রে বাড়িতে বসেই চিকিৎসার মাধ্যমে ডায়রিয়া থেকে মুক্তি পাওয়া সম্ভব। নিচে ডায়রিয়ার ঔষধগুলো উল্লেখ করা হলো —১। খাবার স্যালাইন: সাধারণত প্রতিবার পাতলা পায়খানা হওয়ার পরে শিশুকে বয়স অনুপাতে উপরের পরিমাণে খাবার স্যালাইন খাওয়ানোর উপদেশ দেয়া হয়। ঘরে খাবার স্যালাইন না থাকলেও ঘরোয়া উপায়ে খাবার স্যালাইন তৈরি করে নিতে পারেন। এছাড়া চিড়ার পানি, ভাতের মাড়, কিংবা ডাবের পানিও দেওয়া যেতে পারে। ভাতের মাড়ে সামান্য লবণ দিতে পারেন। বমি ভাব হলে একটু একটু করে খাওয়ানোর চেষ্টা করবেন।২। জিংক ট্যাবলেট: গবেষণায় দেখা গেছে, জিংক ট্যাবলেট ঔষধটি পাতলা পায়খানা হবার সময়কাল এক-চতুর্থাংশ কমিয়ে আনতে পারে। ডাক্তারের পরামর্শ অনুযায়ী শিশুকে ১০-১৪ দিনের জন্য ২০ মিলিগ্রাম করে জিংক ট্যাবলেট কিংবা সিরাপ খাওয়াতে পারেন।৩। প্যারাসিটামল: পেটে অস্বস্তি বোধ করলে প্যারাসিটামল খাওয়া যেতে পারে। শিশুকে ঔষধ দেওয়ার আগে ঔষধের সাথে থাকা নির্দেশিকা ভালো মত পড়ে নিবেন, আর অবশ্যই বয়স অনুযায়ী সঠিক পরিমাণে ঔষধ খাওয়াতে হবে।৪। লোপেরামাইড-জাতীয় ঔষধ: জরুরি প্রয়োজনে কয়েক ঘণ্টার জন্য পাতলা পায়খানা বন্ধ করতে ডাক্তার লোপেরামাইড-জাতীয় ঔষধ সেবনের পরামর্শ দিতে পারেন। তবে ঔষধটি কখনই ১২ বছরের কম বয়সী শিশুদের ক্ষেত্রে ব্যবহার করা যাবে না। এতে স্বাস্থ্যের ক্ষতি হতে পারে।ডায়রিয়ার ঔষধের সাথে বাচ্চাকে পুষ্টিকর খাবারও খাওয়াতে হবে। পুষ্টিহীনতা শিশুদের ডায়রিয়ার একটি অন্যতম কারণ, আবার ডায়রিয়ার কারণে বিভিন্ন পুষ্টি উপাদান শরীর থেকে বেরিয়ে যায়। তাই ছয় মাসের কম বয়সী শিশুদের বুকের দুধ খাওয়ানো এবং বড় শিশুদের জন্য পুষ্টিকর খাবার খাওয়া চালিয়ে যেতে হবে। তবে মনে রাখতে হবে, মারাত্মক পানিশূন্যতা হলে হাসপাতালে ভর্তি করে ইনজেকশনের মাধ্যমে শিরায় স্যালাইন দিতে হতে পারে।ডায়রিয়া হলে যেসব ঔষধ খাওয়া যাবে না

\* ১২ বছরের কম বয়সী শিশুদের ডায়রিয়া বন্ধ করার ঔষধ খাওয়া যাবে না।

\* ১৬ বছরের কম বয়সী শিশুদের অ্যাসপিরিন আছে এমন ঔষধ দিবেন না। খেয়াল করে দেখবেন ঔষধের নামের নিচে ছোট করে ASPIRIN শব্দটি লেখা আছে কি না।

\* চিকিৎসকের পরামর্শ ছাড়া কোন অ্যান্টিবায়োটিক বা দ্রুত পাতলা পায়খানা বন্ধ করার ঔষধ খাওয়াবেন না।

ID: 266

Context: ডায়রিয়ার বিস্তার রোধে করণীয়

Question: পরিবারে ডায়রিয়ার বিস্তার রোধে করণীয় কি কি ?

Answer:

পাতলা পায়খানা বা ডায়রিয়া হলে রোগীর পর্যাপ্ত পরিমাণে বিশ্রাম নেওয়া প্রয়োজন। এটি একদিকে দ্রুত সুস্থ হয়ে উঠতে সাহায্য করবে, অন্যদিকে ডায়রিয়া ছড়িয়ে পড়া বন্ধ করতেও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে।ডায়রিয়া সেরে যাওয়ার পরেও কমপক্ষে দুই দিন শিশুকে বাসায় রাখবেন। বাচ্চাকে স্কুলে বা মাঠে খেলতে পাঠাবেন না। নাহলে অন্যদের মাঝেও এই পাতলা পায়খানা বা ডায়রিয়া ছড়িয়ে যেতে পারে। ডায়রিয়া বিস্তার ঠেকাতে যা করবেন—

\* বারবার সাবান ও পানি দিয়ে শিশুর হাত ধোওয়া নিশ্চিত করবেন।

\* পায়খানার সংস্পর্শে এসেছে এমন কাপড় বা বিছানার চাদর গরম পানি দিয়ে আলাদাভাবে ধুয়ে ফেলবেন।

\* পানির কল, দরজার হাতল, টয়লেট সিট, ফ্লাশের হাতল, জীবাণুর সংস্পর্শে আসতে পারে এমন জায়গা প্রতিদিন পরিষ্কার করবেন।ডায়রিয়া হলে যা যা করবেন না

\* বাচ্চার থালা-বাসন, ছুরি-চামচ, গামছা-তোয়ালে, জামা-কাপড় কারো সাথে ভাগাভাগি করে ব্যবহার করাবেন না।

\* লক্ষণগুলো চলে যাবার পর ২ সপ্তাহ পার হওয়ার আগে পুকুর বা সুইমিং পুলে বাচ্চাকে নামাবেন না।

ID: 267

Context: শিশুর ডায়রিয়ায়

Question: শিশুর ডায়রিয়ায় কখন দ্রুত ডাক্তারের কাছে যাবেন?

Answer:

ডায়রিয়া হলে যদি নিচের লক্ষণগুলোর কোনটি দেখা দেয়, তাহলে দেরী না করে দ্রুত ডাক্তারের পরামর্শ নিবেন। ডায়রিয়ার গুরুতর লক্ষণগুলো হলো—

\* পায়খানার সাথে রক্ত বা আঠালো মিউকাস যাওয়া,

\* প্রচণ্ড পেটব্যথা,

\* ডায়রিয়ার অবস্থার উন্নতি না হওয়া,

\* ১২ ঘণ্টায় একবারও প্রস্রাব না হওয়া,

\* পানিশূন্যতা পূরণ না হওয়া – এর লক্ষণগুলো উপরে বলা হয়েছে,

\* ডায়রিয়ার সাথে ৪৮ ঘণ্টার বেশি সময় ধরে জ্বর, অর্থাৎ শরীরের তাপমাত্রা ১০১ ডিগ্রি ফারেনহাইটের বেশি থাকা, এবং

\* শিশুর হাত-পা ঠাণ্ডা হয়ে আসা ও ত্বকে ছোপছোপ দাগ হওয়া।

ID: 268

Context: ডায়াবেটিস

Question: ডায়াবেটিস কি ?

Answer:

ডায়াবেটিস এমন একটি রোগ যা রক্তে সুগারের মাত্রা স্বাভাবিকের তুলনায় অনেক বাড়িয়ে দেয়।ডায়াবেটিস এমন একটি রোগ যা রক্তে সুগারের মাত্রা স্বাভাবিকের তুলনায় অনেক বাড়িয়ে দেয়।ইনসুলিন নামের একটি হরমোন আপনার রক্তে সুগারের পরিমাণ নিয়ন্ত্রণ করে থাকে। এই হরমোনটি পাকস্থলীর পেছনে থাকা অগ্ন্যাশয় বা প্যানক্রিয়াস নামের একটি গ্রন্থি থেকে তৈরি হয়।যখন খাবার পরিপাক হয়ে আপনার রক্তে প্রবেশ করে, তখন এই ইনসুলিন রক্ত থেকে সুগার (গ্লুকোজ) কোষের ভেতরে ঢুকিয়ে সেটাকে ভেঙ্গে শক্তি উৎপাদন করে। কিন্তু ডায়াবেটিস হলে আপনার দেহ সুগার তথা গ্লুকোসকে ভেঙ্গে এভাবে শক্তি উৎপাদন করতে পারে না।

ID: 269

Context: ডায়াবেটিসের কারণ

Question: ডায়াবেটিসের কারণ ও প্রকারভেদ কি ?

Answer:

মূলত দুটি কারণের ওপর ভিত্তি করে ডায়াবেটিসকে প্রধান দুই ভাগে ভাগ করা হয়:টাইপ ১ ডায়াবেটিস গ্লুকোজকে কোষের ভেতরে সরিয়ে নেয়ার জন্য পর্যাপ্ত পরিমাণ ইনসুলিন আপনার দেহে থাকে না। টাইপ ১ ডায়বেটিসে এমনটি হয়, কারণ এতে দেহের নিজস্ব রোগ-প্রতিরোধ ব্যবস্থা (ইমিউন সিস্টেম) আপনার ইনসুলিন উৎপাদনকারী কোষগুলোকে আক্রমণ করে ধ্বংস করে দেয়।টাইপ ২ ডায়াবেটিস আপনার দেহে যে ইনসুলিন তৈরী হয়েছে তা সঠিকভাবে কাজ করছে না। টাইপ ২ ডায়াবেটিসে এটি দেখা যায়, কারণ এতে দেহে পর্যাপ্ত পরিমানে ইনসুলিন তৈরি হয় না, অথবা পর্যাপ্ত ইনসুলিন তৈরি হলেও দেহের কোষগুলো সেই ইনসুলিনের প্রতি সংবেদনশীল থাকে না।টাইপ ১ ডায়াবেটিসের তুলনায় টাইপ ২ ডায়াবেটিসে আক্রান্ত রোগীর সংখ্যা অনেক বেশি। সচরাচর ডায়াবেটিস বলতে টাইপ ২ ডায়াবেটিসকেই বোঝানো হয়ে থাকে।এই দুটি প্রকার ছাড়াও ডায়াবেটিসের আরও প্রকারভেদ রয়েছে। এর মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য হল গর্ভকালীন ডায়াবেটিস (Gestational Diabetes)। গর্ভবতী নারীদের অনেকের ক্ষেত্রে গর্ভাবস্থায় রক্তে সুগারের মাত্রা এতটা বেড়ে যায় যে তা নিয়ন্ত্রণ করার জন্য দেহে যথেষ্ট পরিমাণে ইনসুলিন তৈরী হয় না, তখন এই ডায়াবেটিস দেখা দেয়। এ সম্পর্কে বিস্তারিত জানতে আমাদের গর্ভকালীন ডায়াবেটিস নিয়ে লেখা আর্টিকেলগুলো পড়তে পারেন।

ID: 270

Context: ডায়াবেটিস নিয়ন্ত্রন

Question: ডায়াবেটিস নিয়ন্ত্রণে রাখা কেন গুরুত্বপূর্ণ?

Answer:

অনেকেই নিজের অজান্তে টাইপ ২ ডায়াবেটিসে ভুগেন। প্রায়ই দেখা যায়, ভিন্ন ধরনের কোনো অসুখ বা সমস্যার জন্য যখন রক্ত কিংবা প্রস্রাব পরীক্ষা করানো হয় তখন এই ডায়াবেটিস ধরা পড়ে।কারও ডায়াবেটিস থাকলে সেটা দ্রুত সনাক্ত করা প্রয়োজন, কারণ সময়মতো ডায়াবেটিস ধরা না পড়লে অর্থাৎ চিকিৎসা না নিলে এটি দিন দিন শরীরকে আরও বেশি অসুস্থ করে ফেলবে। শুধু তাই নয়, ডায়াবেটিস হলে আপনার অন্যান্য স্বাস্থ্য জটিলতার ঝুঁকি বেড়ে যায়। অনেক সময় নীরবে, কোন লক্ষণ ছাড়াই এমন কিছু রোগ শরীরে বাসা বাঁধে যা আপনি বুঝতে পারেন না। এজন্যই আমরা ডায়াবেটিস রোগীদের নিয়মিত চেকআপ করার পরামর্শ দিই।স্বাস্থ্য জটিলতাগুলো সম্পর্কে বিস্তারিত জানতে আমাদের ডায়াবেটিসের নানা স্বাস্থ্য জটিলতা ও আপনার করণীয় শীর্ষক আর্টিকেলটি পড়ুন।

ID: 271

Context: প্রি-ডায়াবেটিস

Question: প্রি-ডায়াবেটিস (Pre-Diabetes) কি ?

Answer:

অনেকেরই রক্তে সুগারের মাত্রা স্বাভাবিকের চেয়ে কিছুটা বেশি থাকে, কিন্তু এতটাও বেশি না যে তাদের ডায়াবেটিস রোগী বলা যায়। এই অবস্থাকে বলে প্রি-ডায়াবেটিস।আপনার রক্তে সুগারের মাত্রা যদি স্বাভাবিকের চেয়ে বেশি থাকে, তাহলে আপনার ভবিষ্যতে ডায়াবেটিস হওয়ার ঝুঁকি অনেকটা বেড়ে যায়। তাই রক্তে সুগারের মাত্রা স্বাভাবিক মাত্রার মধ্যে রাখতে এখনই ব্যবস্থা নিন।সাধারণত একটি স্বাস্থ্যকর ডায়েট এবং ব্যায়ামের অভ্যাস গড়ে তোলার মাধ্যমে আপনি প্রি-ডায়াবেটিস থেকে ডায়াবেটিস হওয়া প্রতিরোধ করতে পারেন। কারও কারও এর সাথে ক্ষেত্রে ওষুধের প্রয়োজন হতে পারে, সেক্ষেত্রে ডাক্তারের পরামর্শ নিন।

ID: 272

Context: ডায়াবেটিসের লক্ষণ

Question: ডায়াবেটিসের লক্ষণ কি কি ?

Answer:

ডায়াবেটিস এর মূল লক্ষণগুলো দেখা দিলে অতি দ্রুত ডাক্তারের সাথে যোগাযোগ করা উচিত। এগুলোর মধ্যে রয়েছে:

\* অতিরিক্ত পিপাসা লাগা

\* স্বাভাবিকের চেয়ে ঘনঘন প্রস্রাব হওয়া, বিশেষ করে রাতের বেলা

\* অতিরিক্ত ক্লান্ত বোধ করা

\* ওজন কমে যাওয়া ও শরীর শুকিয়ে যাওয়া

\* যৌনাঙ্গের আশেপাশে চুলকানো, কিংবা বারবার থ্রাশ (Thrush – ছত্রাক/ফাঙ্গাস দিয়ে ইনফেকশন) হওয়া

\* কাটা-ছেঁড়া বা অন্য কোন ক্ষত শুকাতে অনেক সময় লাগা

\* দৃষ্টি ঝাপসা হয়ে যাওয়াবিশেষ তথ্য

\* টাইপ ১ ডায়াবেটিসের লক্ষণগুলো কয়েক সপ্তাহ, এমনকি কয়েক দিনের ব্যবধানেও দেখা দিতে পারে ও মারাত্মক রূপ ধারণ করতে পারে। অন্যদিকে টাইপ ২ ডায়াবেটিসের শুরুর দিকে তেমন নির্দিষ্ট লক্ষণ থাকে না, বা সেগুলো শুরুতে দুশ্চিন্তার কারণ হয়ে দাঁড়ায় না। এর ফলাফল হিসেবে অনেকে না বুঝেই এই রোগ নিয়ে বছরের পর বছর পার করে দেন। আপনার লাইফস্টাইল বা জীবনধারার পরিবর্তন করলেও টাইপ ১ ডায়াবেটিসের ঝুঁকি কমানো সম্ভব হবে না। তবে স্বাস্থ্যকর, সুষম খাবার খাওয়া এবং নিয়মিত ব্যায়াম করে শরীর সচল রেখে স্বাস্থ্যকর ওজন ধরে রাখার মাধ্যমে আপনি টাইপ ২ ডায়াবেটিস নিয়ন্ত্রণে রাখতে পারেন।

ID: 273

Context: ডায়াবেটিস নিয়ে জীবনযাপন পদ্ধতি

Question: ডায়াবেটিস নিয়ে জীবনযাপন পদ্ধতি কি ?

Answer:

ডায়াবেটিস ধরা পড়লে আপনাকে রক্তে সুগারের পরিমাণ নিয়ন্ত্রণে রাখতে হবে। এজন্য স্বাস্থ্যকর খাবার খেতে হবে, নিয়মিত ব্যায়াম করতে হবে ও সুগারের পরিমাণ ঠিক আছে কি না দেখার জন্য নিয়মিত রক্ত পরীক্ষা করাতে হবে। ডায়াবেটিসের চেকআপ সম্পর্কে বিস্তারিত জেনে নিন।এসব নিয়মকানুন মেনে চললে আপনি সারাজীবন ওষুধের সাহায্য ছাড়া ডায়াবেটিস নিয়ন্ত্রণে রাখতে পারবেন। টাইপ ১ ডায়াবেটিস থাকলে এগুলোর পাশাপাশি আজীবন নিয়মিত ইনসুলিন ইনজেকশন নিতে হয়।

ID: 282

Context: টাইপ ১ ডায়াবেটিস

Question: টাইপ ১ ডায়াবেটিস কি ?

Answer:

টাইপ ১ ডায়াবেটিস বিশেষ করে শিশু-কিশোরদের মধ্যে বেশি দেখা যায়। একারণে টাইপ ১ ডায়াবেটিসকে পূর্বে ‘জুভেনাইল ডায়াবেটিস’ বা কৈশোরকালীন ডায়াবেটিস বলা হতো। তবে যেকোনো বয়সেই কোনো ব্যক্তির এই রোগ হতে পারে।টাইপ ১ ডায়াবেটিস বিশেষ করে শিশু-কিশোরদের মধ্যে বেশি দেখা যায়। একারণে টাইপ ১ ডায়াবেটিসকে পূর্বে ‘জুভেনাইল ডায়াবেটিস’ বা কৈশোরকালীন ডায়াবেটিস বলা হতো। তবে যেকোনো বয়সেই কোনো ব্যক্তির এই রোগ হতে পারে।ডায়াবেটিস অর্থ আমরা সচরাচর যেটিকে বুঝি তা মূলত টাইপ ২ ডায়াবেটিস। ডায়াবেটিসে আক্রান্ত মোট রোগীর মাত্র ৫-১০ শতাংশ টাইপ ১ ডায়াবেটিসে ভোগেন।আমাদের শরীরে ‘ইনসুলিন’ নামে একটি প্রকার হরমোন তৈরি হয়। ইনসুলিন রক্তে সুগারের মাত্রা নিয়ন্ত্রণ করে থাকে। টাইপ ১ ডায়াবেটিসে আক্রান্ত রোগীদের শরীরে এ হরমোন যথেষ্ট পরিমাণে তৈরি হয় না। ফলে রক্তে সুগারের মাত্রা অতিরিক্ত বেড়ে যায়।এখনো পর্যন্ত টাইপ ১ ডায়াবেটিস প্রতিরোধের কোনো উপায় আবিষ্কৃত হয়নি। তবে রক্তের সুগার নিয়ন্ত্রণ, স্বাস্থ্যকর জীবনযাপন ও নিয়মিত ডাক্তারের চেকআপের মাধ্যমে সহজেই রোগটি নিয়ন্ত্রণে রাখা সম্ভব।উল্লেখ্য, বয়স অথবা অতিরিক্ত ওজনের সাথে টাইপ ১ ডায়াবেটিসের কোনো সম্পর্ক নেই। এগুলোর সাথে টাইপ ২ ডায়াবেটিসের সংযোগ রয়েছে। তাই অনেক ক্ষত্রে শুধুমাত্র সুস্থ জীবনধারা মেনে চলার মাধ্যমে টাইপ ২ ডায়াবেটিস প্রতিরোধ করা সম্ভব হলেও, টাইপ ১ ডায়াবেটিস রোগীদের সুস্থ জীবনধারার পাশাপাশি ইনসুলিনও নিতে হয়।

ID: 283

Context: টাইপ ১ ডায়াবেটিসের উপসর্গ

Question: টাইপ ১ ডায়াবেটিসের উপসর্গ ?

Answer:

টাইপ ১ ডায়াবেটিসের উপসর্গগুলো তুলনামূলকভাবে দ্রুত দেখা দেয়। বিশেষ করে শিশুদের ক্ষেত্রে এসব লক্ষণ খুব তাড়াতাড়ি প্রকাশ পায়। লক্ষণগুলোর মধ্যে রয়েছে—

\* অতিরিক্ত তৃষ্ণা

\* স্বাভাবিকের তুলনায় ঘন ঘন প্রস্রাব হওয়া, বিশেষত রাতের বেলায়

\* অতিরিক্ত ক্লান্তি অনুভব করা

\* চেষ্টা ছাড়াই ওজন কমে যাওয়া

\* বারবার ছত্রাকের সংক্রমণ (Thrush) দেখা দেওয়া

\* দৃষ্টি ঝাপসা হয়ে যাওয়া

\* কাটা-ছেঁড়া বা অন্যান্য ক্ষত শুকাতে দেরি হওয়া

\* নিঃশ্বাসের সময়ে ফলের মতো গন্ধ হওয়া

ID: 284

Context: টাইপ ১ ডায়াবেটিসের পরীক্ষা-নিরীক্ষা

Question: টাইপ ১ ডায়াবেটিসের পরীক্ষা-নিরীক্ষা কি কি ?

Answer:

ডায়াবেটিস শনাক্ত করার দুই ধরনের পরীক্ষা আছে—রক্ত পরীক্ষা ও প্রস্রাব পরীক্ষা। এগুলোর মাধ্যমে প্রস্রাবে বা রক্তে কতটুকু সুগার আছে তা দেখা হয়। ডায়াবেটিস শনাক্ত করার জন্য ডাক্তার আপনাকে এ দুটি পরীক্ষার যেকোনো একটি বা দুটি পরীক্ষাই করানোর পরামর্শ দিতে পারেন।পরীক্ষায় ডায়াবেটিস ধরা পড়লে টাইপ ১ ডায়াবেটিসের অবস্থা মূল্যায়নের উদ্দেশ্যে ডাক্তার আপনাকে পরবর্তীতে আরও কিছু পরীক্ষা দিতে পারেন। যেমন

\* অটোঅ্যান্টিবডি পরীক্ষা: অটোঅ্যান্টিবডি হলো আমাদের শরীরে তৈরি হওয়া এমন এক ধরনের অ্যান্টিবডি যা দেহের নিজস্ব কোষগুলোকেই আক্রমণ করে। সাধারণত টাইপ ১ ডায়াবেটিস হলে রক্তে এ ধরনের বিশেষ অটোঅ্যান্টিবডি পাওয়া যায়।

\* কিটোন বডি পরীক্ষা: এই পরীক্ষার মাধ্যমে প্রস্রাবে কিটোন বডি নামক রাসায়নিক পদার্থের উপস্থিতি পরীক্ষা করা হয়। শরীরে মজুত চর্বি বা ফ্যাট ভেঙ্গে কিটোন বডি তৈরি হয়। প্রস্রাবে কিটোন বডির উপস্থিতি টাইপ ১ ডায়াবেটিস নির্দেশ করে।টাইপ ১ ডায়াবেটিস শনাক্ত হলে তা নিয়ন্ত্রণে রাখার ব্যাপারে সচেতন হওয়া প্রয়োজন। এজন্য নিয়মিত রক্তে সুগারের মাত্রা পরিমাপ করতে হবে এবং সেই অনুযায়ী ইনসুলিন নিতে হবে। ডাক্তারের কাছ থেকে এ ব্যাপারে বিস্তারিত জেনে নিন।

ID: 285

Context: টাইপ ১ ডায়াবেটিসের জন্য জরুরি বিষয়

Question: টাইপ ১ ডায়াবেটিস রোগীদের জন্য জানা জরুরি কি কি ?

Answer:

ডায়াবেটিস নরমাল কত পয়েন্টডায়াবেটিসে আক্রান্ত রোগীর রক্তে সুগারের স্বাভাবিক মাত্রা কত পয়েন্টে থাকা উচিত তা ডাক্তারের কাছ থেকে জেনে নিতে হবে। আপনার ব্লাড সুগার লেভেল অন্যদের থেকে ভিন্ন হলেও চিন্তিত হওয়ার কোনো কারণ নেই। এক্ষেত্রে ডাক্তার পরামর্শ অনুযায়ী সুগারের লেভেল নিয়ন্ত্রিত থাকাই যথেষ্ট।গ্লুকোমিটারের সাহায্যে রক্তের সুগার পরিমাপ করলে সাধারণত নিচের পয়েন্টগুলোকে আদর্শ ধরা হয়। ‘পয়েন্ট’ বলতে মিলিমোল/লিটার (mmol/l) এককটি বোঝানো হয়েছে।

\* খাওয়ার আগে ৪ থেকে ৭ পয়েন্ট

\* খাওয়ার ২ ঘন্টা পরে ৮ থেকে ৯ পয়েন্ট

\* ঘুমানোর আগে ৬ থেকে ১০ পয়েন্টরক্তের সুগারের মাত্রা তথা ডায়াবেটিসের মাত্রা যদি রোগীর জন্য আদর্শ পয়েন্টের চেয়ে বেড়ে যায় তখন সেই অবস্থাকে হাইপারগ্লাইসেমিয়া বলা হয়। অন্যদিকে এই মাত্রা যদি রোগীর জন্য নির্ধারিত আদর্শ পয়েন্টের চেয়ে কমে যায় তখন তাকে হাইপোগ্লাইসেমিয়া বলা হয়।আপনার রক্তের সুগারের পরিমাণ বিভিন্ন কারণে প্রভাবিত হতে পারে। যেমন—মানসিক চাপ

\* অসুস্থতা বা কোনো ইনফেকশন

\* একেবারেই শারীরিক পরিশ্রম না করা অথবা অতিরিক্ত ব্যায়াম করা

\* বিভিন্ন ধরনের ব্যথা

\* মাসিক বা পিরিয়ড

\* মদ পান করারক্তের সুগার কখন মাপবেনপ্রতিদিন নিচের সময়গুলোতে রক্তের সুগারের লেভেল মাপা উচিত—সকালের নাস্তার আগে

\* খাওয়ার ২-৩ ঘন্টা পরে

\* ব্যায়াম করার পূর্বে, মাঝখানে বিরতি চলাকালে ও ব্যায়ামের পরে

\* ঘুমাতে যাওয়ার আগেএভাবে নিয়মিত ব্লাড সুগার পরিমাপ করলে সুগারের লেভেল কীভাবে খাবার ও ব্যায়ামের প্রভাবে ওঠানামা করে তা বোঝা যাবে। এর ফলে ব্লাড সুগার একটি স্থিতিশীল মাত্রায় রেখে নিয়ন্ত্রণ করা সহজ হবে।তবে ডায়াবেটিস যদি একেবারেই অনিয়ন্ত্রিত থাকে অথবা রোগী অন্য কোনো অসুখে (যেমন: জ্বর, নিউমোনিয়া বা ডায়রিয়া) আক্রান্ত হয়, তাহলে আরও ঘন ঘন ব্লাড সুগার পরিমাপ করতে হবে। বিশেষত হাইপোগ্লাইসেমিয়ার কোনো উপসর্গ দেখা গেলে যত তাড়াতাড়ি সম্ভব রক্তের সুগার পরিমাপ করে দ্রুত চিকিৎসা শুরু করতে হবে।রক্তের সুগার পরিমাপ করার পদ্ধতিএকটি গ্লুকোমিটার বা ডায়াবেটিস টেস্টিং কিটের সাহায্যে বাড়িতেই রক্তের সুগার কত পয়েন্ট তা নির্ণয় করা যায়। এক্ষেত্রে একটি সূক্ষ্ম সুঁইয়ের মত যন্ত্রের সাহায্যে আঙুলের ডগায় খোঁচা দেয়া হয়। রক্ত বেরিয়ে আসলে টেস্টিং স্ট্রিপে এক ফোঁটা রক্ত নিয়ে তা মিটারে ঢুকিয়ে সুগার পরীক্ষা করা হয়।ডায়াবেটিসে আক্রান্ত রোগীদের জন্য নিয়মিত রক্তের সুগার পরিমাপ করা অত্যন্ত জরুরি। নিয়মিত সুগারের লেভেল পর্যবেক্ষণে রাখলে ডায়াবেটিস নিয়ন্ত্রণ সহজ হবে। ডায়াবেটিসের বিভিন্ন স্বাস্থ্য জটিলতা এড়াতে রক্তের সুগার মাপার যন্ত্রটি সবসময় হাতের কাছে রাখা গুরুত্বপূর্ণ।বাসায় বসে ডায়াবেটিস মাপতে যা যা প্রয়োজন—

\* গ্লুকোমিটার

\* জীবাণুমুক্ত ছোট সুঁই বা ল্যানসেট

\* সুঁই বসানোর প্লাস্টিকের কলম

\* টেস্ট স্ট্রিপফার্মেসিতে গ্লুকোমিটার কেনার সময়ে এগুলো একসাথে কিনে নেওয়া যায়।ঘরোয়া উপায়ে রক্তের সুগার মাপার ৭টি ধাপ এখানে তুলে ধরা হলো—

\* প্রথমে সাবান বা হ্যান্ডওয়াশ দিয়ে হাত ভালো করে ধুয়ে শুকিয়ে নিতে হবে। সাবানের পরিবর্তে অ্যালকোহল প্যাড বা হ্যান্ড স্যানিটাইজার দিয়েও হাত জীবাণুমুক্ত করে নেওয়া যায়। তবে সেক্ষেত্রে আঙ্গুল পুরোপুরি শুকানো পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হবে।

\* গ্লুকোমিটারের নির্ধারিত স্থানে একটি টেস্ট স্ট্রিপ প্রবেশ করাতে হবে। গ্লুকোমিটারের মডেলভেদে স্ট্রিপও ভিন্ন হয়, তাই নির্দিষ্ট মডেল অনুযায়ী সঠিক স্ট্রিপ বেছে নিতে হবে। এছাড়া স্ট্রিপ নকল বা মেয়াদোত্তীর্ন কি না সে বিষয়েও খেয়াল রাখতে হবে।

\* প্লাস্টিকের কলমের ভেতরে একটি ল্যানসেট সংযুক্ত করে ল্যানসেটের ঢাকনা সরিয়ে ফেলতে হবে। উল্লেখ্য, প্রতিবার ডায়াবেটিস মাপার সময়ে নতুন সুঁই ব্যবহার করতে হবে। কলমটি সহজে ও সঠিকভাবে ব্যবহারের উপায় জানতে গ্লুকোমিটারের মোড়কে বা প্যাকেটের ভেতরে থাকা লিফলেটের নির্দেশনা অনুসরণ করুন।

\* এবার কলমটি আঙুলের একপাশে ধরে সুঁই দিয়ে আঙ্গুলের অগ্রভাগে ছিদ্র করতে হবে। কলমটি আঙুলের একপাশে ধরলে ব্যথা কম লাগবে। প্রতিবার রক্তের সুগার মাপার সময়ে ভিন্ন ভিন্ন আঙ্গুল ব্যবহার করতে হবে। স্বতঃস্ফূর্তভাবে বেরিয়ে আসা এক ফোঁটা রক্তই গ্লুকোমিটারে ডায়াবেটিস পরিমাপের জন্য যথেষ্ট।

\* এখন গ্লুকোমিটারে লাগানো টেস্ট স্ট্রিপে রক্তের ফোঁটা বসাতে হবে। আঙুলটি এমনভাবে ধরতে হবে যেন রক্তের ফোঁটা টেস্ট স্ট্রিপের নির্ধারিত অংশকে পূর্ণ করে। রক্তের পরিমাণ খুব কম হলে ভুল রিডিং আসতে পারে অথবা গ্লুকোমিটারের পর্দায় ERROR দেখাতে পারে।

\* কয়েক সেকেন্ডের মধ্যেই গ্লুকোমিটারের পর্দায় রক্তের সুগারে তথা ডায়াবেটিসের পয়েন্ট দেখা যাবে। হিসাবটি সাধারণত mmol/l (মিলিমোল/লিটার) এককে দেখানো হয়। তবে কিছু গ্লুকোমিটারের হিসাবটি mg/dL (মিলিগ্রাম/ডেসিলিটার) এককে দেখানো হতে পারে।

ID: 286

Context: ইন্সুলিনের ব্যাবহার পদ্ধতি

Question: ইন্সুলিনের ব্যাবহার পদ্ধতি কি ?

Answer:

ইনসুলিন যেভাবে নিবেনসাতটি সহজ ধাপে আপনি নিজে নিজে ঘরে বসে ইনসুলিন ইনজেকশন নিতে পারেন। ধাপগুলো হলো—\* হাত ভালোভাবে ধুয়ে শুকিয়ে নিন।\* ইনজেকশনটি শরীরের কোন জায়গায় দিবেন তা ঠিক করুন। ইনসুলিন ইনজেকশন নেওয়ার জন্য সবচেয়ে উপযুক্ত হল শরীরের চর্বিযুক্ত স্থান, যেমন: তলপেট (নাভির নিচের অংশ), উরু বা নিতম্ব।প্রত্যেকবার ভিন্ন ভিন্ন জায়গায় ইনজেকশন নেওয়া জরুরী। আগে যেখানে ইনসুলিন নিয়েছেন তার থেকে থেকে অন্তত ১ সেন্টিমিটার বা আধা ইঞ্চি দূরে পরের ইনজেকশন দেওয়া উচিত। একই জায়গায় বারবার ইনজেকশন দিলে ওই জায়গাটি শক্ত হয়ে ফুলে যেতে পারে, যা পরবর্তীতে ইনসুলিন শোষণে এবং সঠিকভাবে কাজ করতে বাধা দিবে।\* ইনসুলিন পেন এর বাইরের ও ভেতরের ক্যাপ খুলে এতে সুঁইটি লাগিয়ে নিন। ডায়াল ঘুরিয়ে ২ ইউনিটে নিয়ে আসুন। এরপর পেনটিকে সোজা করে ধরুন।যতক্ষণ পর্যন্ত সুঁইয়ের মাথায় ইনসুলিন না দেখা যায় ততক্ষণ পেনের পেছনে থাকা প্লাঞ্জারে ধীরে ধীরে চাপ দিন। এই কাজটিকে বলা হয় ‘প্রাইমিং’। সুঁই ও ইনসুলিন ভায়াল বা কার্তুজের ভেতরে কোনো বাতাস থাকলে তা এই পদ্ধতিতে বের করা যায়, ফলে ডোজ নিয়ন্ত্রণ সহজ হয়।\* এবার ডায়াল ঘুরিয়ে ডাক্তারের প্রেসক্রিপশন অনুযায়ী নির্দিষ্ট ডোজটি বাছাই করুন। যেখানে ইনজেকশনটি নিবেন সেই স্থান পরিষ্কার ও শুকনো আছে কি না তা নিশ্চিত করুন।\* সমকোণে বা খাড়াভাবে (৯০ ডিগ্রী কোণে) সুঁইটি শরীরে প্রবেশ করান। ইনজেকশন দেওয়ার আগে ত্বক আস্তে চিমটি দিয়ে উঠিয়ে নিতে পারেন। যতক্ষণ পর্যন্ত ডায়ালটি ০ তে ফেরত না যায়, ততক্ষণ প্লাঞ্জারে চাপ দিয়ে ধরে রাখুন।\* সুঁইটি সরানোর আগে ইনসুলিন যেন শরীরে প্রবেশ করার যথেষ্ট সময় পায়, সেজন্য ১ থেকে ১০ পর্যন্ত গুনে নিন। ত্বকে চিমটি দিয়ে রাখলে তা সরিয়ে নিন।\* সুঁইটি সরিয়ে নিরাপদ স্থানে ফেলে দিন।

ID: 287

Context: টাইপ ১ ডায়াবেটিস নিয়মিত চেকআপ ও পরীক্ষা-নিরীক্ষা

Question: টাইপ ১ ডায়াবেটিস নিয়মিত চেকআপ ও পরীক্ষা-নিরীক্ষা কখন করবেন ?

Answer:

ডায়াবেটিস ধরা পড়ার পরে নিয়মিত ডাক্তারের ফলো-আপে থাকতে হবে। কোনো প্রশ্ন থাকলে তা ডাক্তারের কাছ থেকে নিঃসংকোচে জেনে নিতে হবে।ডায়াবেটিসের চেকআপে এমন কিছু পরীক্ষা রয়েছে যেগুলো ৬ মাস পরপর করানোর প্রয়োজন হয়। আবার কিছু পরীক্ষা আছে যেগুলো বছরে একবার করালেই হয়।প্রতি ৬ মাসের পরীক্ষাএই পরীক্ষাগুলোর মধ্যে রয়েছে রক্ত ও প্রস্রাবের পরীক্ষা। ডায়াবেটিস কতটুকু নিয়ন্ত্রণে আছে তা জানার জন্য এসব পরীক্ষা করানোর পরামর্শ দেওয়া হয়।সাধারণত ৬ মাস পরপর এসব পরীক্ষা করানোর পরামর্শ দেওয়া হলেও যাদের নতুন করে টাইপ ১ ডায়াবেটিস শনাক্ত হয়েছে তাদের ক্ষেত্রে এসব পরীক্ষা আরও ঘন ঘন করাতে হতে পারে। এসব পরীক্ষার মধ্যে রয়েছে—

\* এইচবিএওয়ানসি পরীক্ষা (HbA1C Test): বিগত ২-৩ মাসে ব্লাড সুগার লেভেলের নিয়ন্ত্রণ কেমন ছিল তা জানার জন্য পরীক্ষাটি করানো হয়।

\* কোলেস্টেরল (Cholesterol) পরীক্ষা: রক্তে চর্বির পরিমাণ জানার জন্য এই পরীক্ষাটি করানো হয়।

\* কিডনির পরীক্ষা (Kidney Function Tests): কিডনি সঠিকভাবে কাজ করছে কি না দেখার জন্য এই পরীক্ষা করানো হয়।

\* ইউরিনারি অ্যালবুমিন (Urinary Albumin): প্রস্রাবে অ্যালবুমিন নামক প্রোটিনের পরিমাণ দেখার জন্য পরীক্ষাটি করানো হয়।এছাড়া রোগীর ওজন ও রক্তচাপ নিয়ন্ত্রণে আছে কি না সেটাও পরীক্ষা করে দেখা হয়। পরীক্ষার রিপোর্ট দেখানোর সুযোগে বাড়িতে গ্লুকোমিটারে মাপা সুগারের লেভেলের ব্যাপারেও ডাক্তারের সাথে আলোচনা করে নিতে পারেন।বাৎসরিক পরীক্ষাচোখ পরীক্ষাবছরে একবার চোখ পরীক্ষা করানো উচিত। এই পরীক্ষায় চোখের পেছনের অংশের একটি ছবি নেয়া হবে এবং ডায়াবেটিসের কারণে চোখে কোনো পরিবর্তন হয়েছে কি না তা পরীক্ষা করে দেখা হবে।এটি সাধারণ দৃষ্টিশক্তির পরীক্ষার চেয়ে আলাদা। কারণ এই পরীক্ষার মাধ্যমে আপনার চশমা প্রয়োজন কি না সেটি পরীক্ষা করা হয় না।পায়ের পাতার পরীক্ষাএক্ষেত্রে যে বিষয়গুলো লক্ষ্য করতে হবে সেগুলো হলো—

\* পায়ের পাতা অবশ হয়ে আসছে কি না

\* পায়ে নতুন করে কড়া পড়ছে কি না

\* পায়ের কোনো অংশে নতুন করে ইনফেকশন বা ঘা হয়েছে কি নাএই সমস্যাগুলোর কোনোটি দেখা দিলে দ্রুত ডাক্তারের পরামর্শ নিতে হবে।

ID: 288

Context: টাইপ ১ ডায়াবেটিস চিকিৎসায় পরিবর্তন

Question: টাইপ ১ ডায়াবেটিস চিকিৎসায় পরিবর্তন কি কি ?

Answer:

টাইপ ১ ডায়াবেটিস সনাক্ত হলে রোগীকে সাধারণত নির্দিষ্ট সময়ে প্রতি বেলার খাবার খাওয়ার পরামর্শ দেওয়া হয়। সেই সাথে নির্দিষ্ট সময়ে নির্দিষ্ট ডোজের ইনসুলিন নিতে হয়।সময়ের সাথে কেউ কেউ ডায়াবেটিসের ওপর ভালো নিয়ন্ত্রণ নিয়ে আসতে পারে। সেক্ষেত্রে নিজস্ব জীবনধারার সাথে মিল রেখে চিকিৎসায় কিছুটা পরিবর্তন আনা যেতে পারে। যার ফলে রোগী নিজের সুবিধামতো সময়ে আহার এবং সেই অনুযায়ী ইনসুলিন নিতে পারে। তবে চিকিৎসায় কোনো পরিবর্তন আনার পূর্বে ডাক্তারের সাথে আলোচনা করে নিতে হবে।হানিমুন পিরিয়ড ডায়াবেটিস সনাক্ত হওয়ার বছরখানেক পর্যন্ত শরীরে কিছুটা ইনসুলিন তৈরি হতে পারে। এই সময়কে ‘হানিমুন পিরিয়ড’ বলা হয়। এই সময়কাল পার হয়ে গেলে রক্তের সুগার নিয়ন্ত্রণ করা কঠিন হয়ে পড়তে পারে। তাই ডায়াবেটিস নিয়ন্ত্রণে রাখতে সমস্যা হলে ডাক্তারের পরামর্শ নিতে হবে।দৈহিক পরিবর্তনবয়স বাড়ার সাথে সাথে অথবা শরীরে বিভিন্ন পরিবর্তন আসার কারণে ডায়াবেটিসের চিকিৎসায় কিছু পরিবর্তন আসতে পারে।

ID: 289

Context: ডেঙ্গু জ্বর

Question: ডেঙ্গু জ্বর কি ?

Answer:

ডেঙ্গু জ্বরে যারা আক্রান্ত হন, তাদের প্রতি ২০ জনের মধ্যে একজনের অবস্থা মারাত্মক হয়। এভাবে শত শত মানুষ প্রতি বছর ডেঙ্গুতে আক্রান্ত হয়ে মৃত্যুবরণ করেন। তবে জ্বর হলে সেটা ডেঙ্গু কি না তা আগেভাগেই ধরে ফেলে সময়মতো চিকিৎসা নিলে ভয়াবহতা অনেকখানি কমিয়ে আনা যায়।ডেঙ্গু জ্বরে যারা আক্রান্ত হন, তাদের প্রতি ২০ জনের মধ্যে একজনের অবস্থা মারাত্মক হয়। এভাবে শত শত মানুষ প্রতি বছর ডেঙ্গুতে আক্রান্ত হয়ে মৃত্যুবরণ করেন। তবে জ্বর হলে সেটা ডেঙ্গু কি না তা আগেভাগেই ধরে ফেলে সময়মতো চিকিৎসা নিলে ভয়াবহতা অনেকখানি কমিয়ে আনা যায়।।

ID: 290

Context: ডেঙ্গুর লক্ষণ

Question: ডেঙ্গুর লক্ষণ কি কি ?

Answer:

বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই ডেঙ্গু ভাইরাসে আক্রান্ত হলে তেমন কোনো লক্ষণ প্রকাশ পায় না। আর ডেঙ্গু জ্বরের লক্ষণ দেখা দিলেও সেগুলো সাধারণত তেমন গুরুতর হয় না।কখন লক্ষণ দেখা দেয়?ডেঙ্গু জ্বর হলে সাধারণত মশা কামড়ানোর ৩–১৪ দিনের (গড়ে ৪–৭ দিনের) মধ্যে লক্ষণগুলো প্রকাশ পায়। এক্ষেত্রে মূলত সাধারণ সর্দিজ্বর কিংবা পেট খারাপের মতো লক্ষণ দেখা দেয়। এসময়ে একদিন হঠাৎ করে কাঁপুনি দিয়ে প্রচণ্ড জ্বর আসতে পারে। শরীরের তাপমাত্রা প্রায় ১০৪ ডিগ্রি ফারেনহাইটে পৌঁছে যেতে পারে। আবার তাপমাত্রা এত বেশি না হলেও গা গরম লাগতে পারে অথবা শরীরে কাঁপুনি হতে পারে।

ডেঙ্গুর সাধারণ লক্ষণগুলোর মধ্যে রয়েছে—

\* তীব্র জ্বর (১০৪ ডিগ্রি ফারেনহাইট বা ৪০ ডিগ্রি সেলসিয়াস)

\* তীব্র মাথাব্যথা

\* চোখের পেছনে ব্যথা

\* পেশিতে ও গিরায় গিরায় ব্যথা

\* বমি বমি ভাব

\* বমি হওয়া

\* শরীরের গ্রন্থি ফুলে যাওয়া। যেমন, বগলে, কুঁচকিতে কিংবা গলায় হাত দিলে বিচির মতো ফোলা অনুভব করা

\* গায়ে লাল লাল র‍্যাশ বা ফুসকুড়ি ওঠাঅন্যান্য লক্ষণের মধ্যে রয়েছে—খাবারে অরুচি

\* পেট ব্যথাডেঙ্গু হলে একই সাথে প্রচণ্ড জ্বর ও গায়ে ব্যথা হয় বলে একে অনেকসময় ‘হাড়ভাঙা জ্বর’ বলা হয়।কতদিন থাকে?ডেঙ্গুর লক্ষণগুলো সাধারণত ২–৭ দিন স্থায়ী হয়।[৫] বেশিরভাগ মানুষই ১ সপ্তাহ পরে সেরে উঠতে শুরু করে। সেরে ওঠার সময়ে ২–৩ দিনের জন্য শরীরে আবার র‍্যাশ দেখা দিতে পারে ও চামড়া উঠতে পারে। লক্ষণগুলো সেরে যাওয়ার পরেও কারও কারও কয়েক সপ্তাহ ধরে ক্লান্ত ও অসুস্থ লাগতে পারে।শিশুদের ডেঙ্গু জ্বরের লক্ষণগুলো কী কী?ডেঙ্গু রোগের প্রধান লক্ষণ হলো জ্বর আসা। এক্ষেত্রে শরীরের তাপমাত্রা প্রায় ১০২–১০৪ ডিগ্রি ফারেনহাইট পর্যন্ত বাড়তে পারে। তবে শিশুদের ক্ষেত্রে অনেক সময় জ্বর না-ও আসতে পারে। জ্বর ছাড়া আরও যেসব লক্ষণ দেখা যেতে পারে সেগুলো হলো—

\* শরীরের শক্তি কমে যাওয়া অথবা দুর্বল হয়ে যাওয়া

\* ঘুম ঘুম ভাব

\* খিটখিটে হয়ে যাওয়া অথবা অল্পতেই চিৎকার কিংবা কান্নাকাটি করা

\* গায়ে লাল র‍্যাশ ওঠা

\* মাড়ি অথবা নাক থেকে রক্ত পড়া

\* ত্বকের নিচে রক্তক্ষরণ হয়ে লাল লাল র‍্যাশ বা ছোপের মতো হওয়া

\* ২৪ ঘন্টায় কমপক্ষে ৩ বার বমি হওয়া

\* পানিশূন্যতা দেখা দেওয়াশিশুদের ডেঙ্গু হলে সেটি খুব দ্রুত মারাত্মক আকার ধারণ করতে পারে। তাই বিশেষ করে এক বছরের কম বয়সী শিশুদের যত দ্রুত সম্ভব হাসপাতালে ভর্তি করানো প্রয়োজন।মারাত্মক ডেঙ্গুর লক্ষণ

\* ডেঙ্গু জ্বরে আক্রান্ত প্রায় প্রতি ২০ জনের মধ্যে একজনের ক্ষেত্রে ‘সিভিয়ার ডেঙ্গি’ বা মারাত্মক ডেঙ্গু রোগ হতে পারে।[৬] সাধারণত লক্ষণ দেখা দেওয়ার ৩–৭ দিনের মধ্যে এমন গুরুতর অবস্থা দেখা যায়।

\* এই সময়ে সাধারণত জ্বর চলে যাওয়ার (তাপমাত্রা <১০০° ফারেনহাইট) ২৪–৪৮ ঘন্টার মধ্যে হঠাৎ করে কিছু মারাত্মক লক্ষণ দেখা দিতে পারে। যেমন—

\* তীব্র পেট ব্যথা

\* পেটে চাপ দিলে ব্যথা লাগা কিংবা পেট ফুলে যাওয়া

\* ২৪ ঘন্টায় ৩ বার অথবা তার বেশি বমি হওয়া

\* শরীরের ভেতরে কিংবা বাইরে রক্তপাত হওয়া। এটি বোঝার উপায় হলো—

\* নাক অথবা মাড়ি দিয়ে রক্ত পড়া

\* বমি অথবা পায়খানার সাথে রক্ত যাওয়া। এক্ষেত্রে কালো পায়খানা হতে পারে ও বমির সাথে কফির দানার মতো রক্ত যেতে পারে

\* গাঢ় রঙের প্রস্রাব হওয়া অথবা প্রস্রাবের সাথে রক্ত যাওয়া

\* মাসিকের সময়ে অস্বাভাবিকভাবে বেশি রক্তপাত হওয়া অথবা যোনিপথে রক্ত যাওয়া

\* ত্বকে রক্তপাত হওয়ার কারণে লাল রঙের ছোপ ছোপ র‍্যাশ দেখা দেওয়া

\* খুব ক্লান্ত, অস্থির কিংবা খিটখিটে লাগা

এসব লক্ষণ ছাড়াও আরও কিছু লক্ষণ রোগীর মুমূর্ষু অবস্থা নির্দেশ করে—

\* রক্তচাপ কমে যাওয়া

\* শ্বাস-প্রশ্বাসের গতি বেড়ে যাওয়া/দ্রুত শ্বাস নেওয়া

\* পালস বা নাড়ির গতি দুর্বল কিন্তু দ্রুত হয়ে যাওয়া (মিনিটে ১০০ এর চেয়ে বেশি)

\* শরীর ঠাণ্ডা, ভেজা ভেজা ও ফ্যাকাশে হয়ে যাওয়া

\* ঝিমুনি, মানসিক বিভ্রান্তি, খিঁচুনি হওয়া কিংবা অজ্ঞান হয়ে যাওয়া

পানিশূন্যতা হওয়া। যেমন—

\* প্রস্রাবের পরিমাণ কমে যাওয়া। যেমন: ৪–৬ ঘন্টা ধরে প্রস্রাব না হওয়া

\* মুখ শুকিয়ে যাওয়া

\* চোখ বসে যাওয়া/গর্তে/কোটরে চলে যাওয়া

\* ছোটোদের ক্ষেত্রে মাথার তালু বসে যাওয়া এবং কান্না করলে চোখ দিয়ে খুব অল্প পানি পড়া কিংবা একেবারেই পানি না পড়া

\*‘সিভিয়ার ডেঙ্গি’ হলে রক্তনালীর ভেতরে থাকা রক্ত থেকে পানি বেরিয়ে যাওয়ার ফলে মারাত্মক পানিশূন্যতা সৃষ্টি, শরীরের বিভিন্ন অঙ্গে পানি আসা, শ্বাসকষ্ট, গুরুতর রক্তপাত ও বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গের কাজে সমস্যা হওয়ার ফলে রোগীর অবস্থা খুব সংকটাপন্ন হয়ে যেতে পারে। এমনকি এসব মারাত্মক জটিলতা থেকে রোগীর মৃত্যু পর্যন্ত হতে পারে।

আগে কখনো ডেঙ্গু হয়ে থাকলে মারাত্মক ডেঙ্গু হওয়ার সম্ভাবনা বেড়ে যায়। সেই সাথে ছোটো শিশু ও গর্ভবতীদের এই জটিলতায় আক্রান্ত হওয়ার ঝুঁকি বেশি।

মারাত্মক ডেঙ্গুর লক্ষণ দেখা দেওয়ার পরেও জ্বর কমতে থাকার কারণে ডেঙ্গু সেরে যাচ্ছে ভেবে বাড়িতে বসে থাকবেন না। জ্বর বাড়ুক অথবা কমুক—যাই-ই হোক না কেন, মারাত্মক ডেঙ্গুর যেকোনো লক্ষণ দেখামাত্রই রোগীকে হাসপাতালে ভর্তি করাতে হবে।

ID: 291

Context: ডেঙ্গুর হাসপাতালে চিকিৎসা

Question: ডেঙ্গু হলে কখন দ্রুত হাসপাতালে যাবেন?

Answer:

সাধারণ ডেঙ্গু জ্বর আসার সাথে সাথেই হাসপাতালে ভর্তি হওয়ার প্রয়োজন হয় না। বেশিরভাগ ক্ষেত্রে ডাক্তারের পরামর্শ মেনে বাসায় চিকিৎসা করলে এই রোগ পুরোপুরি সেরে যায়। তবে মারাত্মক ডেঙ্গুসহ কিছু বিশেষ ক্ষেত্রে রোগীকে জরুরি ভিত্তিতে হাসপাতালে নেওয়ার প্রয়োজন। এক্ষেত্রে তেমন কোনো মারাত্মক লক্ষণ প্রকাশ না পেলেও ডাক্তারের পরামর্শ নিতে দেরি করা যাবে না। কেননা কিছু রোগী আগে থেকেই শারীরিকভাবে দুর্বল থাকেন। ডেঙ্গু রোগে আক্রান্ত হলে হঠাৎ করে খুব দ্রুত গতিতে তাদের শারীরিক অবস্থার অবনতি ঘটতে পারে।এমন ব্যক্তিদের মধ্যে রয়েছে—

\* গর্ভবতী নারী

\* এক বছর অথবা এর কম বয়সী শিশু

\* বৃদ্ধ বা বয়স্ক ব্যক্তি

\* অতিরিক্ত ওজনের বা স্থূল ব্যক্তি

\* কিছু বিশেষ রোগে আক্রান্ত ব্যক্তি। যেমন: ডায়াবেটিস, উচ্চ রক্তচাপ, হার্ট ফেইলিউর ও কিডনি ফেইলিউর

\* দীর্ঘদিন ধরে রক্তের সমস্যায় আক্রান্ত ব্যক্তিএ ছাড়াও আপনি একা বসবাস করলে অথবা আপনার পক্ষে বাড়িতে বসে প্রয়োজনীয় স্বাস্থ্য সেবা পাওয়া সম্ভব নয় মনে হলে নিকটস্থ হাসপাতালে ভর্তি হতে পারেন। এতে করে আপনার রোগের গতিবিধি পর্যবেক্ষণ করা যাবে। যেকোনো সময়ে অবস্থার অবনতি হলে সেটি সমাধানে দ্রুত কার্যকর ব্যবস্থা নেওয়া সহজ হবে।[৯]জ্বর সেরে যাওয়ার সময়টায় সাধারণত ডেঙ্গুর জটিলতা দেখা দেওয়া শুরু করে। তাই এই সময়টায় রোগীর লক্ষণগুলো সতর্কতার সাথে পর্যবেক্ষণ করতে হবে। যেকোনো সমস্যা হলে খুবই দ্রুততার সাথে তা সমাধানের ব্যবস্থা নিতে হবে।

ID: 292

Context: ডেঙ্গু শনাক্ত করার পরীক্ষা

Question: ডেঙ্গু শনাক্ত করার পরীক্ষা কি কি ?

Answer:

ডেঙ্গু হয়েছে কি না সেটি নিশ্চিত হওয়ার এবং রোগীর স্বাস্থ্যের অবস্থা সম্পর্কে ধারণা পাওয়ার জন্য সাধারণত বেশ কিছু পরীক্ষা-নিরীক্ষা করা হয়। সেগুলো হলো—

\* এনএস১ অ্যান্টিজেন (NS1 Antigen) পরীক্ষাএটি একটি রক্ত পরীক্ষা যার সাহায্যে খুব দ্রুত (প্রায় ২০ মিনিটের মধ্যে) ফলাফল পাওয়া যায়। ডেঙ্গু ভাইরাসে আক্রান্ত হলে সাধারণত জ্বর আসার প্রথম দিন থেকেই এই পরীক্ষার ফলাফল পজিটিভ হয়।তবে জ্বর আসার চার–পাঁচ দিন পর থেকে এই টেস্টের ফলাফল নেগেটিভ আসে। অর্থাৎ জ্বর আসার চার–পাঁচ দিন পরে এই টেস্ট করলে শরীরে আদৌ ডেঙ্গু ভাইরাস আছে কি না সেই সম্পর্কে নিশ্চিত হওয়া যাবে না।বাংলাদেশে সরকারি-বেসরকারি বিভিন্ন হাসপাতালে সরকারের নির্ধারিত প্রায় ৫০০ টাকা মূল্যে এই টেস্ট করানো যায়।

\* ডেঙ্গু ইমিউনোগ্লোবিউলিন (Dengue IgM/IgG) পরীক্ষাআইজিএম ও আইজিজি অ্যান্টিবডি টেস্ট এক প্রকার রক্ত পরীক্ষা। এই পরীক্ষা দুটির সাহায্যে রোগী ডেঙ্গু আক্রান্ত কি না সেটা নির্ণয় করা যায়।আইজিএম অ্যান্টিবডি টেস্ট সাধারণত জ্বর আসার পাঁচ দিন পর থেকেই করা যায়। তবে জ্বর আসার প্রায় সাত দিনের দিকে এই পরীক্ষা সবচেয়ে ভালো ফলাফল দিতে পারে। সাম্প্রতিক সময়ে ডেঙ্গু হলে এ পরীক্ষা পজিটিভ আসে।অন্যদিকে শরীরে আইজিজি অ্যান্টিবডি টেস্টের মাধ্যমে পূর্বে কেউ কখনো ডেঙ্গু ভাইরাসে আক্রান্ত হয়েছিল কি না সেটি নির্ণয় করা যায়। এই টেস্টটির মূল্য প্রায় ৩০০–৫০০ টাকা।

\* সিবিসি (CBC) পরীক্ষাএই পরীক্ষার মাধ্যমে মূলত রক্তে লোহিত রক্ত কণিকা, শ্বেত রক্ত কণিকা, প্লাটিলেট ও হেমাটোক্রিটের পরিমাণ নির্ণয় করা হয়। ডেঙ্গু হলে এসব রক্ত কণিকার পরিমাণ সাময়িকভাবে কমে যেতে পারে।এ ছাড়া রক্ত থেকে পানি বেরিয়ে যেতে শুরু করলে হেমাটোক্রিট অনেক বেড়ে যায়। তাই ডেঙ্গু মারাত্মক আকার ধারণ করেছে কি না সেটি নির্ধারণ করার একটি অন্যতম উপায় হলো হেমাটোক্রিটের পরিমাণ নির্ণয় করা। এই টেস্টটির মূল্য প্রায় ১৫০–৪০০ টাকা।এ ছাড়াও বিভিন্ন প্রয়োজনে ডাক্তারের পরামর্শে আরও কিছু পরীক্ষা-নিরীক্ষা করার প্রয়োজন হতে পারে। যেমন: রক্তের ALT/SGPT ও AST/SGOT পরীক্ষা এবং প্রস্রাব পরীক্ষা।

ID: 293

Context: ডেঙ্গুর ঘরোয়া চিকিৎসা

Question: ডেঙ্গুর ঘরোয়া চিকিৎসা কি ?

Answer:

ডেঙ্গুর জীবাণুকে নিষ্ক্রিয় করে দ্রুত ডেঙ্গু সারিয়ে ফেলার মতো নির্দিষ্ট কোনো চিকিৎসা এখনো আবিষ্কৃত হয়নি। তবে সাধারণত ঘরোয়া কিছু পরামর্শ মেনে চলার মাধ্যমেই ডেঙ্গুর বিভিন্ন লক্ষণ উপশম করা যায়।বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই শরীরের নিজস্ব রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতার মাধ্যমে ধীরে ধীরে এই ভাইরাস নিষ্ক্রিয় হয়ে যায়। তবে মারাত্মক ডেঙ্গু এবং কিছু বিশেষ ক্ষেত্রে রোগীকে দ্রুত হাসপাতালে ভর্তি করে চিকিৎসা শুরু করতে হয়।সাধারণ ডেঙ্গু হলে নিচের বিষয়গুলো মেনে চললে তা রোগীর লক্ষণ উপশমে সাহায্য করতে পারে—

\* তরল খাবার: ডেঙ্গু হলে শরীরের রক্তনালী থেকে রক্তের জলীয় অংশ বাইরে বেরিয়ে যায়। তাই এই রোগে শরীরে পানিশূন্যতা হওয়ার সম্ভাবনা অনেক বেশি। পানিশূন্যতা থেকে ডেঙ্গু আক্রান্ত ব্যক্তির মারাত্মক জটিলতা সৃষ্টি হতে পারে।এই সমস্যা প্রতিরোধের জন্য শুরু থেকেই প্রচুর পরিমাণে তরল খাবার খেতে হবে। যেমন: পানি, ডাবের পানি, স্যুপ, লেবু-পানি, দুধ, ফলের রস ও খাবার স্যালাইন। সাধারণত একজন প্রাপ্তবয়স্ক ব্যক্তির দৈনিক কমপক্ষে ৬–৮ গ্লাস পানি ও তরল খাবার খাওয়া প্রয়োজন।পানির পাশাপাশি পানিতে থাকা গুরুত্বপূর্ণ ইলেক্ট্রোলাইট বা লবণের চাহিদা মেটাতে পানির পাশাপাশি পর্যাপ্ত পরিমাণে খাবার স্যালাইন পান করতে পারেন।

\* বিশ্রাম: ডেঙ্গু রোগে শরীর বেশ দুর্বল হয়ে যায়। এজন্য এই সময়ে যতটা সম্ভব বিশ্রামে থাকার পরামর্শ দেওয়া হয়। তাই কাজকর্ম থেকে ছুটি নিয়ে বাড়িতে বিশ্রাম নেওয়ার চেষ্টা করবেন। আর নিয়মিত ঘরের কাজ করলে আপনি বিশ্রামে থেকে বাড়ির অন্য কোনো সদস্য অথবা বন্ধুর সহযোগিতা নিবেন। সেই সাথে ডেঙ্গু ছড়িয়ে পড়া প্রতিরোধ করতে অবশ্যই শোয়ার সময়ে মশারি টানিয়ে রাখবেন।

\* ঔষধ: ডেঙ্গুর কারণে সৃষ্ট ব্যথা ও জ্বর কমানোর একমাত্র নিরাপদ ঔষধ হলো প্যারাসিটামল। জ্বর ও ব্যথা কমানোর জন্য প্যারাসিটামল সেবন করতে পারেন। শিশুদের ক্ষেত্রে বয়স অনুযায়ী উপযুক্ত ডোজে প্যারাসিটামল খাওয়াতে হবে।পড়ুন: শিশুদের জন্য প্যারাসিটামলএ ছাড়া পানিতে এক টুকরা কাপড় ভিজিয়ে রোগীর গা মুছিয়ে দিতে পারেন। জ্বরের সময়ে এভাবে গা মুছিয়ে দিলে অনেকে আরাম পেতে পারে।ডেঙ্গু হলে প্যারাসিটামল ছাড়া অন্য যেকোনো ধরনের এনএসএআইডি জাতীয় ব্যথার ঔষধ (যেমন: অ্যাসপিরিন ও আইবুপ্রোফেন) সেবন করা থেকে বিরত থাকতে হবে। কেননা এসব ঔষধ খেলে শরীরে রক্তক্ষরণের ঝুঁকি বেড়ে যায়, যা রোগীর জীবনকে হুমকির মুখে ফেলে দিতে পারে।সাধারণত এই উপায়গুলো মেনে চললে বেশিরভাগ ক্ষেত্রে ডেঙ্গুর লক্ষণ উপশম করা যায়। তবে ডেঙ্গুর কোনো লক্ষণ অথবা রোগীর সার্বিক অবস্থা নিয়ে চিন্তিত হলে একজন ডাক্তারের পরামর্শ নিয়ে নেওয়া ভালো।

\* প্রচলিত ধারণা: ডেঙ্গু রোগের চিকিৎসায় পেঁপে পাতার রস গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখতে পারে। পেঁপে পাতার রস প্লাটিলেট বাড়াতে সাহায্য করে। এভাবে এটি ডেঙ্গুর ফলে সৃষ্ট রক্তক্ষরণ সংক্রান্ত জটিলতা প্রতিরোধে সাহায্য করে।

\* বিজ্ঞান যা বলে: কোনো রোগের চিকিৎসায় যেকোনো ধরনের ঔষধ ব্যবহারের আগে সেই ঔষধটিকে বেশ কয়েকটি ধাপের বৈজ্ঞানিক গবেষণার পথ পাড়ি দিতে হয়। ডেঙ্গুর চিকিৎসায় পেঁপে পাতার রস নিয়ে এই পর্যন্ত বেশ কিছু গবেষণা হয়েছে। তবে পেঁপে পাতার রসকে সরাসরি ডেঙ্গুর চিকিৎসায় ব্যবহার করার মতো যথেষ্ট প্রমাণ এখনো পাওয়া যায়নি।

কিছু গবেষণায় পশুপাখি ও স্বল্প সংখ্যক ডেঙ্গু রোগীর ক্ষেত্রে পেঁপে পাতার সম্ভাব্য উপকারিতা দেখা গিয়েছে। তবে এসব গবেষণায় ব্যবহৃত পেঁপে পাতা রস তৈরির কাঁচামাল, প্রক্রিয়া ও আক্রান্ত রোগীদের মধ্যে ব্যাপক ভিন্নতা রয়েছে। ঠিক কোন পরিমাণে, কতদিন ধরে এবং কোন ধরনের গাছের পাতার রসে উপকার পাওয়া যেতে পারে সেই বিষয়ে এখনো অনেক গবেষণার প্রয়োজন রয়েছে। তাই ডেঙ্গুর চিকিৎসায় পেঁপে পাতার ওপর নির্ভরশীল না হয়ে সঠিক পরামর্শ মেনে চলুন। প্রয়োজন অনুযায়ী হাসপাতালে ভর্তি হোন।

ID: 294

Context: ডেঙ্গু সংক্রমন

Question: ডেঙ্গু কিভাবে ছড়ায় ?

Answer:

ডেঙ্গু মূলত এডিস মশার মাধ্যমে ছড়ায়। সাধারণত এই মশা ডেঙ্গু ভাইরাসে আক্রান্ত ব্যক্তিকে কামড়ালে সেটিও ডেঙ্গু ভাইরাসে আক্রান্ত হয়। পরবর্তীতে ভাইরাসবাহী মশা অপর কোনো সুস্থ ব্যক্তিকে কামড়ালে সেই ব্যক্তির রক্তেও ডেঙ্গুর জীবাণু প্রবেশ করে।ডেঙ্গু ভাইরাসে আক্রান্ত গর্ভবতী নারী থেকে তার গর্ভের শিশুতে এই ভাইরাস ছড়াতে পারে। এক্ষেত্রে শিশু গর্ভে থাকা অবস্থাতে অথবা জন্মের সময়ে আক্রান্ত হতে পারে। এই ভাইরাস গর্ভের শিশুর ওপর নানান ধরনের বিরূপ প্রভাব ফেলতে পারে। যেমন: নির্দিষ্ট সময়ের আগেই জন্মগ্রহণ করা, স্বাভাবিকের তুলনায় কম ওজন নিয়ে জন্মানো এবং গর্ভাবস্থাতেই শিশুর মৃত্যু হওয়া।জেনে রাখা ভালো

ডেঙ্গু মারাত্মক আকার ধারণ করলে ভাইরাসগুলো রক্তের অণুচক্রিকা বা প্লাটিলেট ধ্বংস করতে পারে। প্লাটিলেটের অভাব হলে শরীরের বিভিন্ন জায়গায় রক্তপাত শুরু হতে পারে। এর পাশাপাশি ভাইরাসের কারণে রক্তনালী থেকে রক্তরস বা প্লাজমা বাইরে বেরিয়ে যায়। ফলে শরীরে মোট রক্তের পরিমাণ কমে যায় এবং রক্ত ঘন হয়ে যায়। সেই সাথে শরীরের প্রতিরক্ষা ব্যবস্থায় খুব অস্বাভাবিক পরিবর্তন আসে।

ডেঙ্গু হলে মূলত এসব কারণে শরীরের বিভিন্ন অঙ্গে গুরুতর জটিলতা সৃষ্টি হয়। ফলে খুব অল্প সময়েই রোগীর অবস্থার অবনতি হতে থাকে। এই অবস্থায় অতি দ্রুত হাসপাতালে চিকিৎসা শুরু করা প্রয়োজন।

ID: 295

Context: ডেঙ্গু প্রতিরোধ করার উপায়

Question: ডেঙ্গু প্রতিরোধ করার উপায় কি ?

Answer:

ডেঙ্গু প্রতিরোধের জন্য যেসব বিষয়ের ওপর গুরুত্ব দিতে হবে সেগুলো হলো—১. মশা নিধনমশার কামড়ের মাধ্যমে ডেঙ্গু ছড়ায় বলে মশা নিয়ন্ত্রণ করাই এই রোগ প্রতিরোধের প্রধান উপায়। এজন্য—ডেঙ্গু রোগের বাহক এডিস মশা সাধারণত জমে থাকা পানিতে ডিম পারে। সেখান থেকেই এই মশার বংশবৃদ্ধি হয়। তাই বাড়ি, অফিস কিংবা স্কুলের আশেপাশের ড্রেন, ডোবা, পুকুর ও জলাশয় নিয়মিত পরিষ্কার করতে হবে।

গাছের টব, নারকেলের ছোবড়া, টায়ার, পরিত্যক্ত আসবাব কিংবা পানি জমতে পারে এমন যেকোনো পাত্র বাড়ির আশেপাশে ফেলে রাখা যাবে না। বাড়ির আশেপাশে ব্যবহার্য কোনো পাত্রে (যেমন: ফুলদানি অথবা গাছের টব) পানি জমলে সেটি অন্তত তিন দিন পর পর ভালোমতো ঘষে মেজে পরিষ্কার করতে হবে। যাতে মশার ডিমগুলোও ধ্বংস হয়ে যায়।

পানি জমা করে রাখার পাত্র (যেমন: পানির ট্যাংক, বালতি ও ড্রাম) সবসময় ঢাকনা দিয়ে ঢেকে রাখতে হবে। কিছুদিন পর পর এসব খালি করে পরিষ্কার করতে হবে। এসব পাত্র খোলা থাকলে সেখানে মশা নিধনকারী ঔষধ স্প্রে করতে হবে।

নিয়মিত এয়ারকন্ডিশনারের ও ফ্রিজের জমে থাকা পানি পরিষ্কার করতে হবে।

কয়েকদিনের জন্য বাড়ির বাইরে গেলে কমোড অথবা প্যান ঢেকে রাখতে হবে। সেই সাথে পানির বালতি খালি করে রাখতে হবে।

বাড়ি, অফিস কিংবা স্কুলের আশেপাশের এলাকায় নিয়মিত এডিস মশা নিধনকারী ঔষধ ছিটিয়ে দিতে হবে। শহুরে এলাকায় অনেক সময় সিটি কর্পোরেশনের পক্ষ থেকে নিয়মিত বিরতিতে মশার ঔষধ ছিটানো হয়। এর পাশাপাশি ঘরের আশেপাশে নিজ উদ্যোগে মশার ঔষধ ছিটানোর ব্যবস্থা করা উচিত।২. নিজেকে মশার কামড় থেকে সুরক্ষিত রাখুনআক্রান্ত মশার মাধ্যমে এ রোগ সুস্থ মানুষের মাঝে ছড়ায়। তাই নিজেকে যথা সম্ভব মশার কামড় থেকে রক্ষা করতে হবে। এজন্য—সম্ভব হলে বাড়ি, অফিস অথবা স্কুলের জানালায় নেট বা জাল লাগিয়ে নিবেন। এতে করে মশা ঘরের ভেতরে ঢুকতে পারবে না। ঘরের দরজা বেশিক্ষণ খোলা রাখবেন না।

বাড়ির দেয়ালে মশা বিতাড়ক রাসায়নিক পদার্থ দিয়ে রঙ করে নিতে পারেন।

ত্বকে লাগানোর জন্য বিভিন্ন ধরনের মশা নিরোধক ক্রিম বা রেপেলেন্ট ব্যবহার করতে পারেন।

বাইরে বের হওয়ার সময়ে কাপড় দিয়ে পুরো ত্বক ভালোভাবে ঢেকে বের হতে চেষ্টা করবেন। এক্ষেত্রে লম্বা প্যান্ট ও লম্বা হাতের জামা পরতে পারেন।

রাত কিংবা দিন—যেকোনো বেলায় ঘুমানোর সময় মশারি টানিয়ে ঘুমাবেন।

ঘরের ভেতরে মশা নিধনের জন্য ইলেকট্রনিক ব্যাট ব্যবহার করতে পারেন।

ঘরের ভেতরে মশার উপদ্রব কমানোর জন্য মতো মশা বিতাড়ক কয়েল, অ্যারোসল অথবা লিকুইড স্প্রে ব্যবহার করতে পারেন। তবে কয়েল কিংবা স্প্রে কেনার সময় চেষ্টা করবেন স্মোক ফ্রি বা ধোঁয়া হয় না—এমন পণ্য কিনতে। কেননা ঘরের ভেতরে এসবের ধোঁয়ার কারণে অনেকেরই শ্বাসকষ্ট হতে পারে। তবে এসব পণ্যের কার্যকারিতা নিয়ে কিছুটা সন্দেহ থাকতে পারে। তাই মশা নিধনের অন্যান্য পদ্ধতিগুলোর দিকে গুরুত্ব দেওয়া বেশি জরুরি।আপনি ইতোমধ্যে ডেঙ্গু জ্বরে আক্রান্ত হয়ে থাকলে, নিজে মশারি টানিয়ে বিশ্রাম নিবেন এবং ঘুমাবেন। কেননা আপনার মাধ্যমে আবার অনেক নতুন মশা এই ভাইরাসে আক্রান্ত হয়ে নতুন করে অন্যদের আক্রান্ত করতে পারে। ফলে খুব দ্রুত ডেঙ্গু বিস্তার লাভ করতে পারে।

ID: 307

Context: দাদ রোগ

Question: দাদ রোগ কি ?

Answer:

দাদ রোগ একটি পরিচিত চর্মরোগ। এই ছোঁয়াচে রোগটি ছত্রাক বা ফাঙ্গাল ইনফেকশনের কারণে ঘটে। মাথা থেকে পা পর্যন্ত শরীরের যেকোনো জায়গায় দাদ হতে পারে। দ্রুত সঠিক চিকিৎসা নিলে এই রোগ থেকে মুক্তি পাওয়া সম্ভব।দাদ রোগ একটি পরিচিত চর্মরোগ। এই ছোঁয়াচে রোগটি ছত্রাক বা ফাঙ্গাল ইনফেকশনের কারণে ঘটে। মাথা থেকে পা পর্যন্ত শরীরের যেকোনো জায়গায় দাদ হতে পারে। দ্রুত সঠিক চিকিৎসা নিলে এই রোগ থেকে মুক্তি পাওয়া সম্ভব।

ID: 308

Context: দাদ রোগের লক্ষণ গুলো

Question: দাদ রোগের লক্ষণ গুলো কি কি ?

Answer:

দাদের প্রধান উপসর্গ হলো ফুসকুড়ি বা র‍্যাশ। এই র‍্যাশ দেখতে সাধারণত আংটির মতো গোল হয়ে থাকে। রঙ হয় লালচে। তবে রোগীর ত্বকের বর্ণভেদে এটি রূপালি দেখাতে পারে। আবার আশেপাশের ত্বকের চেয়ে গাঢ় বর্ণও ধারণ করতে পারে।ছবি: দাদ রোগের লক্ষণদাদ রোগে ত্বকের বর্ণ পরিবর্তনের পাশাপাশি র‍্যাশের উপরিভাগে ছোটো ছোটো আঁইশ থাকতে পারে। এ ছাড়া আক্রান্ত স্থানে নিচের লক্ষণগুলো দেখা দিতে পারে—ত্বক কিছুটা খসখসে বা শুকনো হয়ে যাওয়া

স্থানটি ফুলে যাওয়া

চুলকানি হওয়া

আক্রান্ত ত্বকের ওপরে চুল অথবা লোম থাকলে সেগুলো পড়ে যাওয়া

ID: 309

Context: শরীরে দাদ হওয়ার স্থান

Question: শরীরের কোন কোন স্থানে দাদ রোগ হয়?

Answer:

আমাদের শরীরের যেকোনো অংশে দাদ দেখা দিতে পারে। যেমন: কুঁচকি, মাথার ত্বক, হাত, পা, পায়ের পাতা, এমনকি হাত-পায়ের নখ।[১]আক্রান্ত স্থানভেদে দাদের লক্ষণেও ভিন্নতা আসতে পারে। যেমন, র‍্যাশের আকারে ভিন্নতা থাকতে পারে। দাদের র‍্যাশ আস্তে আস্তে বড় হয়ে ছড়িয়ে যেতে পারে। আবার কখনো কখনো একাধিক র‍্যাশ দেখা দিতে পারে।নিচে শরীরের বিশেষ কিছু স্থানের দাদ রোগ সম্পর্কে প্রয়োজনীয় তথ্য তুলে ধরা হয়েছে—মাথার ত্বকছবি: মাথার ত্বকে দাদ রোগমাথার ত্বকে দাদ দেখা দিলে সাধারণত আক্রান্ত অংশের চুল পড়ে টাক সৃষ্টি হয়। টাক পড়া অংশে লালচে, গোলাকার ও ছোটো ছোটো আঁইশযুক্ত র‍্যাশ তৈরি হয়। এতে চুলকানি থাকতে পারে।ইনফেকশন ছড়িয়ে পড়লে টাক পড়া অংশের পরিমাণ আরও বাড়তে পারে এবং মাথার ত্বকে দাদ রোগের একাধিক র‍্যাশ তৈরি হতে পারে।মাথার ত্বকের দাদ রোগ প্রাপ্তবয়স্কদের তুলনায় শিশুদের মধ্যে বেশি দেখা যায়।পা ও পায়ের আংগুলের ফাঁকেএক্ষেত্রে আক্রান্ত স্থানটি লাল হয়ে ফুলে ওঠে এবং সেখান থেকে চামড়া উঠে যেতে থাকে। সেই সাথে পায়ের আঙ্গুলগুলোর ফাঁকে ফাঁকে চুলকানি হয়। বিশেষ করে পায়ের সবচেয়ে ছোটো আঙুল দুটির মাঝখানের অংশে চুলকানি হয়ে থাকে।[২]পায়ে দাদ হলে পায়ের পাতা ও গোড়ালিও আক্রান্ত হতে পারে। এমনকি গুরতর ক্ষেত্রে পায়ের ত্বকে ফোস্কা পড়তে পারে।ছবি: পা ও পায়ের আংগুলের ফাঁকে দাদ রোগকুঁচকিকুঁচকিতে দাদ হলে সেটি সাধারণত ঊরুর ভেতরের দিকের ভাঁজে লাল লাল র‍্যাশ হিসেবে দেখা যায়। র‍্যাশে আঁইশ থাকে এবং চুলকানি হয়।দাঁড়িগাল, চিবুক ও গলার ওপরের অংশে এই ধরনের দাদ দেখা দেয়। এটিও লাল লাল র‍্যাশ হিসেবে দেখা যায়, যাতে আঁইশ থাকে এবং চুলকানি হয়। দাঁড়িতে দাদ হলে অনেক সময় র‍্যাশের ওপরে চলটা পড়ে।[৩] আবার ভেতরে পুঁজও জমতে পারে। একই সাথে আক্রান্ত অংশের চুল পড়ে যেতে পারে।যেসব ক্ষেত্রে ডাক্তারের কাছে যাওয়া বিশেষভাবে গুরুত্বপূর্ণ

ডাক্তারের পরামর্শ অনুযায়ী ত্বকে অ্যান্টিফাঙ্গাল ঔষধ ব্যবহারের পরেও অবস্থার উন্নতি না হলে

কোনো কারণে শরীরের রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা কমে গেলে। যেমন: কেমোথেরাপি কিংবা স্টেরয়েড জাতীয় ঔষধ ব্যবহার ও ডায়াবেটিস

মাথার ত্বকের দাদ হলে। এক্ষেত্রে ডাক্তারের পরামর্শ অনুযায়ী ১–৩ মাস পর্যন্ত মুখে খাওয়ার ঔষধ ব্যবহার করতে হয়। পাশাপাশি শ্যাম্পু ব্যবহারের পরামর্শও দেওয়া হয়ে থাকে।

ID: 310

Context: দাদ রোগ সংক্রমন

Question: দাদ রোগ কীভাবে ছড়ায়?

Answer:

দাদ একটি সংক্রামক রোগ। এটি ট্রাইকোফাইটন, মাইক্রোস্পোরাম ও এপিডার্মোফাইটন প্রকারের ফাঙ্গাস জাতীয় জীবাণুর মাধ্যমে সংক্রামণ ঘটায়। এটি মূলত তিনভাবে ছড়ায়—আক্রান্ত ব্যক্তি কিংবা তার ব্যবহার্য জিনিসের সংস্পর্শ থেকে। যেমন: চিরুনি, তোয়ালে ও বিছানার চাদর

দাদ আক্রান্ত প্রাণীর সংস্পর্শ থেকে।যেমন: কুকুর, বিড়াল, গরু, ছাগল ও ঘোড়া

দাদ রোগের জীবাণু আছে এমন পরিবেশ, বিশেষ করে স্যাঁতস্যাঁতে স্থান থেকে।

ID: 311

Context: দাদ রোগের চিকিৎসা

Question: দাদ রোগের চিকিৎসা কি ?

Answer:

দাদ রোগের চিকিৎসায় অ্যান্টিফাঙ্গাল ঔষধ ব্যবহার করা হয়। চিকিৎসা নির্ভর করে শরীরের কোন স্থানে ইনফেকশন হয়েছে এবং ইনফেকশন কতটা গুরুতর তার ওপর।ঔষধ ব্যবহারের পাশাপাশি নিজের শরীরের অন্য কোনো স্থানে কিংবা বাড়ির সদস্যদের মধ্যে দাদ রোগ ছড়িয়ে পড়া ঠেকাতে কিছু নিয়ম মেনে চলাও গুরুত্বপূর্ণ।দাদের ঔষধদাদ রোগের চিকিৎসায় ব্যবহৃত ঔষধগুলো বিভিন্ন রূপে পাওয়া যায়। যেমন: ক্রিম, জেল, লোশন, স্প্রে, পাউডার, ট্যাবলেট ও ক্যাপসুল।শরীরের ত্বকে দাদ রোগ হলে সাধারণত মুখে খাওয়ার ঔষধ না দিয়ে ক্রিম, জেল, লোশন, স্প্রে কিংবা পাউডার হিসেবে সরাসরি ত্বকে লাগানোর পরামর্শ দেওয়া হয়। এমন ঔষধের মধ্যে রয়েছে ক্লট্রিমাজোল, মাইকোনাজোল, টার্বিনাফিন ও কিটোকোনাজল। এগুলো সাধারণত ২–৪ সপ্তাহ একটানা ব্যবহার করতে হয়।ডাক্তারের পরামর্শ অনুযায়ী নির্দিষ্ট সময় ধরে ঔষধ ব্যবহার চালিয়ে যাওয়া খুব গুরুত্বপূর্ণ। এমনকি আপাতদৃষ্টিতে র‍্যাশ সেরে গিয়েছে মনে হলেও ঔষধ ব্যবহার করা বন্ধ করা ঠিক নয়।

সঠিক সময় পর্যন্ত চিকিৎসা না নিলে র‍্যাশ পুরোপুরি না-ও সারতে পারে কিংবা ত্বকে পুনরায় দাদ হতে পারে।বিশেষ সতর্কতা: দাদ সারাতে স্টেরয়েড ব্যবহার করবেন না

দাদ রোগের র‍্যাশ দেখা দিলে অনেকে স্টেরয়েড জাতীয় ক্রিম বা মলম ব্যবহার করে থাকেন। এটি একেবারেই ঠিক নয়। কারণ এসব ঔষধ চুলকানি ও ত্বকের লালচে ভাব কমাতে সাহায্য করলেও দাদ সৃষ্টিকারী জীবাণুকে মারতে পারে না। শুধু তাই নয়, এসব ক্রিম ত্বকের রোগ প্রতিরোধ ব্যবস্থাকেও দুর্বল করে ফেলে। ফলে দাদ শরীরের অন্যান্য অংশে ছড়িয়ে পড়তে পারে। এমনকি ইনফেকশন ত্বকের গভীরে ঢুকে গুরুতর নানান জটিলতা সৃষ্টি করতে পারে।

এ ছাড়া স্টেরয়েড মলম দাদের ধরনও পরিবর্তন করে ফেলতে পারে। এর ফলে ডাক্তারের জন্য সঠিকভাবে দাদ নির্ণয় করা কঠিন হয়ে পড়ে। তাই দাদের চিকিৎসায় ডাক্তারের পরামর্শ ছাড়া এই ধরনের ক্রিম ব্যবহার করা যাবে না।দাদ রোগের ঘরোয়া চিকিৎসাযা করবেনযত দ্রুত সম্ভব ডাক্তারের পরামর্শ অনুযায়ী চিকিৎসা শুরু করুন।

ত্বক সবসময় শুকনো ও পরিষ্কার রাখুন। আক্রান্ত ত্বক স্পর্শ করলে সাথে সাথে হাত ধুয়ে ফেলুন।

দৈনন্দিন ব্যবহারের কাপড় (যেমন: তোয়ালে ও বিছানার চাদর) নিয়মিত ফুটন্ত পানি দিয়ে ধুয়ে নিন।যা করবেন না

দাদ হয়েছে এমন কারও ব্যবহার্য জিনিস (যেমন: তোয়ালে, চিরুনি ও বিছানার চাদর) ব্যবহার করা থেকে বিরত থাকুন।

আক্রান্ত ত্বক স্পর্শ করা অথবা চুলকানো থেকে বিরত থাকুন। নাহলে দাদ শরীরের অন্যান্য স্থানে ছড়িয়ে যেতে পারে। এমনকি চুলকানোর কারণে ত্বকে ভিন্ন আরেকটি জীবাণু আক্রমণ করে ইনফেকশন ঘটাতে পারে, যা দাদের চিকিৎসাকে আরও জটিল করে তুলতে পারে।

ID: 312

Context: দাদ রোগ প্রতিরোধে করণীয়

Question: দাদ রোগ প্রতিরোধে করণীয় কি ?

Answer:

দাদ রোগে যে কেউ আক্রান্ত হতে পারেন। তবে নির্দিষ্ট কিছু ক্ষেত্রে দাদ হওয়ার ঝুঁকি বেশি থাকে। তাই দাদ রোগের ঝুঁকি কমাতে সেসব বিষয়ে সতর্ক থাকতে হয়।আপনার শিশুর দাদ রোগ হলে তার ক্ষেত্রেও যত দ্রুত সম্ভব ডাক্তার দেখিয়ে চিকিৎসা শুরু করতে হবে। দাদ হলেও শিশুকে স্কুল, ডে-কেয়ার কিংবা নার্সারিতে পাঠাতে পারবেন। তবে শিক্ষক অথবা পরিচর্যাকারীকে তথ্যটি জানিয়ে রাখুন। এতে অন্য শিশুদের সাথে সরাসরি সংস্পর্শ এড়িয়ে চলতে সুবিধা হবে এবং দাদ ছড়িয়ে পড়া প্রতিরোধ করা যাবে।নিচের তালিকায় দাদ রোগ প্রতিরোধের উপায়গুলো তুলে ধরা হয়েছে—১. অপরিষ্কার শরীরে থাকে জীবাণু। আর অপরিচ্ছন্ন, স্যাঁতস্যাঁতে পরিবেশে দাদ রোগের জীবাণু থাকার সম্ভাবনা বেশি। এজন্য—ত্বক সবসময় পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন ও শুষ্ক রাখুন

হাতের এবং পায়ের নখ ছোটো ও পরিষ্কার রাখুন

দিনে অন্তত একবার মোজা ও অন্তর্বাস পরিবর্তন করুন২. খুব আঁটসাঁট জুতা পরলে এবং অতিরিক্ত ঘাম হলে দাদ রোগের ঝুঁকি বেড়ে যায়। তাই এমন জুতো ব্যবহার করুন যা আপনার পায়ের চারপাশে অবাধে বাতাস চলাচল করতে দেয়।৩. অন্য মানুষের ত্বকের সংস্পর্শে আসতে হয় এমন খেলাধুলা[৫][৬][৭] (যেমন: কুস্তি, হা-ডু-ডু ও বক্সিং) করলেও দাদ রোগের ঝুঁকি বেড়ে যায়। তাই এমন খেলাধুলা করলে আপনার ম্যাচ কিংবা অনুশীলনের পর পরই গোসল করুন। ইউনিফর্ম ও সব ধরনের ক্রীড়া সরঞ্জাম (যেমন: হেলমেট) সবসময় পরিষ্কার রাখুন। অন্যদের সাথে ক্রীড়া সরঞ্জাম ভাগাভাগি না করে নিজস্ব সরঞ্জাম ব্যবহার করতে পারলে সবচেয়ে ভালো হয়।৪. স্যাঁতস্যাঁতে পরিবেশে দাদ রোগের ঝুঁকি বেশি। তাই জিম কিংবা চেঞ্জিং রুম ও পাবলিক গোসলখানা এর মতো স্থানে খালি পায়ে হাঁটা থেকে বিরত থাকা উচিত।৫. পশুপাখির সরাসরি সংস্পর্শে আসলে দাদ হওয়ার ঝুঁকি বাড়ে। তাই প্রাণীর সংস্পর্শে, বিশেষ করে পোষা প্রাণীর সাথে মেলামেশার ক্ষেত্রে সতর্কতা অবলম্বন করুন।প্রাণীর সাথে সরাসরি সংস্পর্শে আসার পরে সাবান ও ট্যাপের পানি দিয়ে হাত ধুয়ে ফেলুন

আপনার পোষা প্রাণীর যদি দাদ হয়েছে বলে মনে হয়—যেমন, প্রাণীর শরীরে যদি দাদ দেখতে পান অথবা শরীর থেকে ছোপ ছোপ করে পশম পড়ে যায়—তাহলে তাকে পশু ডাক্তারের কাছে নিয়ে যান।৬. দাদ রোগে আক্রান্ত ব্যক্তি ও পশুর সংস্পর্শের বিষয়ে সতর্ক থাকুন।আক্রান্ত ব্যক্তির ব্যবহার্য জিনিস ব্যবহার করলেও দাদ সংক্রমণের ঝুঁকি বাড়ে। তাই দাদ আছে এমন কারও সাথে পোশাক, তোয়ালে, চাদর বা অন্যান্য ব্যক্তিগত জিনিস শেয়ার করা থেকে বিরত থাকুন।

দাদ রোগে আক্রান্ত ব্যক্তির অথবা প্রাণীর সংস্পর্শে এসে থাকলে, ত্বকে কোনো পরিবর্তন দেখা দিচ্ছে কি না সেদিকে খেয়াল রাখুন।বিশেষ তথ্য

শরীরের রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা দুর্বল হলে দাদ রোগসহ বিভিন্ন ইনফেকশনে আক্রান্ত হওয়ার ঝুঁকি অনেকখানি বেড়ে যায়।[৮] যেমন, ডায়াবেটিস রোগী ও দীর্ঘদিন ধরে স্টেরয়েড নিচ্ছেন কিংবা কেমথেরাপি নিচ্ছেন এমন ব্যক্তি। তাই এসব ক্ষেত্রে দাদ রোগ প্রতিরোধের উপায়গুলো মেনে চলা বিশেষভাবে জরুরি।

ID: 322

Context: পাইলস বা অর্শ রোগ

Question: পাইলস বা অর্শ রোগ কী?

Answer:

পাইলস একটি অতি পরিচিত স্বাস্থ্য সমস্যা। এটি অর্শ রোগ নামেও পরিচিত। অনেকেই এই সমস্যায় দীর্ঘদিন ভুগলেও এ ব্যাপারে পরামর্শ চাইতে বা ডাক্তার দেখাতে সংকোচ বোধ করেন। ক্ষেত্রবিশেষে পাইলস এর সঠিক চিকিৎসার বদলে হোমিওপ্যাথি, কবিরাজি ঔষধ ও অন্যান্য টোটকা গ্রহণ করেন। এসব কারণে পাইলস ক্রমশ জটিল আকার ধারণ করে। তাই পাইলস বা অর্শ রোগ সম্পর্কে বিস্তারিত জেনে এ সম্বন্ধে সচেতন হওয়া জরুরি।পাইলস একটি অতি পরিচিত স্বাস্থ্য সমস্যা। এটি অর্শ রোগ নামেও পরিচিত। অনেকেই এই সমস্যায় দীর্ঘদিন ভুগলেও এ ব্যাপারে পরামর্শ চাইতে বা ডাক্তার দেখাতে সংকোচ বোধ করেন। ক্ষেত্রবিশেষে পাইলস এর সঠিক চিকিৎসার বদলে হোমিওপ্যাথি, কবিরাজি ঔষধ ও অন্যান্য টোটকা গ্রহণ করেন। এসব কারণে পাইলস ক্রমশ জটিল আকার ধারণ করে। তাই পাইলস বা অর্শ রোগ সম্পর্কে বিস্তারিত জেনে এ সম্বন্ধে সচেতন হওয়া জরুরি।পড়ুন: কোষ্ঠকাঠিন্য দূর করার ঘরোয়া উপায়।

ID: 323

Context: পাইলস বা অর্শ রোগ

Question: পাইলস বা অর্শ রোগ কী?

Answer:

পায়ুপথ বা পায়খানার রাস্তার মুখ যদি কোনো কারণে ফুলে যায় এবং সেখান থেকে রক্ত পড়ে কিংবা পায়খানার রাস্তায় যদি গোটার মত হয় তখন একে বলা হয় পাইলস। চিকিৎসাবিজ্ঞানের ভাষায় এর নাম হেমোরয়েড। জটিল আকার ধারণ করার আগে অপারেশন ছাড়া অর্শ রোগের চিকিৎসা সম্ভব।

ID: 324

Context: পাইলস এর লক্ষণগুলো

Question: পাইলস এর লক্ষণগুলো কী?

Answer:

পাইলস বা অর্শ রোগের অন্যতম চারটি লক্ষণ নিচে তুলে ধরা হলো। এসব লক্ষণ দেখা দিলে চিকিৎসা শুরু করা জরুরি।১. পায়খানার সাথে রক্ত যাওয়াপাইলস হলে পায়খানার সাথে উজ্জ্বল লাল বর্ণের অর্থাৎ তাজা রক্ত যেতে পারে। সাধারণত পায়খানার পরে টয়লেট পেপার ব্যবহার করলে সেখানে রক্তের ফোটা লেগে থাকতে পারে। অথবা কমোডে বা প্যানের গায়ে টকটকে লাল রক্তের ছোপ দেখা যেতে পারে।। পাইলস হলে পায়ুপথের মুখে থাকা অ্যানাল কুশনগুলো থেকে রক্তক্ষরণ হয়। এই রক্ত বেরিয়ে গিয়ে জমাট বাধার সুযোগ পায় না। এ কারণে এক্ষেত্রে তাজা লাল রঙের রক্ত দেখা যায়।কিন্তু যদি কোনো কারণে পায়খানার সাথে গাঢ় খয়েরী রঙের রক্ত যায়, বা আলকাতরার মতো কালো ও নরম পায়খানা হয়, তবে তা সাধারণত পাইলস এর কারণে নয়। পরিপাকতন্ত্রের কোনো অংশে রক্তপাতের কারণে পায়খানার সাথে এমন গাঢ় রক্ত যেতে পারে, তাই এমনটা হলে রক্তপাতের কারণ জানার জন্য দ্রুত ডাক্তারের শরণাপন্ন হতে হবে।২. পায়ুপথের মুখের অংশগুলো বেরিয়ে আসাপাইল হলে সাধারণত মলত্যাগের পরে অ্যানাল কুশনগুলো নরম গোটার মতো বের হয়ে আসে। এগুলো কিছু সময় পর নিজে নিজেই ভেতরে ঢুকে যায়। অনেকের ক্ষেত্রে এগুলো আঙ্গুল দিয়ে ভেতরে ঢোকানোর প্রয়োজন হতে পারে। আবার কারও কারও ক্ষেত্রে পাইলস এমন পর্যায়ে পৌঁছে যায় যে আঙ্গুল দিয়েও গোটাগুলো ভেতরে ঢোকানো যায় না।৩. পায়খানার রাস্তায় ব্যথা হওয়াপাইলস রোগে সাধারণত তীব্র ব্যথা হয় না। তবে যদি পায়ুপথের গোটা এমন পর্যায়ে চলে যায় যে সেগুলো আঙুল দিয়ে ঠেলেও ভেতরে ঢোকানো না যায়, এবং সেগুলোতে রক্ত চলাচল বন্ধ হয়ে যায়, সেক্ষেত্রে অনেক সময় তীক্ষ্ণ বা তীব্র ব্যথা হতে পারে। এই ব্যথা সাধারণত ১-২ দিন স্থায়ী হয়। ব্যথা বেশি হলে ডাক্তারের পরামর্শ নিতে হবে। এছাড়া বিশেষ প্রয়োজনে ঘরোয়া উপায়ে ব্যথার চিকিৎসা করা যায়।৪. পায়খানার রাস্তায় চুলকানিপাইলস হলে কখনো কখনো পায়ুপথে বা এর মুখের আশেপাশে চুলকানি হতে পারে। এছাড়া পায়ুপথ দিয়ে মিউকাস বা শ্লেষ্মা-জাতীয় পিচ্ছিল ও আঠালো পদার্থ বের হতে পারে। অনেক সময় মলত্যাগ করে ফেলার পরও বারবার মনে হতে পারে যে পেট পরিষ্কার হয় নি, আবার মলত্যাগ করা প্রয়োজন।

ID: 325

Context: পাইলস ও এনাল ফিসার-এর মধ্যে কিভাবে

Question: পাইলস ও এনাল ফিসার-এর মধ্যে কিভাবে পার্থক্য করবেন?

Answer:

পাইলস ও এনাল ফিসার বা গেজ রোগের লক্ষণগুলোর মধ্যে কিছুটা মিল থাকলেও এই দুইটি পৃথক দুইটি রোগ। দুটি রোগেই পায়ুপথে চুলকানি হতে পারে এবং টাটকা লাল রক্ত যেতে পারে। তবে এনাল ফিসারে রক্ত খুব অল্প পরিমাণে যায়। পাইলস এবং এনাল ফিসার এই দুইটির মধ্যে মূল পার্থক্য হচ্ছে—পাইলস হলে পায়ুপথে নরম গোটার মত দেখা দেয়। গোটাগুলো সাধারণত মলত্যাগের পরে বের হয়ে আসে, আবার কিছু সময় পর নিজে নিজেই ভেতরে ঢুকে যায় অথবা আঙ্গুল দিয়ে ভেতরে ঢোকাতে হয়। এছাড়া পাইলস হলে পায়ুপথে শ্লেষ্মার মতো দেখতে পিচ্ছিল কিছু পদার্থ বের হতে পারে।এনাল ফিসার বা গেজ রোগের ক্ষেত্রে সাধারণত এসব লক্ষণ দেখা যায় না। আর এক্ষেত্রে প্রতিবার মলত্যাগের সময়ই তীব্র ব্যথা হয়। পাইলসে সাধারণত ব্যথা হয় না। এনাল ফিসার বা গেজ রোগের সম্পর্কে বিস্তারিত জানতে চাইলে আমাদের আর্টিকেলটি পড়তে পারেন।

ID: 326

Context: পাইলস এর কারণ

Question: পাইলস কেন হয়?

Answer:

কিছু কিছু জিনিস পাইলস এর ঝুঁকি বাড়ায়, সেই সাথে ইতোমধ্যে কারো পাইলস রোগ হয়ে থাকলে তার তীব্রতাও বাড়িয়ে দেয়, যেমন—শক্ত বা কষা পায়খানা

মলত্যাগের সময় জোরে চাপ দেয়া

অনেক সময় ধরে মলত্যাগের কসরত করা

পায়খানার বেগ আটকে রাখা

শারীরিক পরিশ্রম না করা

অতিরিক্ত ওজন এছাড়া গর্ভাবস্থায় নানান শারীরিক পরিবর্তনের কারণেও কারও কারও ক্ষেত্রে পাইলস এর ঝুঁকি বেড়ে যায়।স্বাভাবিক অবস্থায় পায়খানার রাস্তা বা পায়ুপথের মুখ সাধারণত বন্ধ থাকে। যখন প্রয়োজন হয়, তখন চাপ দিয়ে পায়ুপথের মুখ খুলে শরীর থেকে পায়খানা বা মল বের করে দেওয়া হয়।পায়ুপথের মুখ বন্ধ রাখতে সেখানে বেশ কিছু জিনিস একসাথে কাজ করে। তার মধ্যে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ হল অ্যানাল কুশন। এই কুশনগুলো ৩ দিক থেকে চাপ দিয়ে পায়ুপথের মুখ বন্ধ রাখতে সাহায্য করে।যদি কোনো কারণে তিন দিকের এই কুশনগুলো ফুলে যায়, সেগুলো থেকে রক্তক্ষরণ হয়, সেগুলো নিচের দিকে নেমে যায়, অথবা পায়ুপথের চারপাশে গোটার মত দেখা যায়, তখন তাকে পাইলস বা অর্শ রোগ বলা হয়ে থাকে।

ID: 327

Context: পাইলস এর ব্যথা সারানোর উপায়

Question: পাইলস এর ব্যথা সারানোর উপায় কি?

Answer:

পাইলস এর ব্যথা উপশম করতে প্যারাসিটামল ঔষধ খাওয়া যেতে পারে। এই ব্যথায় কার্যকরী অন্যান্য ঔষধ ও মলম পাওয়া যায়, ডাক্তারের পরামর্শ অনুযায়ী সেগুলো ব্যবহার করতে পারেন। ঘরোয়া পদ্ধতিতে অর্শ রোগের ব্যথা কমানোর ৪টি উপায় নিচে তুলে ধরা হলো—১. ব্যথার জায়গাটি কুসুম গরম পানিতে ভিজিয়ে রাখা যায়। ছোট বাচ্চাদের গোসল করানো হয় এমন আকারের একটি বোলে কুসুম গরম পানি নিয়ে সেখানে বসতে পারেন। দিনে ৩ বার পর্যন্ত এটি করা যায়। অন্য সময়ে কোথাও বসতে গেলে একটি বালিশ ব্যবহার করে সেটার ওপর বসা যেতে পারে।২. একটা প্যাকেটে কিছু বরফ নিয়ে সেটা তোয়ালে দিয়ে পেঁচিয়ে পায়ুপথে গোটাগুলোর ওপরে লাগানো যায়। এতে আরাম পাওয়া যাবে।৩. বিছানায় শুয়ে পা উঁচু করে রাখলে পাইলস এর গোটাগুলোতে রক্ত চলাচল সহজ হবে ও ব্যথা উপশম হবে। শোবার সময় পায়ের নিচে বালিশ দিতে পারেন। এছাড়া খাটের পায়ার নিচে কোন কিছু দিয়ে খাটের এক পাশ উঁচু করে সেদিকে পা দেওয়া যেতে পারে।৪. পায়ুপথ সবসময় পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন ও শুকনো রাখতে হবে। মলত্যাগের পর জোরে ঘষাঘষি না করে আলতোভাবে জায়গাটি পরিষ্কার করে নিতে হবে। টয়লেট পেপার হালকা ভিজিয়ে তারপর সেটা দিয়ে মুছতে পারেন।

ID: 328

Context: পাইলস এর ব্যথানাশক ঔষধ

Question: পাইলস যেসব ব্যথানাশক ঔষধ ব্যবহার করা যাবে না?

Answer:

ট্রামাডল: এই ঔষধের একটি পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া হচ্ছে কোষ্ঠকাঠিন্য, তাই অর্শ রোগের জন্য এটি খাওয়া যাবেনা। প্যারাসিটামল ও ট্রামাডল একত্রে আছে এমন ব্যথানাশকও এড়িয়ে চলতে হবে।আইবুপ্রোফেন: এটি রক্তক্ষরণের ঝুঁকি বাড়ায়। তাই আপনার পায়ুপথে ব্যথার সাথে রক্ত গেলে এটি খাওয়া যাবেনা। কখন দ্রুত হাসপাতালে যাবেন?

পাইলস হলে কিছু বিশেষ ক্ষেত্রে দ্রুত ডাক্তারের শরণাপন্ন হওয়া জরুরি। যেমন—

টানা ৭ দিন বাসায় চিকিৎসা নেয়ার পরেও অবস্থার উন্নতি না হলে

বারবার পাইলস এর সমস্যা হলে

৫৫ বছরের বেশি বয়সী কারও প্রথমবারের মত পাইলস এর লক্ষণ দেখা দিলে

পাইলস থেকে পুঁজ বের হলে ।

জ্বর বা কাঁপুনি হলে, অথবা খুব অসুস্থ বোধ হলে ।

অনবরত রক্তক্ষরণ হলে ।

অত্যধিক রক্তপাত হলে (উদাহরণস্বরূপ, যদি কমোডের পানি লাল হয়ে যায় বা পায়ুপথ দিয়ে রক্তের বড় বড় চাকা যায়)

তীব্র, অসহনীয় ব্যথা হলে ,

পায়খানার রঙ কালচে বা আলকাতরার মত কালো মনে হলে ।

ID: 329

Context: পাইলস এর ঘরোয়া চিকিৎসা

Question: পাইলস এর ঘরোয়া চিকিৎসা কি?

Answer:

পাইলস এর চিকিৎসা জন্য পাইলস হওয়ার কারণগুলো প্রতিরোধ করতে হবে। অর্শ রোগ সারানোর ৬টি কার্যকর ঘরোয়া উপায় নিচে তুলে ধরা হলো—১. কোষ্ঠকাঠিন্য থেকে বাঁচতে বেশি বেশি আঁশ বা ফাইবারযুক্ত খাবার খতে হবে। এর মধ্যে রয়েছে শাকসবজি, ফলমূল, ডাল, লাল চাল ও লাল আটার তৈরি খাবার। সেই সাথে প্রচুর পরিমাণে পানি পান করতে হবে। ফাইবার পানি শোষণ করার মাধ্যমে পায়খানা নরম করে, তাই ফাইবারকে কাজ করতে হলে সারাদিনে অন্তত দুই লিটার পানি পান করতে হবে।এই দুটো কাজ করলে সাধারণত কয়েকদিনের মধ্যে কোষ্ঠকাঠিন্য দূর হয়, আর কয়েক সপ্তাহের মধ্যে পাইলস এর সব ধরনের লক্ষণ উপশম হয়। ৬ সপ্তাহ অর্থাৎ দেড় মাস ধরে যদি খাবারে যথেষ্ট পরিমাণ ফাইবার নিশ্চিত করা যায়, তাহলে ৯৫ শতাংশ পাইলস রোগীর পায়খানার সাথে রক্ত যাওয়া কমে আসে। কোষ্ঠকাঠিন্য দূর করতে ইসবগুলের ভুসি একটি কার্যকর ঔষধ।প্রতিদিনের খাবারে ফাইবারের পরিমাণ বাড়ানো নিয়ে বিস্তারিত জানতে নিচের ভিডিওটি দেখতে পারেন।২. মলত্যাগের সময় খুব জোরে চাপ দেয়া থেকে বিরত থাকতে হবে। পায়খানা যাতে নরম হয় এবং সহজেই মলত্যাগ করা যায়, সেই উপদেশগুলো মেনে চলতে হবে।৩. মলত্যাগে প্রয়োজনের অতিরিক্ত সময় ব্যয় করা যাবে না। টয়লেটে বসে ম্যাগাজিন, পেপার, মোবাইল-এসবে মনোনিবেশ করা বাদ দিতে হবে।৪. পায়খানার চাপ আসলে তা আটকে রাখা উচিত না, এতে পায়খানা আরও শক্ত হয়ে কোষ্ঠকাঠিন্য দেখা দেয়। চাপ আসলে দেরি না করে বাথরুমে চলে যেতে হবে।৫. নিয়মিত ব্যায়াম বা শরীরচর্চা করতে হবে। ব্যায়ামের মধ্যে ভারী ব্যায়াম বা প্রতিদিন দৌড়ানো বেছে নিতে হবে, তা নয়। শরীরকে চলমান রাখতে হাঁটাচলা, হালকা স্ট্রেচিং, যোগব্যায়াম ইত্যাদির মধ্যে যেকোনোটাই বেছে নেওয়া যায়। গবেষণায় দেখা গেছে, কোষ্ঠকাঠিন্য কমাতে হাঁটাহাঁটি বা হালকা শরীরচর্চাও কার্যকরী ভূমিকা রাখে।প্রয়োজনে অল্প অল্প করে শুরু করতে পারেন। দিনে ২০ মিনিট হাঁটুন। এক বেলা দিয়ে শুরু করুন, এরপর সকাল-সন্ধ্যা দুই বেলা করে হাঁটুন। প্রথমে সপ্তাহে তিন দিন এভাবে হেঁটে আস্তে আস্তে সেটা পাঁচ দিনে নিয়ে আসুন। ৬. ওজন অতিরিক্ত হলে তা কমিয়ে ফেলতে হবে। ওজন বেশী হলে পাইলস হওয়ার সম্ভাবনা বাড়ে, তাই পাইলস এর রোগীদের ওজন কমানোর পরামর্শ দেয়া হয়। ওজন কমানোর কার্যকর উপায় নিয়ে বিস্তারিত জানতে আমাদের এ সংক্রান্ত আর্টিকেলগুলো পড়তে পারেন।

ID: 330

Context: পাইলস এর অপারেশন

Question: পাইলস এর অপারেশন কখন প্রয়োজন হতে পারে ?

Answer:

ঘরোয়া চিকিৎসার উপদেশ এবং ডাক্তারের ঔষধ সেবনের পরামর্শগুলো সঠিকভাবে মেনে চলার পরেও যদি অর্শ রোগের এর সমাধান না হয়, সেক্ষেত্রে অপারেশনের প্রয়োজন হতে পারে। এ ব্যাপারে আপনার চিকিৎসক আপনাকে পরামর্শ দিবেন। সাধারণত ৩ ধরনের অপারেশন করা হয়ে থাকে—১. হেমোরয়েডেকটোমি: এই অপারেশনের মাধ্যমে পাইলস এর গোটাগুলো কেটে অপসারণ করা হয়। ২. স্টেপলড হেমোরয়েডোপেক্সি: এই পদ্ধতিতে সার্জারির মাধ্যমে পাইলস এর গোটাগুলো পুনরায় পায়ুপথের ভেতরে ঢুকিয়ে দেয়া হয়।৩. হেমোরয়েডাল আর্টারি লাইগেশন: এক্ষেত্রে পাইলস এর গোটাগুলোর রক্ত সরবরাহ অপারেশনের মাধ্যমে বন্ধ করে দেয়া হয়, যাতে গোটাগুলো শুকিয়ে যায়।

ID: 335

Context: পাতলা পায়খানা ও বমি কারন

Question: পাতলা পায়খানা ও বমি কারন কি?

Answer:

ছোট শিশু থেকে শুরু করে প্রাপ্তবয়স্ক মানুষ পর্যন্ত সবাইকেই এই দুটি সমস্যা প্রায়ই ভোগায়। বেশিরভাগ ক্ষেত্রে জীবাণু পেটে ঢোকার কারণে এই সমস্যাগুলো সৃষ্টি হয় আর কয়েকদিনের মাঝেই সেরে উঠে।ছোট শিশু থেকে শুরু করে প্রাপ্তবয়স্ক মানুষ পর্যন্ত সবাইকেই এই দুটি সমস্যা প্রায়ই ভোগায়। বেশিরভাগ ক্ষেত্রে জীবাণু পেটে ঢোকার কারণে এই সমস্যাগুলো সৃষ্টি হয় আর কয়েকদিনের মাঝেই সেরে উঠে।ডায়রিয়া ও বমি একসাথে হলে যে পরামর্শ, শুধু ডায়রিয়া অথবা শুধু বমি হলেও একই পরামর্শ।

ID: 336

Context: ডায়রিয়ার লক্ষণ

Question: ডায়রিয়ার লক্ষণ: ডায়রিয়া হয়েছে কীভাবে বুঝবেন?

Answer:

নরম পায়খানা বা পানির মত পাতলা পায়খানা দিনে তিন বা তার বেশী বার হলে সেটাকে ডায়রিয়া বলে। তবে আপনার যদি কোন কারণে পায়খানা এমনিতেই নরম বা পাতলা হয়, তবে দিনে স্বাভাবিকভাবে যতবার পায়খানা হয়, তার চেয়ে বেশী বার হলে সেটা ডায়রিয়া ধরে নিবেন।যে শিশুরা বুকের দুধ পান করে, তাদের পায়খানা স্বাভাবিকভাবেই কিছুটা নরম আর আঠালো হয়। সেটা ডায়রিয়া নয়।

ID: 337

Context: ডায়রিয়া ও বমির ঘরোয়া চিকিৎসা

Question: ডায়রিয়া ও বমির ঘরোয়া চিকিৎসা কী ?

Answer:

সাধারণত আপনি নিজেই বাসায় বসে নিজের অথবা নিজের শিশুর চিকিৎসা করতে পারেন। এক্ষেত্রে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয়টি হল পানিশূণ্যতা এড়াতে প্রচুর পরিমাণে তরল পানীয় ও খাবার খাওয়া।যা যা করবেন:বাসায় থেকে পর্যাপ্ত পরিমাণে বিশ্রাম নিবেন।

প্রচুর পরিমাণে তরল পানীয় ও খাবার খাবেন, যেমন পানি, খাবার স্যালাইন, চিড়ার পানি, ভাতের মাড়, কিংবা ডাবের পানি। ভাতের মাড়ে সামান্য লবণ দিতে পারেন। বমি ভাব হলে ছোট ছোট চুমুকে খাওয়ার চেষ্টা করবেন।

বাজার থেকে কেনা ফলের জুস, কোমল পানীয়, কফি, চিনি দেয়া চা পরিহার করবেন। কারণ এসব খেলে ডায়রিয়া আরো খারাপ হতে পারে।

যখনই মনে হবে খেতে পারবেন, তখনই খেয়ে নিবেন।

নির্দিষ্ট কোন খাবার খাওয়ার প্রয়োজন নেই। যেমন, এমন ধারণা প্রচলিত আছে যে ডায়রিয়ার রোগী সাদা ভাত আর কাঁচকলা ছাড়া আর কিছুই খেতে পারবে না। এই ধারণা টা সঠিক নয়।

প্রতিবার পাতলা পায়খানার পর ২ বছরের কম বয়সী শিশুদের ৫০-১০০ মিলি তরল পানীয় খাওয়াবেন, ২ থেকে ১০ বছর বয়সী শিশুদের ১০০-২০০ মিলি তরল পানীয় খাওয়াবেন আর ১০ বছরের বেশী বয়সী শিশু এবং বড়দেরকে তরল পানীয় খাওয়াবেন যতটুকু তারা খেতে পারে।

শিশুকে বুকের দুধ বা বোতলের দুধ খাওয়ানো চালিয়ে যাবেন। শিশু বমি করলে অল্প অল্প করে বারবার খাওয়াতে পারেন।

ফর্মুলা বা শক্ত খাবার খাচ্ছে এমন শিশুদের দুই বেলা খাবারের মাঝে ছোট ছোট চুমুকে পানি খাওয়াবেন।

শিশুকে প্রতি তিন-চার ঘণ্টা পর পর খাওয়াবেন। একবারে অনেক বেশী খাবার না দিয়ে বার বার অল্প অল্প করে খাওয়ানো শ্রেয়।

বাচ্চাদের ফর্মুলা যে পরিমাণে নির্দেশনা দেওয়া আছে, সেভাবেই বানিয়ে খাওয়াবেন। তার চেয়ে পাতলা ফর্মুলা বানিয়ে বাচ্চাকে খাওয়াবেন না।

অস্বস্তি বোধ করলে প্যারাসিটামল খেতে পারেন। শিশুকে ওষুধ দেওয়ার আগে ওষুধের সাথে থাকা নির্দেশিকা ভালো মত পড়ে নিবেন আর অবশ্যই বয়স অনুযায়ী সঠিক পরিমাণে ওষুধ খাওয়াবেন।

ডায়রিয়ার প্রকোপ কমাতে এবং তাড়াতাড়ি সারিয়ে তুলতে ডাক্তারের পরামর্শে শিশুকে জিঙ্ক ট্যাবলেট বা সিরাপ খাওয়াতে পারেন। সাধারণত ১০ থেকে ১৪ দিন জিঙ্ক খাওয়ার পরামর্শ দেয়া হয়।

১২ বছরের কম বয়সী শিশুদের ডায়রিয়া বন্ধ করার ওষুধ দিবেন না।

১৬ বছরের কম বয়সী শিশুদের অ্যাসপিরিন (aspirin) আছে এমন ওষুধ দিবেন না। খেয়াল করে দেখবেন ওষুধের নামের নিচে ছোট করে “aspirin” শব্দটি লেখা আছে কি না।ঘরে বসে কীভাবে খাবার স্যালাইন বানাবেন?

১।এক লিটার পানি

২।আধা চা চামচ লবণ

৩।ছয় চা চামচ চিনি (চামচের উপরে চিনি নিয়ে সমান করে নিবেন, যাতে পরিমাপ ঠিক থাকে।)

দোকান থেকে খাবার স্যালাইন কিনলে প্যাকেটের গায়ে লেখা নির্দেশনা অনুযায়ী তৈরি করবেন।

ID: 338

Context: ডায়রিয়া ও বমির সময়

Question: ডায়রিয়া ও বমি কতদিন থাকতে পারে?

Answer:

প্রাপ্তবয়স্ক ও বাচ্চাদের ক্ষেত্রে সাধারণত৫-৭ দিনের মধ্যে ডায়রিয়া বন্ধ হয়ে যায়।

১-২ দিনের মধ্যে বমি বন্ধ হয়ে যায়।

ID: 339

Context: ডায়রিয়া ও বমি ছড়িয়ে পড়া ঠেকাতে করনীয়

Question: অন্যদের মাঝে ডায়রিয়া ও বমি ছড়িয়ে পড়া ঠেকাতে আপনি কী করবেন?

Answer:

বমি বা ডায়রিয়া সেরে যাওয়ার পরে কমপক্ষে দুই দিন বাসায় থাকবেন। স্কুলে বা কর্মক্ষেত্রে ফিরে যাবেন না। নাহলে অন্যদের মাঝেও বমি বা ডায়রিয়া ছড়িয়ে যেতে পারে।ডায়রিয়া ও বমি ছড়িয়ে পড়া ঠেকাতে যা করবেন:বারবার সাবান ও পানি দিয়ে হাত ধুবেন।

পায়খানা কিংবা বমির সংস্পর্শে এসেছে এমন কাপড় বা বিছানার চাদর গরম পানি দিয়ে আলাদাভাবে ধুয়ে ফেলবেন।

পানির কল, দরজার হাতল, টয়লেট সিট, ফ্লাশের হাতল, জীবাণুর সংস্পর্শে আসতে পারে এমন জায়গা প্রতিদিন পরিষ্কার করবেন।অসুস্থ অবস্থায় যা যা করবেন না:যদি সম্ভব হয়, অন্যদের জন্য রান্না করা থেকে বিরত থাকুন।

আপনার থালা-বাসন, ছুরি-চামচ, গামছা-তোয়ালে, জামা-কাপড় কারো সাথে ভাগাভাগি করে ব্যবহার করবেন না।

লক্ষণগুলো চলে যাবার পর ২ সপ্তাহ পার হওয়ার আগে সুইমিং পুলে নামবেন না।

ID: 340

Context: ডায়রিয়া হলে ডাক্তারের পরামর্শ

Question: ডায়রিয়া হলে কখন ডাক্তারের পরামর্শ নিবেন?

Answer:

এক বছরের কম বয়সী শিশুর স্বাস্থ্য নিয়ে আপনি চিন্তিত বোধ করেন

পাঁচ বছরের কম বয়সী শিশুর পানিশূন্যতার লক্ষণ দেখা দেয় – যেমন আগের তুলনায় কাঁথা, ন্যাপি বা ডায়াপার কম ভেজাচ্ছে

শিশু বুকের দুধ, বোতলের দুধ কিংবা ফর্মুলা খাওয়া কমিয়ে দেয়

খাবার স্যালাইন খাওয়ার পরেও যদি আপনার অথবা আপনার ৫ বছরের বেশি বয়সী শিশুর মধ্যে পানিশূন্যতার লক্ষণ থেকে যায়

আপনার অথবা আপনার শিশুর যদি পায়খানার সাথে রক্ত যায় বা পায়খানার রাস্তা দিয়ে রক্ত যায়

যদি ২ দিনের বেশি সময় ধরে বমি বা ৭ দিনের বেশি সময় ধরে ডায়রিয়া থাকেডায়রিয়া হলে কখন দ্রুত হাসপাতালে যাবেন?

জরুরি ভিত্তিতে হাসপাতালে যাবেন যদি আপনার অথবা আপনার শিশুর:

১।বমির সাথে রক্ত আসে অথবা কফি দানার মত কালচে বাদামী রঙের কিছু আসে।

২।সবুজ বা হলুদ (পীত) রঙের বমি হয়।

৩।ঘাড় শক্ত হয়ে যায় আর উজ্জ্বল আলোর দিকে তাকালে চোখে ব্যথা হয়

৪।হঠাৎ করেই প্রচণ্ড মাথাব্যথা বা পেটে ব্যথা। ৫।বারবার বমি হয়, পেটে কিছু রাখতে না পারে

৬।বিষাক্ত কিছু গিলে ফেলে।

খুব অসুস্থ বোধ হয়।

প্রচণ্ড বা তীব্র ব্যথা বলতে আমরা যা বুঝি:

সারাক্ষণ থাকে, এবং এতটাই তীব্র হয় যে কোন কিছু বলা বা চিন্তা করা যায় না

ঘুমানো যায় না

নড়াচাড়া করা, বিছানা থেকে ওঠা, বাথরুমে যাওয়া, হাত মুখ ধোওয়া বা গোসল করা, কাপড় পরা ইত্যাদি কাজ করাও খুব কঠিন হয়ে যায়

মৃদু ব্যথা বলতে আমরা যা বুঝি:

ব্যথা আসা যাওয়া করে

ব্যথাটা বিরক্তিকর তবে আপনার দৈনন্দিন কাজ যেমন অফিসে যাওয়া ইত্যাদিতে ব্যঘাত ঘটায় না।

মাঝারি ব্যথা বলতে আমরা যা বুঝি:

ব্যথা সারাক্ষণ আছে।

কোন কাজে মনোযোগ দিতে কষ্ট ।

ঘুমাতে কষ্ট হয়।

ব্যথা সত্ত্বেও বিছানা থেকে ওঠা, হাত মুখ ধোওয়া বা গোসল করা, কাপড় পরা ইত্যাদি কাজ করা সম্ভব ।

ID: 341

Context: বমি ও ডায়রিয়া হওয়ার কারণ

Question: বমি ও ডায়রিয়া হওয়ার কারণ কী?

Answer:

ঠিক কী কারণে বমি বা ডায়রিয়া হচ্ছে তা হয়তো নাও জানা যেতে পারে, তবে বমি বা ডায়রিয়ার মূল কারণগুলোর চিকিৎসা আসলে একই রকম।সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য কারণগুলো হল:পাকস্থলীতে জীবাণুর আক্রমণ বা গ্যাস্ট্রোএন্টেরাইটিস (gastroenteritis)

নরোভাইরাস (পাশ্চাত্য দেশগুলোতে একে vomiting bug ও বলে)

খাদ্যে বিষক্রিয়া (food poisoning)ডায়রিয়ার অন্যান্য কিছু কারণ হল:বিভিন্ন ওষুধ – যে কোন ওষুধের সাথে দেওয়া নির্দেশিকা পড়ে দেখবেন ওষুধের পার্শ্বপ্রতিক্রিয়াগুলো কী কী

নির্দিষ্ট কোন খাবারে এলার্জি বা বিশেষ কোন খাবার সহ্য না হওয়া

ইরিটেবল বাওয়েল সিনড্রোম বা আইবিএস (Irritable Bowel Syndrome/IBS)

ইনফ্ল্যামেটরি বাওয়েল ডিজিজ বা আইবিডি (Inflammatory Bowel Disease/IBD)

সিলিয়াক ডিজিজ (coeliac disease)

ডাইভার্টিকুলার ডিজিজ (diverticular disease)নিচের কারণগুলোতে বমি হতে পারে:

ID: 342

Context: পিঠ ও কোমর ব্যথা হবার কারণ

Question: পিঠ ও কোমর ব্যথা হবার কারণ কি?

Answer:

পিঠ ও কোমর ব্যথা খুবই পরিচিত সমস্যা। বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই এসব ব্যথার পেছনে কোনো মারাত্মক কারণ থাকে না। এ সমস্যাগুলো সাধারণত আপনা আপনিই সেরে ওঠে। তবে কিছু গুরুতর ক্ষেত্রে সুনির্দিষ্ট চিকিৎসার প্রয়োজন হয়।পিঠ ও কোমর ব্যথা খুবই পরিচিত সমস্যা। বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই এসব ব্যথার পেছনে কোনো মারাত্মক কারণ থাকে না। এ সমস্যাগুলো সাধারণত আপনা আপনিই সেরে ওঠে। তবে কিছু গুরুতর ক্ষেত্রে সুনির্দিষ্ট চিকিৎসার প্রয়োজন হয়।

ID: 343

Context: পিঠ ও কোমর ব্যথা হবার কারণ

Question: পিঠ ও কোমর ব্যথা কেন হয়?

Answer:

লিগামেন্ট হলো সুতার মতো টিস্যু যা বিভিন্ন হাড় ও জয়েন্টের (গিরার) মধ্যে সংযোগ স্থাপন করতে সাহায্য করে। বেশিরভাগ ক্ষেত্রে শরীরের পেশি ও লিগামেন্টে হঠাৎ করে টান অথবা চাপ খেলে কোমর ব্যথা হয়।পিঠ ও কোমর ব্যথার কারণসমূহমেরুদণ্ডের হাড়গুলোর মাঝে কিছু বিশেষ চাকতি বা ডিস্ক থাকে। এসব ডিস্ক সরে গেলে পিঠ ও কোমর ব্যথা হয়। পাশাপাশি কোমর, নিতম্ব ও পায়ে ঝিম ঝিম বা খচখচ্ করা, বোধ কমে যাওয়া ও দুর্বলতার মতো লক্ষণগুলো দেখা দিতে পারে।কখনো কখনো সুনির্দিষ্ট কারণ ছাড়াই ব্যথা হতে পারে। এমনকি মানসিক চাপে থাকলেও এই ধরনের ব্যথা হয়।পিঠ ও কোমর ব্যথার লক্ষণঃ

\*যৌনাঙ্গ অথবা নিতম্বের আশেপাশে, বিশেষ করে পায়খানার রাস্তার চারিদিকে অবশ লাগা কিংবা খোঁচা খোঁচা লাগা।

\*স্বাভাবিক প্রস্রাব-পায়খানার চাপ ধরে রাখতে না পারা।

\*প্রস্রাব করতে সমস্যা হওয়া অথবা প্রস্রাব বন্ধ হয়ে যাও...

\*কোমরের নিচ থেকে দুর্বল হয়ে যাওয়া

\*বুকে ব্যথা।

\*হঠাৎ ওজন কমে যাওয়া (এটি ক্যান্সারের লক্ষণ হতে পারে।

\*জ্বর আসা ।

\*গুরুতর দুর্ঘটনা কবলিত হওয়া। যেমন: সড়ক দুর্ঘটনা।

\*পিঠ অথবা কোমরের কোথাও ফুলে কিংবা বেঁকে যাওয়া।

ID: 344

Context: পিঠ ও কোমর ব্যথার চিকিৎসা

Question: পিঠ ও কোমর ব্যথার চিকিৎসা কি?

Answer:

সাধারণত পিঠ ও কোমর ব্যথা ঘরোয়া চিকিৎসাতেই কয়েক সপ্তাহের মধ্যে ভালো হয়ে যায়। ব্যথা কমানোর ঘরোয়া উপায়ের মধ্যে রয়েছে—

১. দৈনন্দিন কাজ: দুই–তিন দিন বিশ্রাম নেওয়ার পরে দৈনন্দিন কাজে ফিরে যেতে হবে। এতে ব্যথা দ্রুত সেরে ওঠে।

২. শরীরচর্চা: সম্ভব হলে ব্যথা কমে যাওয়ার ২–৩ সপ্তাহ পর প্রতিদিন হালকা ব্যায়াম শুরু করা উচিত। হাঁটা, যোগব্যায়াম বা ইয়োগা ও সাঁতার কাটার মতো ব্যায়ামও করা যেতে পারে। এতে করে পেট, পিঠ ও কোমরের পেশি শক্ত হয় এবং রক্ত সঞ্চালন বাড়ে। ফলে ব্যথা তাড়াতাড়ি সেরে ওঠে।

৩. সেঁক: ঠান্ডা অথবা গরম সেঁক নিলে সাময়িকভাবে আরাম পেতে পারেন। প্রথম দুই–তিনদিন ঠান্ডা সেঁক দিয়ে এরপর গরম সেঁক দেওয়া ভালো।ঠান্ডা সেঁকের জন্য তোয়ালে বা মোটা গামছা দিয়ে বরফ মুড়ে এরপর ব্যথার স্থানে লাগাতে পারেন। ফ্রিজে বরফ না থাকলে ফ্রোজেন সবজির প্যাকেট ব্যবহার করা যায়। গরম সেঁকের জন্য একইভাবে হট ওয়াটার ব্যাগ ব্যবহার করতে পারেন, তবে সেক্ষেত্রে সাবধানতা অবলম্বন করতে হবে।

৪. ব্যথানাশক ঔষধ: প্যারাসিটামল অথবা আইবুপ্রোফেন এর মতো ব্যথানাশক সেবন করতে পারেন। এ ছাড়া ব্যথানাশক জেল ও ক্রিম ব্যবহার করতে পারেন। সেক্ষেত্রে প্যাকেটের ভেতরে থাকা নির্দেশিকা ভালোমতো পড়ে নিতে হবে।উল্লেখ্য, ব্যথানাশক সেবনের আগে সেটি আপনার জন্য নিরাপদ কি না সেই সম্পর্কে নিশ্চিত হয়ে নিন। এই বিষয়ে সন্দেহ থাকলে ডাক্তারের পরামর্শ নিতে হবে।

৫. ম্যাসাজ ও মালিশ: ব্যথার স্থানে হালকা ম্যাসাজ, অর্থাৎ আলতোভাবে মালিশ করলে আরাম লাগতে পারে। তবে জোরে জোরে মালিশ করা থেকে বিরত থাকতে হবে।

৬. ইতিবাচক মনোভাব: মানসিকভাবে দৃঢ় থাকতে হবে। পিঠ ও কোমর ব্যথা হওয়া সত্ত্বেও যারা ইতিবাচক মনোভাব নিয়ে স্বাভাবিক জীবনধারা বজায় রাখে তারা দ্রুত সুস্থ হয়ে ওঠে।ভুল ধারণা: পিঠ অথবা কোমর ব্যথা হলে সম্পূর্ণ বিশ্রাম বা বেড রেস্ট-এ থাকতে হবে।

ব্যথা হলে প্রথম কয়েকদিন বিশ্রাম নিতে পারেন। এরপর ধীরে ধীরে স্বাভাবিক কাজে ফিরে যেতে হবে। দুই–তিন সপ্তাহ পর থেকে আস্তে আস্তে ব্যায়াম শুরু করতে পারেন।

২–১ দিনের বেশি পূর্ণ বিশ্রামে থাকলে ব্যথা আরও বাড়তে পারে। ওপরে উল্লেখকৃত নয়টি বিপদচিহ্নের কোনোটি না থাকলে আপনি যত তাড়াতাড়ি স্বাভাবিক কাজকর্ম শুরু করতে পারবেন, ততই ভালো।

তবে মনে রাখতে হবে, পিঠ ও কোমর ব্যথার ছয় সপ্তাহের মধ্যে ভারী কাজ কিংবা পিঠ ও কোমর বাঁকাতে হয় এমন কাজ করা যাবে না।

ID: 345

Context: পিঠ ও কোমর ব্যথার চিকিৎসা

Question: পিঠ ও কোমর হলে কখন ডাক্তারের পরামর্শ হবে ?

Answer:

অনেকের ক্ষেত্রেই পিঠ ও কোমর ব্যথা এক সপ্তাহের মধ্যেই কমে যায়। সাধারণত চার থেকে ছয় সপ্তাহের মধ্যে ব্যথা পুরোপুরি সেরে যায়।পিঠ ও কোমর ব্যথার জন্য সাধারণত ডাক্তারের কাছে যাওয়ার প্রয়োজন হয় না। তবে নিচের ক্ষেত্রগুলোতে ডাক্তারের পরামর্শ নেওয়া উচিত—ব্যথা শুরু হওয়ার কয়েক সপ্তাহ পরেও কোনো উন্নতি না হলে

ব্যথার কারণে দৈনন্দিন কাজে বাধা সৃষ্টি হলে ।

ব্যথা খুবই তীব্র হলে অথবা দিন দিন বাড়তে থাকলে ।

আগে থেকেই কোনো রোগের কারণে পিঠ অথবা কোমর ব্যথা থাকলে।

ব্যথা নিয়ে বেশি চিন্তিত হলে অথবা মানিয়ে নিতে সমস্যা হলেডাক্তার রোগীর সাথে কথা বলে এবং প্রয়োজনীয় পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে ব্যথার সঠিক কারণ নির্ণয় করবেন। সেই অনুযায়ী তিনি উপযুক্ত চিকিৎসা পদ্ধতি নিয়ে পরামর্শ দিবেন। কিছু ক্ষেত্রে রোগীকে বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকের পরামর্শ নিতে বলা হতে পারে।পিঠ ও কোমর ব্যথায় সবসময় পরীক্ষা-নিরীক্ষার প্রয়োজন হয় না। তবে প্রয়োজনবোধে এক্স-রে, এমআরআই ও সিটি স্ক্যান এর মতো পরীক্ষা করানোর পরামর্শ দেওয়া হতে পারে।ডাক্তার ফিজিওথেরাপি নেওয়ার পরামর্শ দিতে পারে। এ ছাড়া কিছু ফ্রি-হ্যান্ড ব্যায়াম শিখিয়ে দিতে পারে। দ্রুত সুস্থতা লাভের জন্য ডাক্তারের পরামর্শ অনুযায়ী চলা, ব্যায়াম করা এবং নিয়মিত ঔষধ সেবন করা গুরুত্বপূর্ণ।উল্লেখ্য, অল্প সংখ্যক রোগীর ক্ষেত্রেই অপারেশনের কথা বিবেচনা করা হয়। সাধারণত নির্দিষ্ট কিছু রোগের কারণে পিঠ ও কোমর ব্যথা হলে কেবল সেসব ক্ষেত্রেই অপারেশন এর সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। যখন জরুরি ভিত্তিতে ডাক্তারের কাছে যাবেন

কিছু ক্ষেত্রে রোগীকে দেরি না করে ডাক্তারের কাছে নিয়ে যেতে হবে। এগুলো গুরুতর কোনো সমস্যার লক্ষণ হতে পারে এবং ইমারজেন্সি ভিত্তিতে বিশেষ চিকিৎসা শুরু করতে হতে পারে। এসব ক্ষেত্রের মধ্যে রয়েছে—

উপরে উল্লেখিত ৯টি বিপদচিহ্ন থাকা

বিশ্রামের পরেও ব্যথার উন্নতি না হওয়া অথবা রাতে ব্যথা বেড়ে যাওয়া ।

এতটাই তীব্র ব্যথা হওয়া যে ঘুমের সমস্যা ।

হাঁচি, কাশি ও পায়খানা করার সময়ে ব্যথা বেড়ে যাওয়া।

ব্যথার জন্য সাধারণ কাজকর্মে ব্যাঘাত ঘটাতে পারে।

ঘাড় থেকে ব্যথা হওয়া ।

ID: 346

Context: পিঠ ও কোমর ব্যথা প্রতিরোধে করণীয়

Question: পিঠ ও কোমর ব্যথা প্রতিরোধে করণীয় কি?

Answer:

স্বাস্থ্যকর খাদ্যাভ্যাস, সঠিক দেহভঙ্গি ও সুস্থ জীবনধারা মেনে চলার মাধ্যমে সহজেই পিঠে ব্যথা প্রতিরোধ করা যায়।স্বাস্থ্যকর খাদ্যাভ্যাসকিছু খাবার হাড়ের জন্য খুব উপকারী। যেমন: ক্যালসিয়াম, ভিটামিন ডি, ভিটামিন কে ও বিভিন্ন মিনারেল বা খনিজ লবণযুক্ত খাবার। এগুলো পিঠে ব্যথার ঝুঁকি কমায়, তাই এসব পুষ্টি উপাদানযুক্ত খাবার আমাদের খাদ্যতালিকায় নিয়মিত থাকা উচিত। এই ধরনের খাবারের মধ্যে রয়েছে—দুধ ও দুগ্ধজাত খাবার

সবুজ শাক-সবজি

মাছ ও মাছের কাঁটা

বাদাম

ডিম

ডালসঠিক দেহভঙ্গিঅস্বাস্থ্যকর দেহভঙ্গিতে কাজ করলে অথবা বিশ্রাম নিলে অনেক ক্ষেত্রেই পিঠ ও কোমর ব্যথা প্রকট আকার ধারণ করে। তাই—অতিরিক্ত শক্ত অথবা নরম বিছানা পরিহার করে মেরুদন্ডকে সঠিকভাবে সাপোর্ট দেয় এমন বিছানা ব্যবহার করুন। জাজিম ও একটি পাতলা তোষকের বিছানায় ঘুমানোর অভ্যাস গড়ে তুলুন।

উপুড় হয়ে শোয়ার অভ্যাস পরিত্যাগ করুন। বিছানা থেকে ওঠার সময়ে একপাশে কাত হয়ে উঠুন।

দীর্ঘক্ষণ বসে থাকা পরিহার করে মাঝে মাঝে উঠে হাঁটাচলা করুন। দীর্ঘক্ষণ বসে থাকার ফলে কোমরের মাংসপেশিতে চাপ পড়ে, ফলে ব্যথা হয়।

একটানা বসে থাকতে হলে নরম গদি অথবা স্প্রিং যুক্ত চেয়ারের পরিবর্তে কাঠ অথবা প্লাস্টিকের চেয়ার ব্যবহার করুন। কোমরের পেছনে ভাঁজ করা তোয়ালে, চাদর অথবা ছোটো বালিশ ব্যবহার করতে পারেন।

একটানা দাঁড়িয়ে কাজ করবেন না। যদি করতেই হয় তাহলে একটি টুলে এক পা রেখে সেটিকে কিছুক্ষণ বিশ্রাম দিন। এরপর সেই পা সরিয়ে অন্য পা টুলে রাখুন।

কোমর সোজা রেখে চেয়ারে বসুন। কোথাও বসার সময়ে এভাবে বসবেন যেন আপনার হাঁটু কোমরের চেয়ে একটু ওপরের লেভেলে থাকে। প্রয়োজনে ছোটো টুল ব্যবহার করতে পারেন।

পিঠ ও কোমর ব্যথা প্রতিরোধ করতে ১ ইঞ্চি পরিমাণের কম হিলের আরামদায়ক জুতা পরুন। এতে দাঁড়ানোর সময়ে মেরুদণ্ডের ওপর কম চাপ পড়বে।

সতর্কতার সাথে হাঁটাচলা করুন। হাঁটার সময় সতর্কতা না থাকলে পা পিছলে ব্যথা পাওয়ার সম্ভাবনা থাকে।

লম্বা সময় ধরে গাড়ি চালাতে হলে প্রতি ঘন্টায় বিরতি নিয়ে একটু হাঁটুন। সিট যথাসম্ভব পিছিয়ে নিন, যেন সিটে বসতে শরীর ভাঁজ করতে না হয়। গাড়ি থেকে নামার সাথে সাথে ভারী জিনিস তোলা থেকে বিরত থাকুন।

ভারী জিনিস তোলা ও বহন করার সময়ে সতর্কতা অবলম্বন করুন। যেমন—

অন্যের সাহায্য নিয়ে ভালোমতো ধরে ওঠান

পা ফাঁকা করে নিন। এতে ভার বহনে সুবিধা হবে

জিনিস শরীরের যতটা সম্ভব কাছাকাছি রেখে এরপর তুলুন

নিচু হতে কোমর সামনের দিকে না বাঁকিয়ে বরং হাঁটু ভাঁজ করুন

বহন করার সময়ে কিছুটা সামনের দিকে ঝুঁকে বহন করুন। মাঝে মাঝে বিশ্রাম নিয়ে কাজ করুন

কখনও ভারী জিনিস তোলার কিংবা বহন করার সময়ে শরীর বাঁকাবেন নাসুস্থ জীবনধারাসুস্থ জীবনধারা মেনে চলার মাধ্যমে পিঠ ও কোমর ব্যথা প্রতিরোধ করা সম্ভব।

ID: 354

Context: পেট ফাঁপা

Question: পেট ফাঁপা কি?

Answer:

বেশিরভাগ মানুষই কখনো না কখনো পেট টান টান হয়ে থাকা, পেট ফুলে থাকা কিংবা পেটে অস্বস্তি হওয়ার মতো উপসর্গের মুখোমুখি হন। বিশেষ করে একটা লম্বা ছুটি কিংবা উৎসবের পরে অনেকেই এমন অনুভব করে থাকেন। এগুলো পেট ফাঁপার লক্ষণ। এই লক্ষণগুলোর সাথে সাধারণত অনিয়ন্ত্রিত খাওয়াদাওয়ার সম্পর্ক থাকে।বেশিরভাগ মানুষই কখনো না কখনো পেট টান টান হয়ে থাকা, পেট ফুলে থাকা কিংবা পেটে অস্বস্তি হওয়ার মতো উপসর্গের মুখোমুখি হন। বিশেষ করে একটা লম্বা ছুটি কিংবা উৎসবের পরে অনেকেই এমন অনুভব করে থাকেন। এগুলো পেট ফাঁপার লক্ষণ। এই লক্ষণগুলোর সাথে সাধারণত অনিয়ন্ত্রিত খাওয়াদাওয়ার সম্পর্ক থাকে।তবে একটানা পেট ফাঁপার সমস্যা হলে এর পেছনে হজমের কোনো সমস্যা অথবা ব্যক্তির ডায়েট দায়ী থাকতে পারে।

ID: 355

Context: পেট ফাঁপার কারণ

Question: পেট ফাঁপার কারণ কি?

Answer:

প্রায়ই পেট ফাঁপা অনুভব করার কারণগুলোর মধ্যে রয়েছে— পায়খানার রাস্তা দিয়ে অতিরিক্ত বায়ু ত্যাগ করা

কোষ্ঠকাঠিন্য।

বাতাস গিলে ফেলা। খাওয়ার সময়ে কথা বললে এমন হতে পারে ।

নির্দিষ্ট কোনো খাবার সহ্য না হওয়া ।

সিলিয়াক ডিজিজ ।

ইরিটেবল বাওয়েল সিন্ড্রোম দৈনন্দিন অভ্যাসে সহজ কিছু পরিবর্তন এনে পেট ফাঁপা ভাব থেকে মুক্তি পাওয়া সম্ভব। এই উদ্দেশ্যে যেসব খাবার খেলে বেশি বায়ু হয় সেগুলো খাওয়ার পরিমাণ কমিয়ে আনতে হবে। কার্বোনেটেড (বুদবুদ ওঠে এমন) কোমল পানীয়ের বিকল্প বেছে নিতে হবে। সময় নিয়ে বসে খাওয়ার অভ্যাস করতে হবে। পাশাপাশি নিয়মিত ব্যায়াম করার অভ্যাস গড়ে তুলতে হবে।

ID: 356

Context: অতিরিক্ত বায়ু ত্যাগের কারণ

Question: কোন কোন খাবার অতিরিক্ত বায়ু ত্যাগের কারণ হতে পারে?

Answer:

যেসব খাবার খেলে পায়খানার রাস্তা দিয়ে বেশি বায়ু যায় সেগুলো খাওয়ার পরিমাণ কমিয়ে দিতে হবে। এতে পেট ফাঁপা ভাব কমে আসবে। এসব খাবারের মধ্যে রয়েছে— শিম ও অন্যান্য বিন জাতীয় সবজি (Beans)

পেঁয়াজ

ব্রকলি

ফুলকপি

বাঁধাকপি

অঙ্কুরিত সবজি বা স্প্রাউট (Sprouts)এই তালিকার সবজিগুলো খাওয়া কমিয়ে দিলেও দৈনিক পর্যাপ্ত পরিমাণে ফল ও অন্যান্য শাকসবজি খাওয়া নিশ্চিত করতে হবে।দৈনিক কতটুকু ফল ও শাকসবজি খাবেন?শরীর সুস্থ রাখতে এবং বিভিন্ন দীর্ঘমেয়াদী রোগ থেকে বাঁচতে দৈনিক কমপক্ষে পাঁচ পরিবেশন ফলমূল ও শাকসবজি খাওয়া খুব গুরুত্বপূর্ণ। এক্ষেত্রে ৮০ গ্রাম তাজা ফলমূল অথবা শাকসবজিকে এক পরিবেশন ধরা হয়। হিসাবের সুবিধার্থে এক হাতের তালুতে যতটুকু তাজা ফলমূল অথবা শাকসবজি আঁটে সেটিকে এক পরিবেশন ধরা যেতে পারে।

ID: 357

Context: কোষ্ঠকাঠিন্য

Question: কোষ্ঠকাঠিন্য কী ?

Answer:

নিচের তিনটি কাজের মাধ্যমে কোষ্ঠকাঠিন্য প্রতিরোধ করা সম্ভব—খাদ্য তালিকায় বেশি বেশি ফাইবার বা আঁশযুক্ত খাবার রাখা। এমন খাবারের মধ্যে রয়েছে বিভিন্ন ফলমূল, শাক, সবজি, ডাল ও পূর্ণশস্য (যেমন: লাল চাল ও লাল আটা)

পর্যাপ্ত পানি ও অন্যান্য তরল পান করা। এটি ফাইবারের কাজে সহায়তা করে এবং হজমে সাহায্য করে

নিয়মিত ব্যায়াম করা। সপ্তাহে কেবল চারদিন ২০-৩০ মিনিট করে দ্রুত হাঁটলেও পেটের কাজ করার ক্ষমতার উন্নতি হবে। ফলে হজমের প্রক্রিয়াটি সহজ হয়ে আসবে

পায়খানার বেগ আসলে তা চেপে না রাখা। পায়খানার বেগ আসলে তা যদি আটকে রাখা হয়, তাহলে শরীর ক্রমশ সেখান থেকে পানি শুষে নিতে থাকে। পেটের ভেতর পায়খানা জমিয়ে রাখলে সেটা দিন দিন আরও শক্ত হতে থাকে, ফলে কোষ্ঠকাঠিন্য দেখা দেয়।

ID: 358

Context: পেট ফাঁপা ভাব

Question: বাতাস গিলে ফেললে পেট ফাঁপা ভাব হচ্ছে এটি কেন ঘটতে পারে?

Answer:

বাতাস গিলে ফেললে পেট ফাঁপা ভাব হতে পারে। অতিরিক্ত বাতাস গিলে ফেলা প্রতিরোধ করার জন্য কিছু কাজ করা যায়। যেমন—খাওয়ার সময়ে কথা বলা থেকে বিরত থাকা

খাওয়ার সময় মুখ বন্ধ করে চিবিয়ে খাওয়া ।

সোজা হয়ে বসে খাওয়া এবং খাওয়ার সময়ে ঝুঁকে বসা থেকে বিরত থাকা ।

বুদবুদ ওঠা কোমল পানীয় (যেমন: কোক-সেভেন আপ) খাওয়া কমিয়ে দেওয়া ।

চুইংগাম খাওয়া বন্ধ করা ।

ID: 359

Context: খাবার সহ্য না হওয়া কারণ

Question: খাবার সহ্য না হওয়া কারণ কী ?

Answer:

কোনো নির্দিষ্ট খাবার পেটে সহ্য না হলে পেট ফাঁপা ভাব হতে পারে। নিচের তিনটি ক্ষেত্রে এ ধরনের পেট ফাঁপার সমস্যা হতে পারে—যদি পায়খানার পরে পেট পুরোপুরি পরিষ্কার না হয়

যদি কোনো খাবার পেটে গ্যাস আটকে রাখে

যদি কোনো খাবারের প্রতিক্রিয়ায় পেটে অতিরিক্ত গ্যাস তৈরি হয় এসব সমস্যার জন্য দায়ী দুটি প্রধান খাবার হলো—১. গ্লুটেন। এটি গম, রাই, বার্লি ও ক্ষেত্রবিশেষে ওটসে থাকা এক ধরনের প্রোটিন২. দুধ ও দুগ্ধজাত খাবারকোনো নির্দিষ্টই খাবার পেটে সহ্য না হলে যদি খাবারটি খাওয়া কমিয়ে দেওয়া যায় অথবা একেবারেই বাদ দেওয়া যায় তাহলে সবচেয়ে ভালো হয়।কয়েক সপ্তাহের জন্য একটি খাবারের ডায়েরি বানতে পারেন। সেখানে আপনি কী কী খাচ্ছেন ও পান করছেন সেটি লিখে রাখুন। কখন পেট ফাঁপার সমস্যা সবচেয়ে বেশি কষ্ট দিচ্ছে সেটিও লিখে রাখুন। এতে পেটে নির্দিষ্ট কোনো খাবার সহ্য না হলে সেই সম্পর্কে ধারণা পাওয়া যাবে।তবে চিকিৎসকের পরামর্শ ছাড়া দীর্ঘ সময়ের জন্য নির্দিষ্ট ধরনের খাবার খাওয়া বন্ধ করে দিবেন না। যখন ডাক্তারের কাছে যাওয়া গুরুত্বপূর্ণ

সবসময় অথবা অনেকদিন ধরে পেট ফাঁপার সমস্যা হলে সেটি কোনো মারাত্মক রোগ—এমনকি ক্যান্সারের লক্ষণ হতে পারে। এক্ষেত্রে দ্রুত ডাক্তারের পরামর্শ নেওয়া জরুরি। নারীদের ক্ষেত্রে পেট ফাঁপা এবং সবসময় পেট ভরা মনে হওয়া ডিম্বাশয়ের ক্যান্সারের অন্যতম প্রধান লক্ষণ। এসব লক্ষণকে সাধারণ সমস্যা মনে করা হলেও ডিম্বাশয়ের ক্যান্সারে অনেকসময় কেবল এই লক্ষণগুলোই দেখা যায়। তাই নারীদের এ জাতীয় লক্ষণ দেখা দিলে গুরুত্বের সাথে বিবেচনা করতে হবে এবং ডাক্তারের পরামর্শ নিতে হবে।

ID: 360

Context: সিলিয়াক ডিজিজ

Question: সিলিয়াক ডিজিজ কী ?

Answer:

সিলিয়াক ডিজিজ (Coeliac Disease) পরিপাকতন্ত্রের একটি পরিচিত রোগ। এই রোগে গ্লুটেন (Gluten) নামক প্রোটিন হজমে সমস্যা হয়। গ্লুটেনযুক্ত কিছু খাদ্য উপাদানের মধ্যে রয়েছে গম, বার্লি, রাই ও ওটস জাতীয় খাদ্যশস্য।সিলিয়াক ডিজিজ থাকলে গ্লুটেনযুক্ত খাবার খাওয়ার পরে পেট ফাঁপার পাশাপাশি ডায়রিয়া, পেট ব্যথা ও ক্লান্তি বা শারীরিক অবসাদের মতো লক্ষণও দেখা দিতে পারে।সিলিয়াক ডিজিজ আছে সন্দেহ হলে ডাক্তারের পরামর্শ নিতে হবে। সিলিয়াক ডিজিজের কোনো স্থায়ী নিরাময় নেই। তবে রোগটি সনাক্ত হলে খাবারের তালিকা থেকে গ্লুটেনযুক্ত খাবার পুরোপুরি বর্জন করার মাধ্যমে অনেকাংশে উপকার পাওয়া সম্ভব।

ID: 361

Context: ইরিটেবল বাওয়েল সিন্ড্রোম

Question: ইরিটেবল বাওয়েল সিন্ড্রোম কি ?

Answer:

ইরিটেবল বাওয়েল সিন্ড্রোম বা আইবিএস (Irritable Bowel Syndrome—IBS) এর রোগীরা প্রায়ই পেট ফাঁপার সমস্যায় ভোগেন। বিশেষ করে সন্ধ্যার দিকে এই পেট ফাঁপার সমস্যা বেড়ে যায়।

ID: 363

Context: গর্ভাবস্থায় পেট ফাঁপা

Question: গর্ভাবস্থায় পেট ফাঁপা কেন হয়?

Answer:

গর্ভধারণের ফলে আপনার দেহে কিছু বিশেষ হরমোনের পরিমাণ অনেকখানি বেড়ে যায়। এমন একটি হরমোন হলো প্রোজেস্টেরন। এই হরমোনের প্রভাবে খাবার হজমের সাথে জড়িত পেশিগুলো কিছুটা শিথিল হয়ে আসে এবং হজমের গতি কমে যায়।[১] এতে করে আপনার পেটে গ্যাস তৈরি হওয়ার সম্ভাবনা বাড়ে এবং পেট ফাঁপা লাগে। অনেকের ক্ষেত্রে এই হরমোনের প্রভাবে বুক জ্বালাপোড়া ও কোষ্ঠকাঠিন্য দেখা দেয় এবং সেখান থেকে পেট ফাঁপা লাগে।এ ছাড়াও গর্ভের সন্তান বড় হতে থাকলে পরিপাক নালীর ওপর চাপ বাড়তে থাকে। চাপ বাড়ার কারণে হজমের গতি কমে আসতে পারে এবং পেট ফাঁপার সম্ভাবনাও বেড়ে যায়।[২]উল্লেখ্য, স্বাভাবিক অবস্থায় পেট ফাঁপার কারণগুলোও এসময় আপনার পেট ফাঁপা লাগার পেছনে দায়ী থাকতে পারে। যেমন: ঠিকমতো চিবিয়ে চিবিয়ে খাবার না খাওয়া, খাওয়ার সময়ে কথা বলার কারণে পেটে বাতাস ঢোকা এবং যেসব খাবারে গ্যাস হয় সেগুলো খাওয়া।তা ছাড়া আগে থেকেই ইরিটেবল বাওয়েল সিনড্রোম কিংবা সিলিয়াক ডিজিজের মতো হজম-সংক্রান্ত রোগ থাকলে গর্ভাবস্থায় পেট ফাঁপা লাগতে পারে।গ্যাস নাকি প্রসববেদনা?

গর্ভকালের শেষের দিকে পেটের ব্যথা গ্যাস থেকে হচ্ছে না কি প্রসববেদনা শুরু হয়েছে—এ নিয়ে অনেক সময় দ্বিধা তৈরি হতে পারে। দুইয়ের মধ্যে পার্থক্য করার সহজ উপায় হলো ব্যথার সময়কাল লক্ষ করা।

যদি ব্যথা অনিয়মিতভাবে যেকোনো সময় হয় এবং একটানা অনেকক্ষণ থাকে তাহলে সেটা পেট ফাঁপার ব্যথা। অপরদিকে প্রসববেদনা কিছু সময়ের জন্য হয়ে চলে যাবে এবং নিয়মিত সময় পর পর ব্যথা হবে।

ব্যথার ধরন লক্ষ্য করলেও একটা ধারণা পাওয়া যায়। পেট ফাঁপার ব্যথা হবে বদহজমের অনুভূতির মতো আর প্রসববেদনা মাসিকের ব্যথার মতো।

ID: 364

Context: গর্ভাবস্থায় পেট ফাঁপা কমানোর উপায়

Question: গর্ভাবস্থায় পেট ফাঁপা কমানোর উপায় কি?

Answer:

গর্ভকালীন সময়ে অল্প মাত্রায় পেট ফেঁপে যাওয়া সাধারণত বড় রকমের কোনো সমস্যা সৃষ্টি করে না। তবে এটা কমানোর জন্য বেশ কিছু উপায় অবলম্বন করা যেতে পারে—১. কোষ্ঠকাঠিন্য দূর করতে পানি ও আঁশযুক্ত খাবার খাওয়াগর্ভাবস্থায় অনেকেই কোষ্ঠকাঠিন্যে ভোগে। কোষ্ঠকাঠিন্য গর্ভাবস্থায় পেটে গ্যাস জমার অন্যতম কারণ।[৩] কোষ্ঠকাঠিন্য হলে পরিপাক নালীতে গ্যাস জমে পেট ফেঁপে যেতে পারে।কোষ্ঠকাঠিন্য দূর করতে প্রচুর পানি পান করা এবং আঁশযুক্ত খাবার খাওয়া খুব গুরুত্বপূর্ণ।একজন সুস্থ নারীর গর্ভাবস্থায় দৈনিক গড়ে ২–৩ লিটার বা ৮–১২ গ্লাস পানি পান করা উচিত। বোতল অথবা স্ট্র দিয়ে পানি না খেয়ে কাপ অথবা গ্লাস দিয়ে পানি পান করবেন। কারণ বোতল অথবা স্ট্র দিয়ে পেটে বেশি বাতাস ঢোকার সম্ভাবনা রয়েছে। পেটে বেশি বেশি বাতাস ঢোকার ফলেও পেট ফাঁপা হয়ে থাকে।আঁশযুক্ত খাবার খেলে আপনি কোষ্ঠকাঠিন্য হওয়ার সম্ভাবনা কমিয়ে আনতে পারবেন। এসব খাবারের মধ্যে রয়েছে সবুজ শাক-সবজি, মিষ্টিকুমড়া, গাজর, কলা ও আঙুর।খাবারের তালিকায় ফাইবারের পরিমাণ আস্তে আস্তে বাড়াবেন। একেবারে অনেক বেশি আঁশযুক্ত খাবার খাবেন না। কারণ আঁশযুক্ত খাবার হজম হতে একটু বেশি সময় লাগে। খাবার বেশি সময় ধরে পরিপাক নালীতে থাকলে পেট ফাঁপার সমস্যা হতে পারে।আঁশযুক্ত খাবার খাওয়ার পাশাপাশি দিনে অন্তত ২ লিটার পানি পান করা খুব গুরুত্বপূর্ণ।বিশেষ তথ্য

গর্ভকালীন সময়ে কিছু বাড়তি ভিটামিন ও মিনারেল (যেমন: আয়রন) খাওয়ার কারণেও কোষ্ঠকাঠিন্য হতে পারে। তবে এজন্য আয়রন ট্যাবলেট সেবন বাদ দেওয়া যাবে না। বরং আয়রন ট্যাবলেট সেবনের পাশাপাশি কোষ্ঠকাঠিন্য সমাধানে প্রচুর পরিমাণে পানি ও শাকসবজি খাওয়ার চেষ্টা করবেন৷ প্রয়োজনে ডাক্তারের পরামর্শ নেবেন।২. যেসব খাবারে গ্যাস হয় সেগুলো এড়িয়ে চলাযেসব খাবারে আপনার গ্যাস হওয়ার প্রবণতা রয়েছে সেগুলো এই সময়ে না খাওয়াই উত্তম। একেকজনের ক্ষেত্রে একেক ধরনের খাবার খাওয়ার পরে পেটে গ্যাস হতে পারে। তাই আপনার কোন খাবারে পেট ফেঁপে যাচ্ছে সেটি নিবিড়ভাবে লক্ষ করে সেগুলো এড়িয়ে চলার চেষ্টা করুন।কিছু খাবার তুলনামূলকভাবে বেশি গ্যাস তৈরি করে। এই তালিকায় রয়েছে—আপেল

নাশপাতি

আম

পেঁয়াজ

ফুলকপি, বাঁধাকপি ও ব্রকলি

বিভিন্ন ধরনের ডাল

শিম, মটরশুঁটি

চা-কফি

ঝাল-মসলাযুক্ত খাবার

গোটা শস্যজাত ও গমজাত খাবার

তেল-চর্বিযুক্ত খাবার যা হজম হতে বেশি সময় লাগে

সরবিটল অথবা ম্যানিটল (চিনির বিকল্পে ব্যবহৃত কৃত্রিম মিষ্টি, অর্থাৎ আর্টিফিশিয়াল সুইটেনার)

সফট ড্রিংক। যেমন: পেপসি, ফানটা ও কোকাকোলাআপনার যদি গর্ভধারণের আগে থেকেই দুধ পান করার কারণে পেট ফাঁপাসহ হজম সংক্রান্ত সমস্যা দেখা দেয়, তাহলে গর্ভাবস্থায় দুধ পানের পরিমাণ বাড়িয়ে দিলে সমস্যাগুলোও বেড়ে যেতে পারে।[৪]৩. পেটে বাতাস ঢোকা কমাতে ধীরে-সুস্থে খাওয়াখুব দ্রুত খাবার খেলে খাবারের সাথে বেশি পরিমাণে বাতাস পেটে চলে যায়। সেই সাথে খাবার ঠিকমতো না চিবিয়ে গিলে ফেললে তা হজম হতে বেশি সময় নেয় এবং গ্যাসও বেশি তৈরি করে। এজন্য—ধীরে-সুস্থে খান: এতে খাবারের সাথে বাতাস গিলে ফেলার পরিমাণ কমে আসে এবং পেটে বাতাস জমে পেট ফাঁপা হওয়ার সম্ভাবনাও কিছুটা কমে যায়। পানি পান করার সময়েও অল্প করে পানি মুখে নিয়ে ঢোক গিলবেন। একনাগাড়ে ঢকঢক করে পানি খাবেন না।মুখ বন্ধ করে খান: খাবার খাওয়ার সময়ে মুখ বন্ধ করে ভালো মতো চিবিয়ে খাবেন। এতে করে বাতাস গিলে ফেলার সম্ভাবনাও কমবে এবং হজমেও উপকার হতে পারে। এ ছাড়া খাবার খাওয়ার সময়ে কথা বলা থেকে বিরত থাকলেও খাবারের সাথে বাতাস গিলে ফেলার পরিমাণ কমাতে পারবেন।ধূমপান এড়িয়ে চলুন: ধূমপান করা এবং চুইংগাম চিবানোর সময়েও পেটে বেশি বাতাস ঢোকার সম্ভাবনা থাকে। তাই এগুলো থেকে বিরত থাকার চেষ্টা করুন। এ ছাড়া ধূমপান করলে গর্ভাবস্থায় নানান জটিলতার সম্ভাবনাও বাড়ে।৪. শরীর সচল রেখে হজমে সহায়তা করাব্যায়ামের মাধ্যমে শরীরকে সচল রাখা হলে হজম প্রক্রিয়া সহজ হয়। এতে পেট ফাঁপা কমে আসে এবং যতটুকু বায়ু স্বাভাবিকভাবে তৈরি হয় তা জমে না থেকে বের হয়ে যায়।[৫] গর্ভাবস্থায় প্রতিদিন অল্প সময়ের জন্য হাঁটা একটি মানানসই হালকা ব্যায়াম হতে পারে।পাশাপাশি খাওয়া শেষ হওয়ার সাথে সাথে বিছানায় শুয়ে না পড়ে অল্প কিছুক্ষণ হাঁটার অভ্যাস করার চেষ্টা করতে পারেন।৫. একেবারে বেশি না খেয়ে অল্প অল্প করে খাওয়াআমরা সাধারণত সারাদিনে তিন বেলা খাবার খেয়ে থাকি। তাই অনেকসময় একবারে বেশি খেয়ে ফেলার প্রবণতা দেখা যায়। এটি এড়াতে সারাদিনের খাবারকে অল্প অল্প করে ছয়টি ভাগে ভাগ করে নিতে পারেন।উল্লেখ্য, এক বার খাওয়ার পর থেকে পরবর্তী খাবার খাওয়ার সময়ের ব্যবধান যেন খুব বেশি না হয়—সেদিকে খেয়াল রাখতে হবে। চাইলে তিন বেলা পরিমিত পরিমাণে খাওয়ার পাশাপাশি কয়েকবার হালকা নাস্তা খাওয়া যেতে পারে। নাস্তা হিসেবে শসা, টমেটো অথবা একটি ফল বেছে নিতে পারেন।এ ছাড়া রাতের খাবার একটু আগে আগেই খেয়ে নিবেন। রাতে খাওয়ার কমপক্ষে তিন ঘন্টা পরে ঘুমাতে যাওয়ার চেষ্টা করবেন। এটি পেট ফাঁপাসহ হজমের সমস্যাগুলো কমাতে সাহায্য করতে পারে।৬. দুশ্চিন্তামুক্ত থাকাবিভিন্ন দুশ্চিন্তা নিয়ে খাবার খাওয়ার সময়ে অস্থিরতা সৃষ্টি হতে পারে। যার ফলে দ্রুত খাবার খেতে যেয়ে অতিরিক্ত বাতাস খাবারের সাথে পেটে চলে গিয়ে পেট ফাঁপার সমস্যা দেখা দিতে পারে।

ID: 365

Context: গর্ভাবস্থায় পেট ফাঁপার ঔষধ

Question: গর্ভাবস্থায় পেট ফাঁপার ঔষধ কি?

Answer:

সাধারণত ঘরোয়া উপদেশগুলো সঠিকভাবে মেনে চললে পেট ফাঁপার সমস্যা অনেকটা নিয়ন্ত্রণে চলে আসে। তবে এর পরেও পেট ফাঁপা না কমলে এই লক্ষণ উপশমের ঔষধ খেতে পারেন।গর্ভাবস্থায় প্রোজেস্টেরন হরমোনের প্রভাবে হজম প্রক্রিয়ায় পরিবর্তন আসে। মূলত একারণেই পেট ফাঁপা হয়। তাই হজমের সমস্যা হলে অ্যান্টাসিড অথবা অ্যালজিনেট জাতীয় ঔষধ খেতে পারেন।যদি অ্যান্টাসিড সেবনের পরেও লক্ষণের কোনো উন্নতি না হয়, তাহলে এগুলোর পরিবর্তে ওমিপ্রাজল খেয়ে দেখতে পারেন।

যদি মনে হয় পেট ফাঁপার সমস্যা হয়তো হজম-সংক্রান্ত নয়, তাহলে সিমেথিকোন নামের একটি ঔষধ খেতে পারেন। এটি পেট ফাঁপা উপশমে সাহায্য করতে পারে।আয়রন ট্যাবলেট ও অ্যান্টাসিড একই সময়ে খাবেন না। এতে আয়রনের কার্যকারিতা কমে যায়। অ্যান্টাসিড খাওয়ার অন্তত ১ ঘণ্টা আগে অথবা ২ ঘণ্টা পরে আয়রন ট্যাবলেট খাবেন।উল্লেখ্য, অ্যান্টাসিড, অ্যালজিনেট, ওমিপ্রাজল ও সিমেথিকোন—এগুলো সবই ‘ওভার দা কাউন্টার’ ঔষধ। ওভার দা কাউন্টার ঔষধগুলো ফার্মেসি থেকে কিনে সাথে থাকা নির্দেশিকা অনুযায়ী সেবন করা নিরাপদ। এই বিষয়ে আপনার কোনো প্রশ্ন থাকলে ডাক্তারের সাথে কথা বলে নিন।গর্ভাবস্থায় পেট ফাঁপার যেসব ঔষধ এড়িয়ে চলতে হবে: বিসমাথ সাবস্যালিসাইলেট, বাইকার্বনেট অফ সোডা, অ্যাসপিরিন, অ্যাক্টিভেটেড চারকোল, এনেমা ও ক্যাস্টর তেল। এই ঔষধগুলো গর্ভের শিশুর জন্য ঝুঁকিপূর্ণ হতে পারে। তাই এগুলো গর্ভাবস্থায় এড়িয়ে চলার পরামর্শ দেওয়া হয়।[১২]কখন ডাক্তারের পরামর্শ নিতে হবে

যদি পেট ফাঁপার সমস্যা ধীরে ধীরে পেট ব্যথা, পেটে টান ধরা বা খিল ধরার রূপ নেয় তখন ডাক্তারের পরামর্শ নেওয়া উচিত। কারণ এরকম ব্যথা গর্ভকালের শুরুতে বদহজম, ইনফেকশন অথবা খাদ্যে বিষক্রিয়া থেকে হতে পারে। এমনকি গর্ভকালের শেষের দিকে প্রি-এক্লাম্পশিয়া নামক মারাত্মক স্বাস্থ্য জটিলতা থেকেও হতে পারে।

আবার আপনার পেটে অস্বস্তি ভাবের কারণ আদৌ পেট ফাঁপা না কি অন্য কিছু—এই নিয়ে মনে সন্দেহ থাকলে নিজে নিজে কোনো পদক্ষেপ নেওয়ার চেয়ে ডাক্তারের পরামর্শ নেওয়াই শ্রেয়।

ID: 366

Context: পেট ব্যথার কারণ

Question: পেট ব্যথার কারণ কি?

Answer:

বেশিরভাগ সময়েই পেট ব্যথা কোন গুরুতর রোগের কারণে হয় না। কয়েকদিনের মাঝেই সেরে যায়। আমাদের যে বিভিন্ন রকমের পেট ব্যথা হয় এবং সেগুলোর সম্ভাব্য কারণ এই আর্টিকেলে আলোচনা করা হয়েছে। তবে নিজেই নিজের রোগ নির্ণয় করার চেষ্টা করবেন না। ব্যথা নিয়ে চিন্তিত হলে অবশ্যই একজন ডাক্তারের শরনাপন্ন হবেন। আর যে ১১টি সময়ে আপনাকে দ্রুত হাসপাতালে যেতে হবে, সেগুলো অবশ্যই জেনে নিবেন।বেশিরভাগ সময়েই পেট ব্যথা কোন গুরুতর রোগের কারণে হয় না। কয়েকদিনের মাঝেই সেরে যায়। আমাদের যে বিভিন্ন রকমের পেট ব্যথা হয় এবং সেগুলোর সম্ভাব্য কারণ এই আর্টিকেলে আলোচনা করা হয়েছে। তবে নিজেই নিজের রোগ নির্ণয় করার চেষ্টা করবেন না। ব্যথা নিয়ে চিন্তিত হলে অবশ্যই একজন ডাক্তারের শরনাপন্ন হবেন। আর যে ১১টি সময়ে আপনাকে দ্রুত হাসপাতালে যেতে হবে, সেগুলো অবশ্যই জেনে নিবেন।

ID: 367

Context: পেট ব্যথার কারণ

Question: পেট ব্যথা কেন হয়?

Answer:

পেট ব্যথার ধরন সম্ভাব্য কারণ

পেট ফাঁপা বোধ করা ও অতিরিক্ত বায়ু ত্যাগ করা আটকে থাকা বায়ু ।

খাওয়ার পর পেট ভরা ভরা বা ফেঁপে আছে এমন মনে হওয়া, বুক জ্বালাপোড়া করা এবং বমি বমি লাগা বদহজম

পায়খানা না হওয়া কোষ্ঠকাঠিন্য ।

পানির মত তরল পায়খানা হওয়া, বমি বমি বোধ করা, বমি হওয়া ডায়রিয়া অথবা ফুড পয়জনিং ।

ID: 368

Context: পেট ব্যথার কারণ

Question: আর কী কী কারণে পেট ব্যথা হয়?

Answer:

পেট ব্যথার ধরন সম্ভাব্য কারণ

পেটের নীচের অংশে ডান দিকে হঠাৎ ব্যথা শুরু হওয়া অ্যাপেন্ডিসাইটিস

পেট কামড়ানো, পেট ফেঁপে ওঠা, পাতলা পায়খানা, কোষ্ঠকাঠিন্য হওয়া ইরিটেবল বাওয়েল সিন্ড্রোম বা আইবিএস

পেট বা পিঠের একপাশে তীব্র ব্যথা হওয়া যা কুঁচকি পর্যন্ত নেমে আসে, বমি বমি ভাব হওয়া, প্রস্রাব করার সময় ব্যথা অনুভব করা কিডনিতে পাথর

পেটের মাঝামাঝি অংশে বা পাঁজরের ডান পাশের ঠিক নীচে কয়েক ঘন্টা ধরে প্রচণ্ড ব্যথা হওয়া পিত্তথলিতে পাথর

পেটের মাঝামাঝি অংশে হঠাৎ তীব্র ব্যথা হওয়া, বমি ভাব বা বমি হওয়া, গায়ে জ্বর আসা প্যানক্রিয়াটাইটিস

মাসিকের সময় পেটে ব্যথা হওয়া বা কামড়ানো মাসিকের ব্যথা

ID: 369

Context: পেট ব্যথার চিকিৎসা

Question: পেট ব্যথা হলে কখন ডাক্তারের সহায়তা নিবেন?

Answer:

বারবার পেট ব্যথা অথবা পেট ফেঁপে ওঠার সমস্যা হতে থাকে

পেট ব্যথা বা পেট ফাঁপা দীর্ঘ সময় ধরে থাকে এবং সহজে সারতে চায় না

পেট ব্যথার পাশাপাশি খাবার গিলতে সমস্যা হয়, খাবার গলায় আটকে যায়

কোন কারণ ছাড়াই শরীরের ওজন কমতে থাকে

ঘন ঘন বমি হয়

পেটে চাকার মত মনে হয়

আয়রনের অভাবজনিত রক্তশূন্যতায় ভোগেন

হঠাৎ করেই আপনার প্রস্রাব স্বাভাবিকের চেয়ে কম বা বেশী বার হয়

প্রস্রাব করার সময় আপনি ব্যথা অনুভব করেন

পায়খানার রাস্তা অথবা যোনিপথ তথা মাসিকের রাস্তা দিয়ে রক্ত যায়, অথবা মাসিকের রাস্তা দিয়ে এমন স্রাব যায় যা অস্বাভাবিক

ডায়রিয়া কিছুদিনের মধ্যে সেরে না ওঠেডাক্তারকে যেসব বিষয় নিয়ে জিজ্ঞেস করতে পারেন, সেগুলো হল:পেট ব্যথা হওয়ার সম্ভাব্য কারণ

কী করলে ব্যথা কমতে পারে

কোষ্ঠকাঠিন্য ও বদহজমের জন্য কোন ওষুধ খাওয়া যেতে পারে

ID: 370

Context: পেটের আলসার

Question: পেটের আলসার কী?

Answer:

পাকস্থলীর আলসার বা গ্যাসট্রিক আলসার হলো পাকস্থলীর ভেতরের আস্তরণে হওয়া এক ধরনের ঘা বা ক্ষত। এ ধরনের আলসার পাকস্থলী ছাড়াও পরিপাকতন্ত্রের অন্যান্য জায়গায় হতে পারে। যেমন: পাকস্থলীর পর থেকে শুরু হওয়া অন্ত্রের প্রথম অংশে এমন ঘা হয়, যাকে বলা হয় ডিওডেনাল আলসার। ডিওডেনাল আলসার ও পাকস্থলীর আলসার—এই দুই প্রকার আলসারকে অনেক সময় পেপটিক আলসারও বলা হয়।পাকস্থলীর আলসার বা গ্যাসট্রিক আলসার হলো পাকস্থলীর ভেতরের আস্তরণে হওয়া এক ধরনের ঘা বা ক্ষত। এ ধরনের আলসার পাকস্থলী ছাড়াও পরিপাকতন্ত্রের অন্যান্য জায়গায় হতে পারে। যেমন: পাকস্থলীর পর থেকে শুরু হওয়া অন্ত্রের প্রথম অংশে এমন ঘা হয়, যাকে বলা হয় ডিওডেনাল আলসার। ডিওডেনাল আলসার ও পাকস্থলীর আলসার—এই দুই প্রকার আলসারকে অনেক সময় পেপটিক আলসারও বলা হয়।এখানে মূলত পেটের আলসার নিয়ে কথা বলা হলেও, তথ্যগুলো ডিওডেনাল আলসারের জন্য সমানভাবে কার্যকর।

ID: 371

Context: পেটের আলসার এর লক্ষণ

Question: পেটের আলসার হলে কী কী লক্ষণ দেখা দেয়?

Answer:

পাকস্থলীর আলসারের সবচেয়ে কমন লক্ষণ হলো বিশেষ এক ধরনের ব্যথা। পেটের আলসারে পেটের মাঝ বরাবর জ্বালাপোড়া করতে থাকে বা সারাক্ষণ ভোঁতা এক ধরনের ব্যথা হতে থাকে। তবে সবার ক্ষেত্রেই যে ব্যথা থাকে তা নয়। কারও কারও ক্ষেত্রে অন্যান্য লক্ষণও থাকতে পারে। যেমন—বদহজম

বুক জ্বালাপোড়া করা ।

বমি বমি ভাবপড়ুন: গ্যাসট্রিক আলসারের লক্ষণ কি ।

ID: 372

Context: পেটের আলসার হলে চিকিৎসা

Question: পেটের আলসার হলে কখন ডাক্তারের পরামর্শ নিতে হবে?

Answer:

আপনার যদি পাকস্থলীর আলসারের কোনো লক্ষণ আছে বলে মনে হয় তবে ডাক্তার দেখিয়ে নিশ্চিত হয়ে নিন। এছাড়া নিচের যেকোনো লক্ষণ দেখা দিলে জরুরি ভিত্তিতে ডাক্তারের শরণাপন্ন হোন—রক্তবমি হলে। বমির সাথে উজ্জ্বল লাল রঙের রক্ত যেতে পারে। অথবা খয়েরী রঙের চাকাচাকা বা দানাদার রক্ত মিশ্রিত থাকতে পারে, যা দেখতে অনেকটা কফির দানার মতো।

কালো, আঠালো, আলকাতরার মতো পায়খানা হলে।

পেটে হঠাৎ করে তীব্র ও তীক্ষ্ণ ব্যথা হলে, যা সময়ের সাথে ক্রমশ বাড়তে থাকে। এসব লক্ষণ শরীরের অভ্যন্তরীণ রক্তক্ষরণ (Internal Bleeding) এর মতো কোনো মারাত্মক জটিলতার কারণে দেখা দিতে পারে। তাই দেরি না করে দ্রুত হাসপাতালে গিয়ে চিকিৎসা শুরু করা প্রয়োজন। গ্যাসট্রিক আলসার রোগ নির্ণয় করার উপায় ।

ID: 373

Context: পেটের আলসার এর কারণ

Question: পেটের আলসার কেন হয়?

Answer:

পাকস্থলীর আস্তরণকে পেটের ভেতরে তৈরি হওয়া এসিডের সংস্পর্শ থেকে রক্ষা করার জন্য এদের মাঝে একটি প্রলেপ থাকে। প্রলেপটি মূলত মিউকাস নামের শ্লেষ্মার মতো পদার্থ দিয়ে তৈরি একটি স্তর। কোনো কারণে এই স্তরটি ক্ষতিগ্রস্ত হলে এসিড সরাসরি পাকস্থলীর আস্তরণের সংস্পর্শে এসে একে ক্ষতিগ্রস্ত করে। এভাবে পেটের আলসার তৈরি হয়।প্রলেপটি ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ার কারণের মধ্যে রয়েছে— হেলিকোব্যাকটার পাইলোরি (H. pylori) নামক ব্যাকটেরিয়ার সংক্রমণ

আইবুপ্রোফেন, ন্যাপ্রক্সেন, এসিক্লোফেনাক বা অ্যাসপিরিনের মতো নন স্টেরয়ডাল অ্যান্টি ইনফ্ল্যামেটরি ড্রাগস বা NSAIDs গ্রুপের ঔষধ বহুদিন ধরে বা উচ্চ ডোজে সেবন আগে ধারণা করা হতো যে মানসিক চাপ থেকে কিংবা নির্দিষ্ট কিছু খাবার খাওয়ার ফলে পাকস্থলীতে আলসার হয়ে থাকে। কিন্তু এগুলোর পক্ষে কোনো অকাট্য প্রমাণ মেলেনি। পড়ুন: গ্যাসট্রিক আলসারের কারণ

ID: 374

Context: পেটের আলসার এর কারণ

Question: পেটের আলসার কাদের হয়?

Answer:

পেটের আলসার বেশ কমন একটি রোগ, যা শিশু থেকে শুরু করে যেকোনো বয়সের মানুষেরই পারে। সাধারণত ৬০ বছর বা তদূর্ধ্ব বয়সীদের ক্ষেত্রে রোগটি বেশি দেখা যায়। নারীদের চেয়ে পুরুষেরা সাধারণত পাকস্থলীর আলসারে বেশি আক্রান্ত হয়।

ID: 375

Context: পেটের আলসারের চিকিৎসা

Question: পেটের আলসারের চিকিৎসা কি?

Answer:

সঠিক চিকিৎসা পেলে অধিকাংশ পেটের আলসারই এক থেকে দুই মাসের মধ্যে সম্পূর্ণ সেরে ওঠে। কোন রোগীকে কী চিকিৎসা দেওয়া হবে তা সাধারণত নির্ভর করে কী কারণে আলসার হয়েছে তার ওপর। পাকস্থলীর আলসারের চিকিৎসায় সাধারণত নিচের পদ্ধতিগুলো ব্যবহার করা হয়—১. বেশিরভাগ মানুষের চিকিৎসায় প্রথমে প্রোটন পাম্প ইনহিবিটর (PPI) গ্রুপের ঔষধ সেবনের পরামর্শ দেওয়া হয়। এগুলোকে আমরা সাধারণত গ্যাস্ট্রিকের ঔষধ হিসেবে চিনি। PPI পাকস্থলী হতে গ্যাস্ট্রিক এসিডের নিঃসরণ কমিয়ে দেয়, ফলে আলসার বা ক্ষতস্থানটি নিজে নিজে সেরে ওঠে।২. হেলিকোব্যাকটার পাইলোরি (H. pylori) ব্যাকটেরিয়া দ্বারা ইনফেকশনের কারণে আলসার হয়ে থাকলে PPI এর পাশাপাশি অ্যান্টিবায়োটিক সেবনের পরামর্শ দেয়া হয়। অ্যান্টিবায়োটিক এই ব্যাকটেরিয়াগুলোকে মেরে ফেলার মাধ্যমে বার বার আলসার হওয়া প্রতিরোধ করে।৩. নন স্টেরয়ডাল অ্যান্টি-ইনফ্ল্যামেটরি ড্রাগস বা NSAIDs গ্রুপের ঔষধ সেবনের ফলে আলসার হলে সেক্ষেত্রেও PPI সেবন করতে হয়। সেই সাথে আপনি NSAIDs জাতীয় ঔষধ সেবন চালিয়ে যাবেন কি না সেই বিষয়েও ডাক্তার আপনার সাথে কথা বলে সিদ্ধান্ত নিবেন। প্রয়োজনে এসব ঔষধের পরিবর্তে প্যারাসিটামলের মতো ঔষধ সেবনের পরামর্শ দেওয়া হতে পারে।চিকিৎসা নিয়ে সেরে ওঠার পরেও পাকস্থলীতে আবার আলসার হতে পারে। তবে যে কারণে আলসার হয়েছিলো তা নির্মূল করা সম্ভব হলে সাধারণত পরবর্তীতে আলসারের সমস্যা আর ফিরে আসে না।পড়ুন: গ্যাসট্রিক আলসারের চিকিৎসা ।

ID: 376

Context: পেটের আলসারের সম্ভাব্য জটিলতা

Question: পেটের আলসারের সম্ভাব্য জটিলতা কি কি হতে পারে?

Answer:

পাকস্থলীর আলসারে সাধারণত বিশেষ জটিলতা দেখা যায় না। তবে কিছু ক্ষেত্রে এসব জটিলতা মারাত্মক রূপ ধারণ করতে পারে। এই জটিলতাগুলো এতটা গুরুতর যে, এগুলো থেকে মৃত্যু পর্যন্ত হতে পারে।পেটের আলসারের প্রধান জটিলতাগুলোর মধ্যে রয়েছে—আলসার বা ক্ষতস্থান থেকে রক্তক্ষরণ হওয়া

আলসারের জায়গাটিতে পাকস্থলীর আস্তরণ ফুটো হয়ে যাওয়া—একে ডাক্তারি ভাষায় পারফোরেশন (Perforation) বলে

আলসারের কারণে পরিপাকনালীর ভেতর দিয়ে খাবারের চলাচল বন্ধ হয়ে যাওয়া—একে বলা হয় গ্যাস্ট্রিক অবস্ট্রাকশন

ID: 384

Context: ফুড পয়জনিং বা খাদ্যে বিষক্রিয়া

Question: ফুড পয়জনিং বা খাদ্যে বিষক্রিয়া কি?

Answer:

ফুড পয়জনিং বা খাদ্যে বিষক্রিয়া একটি পরিচিত পেটের সমস্যা। অসাবধানতাবশত কোনো কারণে আমাদের খাবারে জীবাণু আক্রমণ করলে, সেই খাবার খাওয়ার পরে যেই অসুস্থতা দেখা দেয় তাকেই বলে ফুড পয়জনিং৷ এটি সাধারণত খুব একটা মারাত্মক হয় না। সচরাচর এক সপ্তাহের মধ্যেই ভাল হয়ে যায়। শিশু অথবা বয়স্ক যেই এতে আক্রান্ত হোক না কেনো, ফুড পয়জনিং এর চিকিৎসা সাধারণত বাড়িতেই করা যায়।ফুড পয়জনিং বা খাদ্যে বিষক্রিয়া একটি পরিচিত পেটের সমস্যা। অসাবধানতাবশত কোনো কারণে আমাদের খাবারে জীবাণু আক্রমণ করলে, সেই খাবার খাওয়ার পরে যেই অসুস্থতা দেখা দেয় তাকেই বলে ফুড পয়জনিং৷ এটি সাধারণত খুব একটা মারাত্মক হয় না। সচরাচর এক সপ্তাহের মধ্যেই ভাল হয়ে যায়। শিশু অথবা বয়স্ক যেই এতে আক্রান্ত হোক না কেনো, ফুড পয়জনিং এর চিকিৎসা সাধারণত বাড়িতেই করা যায়।

ID: 385

Context: ফুড পয়জনিং এর লক্ষণগুলো

Question: ফুড পয়জনিং এর লক্ষণগুলো কি কি ?

Answer:

খাদ্যে বিষক্রিয়ার কিছু লক্ষণ হলো—বমি বমি ভাব বা বমি ,পাতলা পায়খানা / ডায়রিয়া ,পেট কামড়ানো, শরীরের তাপমাত্রা ৩৮° সেলসিয়াস/১০০.৪° ফারেনহাইট বা তার বেশি হওয়া অসুস্থ বোধ করা। যেমন: ক্লান্তি, গায়ে ব্যথা অথবা গায়ে কাঁপুনি ওঠাযে খাবারের কারণে খাদ্যে বিষক্রিয়া ঘটেছে, তা খাওয়ার কয়েকদিনের মধ্যেই সাধারণত এসব লক্ষণগুলো দেখা দেয়। তবে এর ব্যতিক্রম ও ঘটতে পারে। যেমন, কিছু কিছু ক্ষেত্রে লক্ষণগুলো কয়েক ঘণ্টার মধ্যে শুরু হয়ে যায়। আবার কিছু ক্ষেত্রে লক্ষণ প্রকাশ পেতে কয়েক সপ্তাহও লাগতে পারে।

ID: 386

Context: ফুড পয়জনিং এ আক্রান্ত হওয়ার কারণ

Question: ফুড পয়জনিং এ আক্রান্ত হওয়ার কারণ কি?

Answer:

যেকোনো জীবাণুযুক্ত খাবার খেলেই খাদ্যে বিষক্রিয়া হতে পারে। বিশেষত খাবারটি যদি—যথেষ্ট তাপ দিয়ে রান্না বা গরম করা না হয়।

সঠিক উপায়ে সংরক্ষণ করা না হয়। যেমন: যে খাবারটি ঠান্ডা করে সংরক্ষণ করা প্রয়োজন তা যদি ফ্রিজে না রাখা হয়।

দীর্ঘসময় ধরে অসংরক্ষিত বা খোলা অবস্থায় ফেলে রাখা হয়।খাবার তৈরি ও পরিবেশনের সাথে জড়িত কেউ যদি অসুস্থ থাকে অথবা ঠিকমতো হাত না ধুয়ে তৈরি বা পরিবেশনে অংশগ্রহণ করে।খাবারটি যদি বাসি, পঁচা বা মেয়াদোত্তীর্ণ হয়।

ID: 387

Context: ফুড পয়জনিং হলে করণীয়

Question: ফুড পয়জনিং হলে করণীয় কি কি ?

Answer:

খাদ্যে বিষক্রিয়ার চিকিৎসা সাধারণত ঘরে থেকে নিজে নিজেই করা যায়। এর জন্য সাধারণত ডাক্তার দেখানো অথবা হাসপাতালে যাওয়ার প্রয়োজন হয় না৷ খাদ্যে বিষক্রিয়ার লক্ষণগুলো এক সপ্তাহের মধ্যেই আপনাআপনি সেরে যায়। ডায়রিয়া সাধারণত ৩ দিনের মধ্যেই সেরে যায় বা কমে আসে।ফুড পয়জনিং এর ঘরোয়া চিকিৎসাফুড পয়জনিং হলে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ যে ব্যাপার টি খেয়াল রাখতে হয় তা হল পানিশূন্যতা প্রতিরোধ করা। যেহেতু পায়খানা বা বমির সাথে শরীর থেকে অনেকটা পানি চলে যায় তাই এ সময়ে প্রচুর পরিমাণে পানি ও তরলজাতীয় খাবার, শরবত, ফলের জুস খেতে হবে। প্রয়োজনে খাবার স্যালাইন পান করতে হবে।কখন দ্রুত ডাক্তার দেখাতে হবে?

খাদ্যে বিষক্রিয়ার সাথে নিচের লক্ষণগুলো উপস্থিত থাকলে দেরি না করে দ্রুত ডাক্তার দেখাতে হবে—

পায়খানার সাথে রক্ত গেলে, অনেক বেশি জ্বর থাকলে (জিহ্বার নিচে থার্মোমিটার দিয়ে মেপে তাপমাত্রা ১০২° ফারেনহাইটের বেশি পেলে),খুব ঘন ঘন বমি হয়ে শরীর থেকে দ্রুত পানি হারাতে থাকলে পানিশূন্যতার লক্ষণগুলো দেখা দিলে। যেমন: প্রস্রাবের পরিমাণ খুব কমে যাওয়া বা একেবারেই বন্ধ হয়ে যাওয়া, মুখ ও গলা শুকিয়ে আসা, দাঁড়ালে মাথা ঘুরানো ইত্যাদি,৩ দিনের বেশি ডায়রিয়া থাকলে।

ID: 388

Context: ফুড পয়জনিং প্রতিরোধের ১০ টি কার্যকরী উপায়

Question: ফুড পয়জনিং প্রতিরোধের ১০ টি কার্যকরী উপায় কি কি ?

Answer:

খাদ্যে বিষক্রিয়ার সম্ভাবনা এড়াতে কার্যকর এমন ১০টি উপায় এখানে আলোচনা করা হলো—১. নিয়মিত হাত ধোয়ার অভ্যাস গড়ে তোলা: নিয়মিত হাত ধোয়ার অভ্যাস করতে হবে। সাবান ও পানি দিয়ে পরিষ্কার ভাবে হাত ধুয়ে এরপর ঠিকমতো শুকিয়ে নিতে হবে। কিছু ক্ষেত্রে হাত ধোয়ার কথা একেবারেই ভুলা যাবে না—খাবার তৈরি বা পরিবেশনের আগে

খাবার খাওয়ার আগে,কাঁচা খাবার ধরার পর। যেমন: কাঁচা মাংস, মাছ, ডিম বা শাকসবজি, ডাস্টবিন বা ময়লার বালতি হাত দিয়ে ধরলে,টয়লেট ব্যবহারের পরে ,হাত বা টিস্যু দিয়ে নাক ঝাড়ার পরে, কুকুর, বিড়াল বা অন্যকোন পশুপাখি হাত দিয়ে ধরার পরে। ২. রান্নার জায়গা ও বাসনকোসন সবসময় পরিষ্কার রাখা: কাটাবাছার জায়গা, রান্নার জায়গা, ছুরি, বটি ও রান্নার কাজে ব্যবহৃত বাসনকোসন সবসময় পরিষ্কার রাখতে হবে। খাবার তৈরি করার আগে ও পরে, বিশেষ করে যদি কাঁচা মাংস, মাছ, ডিম বা সবজির সংস্পর্শে আসে সেক্ষেত্রে এসব ভালোমতো পরিষ্কার করে নিতে হবে। পরিষ্কার করার জন্য সাবান ও গরম পানিই যথেষ্ট। এর জন্য জীবাণুনাশক স্প্রে ধরনের কিছু ব্যবহারের কোনো প্রয়োজন নেই। ৩. বাসন মোছার ন্যাকড়া বা কাপড় নিয়মিত ধোয়া বা পরিষ্কার করা: বাসন মোছার কাজে ব্যবহৃত ন্যাকড়া, কাপড় ও ছোট তোয়ালেগুলো প্রতিদিনের কাজ শেষে ধুয়ে দিতে হবে এবং পুনরায় ব্যবহারের আগে ঠিকমতো শুকিয়ে নিতে হবে। কারণ ময়লা, ভেজা কাপড় জীবাণু ছড়ানোর আদর্শ স্থান।৪. আলাদা আলাদা কাটিং বোর্ড ব্যবহার বা পৃথক স্থানে কাটার ব্যবস্থা করা: কাঁচা খাবার (যেমন: কাঁচা মাংস ও মাছ) কাটার জন্য আলাদা আলাদা কাটিং বোর্ড ব্যবহার করতে হবে। এর মাধ্যমে এক খাবারে উপস্থিত জীবাণু অন্যান্য খাবারে ছড়িয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা কম থাকবে। আলাদা আলাদা কাটিং বোর্ড ব্যবহার সম্ভব না হলে প্রতিবার ব্যবহারের পর কাটিং বোর্ড অথবা কাটাকুটির জায়গাটি পরিষ্কার করে নিতে হবে যাতে কোন জীবাণু থেকে না যায়। ৫. কাঁচা মাছ-মাংস আলাদাভাবে সংরক্ষণের ব্যবস্থা করা: সালাদ, ফল, পাউরুটি ইত্যাদি যেসব খাবার রান্নার প্রয়োজন হয় না সেগুলো সবসময় এমনভাবে সংরক্ষণ করতে হবে যাতে কাঁচা খাবার (যেমন: কাঁচা মাংস-মাছ) এর সংস্পর্শে না আসে। কারণ এগুলো যেহেতু রান্না করতে হয় না, তাই কাঁচা মাছ-মাংস থেকে কোন ধরণের জীবাণু এতে প্রবেশ করলে তা সাধারণত আর মরবে না। ৬. কাঁচা মাছ-মাংস ফ্রিজের নিচের তাকে রাখা: কাঁচা মাছ-মাংস সবসময় ফ্রিজের নিচের তাকে রাখা ভালো যাতে এগুলো বাকি খাবারের সংস্পর্শে না আসে বা এই তাক থেকে রক্ত বা পানি কোন কিছু গড়িয়ে অন্যান্য খাবারের গায়ে না পড়ে। ৭. পর্যাপ্ত উত্তাপ দিয়ে ভালোমতো রান্না করা: কাঁচা মাছ মাংস, সসেজ, কাবাব এসব চুলায় বা উনুনে ততক্ষণ পর্যন্ত রান্না করতে হবে যতক্ষণ না পর্যন্ত ভাপ বেরুচ্ছে। সেই সাথে নিশ্চিত কর‍তে হবে যে মাংস পুরোপুরি রান্না হয়েছে। ভেতরের অংশ যেন গোলাপি (অর্থাৎ, কাঁচা) না থেকে যায় তা খেয়াল রাখতে হবে। রান্নার আগে মাছ-মাংস ধোয়ার সময় সাবধানতা অবলম্বন করতে হবে যাতে এসব থেকে পুরো রান্নাঘরে জীবাণু ছড়িয়ে না পড়ে। কাঁচা মাংস ফ্রিজে রাখলে এতে উপস্থিত ক্যাম্পাইলোবাক্টার নামক ক্ষতিকারক ব্যাকটেরিয়ার পরিমাণ কিছুটা কমে কিন্তু সম্পূর্ণভাবে কমে না। মাংসে ব্যাকটেরিয়ার উপস্থিতি সম্পূর্ণভাবে দূর করার জন্য রান্নাই সবচেয়ে নিরাপদ উপায়।৮. ফ্রিজের তাপমাত্রা ৫ ডিগ্রী সেলসিয়াস এর নিচে রাখা: ফ্রিজের তাপমাত্রা সবসময় ৫ ডিগ্রী সেলসিয়াস এর নিচে রাখা উচিত। কারণ এই নিম্ন তাপমাত্রায় জীবাণু বাঁচতে বা সংখ্যাবৃদ্ধি করতে পারে না। সাধারণত অটোমেটিক ফ্রিজগুলোতে তাপমাত্রা এভাবেই নিয়ন্ত্রণ করা থাকে৷ ফ্রিজে একসাথে অনেক কিছু রাখার ফলে যদি পুরো ফ্রিজ ভরে যায়, বাতাস চলাচলের মত জায়গা না থাকে তবে এর ফলে তাপমাত্রা বেড়ে গিয়ে ফ্রিজিং এ ব্যাঘাত ঘটতে পারে। তাই ফ্রিজে অতিরিক্ত জিনিস একসাথে রাখা পরিহার করতে হবে৷ এছাড়া প্রয়োজন ব্যতীত ফ্রিজের দরজা যেন খোলা রাখা না হয়—সেদিকেও খেয়াল রাখতে হবে। ৯. অতিরিক্ত খাবারটুকু যত দ্রুত সম্ভব ঠান্ডা করে ফ্রিজে রেখে দেওয়া: অনেক সময়ে বেশি পরিমাণে খাবার একসাথে রান্না করে কিছু পরিমাণ সাথে সাথে খাওয়া হয় আর বাকিটা পরের বেলায় খাওয়ার জন্য রেখে দেওয়া হয়। এমনক্ষেত্রে এই অতিরিক্ত খাবারটুকু রান্নার পর যত দ্রুত সম্ভব (সর্বোচ্চ ৯০ মিনিট বা দেড় ঘন্টার মধ্যে) ঠান্ডা করে ফ্রিজে রেখে দেওয়ার ব্যবস্থা করতে হবে। ফ্রিজে রাখা এসব খাবার দুইদিনের মধ্যেই খেয়ে ফেলা উচিত এবং বারবার গরম করা উচিত না। ১০. মেয়াদোত্তীর্ণ খাবার না খাওয়া: যেকোনো খাবার, বিশেষ করে পাউরুটি, প্যাকেটজাত দুধ ইত্যাদি যেসব খাবারের গায়ে উৎপাদন ও মেয়াদ উত্তীর্ণ হওয়ার তারিখ লেখা থাকে, তা খাওয়ার আগে অবশ্যই তারিখগুলো দেখে নিতে হবে। মেয়াদোত্তীর্ণ হয়ে গেছে এমন কোনো কিছু কোনো অবস্থাতেই খাওয়া উচিত নয়। মেয়াদোত্তীর্ণ হয়েছে কিন্তু খাবারটি দেখে বা ঘ্রাণ নিয়ে মনে হচ্ছে যে এখনো নষ্ট হয়নি—এমনটা মনে হলেও খাবারটি খাওয়া যাবে না। কারণ এই মেয়াদের তারিখ সাধারণত নানান পরীক্ষা নিরীক্ষা করে নির্ধারণ করা হয়৷ পরীক্ষায় দেখা হয় যে এই খাবারটিতে জীবাণু আক্রমণ করতে ঠিক কতদিন সময় লাগতে পারে। তাই দেখে বুঝা না গেলেও মেয়াদোত্তীর্ণ খাবারে প্রকৃতপক্ষে জীবাণু আক্রমণ ও বংশবৃদ্ধি করতে শুরু করে দেয়।

ID: 389

Context: ফুড পয়জনিং থেকে দীর্ঘমেয়াদি জটিলতা

Question: ফুড পয়জনিং থেকে দীর্ঘমেয়াদি জটিলতা গুলো কি কি?

Answer:

অধিকাংশ ক্ষেত্রেই ফুড পয়জনিং বা খাদ্যে বিষক্রিয়া একটি মৃদু অসুখ হিসেবে দেখা দেয়, যা কয়েক ঘন্টা থেকে কয়েক দিনের মধ্যেই সম্পূর্ণ ভালো হয়ে যায়। তবে কারো কারো ক্ষেত্রে খাদ্যে বিষক্রিয়ার জন্য হাসপাতালে ভর্তি হতে হয়। আবার অনেকের দীর্ঘমেয়াদি সমস্যা দেখা দেয়—এমনকি মৃত্যু পর্যন্ত হতে পারে।

ID: 390

Context: বদহজম হওয়ার কারণ

Question: বদহজম কেন হয়?

Answer:

বেশিরভাগ মানুষেরই কখনো না কখনো বদহজমের সমস্যা হয়। এটি সাধারণত মারাত্মক কোন কিছুর লক্ষণ নয়। আপনি নিজে নিজেই এর চিকিৎসা করতে পারেন।বেশিরভাগ মানুষেরই কখনো না কখনো বদহজমের সমস্যা হয়। এটি সাধারণত মারাত্মক কোন কিছুর লক্ষণ নয়। আপনি নিজে নিজেই এর চিকিৎসা করতে পারেন।

ID: 391

Context: বদহজমের লক্ষণ

Question: বদহজমের লক্ষণ গুলো কি কি?

Answer:

খাবার খাওয়া বা পানীয় পান করার পরে নিচের লক্ষণগুলো দেখা দিতে পারে:

\* বুক জ্বালাপোড়া করা- বিশেষত খাওয়ার পরে বুকে জ্বালাপোড়ার মত যন্ত্রণা অনুভব করা

\* পেট ভরা বা ফুলে উঠেছে এমন বোধ করা

\* বমিভাব

\* ঢেঁকুর তোলা এবং বায়ু ত্যাগ করা

\* খাবার বা তিক্ত স্বাদের তরল মুখে উঠে আসা

ID: 392

Context: -1

Question: কখন এটি বদহজম নয়?

Answer:

পেট ব্যথা বা পিঠ ব্যথা সাধারণত বদহজমের লক্ষণ নয়। এগুলো থাকলে আপনি হয়তো কোষ্ঠকাঠিন্যে ভুগছেন।

ID: 393

Context: বদহজম, বুক জ্বালাপোড়া আর এসিড রিফ্লাক্স এর পার্থক্য

Question: বদহজম, বুক জ্বালাপোড়া আর এসিড রিফ্লাক্স – এদের মধ্যে পার্থক্য কী?

Answer:

বুক জ্বালাপোড়া আর এসিড রিফ্লাক্স একই জিনিস- পাকস্থলীর ভেতরে থাকা এসিড গলা পর্যন্ত উঠে আসা। এরকম ঘটলে আপনি জ্বালাপোড়া অনুভব করবেন। এটি বদহজমের লক্ষণ হতে পারে।

ID: 394

Context: বদহজমের ঘরোয়া চিকিৎসা

Question: বদহজমের ঘরোয়া চিকিৎসা কি কি ?

Answer:

ঘুমাতে যাওয়ার ৩ থেকে ৪ ঘণ্টা আগে কিছু খাবেন না। বিছানায় শোবার সময় আপনার মাথা ও ঘাড় উঁচু অবস্থানে রাখুন- এটি ঘুমের সময় পাকস্থলীর এসিড গলা পর্যন্ত উঠে আসা বন্ধ করতে পারে। তৈলাক্ত, চর্বিযুক্ত অথবা অতিরিক্ত মসলাযুক্ত খাবার পরিহার করবেন। চা, কফি, কোমল পানীয় (কোলা) অথবা মদ পান কমিয়ে ফেলুন।

ID: 395

Context: বদহজমের চিকিৎসা

Question: বদহজমের চিকিৎসা কি ?

Answer:

বদহজমের সাথে যে বুক জ্বালাপোড়া বা ব্যথা হয়, তা উপশমের জন্য একজন ডাক্তার আপনাকে ওষুধ খাওয়ার পরামর্শ দিতে পারেন। যেসব ওষুধ পেটে এসিডের পরিমাণ কমায় সেগুলো হল:এন্টাসিড (antacid), প্রোটন পাম্প ইনহিবিটর (proton pump inhibitor)কিছু বদহজমের ওষুধ খাবার খাওয়ার পরে সেবন করা ভালো যাতে তাদের কার্যকারিতা দীর্ঘস্থায়ী হয়।

ID: 397

Context: বদহজমের চিকিৎসা

Question: বদহজমের সমস্যা হলে কখন ডাক্তার দেখাবেন?

Answer:

বার বার বদহজমের সমস্যায় ভুগতে থাকেন ।

তীব্র ব্যথা অনুভব করেন ।

৫৫ বছর বা তার বেশি বয়সী হয়ে থাকে।

কোন চেষ্টা ছাড়াই ওজন অনেক কমে যায় ।

খাবার গিলতে সমস্যা অনুভব করেন ।

বার বার বমি করেন ।

আয়রনের অভাবজনিত রক্তস্বল্পতা এর রোগী হন ।

পেটে চাকার মত কিছু অনুভব করেন ।

বমি বা পায়খানার সাথে রক্ত যাওয়ার সমস্যায় ভোগেন এগুলো মারাত্মক কোন সমস্যার লক্ষণ হতে পারে।

ID: 398

Context: বদহজম এর চিকিৎসা

Question: বদহজম কেন হয়?

Answer:

পাকস্থলীতে থাকা এসিড আপনার পাকস্থলীর আস্তরণ কিংবা গলায় জ্বালাপোড়া সৃষ্টি করতে পারে। একারণে বদহজম হয় এবং আপনি জ্বালাপোড়া ও ব্যথা অনুভব করেন। বদহজমের আরও কিছু কারণ হল: বিভিন্ন ওষুধ ,ধূমপান, মদ পান, এক ধরনের ব্যাকটেরিয়া সংক্রমণ যার নাম( Helicobacter pylori)। মানসিক চাপ বদহজমের সমস্যা বাড়ায়।

ID: 399

Context: বমি বমি ভাব বা পেটে অস্বস্তি বোধ করার কারণ

Question: বমি বমি ভাব বা পেটে অস্বস্তি বোধ করার কারণ কি কি?

Answer:

বিভিন্ন কারণে বমি বমি ভাব বা পেটে অস্বস্তি হতে পারে। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই ঘরোয়া কিছু উপায় অবলম্বন করে বমি বমি ভাব দূর করার যায়।বিভিন্ন কারণে বমি বমি ভাব বা পেটে অস্বস্তি হতে পারে। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই ঘরোয়া কিছু উপায় অবলম্বন করে বমি বমি ভাব দূর করার যায়।

ID: 400

Context: বমি বমি ভাব হওয়ার কারণ

Question: বমি বমি ভাব হওয়ার কারণ কী ?

Answer:

বমি বমি ভাবের সাথে অন্য কোনো উপসর্গ থাকলে সেগুলো দেখে বমি বমি ভাবের কারণ সম্পর্কে ধারণা করা যায়। তবে কখনো কখনো অন্য কোনো উপসর্গ ছাড়াই, শুধু বমি বমি ভাব থাকতে পারে।বমি বমি ভাবের সাথে থাকতে পারে এমন অন্যান্য কিছু লক্ষণ এবং এদের সম্ভাব্য কারণ এখানে তুলে ধরা হলো—বমি বমি ভাবের সাথে অন্য লক্ষণ সম্ভাব্য কারণ,

ডায়রিয়া বা বমি ফুড পয়জনিং,মাথাব্যথা ও জ্বর ফ্লু বা এ জাতীয় কোনো ইনফেকশন ,খাওয়ার পর বুক জ্বালা-পোড়া করা অথবা পেট ফাঁপার সমস্যা দেখা দেওয়া এসিড রিফ্লাক্স (পাকস্থলীর এসিড খাদ্যনালী দিয়ে উপরে উঠা আসা), যাকে ‘গ্যাসের সমস্যা’ বলা হয়। মাথাব্যথা এবং তীব্র আলো ও শব্দের প্রতি সংবেদনশীলতা মাইগ্রেন ,মাথা ঘুরানো লেবিরিন্থাইটিস বা ভার্টিগোঅন্যান্য যেসব কারণে বমি বমি ভাব হয়গর্ভাবস্থায় মর্নিং সিকনেস হলে বমিবমি ভাব দেখা দেয়, মোশন সিকনেস এর কারণে চলন্ত গাড়িতে থাকা অবস্থায় বমি বমি ভাব দেখা দিতে পারে ,দুশ্চিন্তাগ্রস্ত অবস্থায় অনেক সময় এমনটা হতে পারে

মদ্যপান করলে বমি বমি ভাব হতে পারে ,অনেকের ঔষধ সেবনের পরে বমি ভাব দেখা দেয় । সম্প্রতি সার্জারি হয়েছে এমন রোগীদের অনেক সময় বমি বমি ভাব বোধ হতে পারেঠিক কী কারণে বমি বমি ভাব হচ্ছে তা বুঝতে না পারলে চিন্তিত হওয়ার কোনো কারণ নেই। যেসব উপায় অবলম্বন করলে সাধারণত বমি বমি ভাব দূর হয় সেগুলো চেষ্টা করে দেখতে হবে৷ তারপরও ভালো না হলে কিংবা কয়েকদিন পরও বমি বমি ভাব না গেলে ডাক্তার দেখিয়ে নিন৷

ID: 401

Context: বমি বমি ভাব দূর করার উপায়

Question: বমি বমি ভাব দূর করার উপায় কি কি?

Answer:

বমি বমি ভাব দূর করতে যা যা করতে পারেন—খোলা হাওয়া বা বিশুদ্ধ বাতাসে বুক ভরে শ্বাস নিতে পারেন

অন্য দিকে মনোযোগ দেওয়ার চেষ্টা করতে পারেন। যেমন: গান শোনা, বই পড়া অথবা কোনো মুভি দেখা।

এক গ্লাস ঠাণ্ডা পানি নিয়ে তাতে কিছুক্ষণ পরপর চুমুক দিতে পারেন। অনেকের ক্ষেত্রে কোক, ফান্টা বা এ জাতীয় কোমল পানীয় পান করলে বমি বমি ভাব সেরে যায়।

আদা বা পুদিনা/পেপারমিন্ট দিয়ে চা খেতে পারেন।

ভালো পরিমাণে আদা আছে এমন খাবার খেতে পারেন। যেমন: বাজারে জিনজার বিস্কুট পাওয়া, আদার ফ্লেভার যুক্ত কিছু পানীয় ও পাওয়া যায়৷

একসাথে বেশি পরিমাণে খাবার খাওয়া পরিহার করা উচিত। এর পরিবর্তে ঘনঘন ও কম পরিমাণে খাবার খাওয়া যেতে পারে।যা এড়িয়ে চলতে হবে

বমি বমি ভাব হলে খুব তীব্র গন্ধযুক্ত খাবার রান্না করলে বা খেলে বমি ভাব বেড়ে যেতে পারে। তাই এগুলো পরিহার করতে হবে।

খুব গরম, ভাজা-পোড়া অথবা তেল চুপচুপে খাবার খাওয়া এড়িয়ে চলতে হবে।

খাওয়ার সময় আস্তে ধীরে খাওয়ার অভ্যাস করতে হবে। তাড়াহুড়ো করা যাবে না।

খাওয়ার সাথে বা খাওয়ার পরে খুব বেশি পরিমাণে পানি বা পানীয় পান করা যাবে না।

খাবার খাওয়া মাত্র শুয়ে পড়া উচিত নয়।

পেটের দিকে টাইট হয়ে থাকে এমন কাপড় বা টাইট প্যান্ট/পায়জামা পরলে অস্বস্তি থেকে বমিবমি ভাব হতে পারে। তাই এই সমস্যা থাকলে এমন কাপড় পরা থেকে বিরত থাকা উচিত।বিশেষভাবে লক্ষণীয়

যদি বমি বমি ভাবের সাথে বমিও হতে থাকে তবে সাবধান থাকতে হবে। কারণ বেশি বমি হলে শরীর থেকে পানি বেরিয়ে গিয়ে আপনি পানিশূন্যতায় আক্রান্ত হতে পারেন। পানিশূন্যতা ঠেকাতে বাড়িতে খাবার স্যালাইন বানিয়ে পান করতে পারেন।পড়ুন: খাবার স্যালাইন বানানোর নিয়ম

ID: 402

Context: বমি বমি ভাব হলে চিকিৎসা

Question: বমি বমি ভাব হলে কখন ডাক্তারের কাছে যাবেন?

Answer:

সাধারণত বমি বমি ভাব বা এজাতীয় সমস্যা কিছু সময়ের মধ্যে নিজে থেকেই সেরে যায়৷ তবে কিছু ক্ষেত্রে ডাক্তারের শরণাপন্ন হওয়ার প্রয়োজন হতে পারে—কয়েকদিন ধরে এই সমস্যা থাকলে এবং নিজে থেকে সেরে না উঠলে।

নিয়মিত অথবা ঘন ঘন এমন সমস্যা দেখা দিলে।ডাক্তার পরীক্ষা নিরীক্ষা করে সমস্যার কারণ চিহ্নিত করবেন এবং প্রয়োজনীয় চিকিৎসা দিতে পারবেন। অনেক সময়ে এর চিকিৎসা হিসেবে বমি নিরোধক ঔষধ সেবন করতে দেওয়া হয়।

ID: 403

Context: বমি বমি ভাব হলে চিকিৎসা

Question: বমি বমি ভাব হলে জরুরি ভিত্তিতে হাসপাতালে যেতে হবে কখন?

Answer:

যদি হঠাৎ করে বমি বমি ভাব হয় এবং সেই সাথে—এমন ভাবে বুকে ব্যথা হতে থাকে যাতে মনে হয় যে বুকে কিছু একটা চাপ দিয়ে আছে অথবা বুক ভার হয়ে আছে। বুকের ব্যথাটি যদি হাতে, পিঠে, গলায়, ঘাড়ে অথবা চোয়াল পর্যন্ত ছড়াতে থাকে। দম বন্ধ হয়ে আসলে অথবা নিঃশ্বাস নিতে কষ্ট হলে।

ID: 410

Context: বুক ও গলা জ্বালা-পোড়া করার কারণ

Question: বুক ও গলা জ্বালা-পোড়া করার কারণ কি?

Answer:

আমরা যখন খাবার খাই, খাবারের সাথে সাথে পাকস্থলীর অ্যাসিড শরীরের নিচের দিকে নামে। যদি এর উল্টো ঘটে, অর্থাৎ পাকস্থলীর অ্যাসিড নিচে না নেমে বরং ওপরে গলার দিকে উঠে আসে, তখন আমরা বুকে জ্বালাপোড়া অনুভব করি। একে অ্যাসিড রিফ্লাক্স বা হার্টবার্ন বলা হয়। অনেকেই আমরা এটাকে গ্যাস্ট্রিক, গ্যাস্ট্রিকের ব্যথা বা অ্যাসিডিটি বলে থাকি।আমরা যখন খাবার খাই, খাবারের সাথে সাথে পাকস্থলীর অ্যাসিড শরীরের নিচের দিকে নামে। যদি এর উল্টো ঘটে, অর্থাৎ পাকস্থলীর অ্যাসিড নিচে না নেমে বরং ওপরে গলার দিকে উঠে আসে, তখন আমরা বুকে জ্বালাপোড়া অনুভব করি। একে অ্যাসিড রিফ্লাক্স বা হার্টবার্ন বলা হয়। অনেকেই আমরা এটাকে গ্যাস্ট্রিক, গ্যাস্ট্রিকের ব্যথা বা অ্যাসিডিটি বলে থাকি।এমন জ্বালাপোড়া যদি বারবার হতে থাকে, তখন এই রোগকে বলা হয় গ্যাস্ট্রো-ইসোফেজিয়াল রিফ্লাক্স ডিজিজ (gastro-oesophageal reflux disease)।

ID: 411

Context: অ্যাসিড রিফ্লাক্সের লক্ষণ গুলো

Question: অ্যাসিড রিফ্লাক্সের লক্ষণ গুলো কি কি ?

Answer:

প্রধান লক্ষণগুলো হলো:বুক জ্বালাপোড়া করা। বুকের ঠিক মাঝামাঝি জায়গাটায় জ্বালাপোড়া অনুভব করা।মুখে অপ্রীতিকর টক স্বাদ পাওয়া, পাকস্থলীর অ্যাসিড মুখে চলে আসার কারণে।এছাড়াও আপনার আরো যেসব লক্ষণ থাকতে পারে:পেট ফাঁপা,বমি ভাব হওয়া,বারবার কাশি বা হেঁচকি হতে থাকা,কণ্ঠ কর্কশ হয়ে যাওয়া,শ্বাসে দুর্গন্ধ আসা।খাওয়ার পরে, শোবার পরে বা উপুড় হলে লক্ষণগুলো আরো তীব্র রূপ ধারণ করতে পারে।

ID: 412

Context: বুক জ্বালা-পোড়ার কারণ গুলো

Question: বুক জ্বালা-পোড়ার কারণ গুলো কি কি ?

Answer:

নির্দিষ্ট কোন কারণ ছাড়াই সময়ে সময়ে অনেকের বুক জ্বালাপোড়া করে। তবে মাঝেমধ্যে কিছু জিনিস এই জ্বালাপোড়ার সূত্রপাত ঘটায় বা তীব্রতা বাড়ায়। যেমন:নির্দিষ্ট কিছু খাবার ও পানীয়- চর্বিযুক্ত বা মসলাদার খাবার, কফি, চকলেট, অ্যালকোহল, ইত্যাদি,ধূমপান,মানসিক চাপ ও উদ্বেগ,ওজন স্বাভাবিকের চেয়ে বেশি হওয়া,গর্ভাবস্থা,হায়াটাস হার্নিয়া (hiatus hernia) নামের একটা রোগ যেখানে পাকস্থলীর কিছু অংশ বুকে উঠে আসে, কিছু ওষুধ যেমন আইবুপ্রোফেন (ibuprofen)। আপনি যদি ডাক্তারের পরামর্শে এই ওষুধগুলি খান, তাহলে কোনভাবেই ডাক্তারের পরামর্শ ছাড়া নিজে নিজে ওষুধগুলো বন্ধ করবেন না।

ID: 413

Context: বুক জ্বালা-পোড়ার ঘরোয়া চিকিৎসা

Question: বুক জ্বালা-পোড়ার ঘরোয়া চিকিৎসা কি ?

Answer:

দৈনন্দিন জীবনে সহজ কিছু পরিবর্তন আনার মাধ্যমে আপনি অ্যাসিড রিফ্লাক্স সারিয়ে তুলতে বা কমিয়ে আনতে পারবেন। যেমন:একবারে ভরপেট খেলে এই সমস্যা বেশি হয়। সারা দিনে ভাগ করে অল্প অল্প করে খাবার খাবেন।যে সকল খাবার কিংবা পানীয় খেলে আপনার সমস্যা বেড়ে যায়, সেগুলো এড়িয়ে চলবেন।রাতে ঘুমাতে যাওয়ার আগে ৩-৪ ঘন্টার মধ্যে কিছু খাবেন না। বিছানায় শোবার সময় আপনার মাথা আর বুক যাতে কোমরের চেয়ে ১০-২০ সেন্টিমিটার উঁচু অবস্থানে থাকে। তাতে পাকস্থলীর অ্যাসিড গলা পর্যন্ত উঠে আসতে পারবে না। বালিশ দিয়ে মাথা উঁচু করবেন না। তোষকের নিচে বা খাটের নিচে কিছু দিয়ে খাটের একটা দিক উঁচু করে নিবেন এবং সেইদিকে মাথা দিবেন।এমন কাপড় পরবেন না যা কোমরে আঁটসাঁট হয়ে বসে থাকে।আপনার ওজন অতিরিক্ত হলে তা কমিয়ে ফেলুন।ধূমপান করবেন না।মনে প্রশান্তি আনে এমন কিছু কাজ নিয়মিত করুন। নিজে নিজে আইবুপ্রোফেন (ibuprofen) অথবা অ্যাসপিরিন (aspirin) সেবন করবেন না, কারণ এই ওষুধগুলো বদহজম আরো বাড়ায়। তবে আপনি যদি ডাক্তারের পরামর্শে এই ওষুধগুলি খান, তাহলে কোনভাবেই ডাক্তারের পরামর্শ ছাড়া নিজে নিজে ওষুধগুলো বন্ধ করবেন না।

ID: 414

Context: বুক জ্বালা-পোড়া হলে চিকিৎসা

Question: বুক জ্বালা-পোড়া হলে কখন ডাক্তারের সহায়তা নিবেন?

Answer:

যদি জীবনধারায় পরিবর্তন এনেও কোন উপকার না হয়। যদি এই সমস্যা ৩ সপ্তাহ বা তার বেশী সময় ধরে প্রায় প্রতিদিনই দেখা দেয়।

যদি তীব্র ব্যথা অনুভব করেন।যদি ৫৫ বছর বা তার বেশী বয়সী হয়ে থাকেন।যদি অন্যান্য লক্ষণ দেখা দেয়, যেমন:কোন কারণ ছাড়াই শরীরের ওজন কমে যাওয়া,গলায় খাবার আঁটকে যাওয়া বা খাবার গিলতে কষ্ট হওয়া,ঘনঘন বমি করা,বমি বা পায়খানার সাথে রক্ত যাওয়া, পায়খানা কালো হওয়া অথবা বমির মধ্যে কফি দানার মত কালচে বাদামি কিছু থাকা,পেটে চাকার মত মনে হওয়া,আয়রনের অভাবজনিত রক্তশূন্যতায় ভোগা।আপনার লক্ষণগুলো কোন গুরুতর রোগের কারণে কি না, ডাক্তার সেটা যাচাই করবেন এবং আপনাকে যথাযথ চিকিৎসা প্রদান করবেন।ডাক্তার কীভাবে আপনাকে সহায়তা করতে পারেন?লক্ষণগুলো কমিয়ে আনতে ডাক্তার আপনাকে অ্যান্টাসিড (antacid) নামক একটি ওষুধ দিতে পারেন। এই ওষুধটি খাবারের সাথে অথবা খাবারের ঠিক পরপর সেবন করা শ্রেয়, কারণ এই সময়েই বুকে জ্বালাপোড়ার সমস্যা বেশি হয়। খাবারের সাথে সেবন করলে ওষুধটির কার্যকারিতার সময়ও বৃদ্ধি পেতে পারে।ডাক্তার আপনাকে অন্য আরেক প্রকারের ওষুধ সেবন করার পরামর্শও দিতে পারেন, যেগুলো আপনার পাকস্থলীর অ্যাসিড তৈরির পরিমাণ কমিয়ে আনবে। যেমন:ওমিপ্রাজল (omeprazole) , ল্যান্সোপ্রাজল (lansoprazole)আপনার লক্ষণ সেরে উঠছে কি না তা দেখার জন্য এই ওষুধগুলোর একটি আপনাকে মাস দুয়েকের জন্য দেওয়া হতে পারে।যদি ওষুধ বন্ধ করার পর আপনার উপসর্গ আবার বেড়ে যায়, অবশ্যই ডাক্তারের কাছে ফেরত যাবেন। আপনার হয়ত আরো দীর্ঘ সময় ওষুধ খেতে হতে পারে।যেসব পরীক্ষা ও অপারেশন করা হয়আপনার রোগের লক্ষণ যদি বেশী গুরুতর হয় অথবা ওষুধ খেলেও কোন উপকার না হয়, তাহলে আপনাকে একজন বিশেষজ্ঞ ডাক্তারের কাছে পাঠানো হতে পারে। বিশেষজ্ঞ ডাক্তার যা করতে পারেন, তা হল:

ID: 431

Context: মাথাব্যথার কারণ ও প্রতিকার

Question: মাথাব্যথার কারণ ও প্রতিকার কি?

Answer:

বাড়িঘর পরিষ্কার করা থেকে শুরু করে দেরিতে ঘুমানো – এমন অনেক কারণেই মাথাব্যথা হতে পারে।

১ মানসিক চাপের পরে রিল্যাক্স করা

২ জমে থাকা রাগ

৩ অস্বাস্থ্যকর দেহভঙ্গি (Poor posture)

৪ খারাপ আবহাওয়া

৫ দাঁতে দাঁত ঘষা

৬ উজ্জ্বল আলো

৭ খাবার থেকে মাথাব্যথা

৮ যৌন সহবাস থেকে মাথাব্যথা

৯ আইসক্রিম

ID: 434

Context: মাথা ব্যাথার কারণ

Question: অস্বাস্থ্যকর দেহভঙ্গি থেকে কি মাথা ব্যাথা হতে পারে?

Answer:

অস্বাস্থ্যকর দেহভঙ্গী (যেমন কুঁজো হয়ে বসা) আপনার পিঠের উপরের দিকে, ঘাড়ে ও কাঁধ দুটোতে চাপ সৃষ্টি করে, যা থেকে মাথাব্যথা হতে পারে।এই মাথাব্যথায় সাধারণত মাথার নিচের দিকে টনটনে ব্যথা করে এবং কখনো কখনো মুখমণ্ডলে, বিশেষ করে কপালের দিকে, ঝলকানির মত করে ব্যথার অনুভূতি হয়।কীভাবে এর চিকিৎসা করবেন?একই ভঙ্গীতে দীর্ঘ সময় বসে বা দাঁড়িয়ে থাকবেন না। সোজা হয়ে, কোমরে ঠেক বা সাপোর্ট দিয়ে বসুন।

আপনার দীর্ঘক্ষণ ফোন ব্যবহার করার প্রয়োজন বা অভ্যাস থাকলে আলাদা হেডসেট বা ইয়ারফোন (Earphones) ব্যবহার করুন, কারণ বেশি সময় ধরে মাথা ও কাঁধের মাঝামাঝি ফোন ধরে রাখলে আপনার মাংসপেশিতে চাপ পড়ে মাথাব্যথা হতে পারে।

আপনি একজন ফিজিক্যাল থেরাপিস্ট (physical therapist) এর পরামর্শও নিতে পারেন। তারা আপনার দেহভঙ্গির সমস্যা বের করে সেটা সংশোধন করতে সাহায্য করতে পারবেন।পারফিউমআপনার যদি মনে হয় যে ঘরের কাজ করলে আপনার মাথাব্যথা হয়, তবে আপনার ধারণা সঠিকও হতে পারে। বাসাবাড়ি পরিষ্কার করার কাজে ব্যবহৃত সাবান বা ডিটারজেন্ট, সেই সাথে পারফিউম এবং সুগন্ধি এয়ার ফ্রেশনার – এগুলোতে নানান ধরনের রাসায়নিক পদার্থ থাকে, যা মাথাব্যথার জন্য দায়ী।কীভাবে এর চিকিৎসা করবেন?কোন বিশেষ ঘ্রাণে যদি আপনার মাথাব্যথা শুরু হয়, তবে তীব্র ঘ্রাণযুক্ত পারফিউম বা সাবান, শ্যাম্পু ও কন্ডিশনার ব্যবহার করা থেকে বিরত থাকুন।

বাড়িতে ঘ্রাণহীন সাবান, ডিটারজেন্ট ও এয়ার ফ্রেশনার ব্যবহার করুন ।

ঘরের দরজা-জানালা যতক্ষণ সম্ভব খুলে রাখুন।

কর্মস্থলে কোন সহকর্মীর পারফিউমে আপনার সমস্যা হলে নিজের ডেস্কে একটি ছোট ফ্যান চালাতে পারেন।

ID: 435

Context: খারাপ আবহাওয়া থেকে মাথাব্যাথা

Question: খারাপ আবহাওয়া কি মাথা ব্যাথার কারণ হতে পারে?

Answer:

আপনার যদি প্রায়ই মাথাব্যথা হয়, তাহলে খেয়াল করুন যে আপনার নিচের সময়গুলোতে মাথাব্যথা শুরু হয় কি না:আকাশ মেঘলা হলে

বাতাসে আর্দ্রতা বেশি থাকলে

গরম পরলে বা তাপমাত্রা বাড়তে থাকলে

ঝড় হলেবায়ুচাপের পরিবর্তনের কারণে আবহাওয়ার পরিবর্তন হয়। এই পরিবর্তন মস্তিষ্কে রাসায়নিক ও বৈদ্যুতিক পরিবর্তন ঘটায়, যার ফলে স্নায়ু উত্তেজিত হয়ে মাথাব্যথা হয়।কীভাবে এর চিকিৎসা করবেন?আমরা তো আর আবহাওয়া পরিবর্তন করতে পারি না! তবে আপনি আবহাওয়ার পূর্বাভাস জেনে আপনার মাথাব্যথা হবে কি না সেটা ধারণা করতে পারেন, আর সেই অনুযায়ী মাথাব্যথা রোধে ২-১ দিন আগেই একটি ব্যথানাশক ওষুধ বা পেইনকিলার খেয়ে নিতে পারেন।

ID: 436

Context: মাথা ব্যাথার কারণ

Question: দাঁতে দাঁত ঘষার কারণে কি মাথা ব্যথা হয়?

Answer:

রাতে ঘুমের মধ্যে কেউ কেউ দাঁতে দাঁত ঘষেন, চিকিৎসাবিজ্ঞানের ভাষায় একে বলা হয় ব্রাক্সিজম (bruxism)। এর ফলে চোয়ালের পেশির সংকোচন হয়, ফলে একটা ভোঁতা ধরনের মাথাব্যথা হয়।কিভাবে এর চিকিৎসা করবেন?দাঁতের ডাক্তারের পরামর্শ অনুযায়ী ঘুমের মধ্যে দাঁতকে সুরক্ষিত রাখার জন্য আপনাকে সঠিক মাপের মাউথ গার্ড (mouth guard) বানিয়ে নিতে হবে।

ID: 437

Context: মাথা ব্যাথার কারণ

Question: উজ্জ্বল আলো কি মাথা ব্যথার কারণ হতে পারে?

Answer:

উজ্জ্বল ও ঝলমলে আলো – বিশেষ করে তা যদি দ্রুত জ্বলতে আর নিভতে থাকে, তাহলে মাইগ্রেনের ব্যথা শুরু হতে পারে। এর কারণ হল, উজ্জ্বল ও মিটমিট করতে থাকা আলো মস্তিষ্কে বিশেষ কিছু রাসায়নিক পদার্থের ক্ষরণ বাড়িয়ে দেয়, যার ফলে মস্তিষ্কের মাইগ্রেনের কেন্দ্রটি সচল হয়ে যায়।কীভাবে এর চিকিৎসা করবেন?চোখে আলোর তীব্রতা কমাতে সানগ্লাসের ব্যবহার খুবই কার্যকর। আপনি ঘরে-বাইরে সব জায়গায় এটি পরতে পারেন। পোলারাইজড লেন্সও ঝলমলে আলোর তীব্রতা কমাতে সাহায্য করে।

কর্মস্থলে আপনার মনিটরের উজ্জ্বলতার মাত্রা ঠিক করে নিন অথবা ঝলমলে আলো কমায় এমন গ্লেয়ার স্ক্রিন (glare screen) ব্যবহার করুন।

অফিসে কিছু লাইট বন্ধ করে দিতে পারেন বা সেগুলোকে অন্য কোথাও সরিয়ে ফেলতে পারেন। যদি সেটা সম্ভব না হয়, তাহলে অফিসে আপনার বসার জায়গাটি বদলে ফেলুন।

টিউবলাইট ও ফ্লু্রোসেন্ট লাইট (fluorescent lighting) বেশি মিটমিট করে, তাই সম্ভব হলে এগুলোর বদলে অন্য ধরনের লাইট ব্যবহার করুন।

ID: 438

Context: খাবার থেকে মাথাব্যথা

Question: খাবার থেকে কী মাথাব্যথা হয়?

Answer:

চিজ কিংবা ডার্ক চকলেট এর মত লোভনীয় খাবার হতে পারে আপনার মাথাব্যথার কারণ! এই ব্যাপারে খেয়াল রাখুন। এসব খাবারে কিছু রাসায়নিক পদার্থ থাকে যার কারণে মাইগ্রেন অ্যাটাক শুরু হয়। এগুলো ছাড়া আরও যেসব খাবারের কারণে মাইগ্রেন হয় তার মধ্যে রয়েছে:প্রক্রিয়াজাত মাছ ও মাংস

ডায়েট কোমল পানীয়কীভাবে এর চিকিৎসা করবেন?মাইগ্রেনের কারণগুলো লিখে রাখার জন্য একটি ডায়েরি রাখুন।

কোনো খাবারের কারণে মাথাব্যথা হচ্ছে সন্দেহ হলে তা কয়েক মাসের জন্য খাওয়া বন্ধ রেখে দেখুন মাথাব্যথা আগের চেয়ে কমে কি না। কোন বিশেষ খাবার বন্ধ করার ব্যপারে আপনার মনে সন্দেহ থাকলে ডাক্তারের পরামর্শ নিন বা একজন রেজিস্টার্ড ডায়েটিশিয়ানের কাছে যান।

নিয়মিত খাবার খান, কারণ কোন বেলার খাবার বাদ পড়লেও মাথাব্যথা শুরু হতে পারে।

ID: 439

Context: যৌন সহবাস থেকে মাথাব্যথার

Question: যৌন সহবাস থেকে মাথাব্যথার কারণ কী?

Answer:

অনেক পুরুষ ও নারীর জন্য যৌনমিলনের সময় প্রচণ্ড উত্তেজনার কারণে হওয়া মাথাব্যথা একটি চরম বাস্তব ও পীড়াদায়ক সমস্যা।ডাক্তাররা ধারণা করেন যে এই মাথাব্যথার কারণ হল মাথা ও ঘাড়ের মাংসপেশিতে অতিরিক্ত চাপ সৃষ্টি হওয়া। এটা যৌন মিলনের যেকোন পর্যায়ে হতে পারে, এবং কয়েক মিনিট থেকে এক ঘন্টা পর্যন্ত স্থায়ী হতে পারে।কীভাবে এর চিকিৎসা করবেন?এই মাথাব্যথা অস্বস্তিকর হলেও তেমন ক্ষতিকর নয়, আর এমনটাও নয় যে এটি থাকলে আপনাকে যৌন সহবাস এড়িয়ে চলতে হবে। মাথাব্যথা রোধ করতে কয়েক ঘন্টা আগে একটি ব্যথানাশক ওষুধ খেয়ে নিন।

ID: 440

Context: আইসক্রিম ঠাণ্ডা জাতীয় খাবার থেকে মাথা ব্যথা

Question: আইসক্রিম ঠাণ্ডা জাতীয় খাবার খেলে কি মাথা ব্যথা হয়?

Answer:

আইসক্রিমে কামড় দেওয়ার সাথে সাথে কি আপনি কপালে তীক্ষ্ণ, ছুরির আঘাতের মত ব্যথা অনুভব করেন? উত্তর যদি হ্যাঁ হয়, তাহলে আপনার আইসক্রিম থেকে মাথাব্যথা (Ice-cream Headache) হয়, যার কারণ হল মুখের ভেতরে উপরের তালু ও গলার ভেতরের দিক দিয়ে ঠাণ্ডা খাবারের চলাচল। বরফ-ঠাণ্ডা পানীয় থেকেও একই রকম সমস্যা হতে পারে।

ID: 441

Context: টেনশন টাইপ মাথাব্যথা

Question: টেনশন টাইপ মাথাব্যথা কী?

Answer:

বিভিন্ন ধরনের মাথাব্যথার মধ্যে সবচাইতে বেশি দেখা যায় টেনশন টাইপ মাথাব্যথা। দৈনন্দিন জীবনে যে মাথাব্যথা আমরা স্বাভাবিক ধরে নেই, এটি মূলত সেই মাথাব্যথা।বিভিন্ন ধরনের মাথাব্যথার মধ্যে সবচাইতে বেশি দেখা যায় টেনশন টাইপ মাথাব্যথা। দৈনন্দিন জীবনে যে মাথাব্যথা আমরা স্বাভাবিক ধরে নেই, এটি মূলত সেই মাথাব্যথা।

ID: 442

Context: টেনশন টাইপ মাথাব্যথার লক্ষণ

Question: টেনশন টাইপ মাথাব্যথার লক্ষণগুলো কী?

Answer:

মাথার দুপাশেই একটা স্থায়ী ব্যথা অনুভূত হতে পারে। এছাড়াও ঘাড়ের মাংসপেশিতে টানটান লাগতে পারে এবং চোখের পেছনে একটা চাপ চাপ ভাব হতে পারে।তবে সাধারণত এই মাথাব্যথাটি আপনার প্রতিদিনের কাজে ব্যাঘাত ঘটানোর মত তীব্র হয় না।এই ব্যথা ৩০ মিনিট থেকে কয়েক ঘন্টা পর্যন্ত থাকতে পারে। তবে মাঝে মধ্যে ব্যথাটি কিছু দিন স্থায়ী হতে পারে।এই মাথাব্যথা কাদের হয়?বেশির ভাগ মানুষই জীবনে কোন না কোন সময়ে এই ধরণের মাথাব্যথায় ভোগে। যেকোন বয়সেই এই মাথাব্যথা হতে পারে, তবে টিনেজ বয়সী ছেলেমেয়ে এবং প্রাপ্তবয়স্কদের মাঝে বেশি দেখা যায়। পুরুষদের তুলনায় নারীদের মাঝে এই মাথাব্যথা বেশি হয়ে থাকে।যদি কোন প্রাপ্তবয়স্ক মানুষের মাঝে এই মাথাব্যথা টানা ৩ মাস (ন্যূনতম) আর প্রতিমাসে ১৫ বারের বেশি দেখা দেয়, তবে সেটাকে ক্রনিক টেনশন টাইপ মাথাব্যথা বলে।

ID: 443

Context: টেনশন টাইপ মাথাব্যথার চিকিৎসা

Question: টেনশন টাইপ মাথাব্যথায় কখন ডাক্তারের সহায়তা নিবেন?

Answer:

এই ধরণের মাথাব্যথা কদাচিৎ হলে ডাক্তারের কাছে যাওয়ার প্রয়োজন নেই। তবে যদি এক সপ্তাহে বেশ কয়েকবার দেখা দেয় অথবা যদি খুব তীব্র হয়, তাহলে একজন ডাক্তারের সহায়তা নিবেন।ডাক্তার আপনাকে মাথাব্যথা সম্পর্কে প্রশ্ন করবেন। আপনার পারিবারিক স্বাস্থ্য ইতিহাস, খাওয়া-দাওয়ার অভ্যাস, জীবনধারা সম্পর্কেও তিনি জানতে চাইতে পারেন। এ তথ্যগুলো আপনার মাথাব্যথার ধরন নির্ণয়ে ডাক্তারকে সাহায্য করবে।কখন দ্রুত হাসপাতালে যাবেন

নিচের লক্ষণগুলো থাকলে মাথাব্যথার পেছনে অন্য কোন গুরুতর সমস্যা লুকিয়ে থাকতে পারে। তাই কিছু পরীক্ষা এবং দ্রূত চিকিৎসার প্রয়োজন হতে পারে।

১.মাথায় গুরুতর আঘাত পেলে (যেমন কোন দুর্ঘটনার বা কোথাও পরে যাওয়ার কারণে)।

২.মাথাব্যথা হঠাৎ শুরু হলে এবং শুরুতেই ব্যথার তীব্রতা অনেক বেশি হলে।

৩.মাথাব্যথা হঠাৎ শুরু হলে এবং পূর্বে কখনো এমন তীব্র মাথাব্যথা অনুভব না করে থাকলে।

৪.প্রচণ্ড মাথাব্যথার সাথে নিচের কোন লক্ষণ দেখা দিলে দ্রুত হাসপাতালে যাবেন:

কথা বলতে কিংবা কিছু মনে করতে হঠাৎ অসুবিধা হলে

হাত বা পা দুর্বল বা অবশ হয়ে আসলে

কথা বলার সময়ে জড়িয়ে আসলে

দৃষ্টিশক্তি হারিয়ে ফেললে

ঝিমিয়ে পরলে অথবা অসংলগ্ন আচরণ করলে

গায়ে জ্বর আসলে, কাঁপুনি হলে, ঘাড় শক্ত হয়ে গেলে, অথবা চামড়ায় র‍্যাশ (ফুসকুড়ি) উঠলে

চোখের সাদা অংশ লাল হয়ে গেলে

খিঁচুনি হলে

অজ্ঞান হয়ে পরলে

৫.এছাড়াও প্রচণ্ড মাথাব্যথার সাথে নিচের কোন লক্ষণ দেখা দিলে দ্রুত হাসপাতালে যাবেন। এই লক্ষণগুলি মাথা এবং ঘাড়ের রক্তনালীর প্রদাহের কারণে দেখা দিতে পারে। সেক্ষেত্রে জরুরী চিকিৎসা প্রয়োজন হয়।

খাওয়ার সময় চোয়ালে ব্যথা হলে

চোখে ঝাপসা দেখলে অথবা একটার জায়গায় দুটো দেখলে

মাথার তালুতে চাপ দিয়ে ব্যথা অনুভব করলে

ID: 444

Context: টেনশন টাইপ মাথাব্যথার কারন

Question: টেনশন টাইপ মাথাব্যথা কী কারণে হয়?

Answer:

টেনশন টাইপ মাথাব্যথা হওয়ার নির্দিষ্ট কারণ চিকিৎসাবিজ্ঞানে এখনো স্পষ্ট হয় নি। কিন্তু কিছু বিষয় জানা গেছে যেগুলো টেনশন টাইপ মাথাব্যথা সৃষ্টিতে ভূমিকা রাখে। যেমন:মানসিক চাপ ও উদ্বেগ, চোখ কুঁচকে দেখা, অস্বাস্থ্যকর দেহভঙ্গি যেমন কুঁজো হয়ে বসা,ক্লান্তি,অনিয়মিত খাদ্যাভ্যাস, ব্যায়াম বা শারীরিক কাজের স্বল্পতা, উজ্জ্বল সূর্যের আলো,আওয়াজ বা কোলাহল, নির্দিষ্ট কিছু ঘ্রাণটেনশন টাইপ মাথাব্যথা অন্য কোন রোগের উপসর্গ নয়। এই মাথাব্যথা নিজেই একটা রোগ। একে এক প্রকারের প্রাথমিক মাথাব্যথা বলা হয়। অন্যান্য প্রাথমিক মাথাব্যথার উদাহরণ হল ক্লাস্টার মাথাব্যথা ও মাইগ্রেন।

ID: 445

Context: টেনশন টাইপ মাথাব্যথার চিকিৎসা

Question: টেনশন টাইপ মাথাব্যথার চিকিৎসা কী?

Answer:

এই মাথাব্যথা প্রাণঘাতী নয়। ব্যথানাশক ওষুধ ও দৈনন্দিন জীবনে কিছু পরিবর্তন আনার মাধ্যমে এটা সাধারণত কমিয়ে আনা যায়।দৈনন্দিন জীবনে কী পরিবর্তন আনবেন? যদি আপনার মাথাব্যথা দুশ্চিন্তার কারণে হয়ে থাকে, তবে মানসিক প্রশান্তি আনে এমন কিছু কাজ তা কমিয়ে আনতে সাহায্য করতে পারে। যেমন:যোগ ব্যায়াম,ম্যাসাজ,ব্যায়াম কপালে ঠান্ডা কাপড় রাখা কিংবা গলার পেছনে হাল্কা গরম কাপড় ধরে রাখা।ব্যথানাশক ওষুধব্যথানাশক ওষুধ যেমন প্যারাসিটামল বা আইবুপ্রোফেন মাথাব্যথা কমাতে সাহায্য করে। মাঝে মধ্যে এসপিরিন ব্যবহার করার পরামর্শ দেওয়া হয়ে থাকে।গর্ভাবস্থায় ব্যথানাশক ওষুধ হিসেবে প্যারাসিটামল সবচাইতে ভালো। ডাক্তারের পরামর্শ ব্যতীত এই সময়ে আইবুপ্রোফেন সেবন করবেন না। ১৬ বছরের কম বয়সীদের এসপিরিন সেবন করানো উচিত নয় ।ব্যথানাশক ওষুধ জনিত মাথাব্যথাএকটানা অনেকদিন (সাধারণত ১০ দিন বা তার অধিক সময়) ব্যথানাশক ওষুধ সেবন করলে মাথাব্যথা হতে পারে। অতিরিক্ত ওষুধ সেবন করার কারণে এই মাথাব্যথা সৃষ্টি হয়। আবার এমনও হতে পারে ওষুধ বন্ধ করলে মাথাব্যথা শুরু হয় কারণ আপনার শরীর ওষুধে অভ্যস্ত হয়ে গেছে।ডাক্তারের পরামর্শ অনুযায়ী বহুদিন ব্যথানাশক ওষুধ খাওয়ার পর আপনার যদি মাথাব্যথা হয়, তাহলে ডাক্তারের সাথে যোগাযোগ করুন। নিজে নিজে ডাক্তারের পরামর্শ ছাড়া ওষুধ খাওয়া বন্ধ করবেন না।

ID: 446

Context: টেনশন টাইপ মাথাব্যথার প্রতিকার

Question: টেনশন টাইপ মাথাব্যথার প্রতিকার কি?

Answer:

আপনি যদি খুব ঘনঘন টেনশন টাইপ মাথাব্যথায় ভোগেন, তাহলে একটি ডায়েরিতে লিখে রাখতে পারেন কখন কোন অবস্থায় আপনার মাথাব্যথা শুরু হচ্ছে। এতে করে মাথাব্যথা শুরু হওয়ার কারণ সনাক্ত করতে সুবিধা হতে পারে। সেই অনুযায়ী আপনার খাদ্যাভ্যাস বা দৈনন্দিন জীবনে পরিবর্তন এনে ঘনঘন মাথাব্যথা থেকে পরিত্রাণ পেতে পারেন।আপনার মাথাব্যথা যদি মানসিক চাপ আর দুশ্চিন্তা সংক্রান্ত হয়, তবে নিয়মিত ব্যায়াম এবং মানসিক প্রশান্তি আনে এমন কাজ আপনার জন্য উপকারী হতে পারে। অস্বাস্থ্যকর দেহভঙ্গি পরিহার করা, পর্যাপ্ত পরিমাণে বিশ্রাম নেওয়া এবং যথেষ্ট পরিমাণে পানি খাওয়া আপনার জন্য সহায়ক হতে পারে।

ID: 447

Context: বাচ্চাদের মাথাব্যথার কারণ

Question: বাচ্চাদের মাথাব্যথার কারণ কি?

Answer:

বেশিরভাগ শিশু এবং টিনেজ বয়সী ছেলেমেয়ে বছরে অন্তত একবার মাথাব্যথায় আক্রান্ত হয়। এই মাথাব্যথা বড়দের মাথাব্যথা থেকে খানিকটা ভিন্ন। তাই দেখা যায় মা-বাবারা এ সমস্যাটা লক্ষ্য করেন না।বেশিরভাগ শিশু এবং টিনেজ বয়সী ছেলেমেয়ে বছরে অন্তত একবার মাথাব্যথায় আক্রান্ত হয়। এই মাথাব্যথা বড়দের মাথাব্যথা থেকে খানিকটা ভিন্ন। তাই দেখা যায় মা-বাবারা এ সমস্যাটা লক্ষ্য করেন না।বাচ্চাদের ক্ষেত্রে মাইগ্রেন এবং অন্যান্য মাথাব্যথা বড়দের তুলনায় কম সময়ের জন্য স্থায়ী হয়। বাচ্চাদের মাথাব্যথা হঠাৎ করেই শুরু হয় এবং এর ফলে বাচ্চা দ্রুত ফ্যাঁকাসে ও অবসন্ন হয়ে পরে। এছাড়াও বাচ্চারা বমিবমি ভাব ও বমি করতে পারে। তবে বাচ্চারা বেশ দ্রুতই সেরে উঠে। কিছু ক্ষেত্রে দেখা যায় যে মাথাব্যথা ৩০ মিনিটের মধ্যেই চলে গিয়েছে এবং বাচ্চা স্বাভাবিক হয়ে উঠেছে। এমনকি সে বাইরে খেলাধুলাও করে এমনভাবে যেন কিছুই হয়নি।বাচ্চাদের মাথাব্যথা তাদের পেটেও প্রভাব ফেলতে পারে। তাই সাধারণত পেটব্যথাও হয়ে থাকে।

ID: 448

Context: বাচ্চাদের মাথাব্যথার কারণ

Question: দুপুরের খাবার না খেলে কি বাচ্চাদের মাথাব্যথা হতে পারে?

Answer:

প্রায়সই বাচ্চাদের মাথাব্যথা হয় যখন তারা দুপুরের খাবার খায় না, কিংবা সারা দিনে পরিমাণ মত পানি পান করে না। তাই এই ধরণের মাথাব্যথা প্রতিকারের সবচেয়ে ভালো উপায় হলো বাচ্চাদের নিয়মিত খাবার খাওয়ানো, পানি পান করানো এবং পর্যাপ্ত পরিমাণে ঘুম নিশ্চিত করা।

ID: 449

Context: খেলাধুলার কারণে মাথাব্যথা

Question: খেলাধুলার কারণে মাথাব্যথা ঠেকাতে কি ধরনের সতর্কতা প্রয়োজন?

Answer:

খেলাধুলা বাচ্চাদের মাথাব্যাথার সৃষ্টি করতে পারে। এর সম্ভাব্য কারণ হল খেলাধুলার ফলে ডিহাইড্রেশন বা জলশূন্যতা হওয়া এবং রক্তের সুগার লেভেলে পরিবর্তন আসা। খেলার আগে ও পরে বেশি করে পানি খাওয়া, গ্লুকোজ নেয়া মাথাব্যাথা প্রতিরোধে সাহায্য করতে পারে।নিয়মিত খাবারের সাথে মধ্য সকাল (সকাল ও দুপুরের মাঝামাঝি সময়) এবং মধ্য বিকালে (দুপুর ও সূর্যাস্তের মাঝামাঝি সময়) হাল্কা নাস্তা এক্ষেত্রে উপকারী হতে পারে।

ID: 451

Context: মাথাব্যথা সারাতে বাচ্চা

Question: মাথাব্যথা সারাতে বাচ্চা নিজে কি কি করতে পারে?

Answer:

কিছু সাধারণ পদক্ষেপ আপনার বাচ্চাকে মাথাব্যথা বা মাইগ্রেনের সময় সহায়তা করতে পারে। যেমন:নিঃশব্দ ও অন্ধকার রুমে শুয়ে থাকা,কপালে অথবা চোখের উপর ঠান্ডা,আর্দ্র কাপড় দিয়ে রাখা, ধীরে ধীরে গভীর নিঃশ্বাস নেয়া, ঘুমিয়ে যাওয়া, কারণ ঘুম মাথাব্যথা দ্রুত কমিয়ে আনতে সাহায্য করে, খাবার খাওয়া বা তরল কিছু পান করা। (তবে ক্যাফেইন-যুক্ত পানীয় পরিহার করবেন)যদি আপনার মনে হয় বাচ্চার পেইনকিলারে (ব্যথানাশক ওষুধ) ব্যথা কমে যাবে, তাহলে নিয়ম মেনে নিরাপদ পরিমাণে তাকে ওষুধ খাইয়ে দিন। প্যারাসিটামল ও আইবুপ্রোফেন দুইটি ওষুধই বাচ্চাদের মাথাব্যথার ক্ষেত্রে কার্যকর ও নিরাপদ। তবে বাচ্চাদের ক্ষেত্রে ট্যাবলেটের বদলে সিরাপ খাওয়াটা সহজতর।

ID: 475

Context: সর্দি-কাশি

Question: সর্দি-কাশি ও ফ্লু কি?

Answer:

সারাবছর জুড়েই সর্দি-কাশি ও ফ্লু এর সমস্যা হলেও ঋতু পরিবর্তনের সাথে সাথে, বিশেষত শীত ও বসন্ত কালে সমস্যাগুলো বেড়ে যায়।সারাবছর জুড়েই সর্দি-কাশি ও ফ্লু এর সমস্যা হলেও ঋতু পরিবর্তনের সাথে সাথে, বিশেষত শীত ও বসন্ত কালে সমস্যাগুলো বেড়ে যায়।এসব রোগের চিকিৎসার জন্য সাধারণত ডাক্তারের কাছে যাওয়ার প্রয়োজন হয় না। কিছু উপদেশ মেনে চললে ঘরে বসেই নিজের যত্ন নেয়া যায়। তা ছাড়া কিছু সতর্কতা অবলম্বন করলে আক্রান্ত হওয়ার ঝুঁকিও কমানো যায়।

ID: 476

Context: ফ্লু ও সর্দি-কাশি বা ঠান্ডার লক্ষণ

Question: ফ্লু ও সর্দি-কাশি বা ঠান্ডার লক্ষণগুলো কী?

Answer:

ফ্লু ও সাধারণ সর্দি-কাশির লক্ষণ প্রায় একই রকম। তবে সাধারণ সর্দি-কাশির তুলনায় ফ্লু এর লক্ষণগুলোর তীব্রতা বেশি হতে পারে এবং সেরে উঠতেও বেশি সময় লাগতে পারে। শিশুদের ক্ষেত্রে কখনো কখনো লক্ষণগুলো বড়দের তুলনায় বেশিদিন ধরে থাকতে পারে।কীভাবে বুঝবেন আপনার ফ্লু হয়েছে না কি সর্দি-কাশি?এ ছাড়া ফ্লুতে শিশুদের ক্ষেত্রে জ্বরের পাশাপাশি ডায়রিয়া ও বমির সমস্যা বেশি দেখা যায়। সেই সাথে শিশুর কান ব্যথা হতে পারে এবং চঞ্চলতা কমে যেতে পারে।\*জ্বর, \*নতুন করে একটানা কাশি হওয়া, \*অস্বাভাবিক স্বাদ-গন্ধ পাওয়া অথবা স্বাদ ও ঘ্রাণশক্তি হারিয়ে ফেলা কোভিড-১৯ ইনফেকশন বা করোনার লক্ষণ হতে পারে।

ID: 477

Context: ফ্লু ও সাধারণ সর্দি-কাশির চিকিৎসা

Question: ফ্লু ও সাধারণ সর্দি-কাশির চিকিৎসা কি?

Answer:

কারণ ও লক্ষণে পার্থক্য থাকলেও ফ্লু ও সাধারণ সর্দি-কাশির চিকিৎসা প্রায় কাছাকাছি।ঘরোয়া চিকিৎসাদ্রুত সর্দি-কাশি ও ফ্লু সারাতে প্রাথমিকভাবে নিচের পরামর্শগুলো মেনে চলুন—বিশ্রাম নিন ও পর্যাপ্ত পরিমাণে ঘুমান

শরীর উষ্ণ রাখুন

প্রচুর পরিমাণে পানি পান করুন। পানির পাশাপাশি তরল খাবারও উপকারী। যেমন: ফলের জুস, চিড়া পানি, ডাবের পানি, স্যুপ, ইত্যাদি। পানিশূন্যতা এড়াতে এমন পরিমাণে তরল খাওয়া উচিত যেন প্রস্রাবের রঙ স্বচ্ছ অথবা হালকা হলুদ হয়

গলা ব্যথা উপশমের জন্য লবণ মিশিয়ে কুসুম গরম পানি দিয়ে গড়গড়া করুন। তবে ছোটো শিশুরা ঠিকমতো গড়গড়া করতে পারে না বলে তাদের ক্ষেত্রে এই পরামর্শ প্রযোজ্য নয়

কাশি উপশমের জন্য মধু খেতে পারেন। ১ বছরের কম বয়সী বাচ্চাদের জন্য এই পরামর্শ প্রযোজ্য নয়অনেকে ধারণা করেন যে ভিটামিন সি, রসুন ও একানেশিয়া নামের হারবাল ঔষধ সর্দি-কাশি প্রতিরোধে কিংবা সর্দি-কাশি থেকে দ্রুত সেরে উঠতে সাহায্য করে। তবে এই ধারণার পক্ষে তেমন কোনো প্রমাণ পাওয়া যায়নি।ফ্লু ও সর্দি কাশির ঔষধসাধারণ সর্দি-কাশি সাধারণত কোনো ঔষধ ছাড়াই ৭–১০ দিনের মধ্যে সেরে যায়। ফ্লু-ও সাধারণত দুই সপ্তাহের মধ্যে আপনা-আপনি ঠিক হয়ে যায়। তবে লক্ষণ উপশমে কিছু ঔষধ ব্যবহার করা যেতে পারে। যেমন—প্যারাসিটামল: জ্বর ও ব্যথার জন্য প্যারাসিটামল সেবন করতে পারেন। তবে প্যারাসিটামল সেবন চলাকালে অন্য কোনো ব্যথার ঔষধ, কফ সিরাপ অথবা সর্দি-কাশির হারবাল ঔষধ সেবনের বিষয়ে সতর্ক থাকতে হবে। কারণ এসবের অনেকগুলোতে প্যারাসিটামল থাকে। ফলে নিরাপদ মাত্রার চেয়ে অতিরিক্ত পরিমাণে প্যারাসিটামল সেবন করার ঝুঁকি থাকে।নাক বন্ধের ড্রপ: এগুলোকে ‘ন্যাসাল ডিকনজেসট্যান্ট’ বলা হয়। নাক বন্ধ উপশমে এসব ড্রপ ব্যবহার করা যায়। তবে টানা ১ সপ্তাহের বেশি ব্যবহার করবেন না, তাতে নাক বন্ধের সমস্যা আরও বেড়ে যেতে পারে। ১ সপ্তাহেও উন্নতি না হলে ডাক্তারের পরামর্শ নিবেন।৬ বছরের কম বয়সী শিশুদের এসব ড্রপ দিবেন না। ডাক্তারের পরামর্শে ৬–১২ বছর বয়সী শিশুদের এই ধরনের ড্রপ দেওয়া যেতে পারে, সেক্ষেত্রেও সাধারণত পাঁচ দিনের বেশি দেয়া হয় না।কফ সিরাপ: কাশি বেশি হলে সর্দি-কাশির ঔষধ বা কফ সিরাপ ব্যবহার করা যেতে পারে।অ্যান্টিহিস্টামিন: নাক থেকে পানি পড়া এবং হাঁচি কমানোর জন্য ডাক্তার এই ধরনের ঔষধ সেবনের পরামর্শ দিতে পারেন। এগুলো কারও কারও কাছে ‘অ্যালার্জির ঔষধ’ হিসেবেও পরিচিত।অ্যান্টিভাইরাল: সাধারণত ফ্লু এর চিকিৎসায় বিশেষ কোনো ঔষধের দরকার হয় না। তবে যাদের ফ্লু এর তীব্র লক্ষণ দেখা দেয় এবং জটিলতায় আক্রান্ত হওয়ার ঝুঁকি বেশি, তারা ডাক্তারের পরামর্শ অনুযায়ী অ্যান্টিভাইরাল ঔষধ সেবন করতে পারেন৷ডাক্তারের প্রেসক্রিপশন ছাড়া শিশুদের কোনো ধরনের ঔষধ দিবেন না।

১৮ বছরের কম বয়সী শিশুদের ফ্লু হয়েছে বলে সন্দেহ হলে তাদের অ্যাসপিরিন ও স্যালিসাইলেট যুক্ত সব ধরনের ঔষধ দেওয়া থেকে বিরত থাকুন। স্যালিসাইলেট যুক্ত ঔষধের মধ্যে রয়েছে পিংক-বিসমল, পেপ্টো, পেপ্টোফিট ও পেপ্টোসিড জাতীয় পেট খারাপের ঔষধ।ঔষধ সেবনের পূর্বে সতর্কতাসব ধরনের ঔষধ সেবন করার আগেই সতর্কতা অবলম্বন করা উচিত। লক্ষণ দেখা গেলেই হুট করে কোনো ঔষধ সেবন করলে ক্ষতিকর পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া দেখা দিতে পারে। সর্দি-কাশির ঔষধ সেবনের ক্ষেত্রে নিচের বিষয়গুলো খেয়াল রাখুন—ঔষধ সেবনের আগে সেটির গায়ে লাগানো লেবেল দেখে নিবেন। ঔষধের সাথে থাকা নির্দেশনাগুলো মেনে চলবেন

অনেক সর্দি-কাশির ঔষধের মধ্যে ব্যথানাশক ঔষধের উপাদান থাকে, যেমন প্যারাসিটামল, আইবুপ্রফেন ইত্যাদি। সেক্ষেত্রে আলাদা করে ব্যথানাশক ব্যবহার করলে ঔষধের মাত্রা ক্ষতিকর পর্যায়ে চলে যেতে পারে

গর্ভাবস্থায় অনেক ঔষধ সেবন করাই মা ও গর্ভের শিশুর জন্য ক্ষতিকর হতে পারে। ডাক্তারের পরামর্শ ছাড়া গর্ভবতী মায়েদের যেকোনো ঔষধ সেবন করা থেকে বিরত থাকা উচিত

দুই বছরের ছোটো শিশুদের সর্দি-কাশির জন্য কোনো ঔষধ দেওয়া উচিত নয়

শিশুদের অ্যাসপিরিন জাতীয় ঔষধ দেওয়া উচিত নয়অ্যান্টিবায়োটিক কেন নয়?

সর্দি-কাশি ও ফ্লু এর চিকিৎসায় অ্যান্টিবায়োটিক কার্যকর নয়। কারণ সর্দি-কাশি ও ফ্লু ভাইরাস বাহিত রোগ। আর অ্যান্টিবায়োটিক ব্যাকটেরিয়ার বিরুদ্ধে কাজ করে, ভাইরাসের বিরুদ্ধে নয়। তাই অযথা অ্যান্টিবায়োটিক সেবন করলে অন্যান্য জটিলতা তৈরি হওয়ার সম্ভাবনা থাকে।

উল্লেখ্য, ফ্লু এর চিকিৎসায় ক্ষেত্রবিশেষে অ্যান্টিভাইরাল ঔষধ ব্যবহৃত হতে পারে। ডাক্তার আপনার লক্ষণের ওপর ভিত্তি করে ঔষধ সেবন করতে হবে কি না সেটি নির্ধারণ করবেন।

ID: 478

Context: ফ্লু ও সাধারণ সর্দি-কাশির চিকিৎসা

Question: ফ্লু ও সাধারণ সর্দি-কাশির কখন ডাক্তারের কাছে যেতে হবে?

Answer:

নিচের লক্ষণগুলো দেখা গেলে ডাক্তারের পরামর্শ নিতে হবে—ফ্লু এর ক্ষেত্রে সাত দিনের বেশি এবং সর্দি-কাশির ক্ষেত্রে তিন সপ্তাহের বেশি সময় ধরে লক্ষণ থাকলে

তিন মাসের কম বয়সী শিশুর জ্বর আসলে অথবা খুব নিস্তেজ হয়ে পড়লে, কিংবা যেকোনো বয়সী শিশুকে নিয়ে শঙ্কা থাকলে

বয়স ৬৫ বছরের বেশি হলে কিংবা গর্ভবতী হলে

দীর্ঘমেয়াদী স্বাস্থ্য সমস্যা থাকলে। যেমন: ডায়াবেটিস, হৃদরোগ, কিডনি রোগ ও ফুসফুসের রোগ

শরীরের রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা কমে যায় এমন চিকিৎসা নিলে। যেমন: কেমোথেরাপি ও লম্বা সময় ধরে স্টেরয়েড সেবন

অনেক জ্বর আসলে অথবা জ্বরের সাথে কাঁপুনি থাকলেযেসব লক্ষণ দেখা দিলে জরুরি ভিত্তিতে চিকিৎসা নিতে হবে—

শিশুদের ক্ষেত্রে

\*খিঁচুনি

\*ঠোঁট ও মুখ নীল হয়ে যাওয়া

\*পানিশূন্যতা। এর কিছু লক্ষণ হলো—৮ ঘন্টায় একবারও প্রস্রাব না হওয়া, মুখ শুকিয়ে যাওয়া এবং কান্না করলে চোখে পানি না আসা। ছোটো শিশুদের মাথার সামনের দিক বসে যেতে পারে

\*সজাগ অবস্থাতেও পুরোপুরি সচেতন না থাকা এবং অন্যদের সাথে না মেশা

\*দ্রুত শ্বাস নেওয়া অথবা শ্বাসকষ্ট হওয়া

\*শ্বাস-প্রশ্বাসের সাথে পাঁজরের হাড় ভেতরে ঢুকে যাওয়া

\*বুকে ব্যথা

\*মাংসপেশিতে তীব্র ব্যথা। ব্যথা এতটাই তীব্র হয় যে শিশু হাঁটাচলা করতে চায় না

\*জ্বর ১০৪° ফারেনহাইট এর ওপরে চলে যাওয়া

\*প্রাপ্তবয়স্কদের ক্ষেত্রে

\*শ্বাসকষ্ট

\*বুকে অথবা তলপেটে ক্রমাগত ব্যথা অথবা চাপ চাপ লাগা

\*ক্রমাগত মাথা ঘোরানো, বিভ্রান্তি ও ঝিমুনি

\*খিঁচুনি

\*প্রস্রাব না হওয়া

\*মাংসপেশিতে তীব্র ব্যথা

\*প্রচণ্ড দুর্বলতা ও অস্থিরতা

\*কাশির সাথে রক্ত যাওয়া

এ ছাড়া দীর্ঘমেয়াদী অন্যান্য রোগের লক্ষণগুলো বেড়ে গেলে, জ্বর-কাশি কিছুটা কমার পরে আবার ফিরে আসলে, অথবা হঠাৎ করে লক্ষণগুলো বেড়ে গেলে রোগীকে দ্রুত হাসপাতালে নিতে হবে।

ID: 479

Context: ফ্লু ও সাধারণ সর্দি-কাশি প্রতিরোধের উপায়গুলো

Question: ফ্লু ও সাধারণ সর্দি-কাশি প্রতিরোধের উপায়গুলো কি?

Answer:

এই রোগগুলো সহজেই একজন থেকে আরেকজনে ছড়াতে পারে। তবে সহজ কিছু পদক্ষেপ দিয়ে তা ঠেকানো সম্বব। ফ্লু এর ক্ষেত্রে প্রথম পাঁচ দিনে ইনফেকশন ছড়ানোর সম্ভাবনা সবচেয়ে বেশি থাকে। সর্দি-কাশিতে আক্রান্ত ব্যক্তির লক্ষণগুলো পুরোপুরি সেরে যাওয়ার আগ পর্যন্ত অন্যদের মধ্যে জীবাণু ছড়াতে পারে।পরিবার ও কর্মক্ষেত্রে রোগ ছড়ানো প্রতিরোধসম্ভব হলে কাজ থেকে ছুটি নিয়ে নিজের ঘরে থাকুন। মানুষের সংস্পর্শে আসা হতে বিরত থাকুন।

ফ্লু হলে জ্বর ছেড়ে যাওয়ার পর অন্তত ২৪ ঘন্টা পার হওয়ার আগে পর্যন্ত জরুরি প্রয়োজন ছাড়া ঘরের বাইরে যাবেন না। এক্ষেত্রে জ্বর কমানোর ঔষধ খাওয়া ছাড়াই জ্বর চলে যাওয়া উচিত।

সুস্থ হওয়ার আগে পর্যন্ত জনসমাগম এড়িয়ে চলুন। কারও সাথে হ্যান্ডশেক অথবা কোলাকুলি করা থেকে বিরত থাকুন। বাইরে বের হলে মাস্ক ব্যবহার করুন।

হাঁচি-কাশি দেওয়ার সময়ে অন্যদের থেকে দূরে সরে যান এবং টিস্যু দিয়ে নাক ও মুখ ঢাকুন। ব্যবহারের পর টিস্যু ডাস্টবিনে ফেলে দিন। হাতের কাছে টিস্যু না থাকলে কনুই এর ফাঁকে হাঁচি-কাশি দিন। হাঁচি-কাশি দিয়ে সাথে সাথে হাত ধুয়ে ফেলুন।

দরজার হাতল, মোবাইল ফোন ও শিশুদের খেলনার মতো দৈনন্দিন ব্যবহার্য্য জিনিসগুলো কিছুক্ষণ পর পর জীবাণুমুক্ত করুন।

বারবার সাবান-পানি দিয়ে হাত ধোয়ার অভ্যাস করুন।ফ্লু ও সর্দি-কাশি থেকে সুরক্ষাফ্লু ও সর্দি-কাশি রোগে আক্রান্ত হওয়া থেকে বাঁচতে নিচের পাঁচটি উপায় অবলম্বন করুন—নিয়মিত কুসুম গরম পানি ও সাবান দিয়ে অন্তত ২০ সেকেন্ড ধরে ভালোভাবে হাত ধোয়ার অভ্যাস করুন। যদি পানি-সাবান হাতের কাছে না থাকে, অ্যালকোহল জাতীয় হ্যান্ড স্যানিটাইজার দিয়ে হাত পরিষ্কার করুন।

অপরিষ্কার হাতে চোখ, নাক ও মুখ স্পর্শ করা থেকে বিরত থাকুন। না হলে ভাইরাস শরীরে ঢুকে ইনফেকশন করতে পারে।

অসুস্থ মানুষের সংস্পর্শ যতটা সম্ভব এড়িয়ে চলুন। তাদের ব্যবহৃত জিনিস ও বাসনপত্রও ব্যবহার করা থেকে বিরত থাকুন।

ব্যায়াম করুন ও সুস্থ জীবনধারা মেনে চলুন।

সাধারণ সর্দি-কাশির কার্যকর ভ্যাকসিন নেই। তবে নিয়মিত ফ্লু এর ভ্যাকসিন নেওয়ার মাধ্যমে ফ্লু রোগটি প্রতিরোধ করা যায়। প্রয়োজনবোধে চিকিৎসকের পরামর্শ অনুযায়ী ফ্লু ভ্যাকসিন নিতে পারেন।

ID: 480

Context: সাধারণ সর্দি-কাশি রোগ পরবর্তী জটিলতা

Question: সাধারণ সর্দি-কাশি রোগ পরবর্তী জটিলতাগুলো কি?

Answer:

সর্দি-কাশি সাধারণত ৭–১০ দিনের মধ্যে সেরে যায়। তবে যাদের রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা কম কিংবা অ্যাজমার মতো শ্বাস-প্রশ্বাসের রোগ আছে, তাদের সাধারণ সর্দি-কাশি থেকেও নিউমোনিয়ার মতো জটিলতায় ভোগার সম্ভাবনা থাকে।অন্যদিকে ফ্লু বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই দুই সপ্তাহের মধ্যে সেরে যায়। তবে কারও কারও ক্ষেত্রে নিউমোনিয়াসহ নানান জটিলতা হতে পারে। এমনকি কিছু জটিলতা থেকে মৃত্যু হতে পারে।ফ্লু এর জটিলতার মধ্যে রয়েছে—নিউমোনিয়া

সাইনোসাইটিস

কানের ইনফেকশন

হার্টের প্রদাহ বা মায়োকার্ডাইটিস

ব্রেইনে প্রদাহ বা এনসেফালাইটিস

মাংসপেশির প্রদাহ

ফুসফুস ও কিডনির মতো একাধিক অঙ্গের কাজ মারাত্মকভাবে বাধাগ্রস্ত হওয়া

গুরুতর ইনফেকশন থেকে শরীরে ‘সেপসিস’ নামক জীবনঘাতী প্রতিক্রিয়া তৈরি হওয়াএ ছাড়া দীর্ঘমেয়াদী রোগে আক্রান্ত ব্যক্তিদের ফ্লু হলে সেটি রোগের তীব্রতা বাড়িয়ে দিতে পারে। যেমন, অ্যাজমা বা হাঁপানি রোগীদের অ্যাজমার অ্যাটাক হতে পারে এবং হার্টের রোগীদের অবস্থার অবনতি হতে পারে।যাদের জন্য ফ্লু বেশী ঝুঁকিপূর্ণযে কেউই ফ্লুতে আক্রান্ত হতে পারেন এবং ফ্লু সংক্রান্ত জটিলতায় ভুগতে পারেন। তবে কিছু মানুষের ক্ষেত্রে ফ্লু হওয়ার পর ভোগার সম্ভাবনা বেশি। যেমন—৬৫ বছর ও তদূর্ধ্ব বয়সী ব্যক্তি

গর্ভবতী নারী

পাঁচ বছরের কম বয়সী শিশু

ইতোমধ্যে কোনো রোগে ভুগছেন এমন ব্যক্তি

ID: 503

Context: হাইপারগ্লাইসেমিয়া বা সুগার বেড়ে যাওয়া

Question: হাইপারগ্লাইসেমিয়া বা সুগার বেড়ে যাওয়া কি?

Answer:

রক্তে শর্করা বা ব্লাড সুগারের মাত্রা বেড়ে যাওয়াকে হাইপারগ্লাইসেমিয়া (Hyperglycemia) বলে। ডায়াবেটিস রোগীদের ক্ষেত্রে এটি একটি পরিচিত সমস্যা। টাইপ ১ ডায়াবেটিস, টাইপ ২ ডায়াবেটিস ও গর্ভকালীন ডায়াবেটিস—যেকোনো ধরণের ডায়াবেটিস রোগে আক্রান্ত রোগীর ক্ষেত্রেই হাইপারগ্লাইসেমিয়া দেখা দিতে পারে। রক্তে শর্করা বা ব্লাড সুগারের মাত্রা বেড়ে যাওয়াকে হাইপারগ্লাইসেমিয়া (Hyperglycemia) বলে। ডায়াবেটিস রোগীদের ক্ষেত্রে এটি একটি পরিচিত সমস্যা। টাইপ ১ ডায়াবেটিস, টাইপ ২ ডায়াবেটিস ও গর্ভকালীন ডায়াবেটিস—যেকোনো ধরণের ডায়াবেটিস রোগে আক্রান্ত রোগীর ক্ষেত্রেই হাইপারগ্লাইসেমিয়া দেখা দিতে পারে। হাইপারগ্লাইসেমিয়া এবং হাইপোগ্লাইসেমিয়া শব্দ দুটি দেখতে একই রকম মনে হলেও এই দুটি শব্দ পরস্পরের বিপরীত অর্থ বহন করে। রক্তে সুগারের মাত্রা যদি ন্যূনতম স্বাভাবিক মাত্রার চেয়েও কমে যায়, তখন সেই অবস্থাটিকে হাইপো-গ্লাইসেমিয়া (Hypoglycemia) বলা হয়। অপরদিকে, রক্তে শর্করা বা সুগার সর্বোচ্চ স্বাভাবিক মাত্রার চেয়ে বেড়ে যাওয়াকে হাইপার-গ্লাইসেমিয়া (Hyperglycemia) বলেকখনো কখনো ডায়াবেটিস নেই এমন কারোর ক্ষেত্রেও বিশেষ অসুস্থতার ইতিহাস থাকলে হাইপারগ্লাইসেমিয়া দেখা দিতে পারে। এমন কিছু বিশেষ অসুস্থতা হচ্ছে—ব্রেইন স্ট্রোক, হার্ট অ্যাটাক, কিংবা গুরুতর কোনো সংক্রমণে আক্রান্ত হওয়া।এই আর্টিকেলে ডায়াবেটিসে আক্রান্ত রোগীদের মধ্যে হাইপারগ্লাইসেমিয়ার প্রভাব ও চিকিৎসা নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে।

ID: 504

Context: রক্তে সুগার বেড়ে যাওয়ার লক্ষণগুলো

Question: রক্তে সুগার বেড়ে যাওয়ার লক্ষণগুলো কি কি?

Answer:

ডায়াবেটিস রোগীদের ক্ষেত্রে হাইপারগ্লাইসেমিয়ার লক্ষণগুলো সাধারণত কয়েক দিন বা কয়েক সপ্তাহ ধরে ধীরে ধীরে দেখা দেয়। কারো কারো ক্ষেত্রে রক্তের শর্করা বেড়ে অতি উচ্চমাত্রায় পৌঁছানোর আগে কোনো লক্ষণ না-ও দেখা দিতে পারে।হাইপারগ্লাইসেমিয়ার অন্যতম কিছু লক্ষণ হলো—অতিরিক্ত তৃষ্ণা পাওয়া

কিছুক্ষণ পরপর মুখ শুকিয়ে আসা

ঘন ঘন প্রস্রাব হওয়া

শারীরিক ও মানসিক ক্লান্তি

ঝাপসা দৃষ্টি

চেষ্টা ছাড়াই ওজন কমে যাওয়া

বারবার ইনফেকশন হওয়া। যেমন—ছত্রাকের সংক্রমণ (Thrush), মূত্রথলির সংক্রমণ (Cystitis) অথবা ত্বকের ইনফেকশন

পেট ব্যথা

বমি বমি ভাব বা বমি হওয়া

নিঃশ্বাসে মিষ্টি ফলের ন্যায় গন্ধ হওয়া হাইপারগ্লাইসেমিয়ার লক্ষণগুলো যেহেতু ডায়াবেটিসে আক্রান্ত হওয়া নির্দেশ করতে পারে, তাই ডায়াবেটিস নেই জানলেও, এসব লক্ষণগুলো দেখা দিলে এই ব্যাপারে নিশ্চিত হতে ডাক্তারের পরামর্শ নিতে হবে। প্রয়োজনে পরীক্ষাও করিয়ে নিতে পারেন।

ID: 505

Context: রক্তে সুগারের মাত্রা বেড়ে যাওয়ার কারণ

Question: রক্তে সুগারের মাত্রা বেড়ে যাওয়ার কারণ কি?

Answer:

নানান কারণে ডায়াবেটিস রোগীদের ব্লাড সুগারের লেভেল বেড়ে যেতে পারে। যেমন—মানসিক চাপ

যেকোনো অসুস্থতা (যেমন: ঠান্ডার সমস্যা)

অতিরিক্ত খাবার খাওয়া (যেমন: তিন বেলার খাবারের পাশাপাশি বিভিন্ন স্ন্যাকস খাওয়া)

ব্যায়াম না করা

ডায়াবেটিসের ঔষধের কোন ডোজ বাদ পড়া অথবা ভুল ডোজে ঔষধ সেবন করা

নির্দিষ্ট কিছু ঔষধ সেবন করা (যেমন: স্টেরয়েড)

রক্তে সুগারের মাত্রা অতিরিক্ত কমে গিয়ে হাইপোগ্লাইসেমিয়া হলে, প্রয়োজনের অতিরিক্ত চিকিৎসা চালিয়ে যাওয়াউল্লেখ্য, বাড়ন্ত শিশু-কিশোরদের বেড়ে ওঠার সময়ে কখনো কখনো হাইপারগ্লাইসেমিয়া দেখা দিতে পারে।

ID: 506

Context: রক্তে সুগারের মাত্রা ঠিক রাখার উপায়

Question: রক্তে সুগারের স্বাভাবিক লেভেল ঠিক রাখতে কি করা উচিৎ?

Answer:

প্রথমবার ডায়াবেটিস ধরা পড়ার পরে ডাক্তারের কাছ থেকে নিচের দুটি বিষয় জেনে নিন—আপনার রক্তে সুগারের মাত্রা কেমন

সুগার কোন মাত্রায় নামিয়ে আনা প্রয়োজন ঘরে বসেই রক্তে সুগারের মাত্রা মাপার মেশিন বা গ্লুকোমিটারের সাহায্যে নিয়মিত ডায়াবেটিস পরীক্ষা করে রক্তে সুগারের মাত্রা পর্যবেক্ষণ করা যায়। অথবা ২-৩ মাস পরপর হাসপাতালে গিয়ে এইচবিএওয়ানসি (HbA1c) নামক ডায়াবেটিসের পরীক্ষা করিয়ে নিতে পারেন। এই পরীক্ষার মাধ্যমে রক্তে সুগারের গড় মাত্রা এবং সুগার নিয়ন্ত্রিত হচ্ছে কি না সেই সম্বন্ধে ধারণা পাওয়া যায়। সাধারণত HbA1c এর মান ৬.৫% এর নিচে থাকা ভালো। সবার ক্ষেত্রে রক্তে সুগারের লক্ষ্যমাত্রা একই হয় না। তবে সাধারণত নিচের লক্ষ্যমাত্রাগুলোকে ব্লাড সুগারের স্বাভাবিক মাত্রা হিসেবে ধরা হয়—গ্লুকোমিটার: খালিপেটে ৪ থেকে ৭ মিলিমোল/লিটার এবং খাওয়ার ২ ঘন্টা পরে ৮.৫ থেকে ৯ মিলিমোল/লিটার

এইচবিএওয়ানসি (HbA1c) টেস্ট: ৬.৫ শতাংশ বা ৪৮ মিলিমোল/মোলের নিচে

ID: 507

Context: রক্তে সুগার বেড়ে যাওয়ার লক্ষণগুলো

Question: রক্তে সুগার বেড়ে গেলে কী হয়?

Answer:

ডায়াবেটিস চিকিৎসার প্রধান লক্ষ্য হলো ব্লাড সুগারের মাত্রা যতটুকু সম্ভব স্বাভাবিক মাত্রার কাছাকাছি রাখা। তবে সাবধানতা অবলম্বন করার পরেও ডায়াবেটিস রোগীদের কোনো না কোনো পর্যায়ে হাইপারগ্লাইসেমিয়ার সমস্যা দেখা দিতে পারে। হাইপারগ্লাইসেমিয়া নির্ণয় করে এর চিকিৎসা করা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। চিকিৎসা না নিলে হাইপারগ্লাইসেমিয়া থেকে বিভিন্ন জটিল স্বাস্থ্য সমস্যা তৈরি হতে পারে। হঠাৎ হঠাৎ ডায়াবেটিস রোগীর সুগারের লেভেল কিছুটা বেড়ে যেতে পারে। এটি সাধারণত তেমন উদ্বেগের বিষয় নয়, কারণ মৃদু হাইপারগ্লাইসেমিয়া সহজ চিকিৎসায় সেরে ওঠে। এমন কি কখনো কখনো সুগার বিশেষ চেষ্টা ছাড়াই স্বাভাবিক লেভেলে নেমে আসে। তবে যদি রক্তে সুগারের মাত্রা অনেক বেড়ে যায় অথবা দীর্ঘ সময় ধরে উচ্চমাত্রায় থাকে তাহলে এর পরিণতি মারাত্মক হতে পারে।রক্তের সুগার অতি উচ্চমাত্রায় পৌঁছে গেলে তা প্রাণঘাতী জটিলতা সৃষ্টি করতে পারে। যেমন—ডায়াবেটিক কিটোএসিডোসিস—ফ্যাট বা চর্বি ভেঙ্গে শরীরে শক্তি উৎপাদনের প্রয়োজন হলে এই অবস্থার সৃষ্টি হয়। চর্বি ভাঙনের ফলে দেহে কিটোন বডি নামক রাসায়নিক পদার্থ তৈরি হয়। অতিরিক্ত কিটোন বডি জমে গেলে ডায়াবেটিক কিটোএসিডোসিস দেখা দিতে পারে—যা থেকে রোগী ডায়াবেটিক কোমায় পর্যন্ত চলে যেতে পারে। সাধারণত টাইপ ১ ডায়াবেটিসের রোগীদের এই সমস্যা হয়ে থাকে।

হাইপারঅসমোলার হাইপারগ্লাইসেমিক স্টেট—রক্তের সুগার অতি উচ্চমাত্রায় পৌঁছে গেলে শরীর এই অতিরিক্ত সুগার বের করে দেয়ার চেষ্টা করে। এই প্রক্রিয়ায় মারাত্মক পানিশূন্যতা দেখা দেয়। সাধারণত টাইপ ২ ডায়াবেটিসের রোগীদের ক্ষেত্রে এই অবস্থা সৃষ্টি হয়।যদি মাসের পর মাস ব্লাড সুগারের লেভেল সবসময়ই বেশি থাকে, তাহলে শরীরের বিভিন্ন অংশের চিরস্থায়ী ক্ষতি হতে পারে। যেমন: চোখ, নার্ভ বা স্নায়ু, কিডনি ও রক্তনালীসমূহ—সারা জীবনের জন্য নষ্ট হয়ে যেতে পারে।তাই আপনার যদি নিয়মিত হাইপারগ্লাইসেমিয়া হয়, তাহলে দ্রুত ডাক্তারের শরণাপন্ন হোন। রক্তে সুগারের পরিমাণ স্বাস্থ্যকর মাত্রার কাছাকাছি রাখার জন্য চিকিৎসা ও জীবনধারায় কিছু পরিবর্তন আনার প্রয়োজন হতে পারে।

ID: 508

Context: রক্তের সুগার বেড়ে গেলে করণীয়

Question: রক্তের সুগার বেড়ে গেলে করণীয় কি?

Answer:

ডায়াবেটিক রোগীর ক্ষেত্রে যদি হাইপারগ্লাইসেমিয়ার লক্ষণ দেখা দেয়, তাহলে রক্তের সুগারে নিয়ন্ত্রণে ডাক্তারের দেওয়া পরামর্শগুলো মেনে চলতে হবে। আপনার করণীয় সম্পর্কে স্পষ্ট ধারণা না থাকলে ডাক্তারের সাথে কথা বলে আপনার করণীয় সম্পর্কে নিশ্চিত হয়ে নিন।সুগার কমানোর ঘরোয়া উপায়১. খাবারের তালিকা পরিবর্তন: যেসব খাবার খেলে রক্তে সুগার বেড়ে যায়, সেগুলো এড়িয়ে চলার পরামর্শ দেয়া হতে পারে। এসব খাবারের মধ্যে রয়েছে কেক, মিষ্টি ও বিভিন্ন চিনিযুক্ত পানীয়।২. প্রচুর পরিমাণে পানি ও চিনিমুক্ত পানীয় পান করা: এভাবে অতি উচ্চমাত্রার হাইপারগ্লাইসেমিয়ার কারণে সৃষ্ট পানিশূন্যতার সমাধান হবে। ৩. নিয়মিত শরীরচর্চা করা: নিয়মিত হাঁটাহাঁটির মতো হালকা ব্যায়াম করলেও তা ব্লাড সুগার নিয়ন্ত্রণে সাহায্য করতে পারে। অতিরিক্ত ওজনের অধিকারীদের ক্ষেত্রে বিভিন্ন শরীরচর্চা পদ্ধতি ওজন কমিয়ে আনতে সাহায্য করে। ওজন নিয়ন্ত্রণে থাকলে হাইপারগ্লাইসেমিয়া হওয়ার সম্ভাবনা কমে যায়।৪. ইনসুলিনের ডোজ পরিবর্তন: ইনসুলিন ব্যবহারকারীদের ক্ষেত্রে ব্লাড সুগার নিয়ন্ত্রণে আনার জন্য ইনসুলিনের ডোজ পরিবর্তনের প্রয়োজন হতে পারে। এ বিষয়ে ডাক্তারের কাছ থেকে সুনির্দিষ্ট পরামর্শ নেওয়া উচিত।৫. নিয়মিত পর্যবেক্ষণ: ডায়াবেটিস রোগীকে নিয়মিত রক্তের সুগার পরিমাপ করার পরামর্শ দেওয়া হয়ে থাকে। এ ছাড়া ডায়াবেটিক কিটোএসিডোসিস নির্ণয়ের উদ্দেশ্যে রক্ত অথবা মূত্র পরীক্ষায় কিটোন টেস্ট করা হতে পারে। ব্লাড সুগার পুরোপুরি নিয়ন্ত্রণে না আসা পর্যন্ত কোনো নতুন লক্ষণ দেখা দিচ্ছে কি না সেদিকেও খেয়াল রাখতে হবে। এমন লক্ষণ কোনো গুরুতর সমস্যা নির্দেশ করতে পারে৷ কখন জরুরি চিকিৎসা সেবা নিতে হবেরক্তে সুগারের মাত্রা বেশি থাকার পাশাপাশি নিম্নোক্ত লক্ষণগুলো দেখা দিলে দ্রুত ডাক্তারের সাথে যোগাযোগ করতে হবে—বমি বমি ভাব বা বমি হলে

পেটব্যথা ও ডায়রিয়া হলে

শ্বাসপ্রশ্বাস গভীর ও দ্রুত হয়ে গেলে

২৪ ঘন্টার বেশি সময় ধরে জ্বর থাকলে (অর্থাৎ, তাপমাত্রা ৩৮° সেলসিয়াস বা ১০০.৪° ফারেনহাইটের উপরে থাকলে)

পানিশূন্যতার লক্ষণ দেখা দিলে (যেমন: মাথাব্যথা, ত্বক শুষ্ক হয়ে যাওয়া, হৃৎস্পন্দন দ্রুত ও দুর্বল হয়ে যাওয়া)

ঝিমিয়ে পড়া অথবা সজাগ থাকতে কষ্ট হলেএসব লক্ষণ হাইপারগ্লাইসেমিয়ার কারণে সৃষ্ট গুরুতর জটিলতা (যেমন: ডায়াবেটিক কিটোএসিডোসিস ও হাইপারঅসমোলার হাইপারগ্লাইসেমিক স্টেট) এর চিহ্ন হতে পারে। এ সকল ক্ষেত্রে জরুরি হাসপাতালে গিয়ে চিকিৎসা নেওয়া প্রয়োজন।

ID: 509

Context: রক্তের সুগার বেড়ে যাওয়া প্রতিরোধের উপায়

Question: রক্তের সুগার বেড়ে যাওয়া প্রতিরোধের উপায় কি?

Answer:

সহজ কিছু উপায় অবলম্বন করে গুরুতর বা দীর্ঘমেয়াদী হাইপারগ্লাইসেমিয়ার ঝুঁকি কমানো সম্ভব। যেমন—খাবার ও পানীয় বিষয়ে সতর্ক হোন। অতিরিক্ত চিনিযুক্ত বা মিষ্টিজাতীয় খাবার কিভাবে রক্তের সুগারের মাত্রাকে প্রভাবিত করতে পারে সেই ব্যাপারে বিশেষভাবে সচেতন হোন।

চিকিৎসা পদ্ধতি সঠিকভাবে মেনে চলুন। ডাক্তারের পরামর্শ অনুযায়ী নিয়মিত ঔষধ সেবন করুন এবং ইনসুলিন নেওয়া চালিয়ে যান।

শুয়েবসে না থেকে যতটুকু সম্ভব সক্রিয় থাকার চেষ্টা করুন। নিয়মিত শরীরচর্চা রক্তে সুগারের মাত্রা নিয়ন্ত্রণে সাহায্য করে। তবে যারা ডায়াবেটিসের ঔষধ সেবন করেন তাদের ক্ষেত্রে ব্যায়াম শুরু করার আগে ডাক্তারের পরামর্শ নিতে হবে। কারণ কিছু ঔষধ খাওয়া অবস্থায় ভারী ব্যায়াম অথবা অধিক শরীরচর্চা করলে ঔষধগুলোর প্রভাবে সুগারের পরিমাণ অতিরিক্ত মাত্রা কমে হাইপোগ্লাইসেমিয়া হতে পারে।

অসুস্থ অবস্থায় বাড়তি যত্ন নিন। অসুস্থ অবস্থায় রক্তের সুগার নিয়ন্ত্রণে ডাক্তার কিছু বিশেষ পরামর্শ মেনে চলার উপদেশ দিতে পারেন।

ID: 510

Context: হাইপোগ্লাইসেমিয়া বা সুগার কমে যাওয়া

Question: হাইপোগ্লাইসেমিয়া বা সুগার কমে যাওয়া কি?

Answer:

রক্তে গ্লুকোজ বা সুগারের পরিমাণ স্বাভাবিক মাত্রার চেয়ে কমে গেলে তাকে হাইপোগ্লাইসেমিয়া বলা হয়। অনেকে একে সংক্ষেপে ‘হাইপো’ হিসেবে চেনেন। মূলত ডায়াবেটিসে আক্রান্ত রোগীদের, বিশেষ করে ইনসুলিন নিতে হয় এমন রোগীদের, হাইপোগ্লাইসেমিয়া দেখা দেয়।রক্তে গ্লুকোজ বা সুগারের পরিমাণ স্বাভাবিক মাত্রার চেয়ে কমে গেলে তাকে হাইপোগ্লাইসেমিয়া বলা হয়। অনেকে একে সংক্ষেপে ‘হাইপো’ হিসেবে চেনেন। মূলত ডায়াবেটিসে আক্রান্ত রোগীদের, বিশেষ করে ইনসুলিন নিতে হয় এমন রোগীদের, হাইপোগ্লাইসেমিয়া দেখা দেয়।অপরদিকে, রক্তে সুগারের মাত্রা বেড়ে যাওয়াকে হাইপারগ্লাইসেমিয়া বলে।হাইপোগ্লাইসেমিয়া হলে মাথা ঘুরানো ও বুক ধড়ফড় করা থেকে শুরু করে খিঁচুনি ও জ্ঞান হারানোর মতো মারাত্মক সমস্যা দেখা দিতে পারে। তাই ‘হাইপো’ এর লক্ষণগুলো দ্রুত শনাক্ত করে চিকিৎসা শুরু করা জরুরি। সাধারণত বাড়িতে বসে নিজে নিজেই এর চিকিৎসা করা সম্ভব।

ID: 511

Context: সুগার কমে যাওয়ার লক্ষণগুলো

Question: সুগার কমে যাওয়ার লক্ষণগুলো কি কি?

Answer:

হাইপোগ্লাইসেমিয়ার লক্ষণ একেকজনের ক্ষেত্রে একেক রকম হতে পারে। আপনার যদি বারবার সুগার কমে যাওয়ার ইতিহাস থাকে তাহলে আপনি নিজেই হয়তো লক্ষণগুলো খেয়াল করলে হাইপোগ্লাইসেমিয়া হচ্ছে কি না তা বুঝতে পারবেন। তবে সময়ের সাথে আপনার লক্ষণগুলোতেও ভিন্নতা আসতে পারে।রক্তে সুগার কমে যাওয়ার লক্ষণগুলোর মধ্যে কিছু লক্ষণ শুরুর দিকেই দেখা দেয়। দ্রুত চিকিৎসা শুরু না করলে খিঁচুনি ও জ্ঞান হারানোর মতো মারাত্মক সমস্যা দেখা দিতে পারে।শুরুর দিকের লক্ষণগুলো হলো—অতিরিক্ত ঘেমে যাওয়া

ক্লান্ত অনুভব করা

মাথা ঘুরানো

ক্ষুধা লাগা

ঠোঁটের চারিদিকে পিন বা সুঁই ফোটানোর মত অনুভূতি হওয়া

শরীরে কাঁপুনি হওয়া

বুক ধড়ফড় করা

সহজেই বিরক্ত, অশ্রুসিক্ত, উত্তেজিত অথবা খামখেয়ালি হয়ে যাওয়া

ফ্যাকাসে হয়ে যাওয়াসময়মতো চিকিৎসা শুরু না করলে আরও কিছু লক্ষণ দেখা দিতে পারে। যেমন—দুর্বলতা

দৃষ্টি ঝাপসা হয়ে যাওয়া

কাজে মনোযোগ দিতে কষ্ট হওয়া

বিভ্রান্তি

অসংলগ্ন আচরণ, কথা জড়িয়ে যাওয়া ও ভারসাম্যহীন হয়ে পড়া (মাতাল হলে যেমনটা হয়)

ঘুম ঘুম লাগা

খিঁচুনি

জ্ঞান হারিয়ে ফেলা বা ফিট হয়ে যাওয়াঘুমের মধ্যেও রোগী ‘হাইপো’ হয়ে যেতে পারে। এর ফলে নিচের লক্ষণগুলো দেখা দেয়—

রাতে ঘুম ভেঙে যাওয়া

মাথাব্যথা

ক্লান্ত লাগা

সারারাত অতিরিক্ত ঘেমে বিছানার চাদর ভিজে যাওয়াএসব লক্ষণ ছাড়াও বাড়িতে ডায়াবেটিস মাপা হলে যদি রক্তের সুগার ৪ পয়েন্টের (mmol/l) কম আসে তাহলে দ্রুত চিকিৎসা শুরু করতে হবে।

ID: 512

Context: রক্তে সুগার কমে যাওয়ার কারণ

Question: রক্তে সুগার কমে যাওয়ার কারণ কি?

Answer:

ডায়াবেটিসের রোগীদের রক্তে সুগারের মাত্রা কমে ‘হাইপো’ হয়ে যাওয়ার মূল কারণগুলো হলো—ঔষধের প্রভাব—বিশেষত ডায়াবেটিসের ঔষধের মধ্যে অতিরিক্ত পরিমাণে ইনসুলিন গ্রহণ, সালফোনাইলইউরিয়া (যেমন: গ্লিবেনক্ল্যামাইড ও গ্লিক্ল্যাজাইড) ও গ্লিনাইড (যেমন: রিপাগ্লিনাইড ও ন্যাটেগ্লিনাইড) গ্রুপের ঔষধ সেবন অথবা হেপাটাইটিস সি এর ঔষধ সেবন

কোনো বেলার খাবার বাদ দেওয়া অথবা দেরি করে খাওয়া

আহারের সময়ে যথেষ্ট পরিমাণে শর্করাযুক্ত খাবার না খাওয়া। যেমন: ভাত, রুটি, আলু, পাউরুটি, পাস্তা ও ফলমূল

ব্যায়াম করা—বিশেষ করে ভারী ব্যায়াম, ভারী কাজ অথবা পূর্বপরিকল্পনা ছাড়া ব্যায়াম করা

অতিরিক্ত মদপান অথবা খালি পেটে মদ পান করামাঝে মাঝে রক্তের সুগার কমে যাওয়ার কোনো স্পষ্ট কারণ খুঁজে পাওয়া যায় না। কোনো কোনো সময় ডায়াবেটিস নেই এমন ব্যক্তিদের ক্ষেত্রেও রক্তের সুগার কমে যেতে পারে।

ID: 513

Context: সুগার কমে যাওয়ার অন্যান্য কারণগুলো

Question: ডায়াবেটিস ছাড়াও সুগার কমে যাওয়ার অন্যান্য কারণগুলো কি?

Answer:

যাদের ডায়াবেটিস নেই তাদের সচরাচর হাইপোগ্লাইসেমিয়া হয় না। তবে ডায়াবেটিস ছাড়াও রক্তের সুগারের মাত্রা কমে যাওয়ার অন্যান্য কারণগুলোর মধ্যে রয়েছে—খাবার খাওয়ার পরে শরীরে অতিরিক্ত ইনসুলিন নিঃসরণ হওয়া। পাকস্থলীর অপারেশনসহ বিভিন্ন কারণে এই অবস্থার সৃষ্টি হয়। এক্ষেত্রে সাধারণত শর্করাবহুল খাবার খাওয়ার ৪ ঘন্টা পরে হাইপোগ্লাইসেমিয়ার উপসর্গ দেখা দেয়।

না খেয়ে থাকা অথবা রোযা রাখা

অপুষ্টি

গর্ভকালীন জটিলতা

গ্যাস্ট্রিক বাইপাস সার্জারি (ওজন কমানোর উদ্দেশ্যে পাকস্থলীর এক প্রকার অপারেশন)

অনিয়ন্ত্রিত মদ পান

বিভিন্ন শারীরিক সমস্যা। যেমন—

হরমোন জনিত সমস্যা

অগ্ন্যাশয়ের রোগ

লিভারের সমস্যা

কিডনি রোগ

অ্যাড্রেনাল গ্রন্থির রোগ অথবা হৃদরোগের মতো বিভিন্ন স্বাস্থ্য সমস্যা

কিছু ঔষধ। যেমন: ম্যালেরিয়ার চিকিৎসায় ব্যবহৃত কুইনাইনবারবার হাইপোগ্লাইসেমিয়ার লক্ষণ দেখা দিলে ডাক্তারের কাছে যেতে হবে। ডাক্তার রক্তে সুগারের মাত্রা প্রকৃতপক্ষেই কমে গিয়েছে কি না সেটি নির্ণয়ে কিছু সাধারণ পরীক্ষা-নিরীক্ষা করার পরামর্শ দিবেন। এ ছাড়া কী কারণে এসব লক্ষণ দেখা দিচ্ছে সেটিও খুঁজে বের করার চেষ্টা করবেন।

ID: 514

Context: রক্তে সুগার কমে গেলে করণীয়

Question: রক্তে সুগার কমে গেলে করণীয় কি?

Answer:

রক্তের সুগার ৪ পয়েন্টের নিচে নেমে গেলে অথবা হাইপোগ্লাইসেমিয়ার লক্ষণ দেখা দিলে নিচের কাজগুলো করুন—প্রথম ধাপ: চিনিযুক্ত খাবার খান অথবা চিনিযুক্ত পানীয় পান করুনএকটি ছোটো গ্লাসে কোমল পানীয় (যেমন: কোক বা সেভেন আপ) অথবা ফলের রস নিয়ে খান। বিকল্প হিসেবে ছোটো এক মুঠো মিষ্টি অথবা তিন থেকে ছয়টি গ্লুকোজ বা ডেক্সট্রোজ ট্যাবলেট খেতে পারেন।বাড়িতে গ্লুকোজ জেলের টিউব থাকলে দুই টিউব জেল মুখের ভেতরে দিয়ে খেয়ে ফেলুন।দ্বিতীয় ধাপ: ১০ মিনিট পরে আপনার রক্তের সুগার পরিমাপ করুনযদি এটি ৪ পয়েন্ট বা তার ওপরে থাকে এবং আপনি আগের তুলনায় ভালো অনুভব করেন তাহলে তৃতীয় ধাপে যান।যদি রক্তের সুগার এখনো ৪ পয়েন্টের নিচে থাকে তাহলে আবার প্রথম ধাপে গিয়ে চিনিযুক্ত পানীয় অথবা খাবার খান। এর ১০-১৫ মিনিট পরে আবার রক্তের সুগার পরীক্ষা করুন।তৃতীয় ধাপ: ইতোমধ্যে যদি আপনার খাবারের সময় হয়ে থাকে তাহলে খাবার খেয়ে নিন। এক্ষেত্রে এমন খাবার বেছে নেওয়া উচিত যা ধীরে ধীরে শরীরে শর্করা সরবরাহ করে। খাবারটি হতে পারে আটার রুটি (লাল আটার রুটি হলে ভালো হয়), ডাল ও সবজি দিয়ে রান্না করা খিচুড়ি, লাল চালের ভাত অথবা ওটস। এগুলোর সাথে গরুর দুধ অথবা দই খেতে পারেন। এক্ষেত্রে লো-ফ্যাট দুধ ও দই বেছে নেওয়া উত্তম।আহারের সময় না হয়ে থাকলে শর্করাযুক্ত কোনো নাস্তা খান। নাস্তাটি হতে পারে এক পিস পাউরুটি (হোলগ্রেইন হলে ভালো হয়), কয়েকটি বিস্কুট অথবা এক গ্লাস গরুর দুধ।আপনি যদি আগের চেয়ে সুস্থ অনুভব করেন অথবা হাতেগোনা কয়েকবার হাইপোগ্লাইসেমিয়ার লক্ষণ দেখা দিয়ে থাকে, তাহলে সাধারণত হাসপাতালে যাওয়ার প্রয়োজন হবে না। কিন্তু যদি বারবার হাইপোগ্লাইসেমিয়া হতে থাকে অথবা রক্তে সুগার কমে যাওয়ার পরও আপনার কোনো লক্ষণ দেখা না দেয় তাহলে ডাক্তারের সাথে যোগাযোগ করতে হবে।

ID: 515

Context: অজ্ঞান হওয়ার চিকিৎসা

Question: অজ্ঞান হয়ে পড়েছে এমন কারোর চিকিৎসা কিভাবে করবেন?

Answer:

প্রথমে রোগীকে নিচের বর্ণনা অনুযায়ী ‘রিকভারি পজিশন’ নামক একটি বিশেষ অবস্থানে রাখুন। এরপর যত দ্রুত সম্ভব রোগীকে হাসপাতালে নেওয়ার ব্যবস্থা করুন।নিস্তেজ অবস্থায় রোগীর গলায় যেন কিছু আটকে না যায় সেজন্য মুখে কোনো ধরনের খাবার দেওয়া থেকে বিরত থাকুন।রোগীকে রিকভারি পজিশনে রাখার উপায়নির্দেশনা অনুযায়ী রোগীকে এই অবস্থানে আনা কিছুটা চ্যালেঞ্জিং। কিন্তু এটি সঠিকভাবে সম্পন্ন করার মাধ্যমে রোগীর শ্বাসরুদ্ধ হওয়ার সম্ভাবনা কমিয়ে আনা যায়। নিচে রোগীকে রিকভারি পজিশনে রাখার উপায় নয়টি ধাপে তুলে ধরা হয়েছে—১. রোগীকে তার পিঠের ওপর শুইয়ে দিন।২. রোগীর একপাশে হাঁটু গেড়ে বসুন। রোগীর যেই হাতটি আপনার কাছে আছে সেটি রোগীর দেহের সাথে সমকোণে বাঁকিয়ে রাখুন। অর্থাৎ, রোগীর হাতটি কাঁধ বরাবর আড়াআড়িভাবে রাখুন। এভাবে রাখবেন যেন হাতের তালু ওপরের দিকে মুখ করে থাকে।৩.রোগীর অপর হাতটি বিশেষ কায়দায় ভাঁজ করতে হবে। এজন্য আপনি রোগীর যেদিকে বসেছেন সেই গালের ওপরে রোগীর অপর হাতটি বসান। রোগীর হাত এমনভাবে ভাঁজ করুন যেন এই হাতের পেছনের দিকটি রোগীর গালের ওপর থাকে। এবার আপনার এক হাত দিয়ে রোগীর হাতটি তার গালের ওপর ধরে রাখ…৪. এবার রোগীর যেই হাঁটু আপনার থেকে দূরে আছে সেটি ভাঁজ করতে হবে। আপনার যেই হাত খালি আছে সেটি দিয়ে রোগীর হাঁটু ৯০ ডিগ্রি কোণে বা সমকোণে ভাঁজ করুন।৫. রোগীর ভাঁজ করা হাঁটু ধরে রোগীকে সাবধানে টেনে একপাশে কাত করুন। এমনভাবে কাত করবেন যেন রোগী আপনার দিকে মুখ করে কাত হয়। যেই পা নিচে থাকবে সেটি যেন লম্বা হয়ে থাকে।৬. রোগীর ভাঁজ করা অর্থাৎ গালের ওপর রাখা হাত যেন মাথার ভারসাম্য ধরে রাখে সেটি নিশ্চিত করতে হবে। রোগীর অপর হাত অর্থাৎ আড়াআড়িভাবে রাখা হাতটি কোনো একপাশে বেশি কাত হয়ে যাওয়া প্রতিরোধ করবে।৭. রোগীকে কাত করার পরেও যেন ভাঁজ করা হাঁটু সমকোণে থাকে সেটি নিশ্চিত করুন।৮. রোগীর মাথা আলতো করে পেছনের দিকে কাত করুন এবং থুতনি উঁচু করে ধরুন। এভাবে শ্বাসনালী উন্মুক্ত করুন। শ্বাসপ্রশ্বাসে কোনো কিছু বাধা সৃষ্টি করছে কি না সেটি লক্ষ কর।৯. রোগীকে হাসপাতালে নেওয়ার ব্যবস্থা হওয়ার আগ পর্যন্ত রোগীকে এভাবে রেখে অবস্থা প্রতিনিয়ত পর্যবেক্ষণ করতে থাকুন।উল্লেখ্য, হাতের কাছে যদি গ্লুকাগন (Glucagon) ইনজেকশন থাকে এবং আপনি এটি দেওয়ার প্রক্রিয়া জানেন তাহলে রোগীকে রিকভারি পজিশনে রেখে এই ইনজেকশন দিন। তবে রোগী যদি ‘হাইপো’ হওয়ার আগে মদপান করে থাকে তাহলে এটি দেওয়া থেকে বিরত থাকতে হবে।যদি ইনজেকশন দেওয়ার ১০ মিনিটের মধ্যে অবস্থার উন্নতি না হয় তাহলে রোগীকে জরুরী ভিত্তিতে হাসপাতালে নিয়ে যেতে হবে।ইনজেকশন দেওয়ার ১০ মিনিটের মধ্যে যদি রোগীর জ্ঞান ফিরে আসে এবং রোগী সুস্থ বোধ করে তাহলে রোগীর অবস্থা পর্যবেক্ষণ করুন। যদি তিনি ঠিকমতো খাওয়াদাওয়া করতে পারেন তাহলে তাকে শর্করাযুক্ত একটি স্ন্যাকস খেতে দিন। স্ন্যাকস হিসেবে এক পিস পাউরুটি বা টোস্ট (হোলগ্রেইন হলে ভালো হয়), কয়েকটি বিস্কুট অথবা এক গ্লাস গরুর দুধ বেছে নিতে পারেন।রোগীর জ্ঞান ফিরে আসলেও নিচের দুটি ক্ষেত্রে রোগীকে হাসপাতালে নিতে হবে—বমি হলে

রক্তের সুগার আবারও কমে গেলেআপনি কখনো গুরুতর হাইপোগ্লাইসেমিয়ার কারণে জ্ঞান হারিয়ে থাকলে ডাক্তারকে বিষয়টি অবহিত করা জরুরি।

ID: 516

Context: খিঁচুনি এর চিকিৎসা

Question: খিঁচুনি হচ্ছে এমন কারও চিকিৎসা যেভাবে করবেন?

Answer:

রক্তে সুগার কমে যাওয়ার কারণে কারও খিঁচুনি হলে নিচের পদক্ষেপগুলো অনুসরণ করুন—১. রোগীর সাথে থাকুন। তিনি যেন আঘাত না পান সেদিকে লক্ষ রাখুন। রোগীকে নরম কিছুর ওপরে শুইয়ে দিন। সবধরনের বিপদজনক জিনিস থেকে রোগীকে দূরে সরিয়ে রাখুন। যেমন: রাস্তাঘাট, চুলা, হিটার, রেডিয়েটর ও উন্মুক্ত বৈদ্যুতিক সংযোগ।২. যদি পাঁচ মিনিটের বেশি সময় ধরে খিঁচুনি থাকে তাহলে রোগীকে জরুরী ভিত্তিতে হাসপাতালে নেওয়ার ব্যবস্থা করুন।৩. খিঁচুনি বন্ধ হয়ে গেলে রোগীকে চিনিযুক্ত খাবার খেতে দিন এবং হাইপোগ্লাইসেমিয়ার চিকিৎসার সাধারণ পদ্ধতি অনুসরণ করুন।মারাত্মক হাইপোগ্লাইসেমিয়ার কারণে আপনার কখনো খিঁচুনি হয়ে থাকলে ডাক্তারকে বিষয়টি অবহিত করা গুরুত্বপূর্ণ।

ID: 517

Context: সুগার কমে যাওয়া প্রতিরোধের উপায়

Question: ঘরোয়া উপায়ে সুগার কমে যাওয়া প্রতিরোধের উপায়গুলো কি?

Answer:

ডায়াবেটিসের রোগীরা নিচের ছয়টি উপদেশ মেনে চলার মাধ্যমে রক্তের সুগার কমে হাইপো হয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা কমিয়ে আনতে পারেন—১ .নিয়মিত. রক্তের সুগার লেভেল পরিমাপ করতে হবে। রক্তের সুগার কমে যাওয়ার লক্ষণগুলো সম্পর্কে সচেতন থাকতে হবে। এভাবে হাইপোগ্লাইসেমিয়ার লক্ষণ দেখা দিলে দ্রুত চিকিৎসা শুরু করে মারাত্মক নানান জটিলতা এড়ানো সম্ভব হবে২. সবসময় কিছু চিনিযুক্ত খাবার অথবা পানীয় সাথে রাখতে হবে। যেমন: গ্লুকোজ বা ডেক্সট্রোজ ট্যাবলেট, ফলের জুস, কিছু মিষ্টি অথবা লজেন্স। যদি গ্লুকাগন ইনজেকশন কিট থাকে তাহলে সেটি সবসময় সাথে রাখতে হবে৩. কোনো বেলার আহার বাদ দেওয়া যাবে না। সঠিক সময়ে প্রতি বেলার খাবার খেয়ে নিতে হবে। বিশেষ করে সকালের নাস্তা কোনোভাবেই বাদ দেওয়া যাবে না। আপনি বিশেষ কোনো ডায়েট অনুসরণ করলে এ ব্যাপারে ডাক্তারের পরামর্শ নিন।৪. ব্যায়াম করার সময়ে সতর্ক থাকতে হবে। ব্যায়ামের আগে শর্করাযুক্ত স্ন্যাকস খেয়ে নিলে সেটি ‘হাইপো’ এর ঝুঁকি কমাতে সাহায্য করে। ভারী ব্যায়াম করার আগে অথবা পরে ইনসুলিনসহ ডায়াবেটিসের কিছু ঔষধের ডোজ কমানোর প্রয়োজন হতে পারে। এ ব্যাপারে ডাক্তারের কাছ থেকে বিস্তারিত জেনে নিন৫. বিশেষত ইনসুলিন ব্যবহারকারী রোগীর ঘুমের মধ্যে হাইপো হয়ে যেতে পারে। এই ঘটনা প্রতিরোধে ঘুমাতে যাওয়ার আগে বিস্কুট অথবা এক পিস পাউরুটির মতো শর্করাযুক্ত স্ন্যাকস খেতে হবে৬. অতিরিক্ত মদপান থেকে বিরত থাকতে হবে।যদি বারবার রক্তের সুগারের পরিমাণ কমে যায় তাহলে সেটি প্রতিরোধ করার উপায় জানতে ডাক্তারের পরামর্শ নিন।

ID: 518

Context: রক্তে সুগারের স্বল্পতা এবং গাড়ি চালানোর নিয়মগুলো

Question: রক্তে সুগারের স্বল্পতা এবং গাড়ি চালানোর নিয়মগুলো কি কি?

Answer:

ডায়াবেটিস অথবা অন্য কোনো রোগের কারণে রক্তের সুগার কমে যাওয়ার সম্ভাবনা থাকলেও আপনি হয়তো গাড়ি চালাতে পারবেন। তবে এক্ষেত্রে বিপদ এড়াতে কিছু বাড়তি সতর্কতা অবলম্বন করা খুবই গুরুত্বপূর্ণ।ডায়াবেটিস রোগীদের পেশাগত কারণে কিংবা নিত্যদিনের যাতায়াতে গাড়ি (যেমন: সিএনজি, মোটরগাড়ি, পিকআপ, বাস ও ট্রাক) চালাতে হতে পারে। এক্ষেত্রে হাইপোগ্লাইসেমিয়ার ঝুঁকি এড়াতে নিচের তিনটি বিষয় নিশ্চিত করা উচিত—গাড়ী চালানোর পূর্বে ২ ঘন্টার ভেতর ব্লাড সুগারের লেভেল পরিমাপ করা

দীর্ঘ সময় ধরে গাড়ি চালালে ২ ঘন্টা পর পর ব্লাড সুগারের লেভেল পরিমাপ করা

যাত্রা শুরু করার সময়ে চিনিযুক্ত হালকা নাস্তা এবং কলা অথবা আটার রুটির মতো শর্করা জাতীয় খাবার সাথে রাখাচলন্ত অবস্থায় যদি মনে হয় সুগারের মাত্রা কমে ‘হাইপো’ হয়ে গিয়েছে তাহলে—নিরাপদ স্থানে গাড়ি থামিয়ে ফেলতে হবে

চাবি সরিয়ে নিয়ে গাড়ি বন্ধ করে রাখতে হবে

চালকের আসন থেকে সরে যেতে হবে

গ্লুকোমিটারের সাহায্যে রক্তের সুগারের লেভেল মাপতে হবে। যদি হাইপোগ্লাইসেমিয়া হয়ে থাকে তাহলে দ্রুত প্রয়োজনীয় চিকিৎসা নিতে হবে

স্বাভাবিক বোধ করার অন্তত ৪৫ মিনিট হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত গাড়ি চালানো যাবে না

ID: 524

Context: হার্ট অ্যাটাক

Question: হার্ট অ্যাটাক কি?

Answer:

হৃৎপিণ্ড বা হার্ট আমাদের শরীরে রক্ত সরবরাহের কেন্দ্র হিসেবে কাজ করে। কাজটি নির্বিঘ্নে চালিয়ে যেতে রক্তনালীর মাধ্যমে হার্টের নিজস্ব রক্ত সরবরাহও নিরবচ্ছিন্নভাবে বজায় থাকতে হয়।হৃৎপিণ্ড বা হার্ট আমাদের শরীরে রক্ত সরবরাহের কেন্দ্র হিসেবে কাজ করে। কাজটি নির্বিঘ্নে চালিয়ে যেতে রক্তনালীর মাধ্যমে হার্টের নিজস্ব রক্ত সরবরাহও নিরবচ্ছিন্নভাবে বজায় থাকতে হয়।কোনো কারণে হার্টের এই নিজস্ব রক্তনালীগুলো সংকুচিত হয়ে গেলে অথবা রক্তনালীর ভেতরে ব্লক বা বাধা সৃষ্টি হলে হার্টের রক্ত চলাচলে বিঘ্ন ঘটে। এই অবস্থাকে হার্ট অ্যাটাক বলা হয়। হার্ট অ্যাটাককে মেডিকেলের ভাষায় মায়োকার্ডিয়াল ইনফার্কশন (এমআই) বলা হয়।হার্ট অ্যাটাক একটি ইমারজেন্সি অবস্থা। আপনার অথবা আপনার আশেপাশের কারও হার্ট অ্যাটাকের লক্ষণ দেখা দিলে যত দ্রুত সম্ভব রোগীকে হাসপাতালে নেওয়ার ব্যবস্থা করতে হবে।হার্টে রক্ত সরবরাহ বন্ধ থাকলে সেটি হার্টের পেশীগুলোর মারাত্মক ক্ষতি করতে পারে। এর ফলে রোগীর জীবন হুমকির মুখে পড়তে পারে।

ID: 525

Context: হার্ট অ্যাটাকের লক্ষণগুলো

Question: হার্ট অ্যাটাকের লক্ষণগুলো কি?

Answer:

হার্ট অ্যাটাকের কিছু লক্ষণ হলো—১. বুকে ব্যথা: বুকের মাঝখানে চাপ ধরার মতো ব্যথা হতে পারে। এছাড়া রোগীর বুকের মধ্যে কিছু চেপে বসে আছে অথবা কিছু আটকে (টাইট হয়ে) আসছে এমন অনুভূত হতে পারে২. শরীরের অন্য জায়গায় ব্যথা: এই ব্যথা বুক থেকে হাতে চলে আসছে এমন মনে হতে পারে। সাধারণত বাম হাতে এমন ব্যথা হয়। তবে এই ব্যথা উভয় হাতেই যেতে পারে। হাতের পাশাপাশি চোয়াল, ঘাড়, পিঠ ও পেটে ব্যথা যেতে পারে।৩. মাথা ঘুরানো অথবা মাথা ঝিমঝিম করা৪. শরীরের ঘেমে যাওয়া৫. শ্বাসকষ্ট ৬. বমি বমি ভাব অথবা বমি হওয়া৭. প্রচণ্ড উদ্বিগ্ন হয়ে পড়া: রোগী অস্বাভাবিক অস্থিরতা অনুভব করবেন (প্যানিক অ্যাটাক) অথবা তিনি মারা যাচ্ছেন এমন মনে হবে।মনে রাখতে হবে, হার্ট অ্যাটাক হলেই সবার বুকে তীব্র ব্যথা হবে—এমনটি নয়। কারও কারও ক্ষেত্রে ব্যথাটি বদহজম অথবা গ্যাস্ট্রিকের ব্যথার মতো সামান্য বা মৃদু হতে পারে। কেউ কেউ আবার একেবারেই ব্যথা অনুভব করেন না। বিশেষত অনেক নারী রোগীর ক্ষেত্রে এমনটি দেখা যায়।এসব ক্ষেত্রে রোগীর আসলেই হার্ট অ্যাটাক হচ্ছে কি না তা বুক ব্যথার তীব্রতার ওপর নয়, বরং আনুষঙ্গিক লক্ষণগুলো পর্যবেক্ষণ করার মাধ্যমে নির্ধারণ করতে হয়।হার্ট অ্যাটাক হচ্ছে মনে হলে দেরি না করে হাসপাতালে যেতে হবে। লক্ষণগুলো নিয়ে সন্দেহ থাকলেও চিকিৎসা নিতে দ্বিধা করা ঠিক নয়। কারণ অন্য কোনো রোগের কারণে লক্ষণগুলো দেখা দিলে হাসপাতালে সেটিরও চিকিৎসা করা সম্ভব। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে হার্ট অ্যাটাক হয়ে থাকলে যদি সঠিক চিকিৎসা না নেওয়া হয় তাহলে রোগীর মৃত্যু পর্যন্ত হতে পারে।গুরুত্বপূর্ণ: কিছু ক্ষেত্রে হার্ট অ্যাটাক হলে হার্ট রক্ত পাম্প করা একেবারে বন্ধ করে দিয়ে স্থবির হয়ে যেতে পারে। এই ঘটনাকে কার্ডিয়াক অ্যারেস্ট বলা হয়ে থাকে। কার্ডিয়াক অ্যারেস্টের লক্ষণগুলোর মধ্যে রয়েছে—

রোগী শ্বাস নিচ্ছে না বলে মনে হওয়া

রোগীর সব ধরনের নড়াচড়া বন্ধ হয়ে যাওয়া

রোগীর সাথে কথা বললে বা তার গায়ে সজোরে ধাক্কা দিলেও কোনো সাড়া না পাওয়া

যদি কারও কার্ডিয়াক অ্যারেস্ট হচ্ছে বলে মনে হয় তাহলে সাথে সাথে রোগীকে সিপিআর (কার্ডিওপালমোনারি রিসাসিটেশন) দিতে হবে। একই সাথে অন্যদের সাহায্য নিয়ে রোগীকে যত দ্রুত সম্ভব হাসপাতালে নেওয়ার ব্যবস্থা করতে হবে।

সিপিআর দিয়ে আপনি কার্ডিয়াক অ্যারেস্টের রোগীর জীবন বাঁচাতে পারেন। অ্যাম্বুলেন্স আসার আগে কীভাবে সিপিআর দিয়ে রোগীর জীবন বাঁচাতে পারেন জানতে নিচের ভিডিওটি দেখুন।হার্ট অ্যাটাকের লক্ষণ আর্টিকেলে সিপিআর দেওয়ার নিয়ম সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে।বিস্তারিত পড়ুন: হার্ট অ্যাটাক শনাক্তকরণ

ID: 526

Context: হার্ট অ্যাটাকের চিকিৎসা

Question: হার্ট অ্যাটাকের চিকিৎসা কিভাবে করা হয়?

Answer:

রোগীর হার্ট অ্যাটাক হচ্ছে মনে হলে যত দ্রুত সম্ভব রোগীকে হাসপাতালে নিয়ে যেতে হবে। হার্টের ওপরে চাপ কমাতে হাসপাতালে পৌঁছানোর পূর্বের সময়টুকুতে রোগীকে সম্পূর্ণ বিশ্রামে থাকতে হবে। হাতের কাছে অ্যাসপিরিন (৩০০ মিলিগ্রাম) ট্যাবলেট থাকলে এবং রোগীর অ্যাসপিরিন জাতীয় ঔষধে কোনো অ্যালার্জি না থাকলে হাসপাতালে পৌঁছানো পর্যন্ত আস্তে আস্তে চিবিয়ে ট্যাবলেটটি খেতে পারে।অ্যাসপিরিন রক্ত পাতলা করে এবং হার্টে রক্ত সরবরাহ বাড়াতে সাহায্য করে।হার্ট অ্যাটাক কতটা গুরতর সেটির ওপর নির্ভর করে হাসপাতালে সঠিক চিকিৎসা পদ্ধতি বেছে নেওয়া হয়। প্রধান দুটি চিকিৎসা পদ্ধতি হলো—জমাট বাঁধা রক্ত ভাঙতে ঔষধ দেওয়া

হার্টের রক্ত সরবরাহ স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরিয়ে আনতে অপারেশন করাবিস্তারিত পড়ুন: হার্ট অ্যাটাকের চিকিৎসা

ID: 527

Context: হার্ট অ্যাটাকের কারণগুলো

Question: হার্ট অ্যাটাকের কারণগুলো কি কি?

Answer:

হার্ট অ্যাটাকের প্রধান কারণ হলো রক্তনালী সম্পর্কিত হৃদরোগ বা করোনারি হার্ট ডিজিজ।হার্টে রক্ত সরবরাহকারী প্রধান রক্তনালীগুলোকে করোনারি আর্টারি বা ধমনী বলা হয়। করোনারি হার্ট ডিজিজে এসব ধমনীর ভেতরে কোলেস্টেরল জমা হয়ে রক্তের স্বাভাবিক প্রবাহে বাধা সৃষ্টি করে। জমাট বাঁধা এসব কোলেস্টেরলকে প্ল্যাক বলা হয়।হার্ট অ্যাটাকের আগে এমন একটি কোলেস্টেরল প্ল্যাক ফেটে যায়। ফলে সেখানে রক্ত জমাট বাঁধে। এই জমাট বাঁধা রক্ত হার্টে রক্ত সরবরাহে বাধা সৃষ্টি করে।কিছু বিষয়ের কারণে করোনারি হার্ট ডিজিজে আক্রান্ত হওয়ার ঝুঁকি বেড়ে যায়। যেমন—ধূমপান করা

উচ্চ রক্তচাপ

রক্তে অতিরিক্ত কোলেস্টেরল থাকা

খাদ্যে অস্বাস্থ্যকর চর্বিবহুল খাবার রাখা

নিয়মিত শারীরিক পরিশ্রমের অভাব

অতিরিক্ত ওজনের অধিকারী হওয়া

ডায়াবেটিসএছাড়া আপনার বাবা অথবা ভাই ৫৫ বছর বয়সের আগে কিংবা আপনার মা অথবা বোন ৬৫ বছর বয়সের আগে হার্ট অ্যাটাক অথবা স্ট্রোকে আক্রান্ত হয়ে থাকলে, আপনারও করোনারি হার্ট ডিজিজে আক্রান্ত হওয়ার ঝুঁকি বেড়ে যাবে।বিস্তারিত পড়ুন: হার্ট অ্যাটাকের কারণ ও প্রতিরোধ

ID: 528

Context: হার্ট অ্যাটাকের পরে সুস্থতা লাভ করার উপা

Question: হার্ট অ্যাটাকের পরে সুস্থতা লাভ করার উপায় কি?

Answer:

হার্ট অ্যাটাকের পরে আরোগ্য লাভ করতে কতটুকু সময় লাগবে তা নির্ভর করে হার্টের পেশীগুলো কী পরিমাণে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে সেটির ওপর। বেশীরভাগ রোগীই হার্ট অ্যাটাকের পরে স্বাভাবিক কাজকর্মে ফিরে যেতে পারেন। কেউ কেউ ২ সপ্তাহ পরেই কাজে যোগ দিতে পারেন। আবার অন্যদের সুস্থ হয়ে উঠতে কয়েক মাস সময় লেগে যেতে পারে। একজন রোগী কত দ্রুত কাজে ফিরতে পারবেন সেটি নির্ভর করে তার স্বাস্থ্য, হার্টের অবস্থা ও কাজের ধরনের ওপর।আরোগ্য লাভের প্রক্রিয়ার মূল উদ্দেশ্য হলো—১. জীবনধারায় বিভিন্ন স্বাস্থ্যকর পরিবর্তনের সমন্বয় ঘটিয়ে (যেমন: স্বাস্থ্যকর ও সুষম ডায়েট) এবং রক্তের কোলেস্টেরল কমানোর ঔষধ (যেমন: স্ট্যাটিন গ্রুপের ঔষধ) সেবনের মাধ্যমে পুনরায় হার্ট অ্যাটাক হওয়ার ঝুঁকি কমিয়ে আনা।২. ধীরে ধীরে শারীরিক সুস্থতা বা ফিটনেস ফিরিয়ে আনা যেন রোগী স্বাভাবিক জীবনে ফিরতে পারেন। এই প্রক্রিয়াকে কার্ডিয়াক পুনর্বাসন বলা হয়।

ID: 529

Context: হার্ট অ্যাটাক-পরবর্তী স্বাস্থ্য জটিলতাগুলো

Question: হার্ট অ্যাটাক-পরবর্তী স্বাস্থ্য জটিলতাগুলো কি কি?

Answer:

হার্ট অ্যাটাকের ফলে সৃষ্ট জটিলতাগুলো গুরুতর—এমনকি প্রাণঘাতী হতে পারে। এসব জটিলতার মধ্যে রয়েছে—অ্যারিদমিয়া: সহজ ভাষায় অস্বাভাবিক হৃৎস্পন্দন বা হার্টবিটকে অ্যারিদমিয়া বলা হয়। এক ধরনের অ্যারিদমিয়াতে হার্ট প্রথমে খুব দ্রুত স্পন্দন বা পাম্প করতে শুরু করে। এরপর হঠাৎ হার্টে খিঁচুনির মতো অবস্থা শুরু হয়ে যায় এবং হার্ট কাজ করা সম্পূর্ণভাবে বন্ধ করে দেয় (কার্ডিয়াক অ্যারেস্ট)

কার্ডিওজেনিক শক: এক্ষেত্রে হার্ট অ্যাটাকের পরে হার্টের পেশীগুলো এতটাই দুর্বল হয়ে পড়ে যে হার্ট স্বাভাবিক শারীরিক কার্যকলাপ চালিয়ে যাওয়ার জন্য দেহে যথেষ্ট পরিমাণ রক্ত সঞ্চালন করতে ব্যর্থ হয়

হার্ট রাপচার: এই অবস্থায় হার্টের পেশী, দেয়াল অথবা ভেতরের ভালভগুলোর যেকোনোটি ছিঁড়ে বা ফেটে যেতে পারেএসব জটিলতা হার্ট অ্যাটাকের অল্প সময়ের মাঝেই দেখা দিতে পারে। এগুলো হার্ট অ্যাটাক জনিত মৃত্যুর প্রধান কারণ। এসব জটিলতা থেকে অনেকে হাসপাতালে পৌঁছানোর পূর্বে কিংবা হার্ট অ্যাটাক হওয়ার এক মাসের মধ্যে আকস্মিকভাবে মৃত্যুবরণ করতে পারেন।একজন রোগীর মধ্যে এসব জটিলতা কতটুকু প্রভাব ফেলবে সেটি কয়েকটি বিষয়ের ওপর নির্ভর করে। যেমন—বয়স বাড়ার সাথে বিভিন্ন গুরুতর জটিলতা দেখা দেওয়ার সম্ভাবনা বেড়ে যায়

হার্ট অ্যাটাকের ধরনটি কতটা গুরুতর এবং অ্যাটাকের ফলে হার্টের পেশীগুলো কতটুকু ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে তার ওপর জটিলতার তীব্রতা নির্ভর করেএ ছাড়া লক্ষণ দেখা দেওয়ার পর থেকে চিকিৎসা শুরু করতে যতটুকু সময় লাগে সেটি বিভিন্ন জটিলতা দেখা দেওয়ার সম্ভাবনার ওপর প্রভাব ফেলে।বিস্তারিত পড়ুন: হার্ট অ্যাটাকের জটিলতা

ID: 530

Context: হার্ট অ্যাটাক প্রতিরোধের উপায়গুলো

Question: হার্ট অ্যাটাক প্রতিরোধের উপায়গুলো কি কি?

Answer:

হার্ট অ্যাটাক প্রতিরোধ করার পাঁচটি প্রধান উপায় এখানে তুলে ধরা হয়েছে। ইতোমধ্যে হার্ট অ্যাটাক হয়েছে এমন ব্যক্তিও এই পাঁচটি উপদেশ মেনে চলার মাধ্যমে পুনরায় হার্ট অ্যাটাক হওয়ার ঝুঁকি কমিয়ে আনতে পারবেন। উপায়গুলো হলো—১. ধূমপানের অভ্যাস থাকলে সেটি ছেড়ে দিতে হবে।২. শরীরের ওজন বেশি হলে সেটি কমিয়ে ফেলতে হবে।৩. নিয়মিত ব্যায়াম করতে হবে। প্রাপ্তবয়স্ক ব্যক্তিদের সপ্তাহে কমপক্ষে আড়াই ঘণ্টা মাঝারি ধরনের ব্যায়াম করা উচিত। প্রথমবারের মতো ব্যায়াম করা শুরু করার আগে ডাক্তারের পরামর্শ নিন।৪. খাবারে ফ্যাটের পরিমাণ কমিয়ে পূর্ণশস্য (যেমন: ঢেঁকিছাটা চাল বা লাল চাল ও লাল আটার রুটি) সহ ফাইবারযুক্ত খাবার বেশি বেশি খেতে হবে। এছাড়া প্রতিদিনের খাবার তালিকায় প্রচুর ফলমূল ও শাকসবজি রাখতে হবে।৫. মদপানের অভ্যাস থাকলে সেটি ছেড়ে দিতে হবে

ID: 685

Context: ১২ সপ্তাহে ওজন কমানোর উপায়

Question: ১২ সপ্তাহে ওজন কমানোর উপায়: প্রথম সপ্তাহ

Answer:

দ্রুত ওজন কমানোর পর অধিকাংশ মানুষের পক্ষেই তা ধরে রাখা সম্ভব হয় না। স্থায়ীভাবে ওজন কমানোর সবচেয়ে কার্যকর পদ্ধতি হলো স্বাস্থ্যকর অভ্যাস তৈরি করার মাধ্যমে পর্যায়ক্রমে ওজন নিয়ন্ত্রণে আনা। আর এজন্য সর্বপ্রথম ধাপ হচ্ছে স্বাস্থ্যকর খাবারগুলো চিনে নেয়া এবং সেই অনুযায়ী দৈনন্দিন খাদ্যাভ্যাস গড়ে তোলা।

একই ধরণের স্বাস্থ্যকর খাবার সবার পছন্দ নয়। খেয়ে তৃপ্তি আসে না এমন খাবার খেয়ে খুব দ্রুত ওজন কমানো গেলেও অধিকাংশ ক্ষেত্রে তা আর ধরে রাখা সম্ভব হয় না। তাই আগামী কয়েক সপ্তাহে আমরা আপনাকে সাহায্য করবো এমন সব খাবার খুঁজে পেতে যা স্বাস্থ্যকর এবং আপনার রুচির সাথে মানানসই। এতে আপনার দীর্ঘমেয়াদি স্বাস্থ্যকর খাদ্যাভ্যাস গড়ে উঠবে। পাশাপাশি কষ্ট করে কমানো ওজন ও মেদ যেন আবার ফিরে না আসে সেটিও নিশ্চিত করা যাবে।

ID: 686

Context: ১ সপ্তাহে দরকারি অভ্যাসগুলো

Question: ১ সপ্তাহে যে অভ্যাসগুলো শুরু করবেন?

Answer:

আগামী ১২ সপ্তাহের অগ্রগতি বুঝার জন্য প্রতি সপ্তাহের শুরুতে আপনার ওজন ও কোমরের মাপের একটি রেকর্ড রাখুন। প্রতি সপ্তাহের পরিবর্তন আপনাকে পরবর্তী সপ্তাহগুলোতেও কার্যক্রমগুলো ধরে রাখার অনুপ্রেরণা যোগাবে।

ছোট আকারের প্লেট ও বাটি ব্যবহার করুন। এতে অতিরিক্ত খাবার আঁটানোর সুযোগ থাকবে না, ফলে সঠিক পরিমাণে খাওয়া হবে। আপনিও খেয়ে তৃপ্তি পাবেন, অতিরিক্ত খাওয়ার কারণে অস্বস্তি হবেনা।

প্রতিবেলায় খাবার খাওয়ার আগে ৫০০ মিলিলিটার বা দুই গ্লাস পানি খেয়ে নিবেন। এটি আপনার পেট ভরাতে সাহায্য করে। গবেষণায় দেখা গেছে, এই সহজ অভ্যাসটি আপনার ওজন কমাতে বেশ কার্যকর।

লিফটের বদলে সিঁড়ি ব্যবহার করুন। এটি আপনাকে সামনের সপ্তাহগুলোর ব্যায়ামের জন্য প্রস্তুত করবে।

ID: 687

Context: ওজন কমানোর ডায়েট চার্ট

Question: ওজন কমানোর ডায়েট চার্ট কি?

Answer:

\*সকালের নাস্তা,

আমরা এখানে কয়েক ধরণের নাস্তা উল্লেখ করছি। আপনার যেটা ভালো লাগে, সেটাই খেতে পারবেন। তবে শুধু খেয়াল রাখবেন, নাস্তায় যেসব খাবার খাচ্ছেন সেগুলোর ক্যালরির যোগফল যেন নারীদের ক্ষেত্রে ২৮০ এবং পুরুষদের ক্ষেত্রে ৩৮০ এর বেশি না হয়। সকালের নাস্তায় খেতে পারেন এমন কিছু খাবার নিচে তুলে ধরা হলো—

খাবার ক্যালরির পরিমাণ

\* ১টি মাঝারি কলা প্রায় ৮০ ক্যালরি।

\* ১টি সেদ্ধ ডিম প্রায় ৮০ ক্যালরি।

\* ১টি বড় খেজুর প্রায় ৭০ ক্যাল।

\* আধা কাপ দুধ প্রায় ৮০ ক্যালরি।

\* তেল ছাড়া আটার বা লাল আটার রুটি (৬ ইঞ্চি আকারের) প্রায় ৯০ ক্যাল।

\* ১টি মাল্টা প্রায় ৮০ ক্যালরি।

\* ১টি মাঝারি আপেল প্রায় ১০০ ক্যাল।

\* ১ স্লাইস আটার (লাল আটা হলে ভাল) তৈরি বা হোলগ্রেইন পাউরুটি (৫০ গ্রাম) প্রায় ১০০ ক্যালরি।

আধা কাপ শুকনো ওটস ১৫০ ক্যালরি

এক চা চামচ তেল দিয়ে রান্না করা আধা কাপ সবজি প্রায় ৯০ ক্যালরি

এ খাবারগুলো যেভাবে খাওয়া যেতে পারে—

কলা, দুধ দিয়ে রান্না করা ১/২ কাপ ওটস।

রুটি, সবজি, ডিম, আপেল।

ডিম, মাল্টা, দুধ দিয়ে রান্না করা ১/৪ কাপ ওটস, খেজুর ইত্যাদি।

আমরা যে তালিকা দিয়েছি সেভাবেই যে খেতে হবে, তা নয়। আপনি নিজের পছন্দমত খাবার খেতে পারবেন। তবে অতিরিক্ত ক্যালরি যেহেতু ওজন বাড়ার ক্ষেত্রে দৃশ্যমান ভূমিকা রাখে, তাই কত ক্যালরি খাচ্ছেন সে ব্যাপারটা মাথায় রাখবেন।

\* দুপুরের খাবার,

দুপুরের খাবার খাওয়ার সময় মনে মনে আপনার প্লেটকে চারটি সমান ভাগে ভাগ করে ফেলুন। এবার প্লেটের চারভাগের দুইভাগ ভরে নিবেন শাকসবজি ও ফলমূল দিয়ে। বাকি দুইভাগের একভাগে থাকবে শস্যদানা বা শ্বেতসারজাতীয় খাবার, আরেকভাগে থাকবে প্রোটিন বা আমিষজাতীয় খাবার।

আমরা এখানে বিভিন্ন ধরণের খাবারের কথা উল্লেখ করছি। এগুলো থেকে আপনার পছন্দমত খাবার বেছে নিন। সপ্তাহের একেকদিন একেক ধরনের খাবার খেয়ে দেখতে পারেন। দুপুরের খাবার খাওয়ার সময় খেয়াল রাখবেন, যা খাচ্ছেন তার ক্যালরির যোগফল যেন নারীদের ক্ষেত্রে ৪২০ এবং পুরুষদের ক্ষেত্রে ৫৭০ এর বেশি না হয়।

\* শাকসবজি,

শাকসবজিতে ক্যালরির পরিমাণ খুবই কম, তাই এগুলো প্রচুর পরিমাণে খাওয়া যাবে। এগুলোতে অনেক আঁশ বা ফাইবার থাকে, তাই পেট সহজে ভরে উঠবে এবং অনেকক্ষণ ক্ষুধা লাগবে না। শাকসবজি খাওয়ার সুবিধা হল, আপনি এগুলো কাঁচা কিংবা সেদ্ধ, ভাজি কিংবা তরকারি – যেকোনোভাবে খেতে পারেন। চেষ্টা করবেন বিভিন্ন ধরনের, টাটকা, মৌসুমি শাকসবজি খেতে। এতে খরচ কম পড়বে, আবার শরীর নানা ধরনের পুষ্টি উপাদান সহজেই পেয়ে যাবে।

তবে রান্না করার সময় অবশ্যই কতটুকু তেল ব্যবহার করছেন তা মাথায় রাখবেন। সামান্য এক টেবিল চামচ অলিভ অয়েলে প্রায় ১২০ ক্যালরি থাকে, যা দুটি আস্ত মাল্টা কিংবা প্রায় আধা কেজি বরবটিতে থাকা ক্যালরির সমান। তাই সবজি রান্না করার সময় তেল-লবণ ইত্যাদি যতটুকু ব্যবহার না করলেই নয় ঠিক ততটুকুই ব্যবহার করবেন। বাহারি রঙের শাকসবজি খাবেন।

মনে রাখবেন, আলু সবজির মধ্যে পড়বে না। আলুর পাশাপাশি কাঁচকলা, মাটির নিচের আলু, কাসাভা ইত্যাদিও শাকসবজির তালিকায় অন্তর্ভুক্ত হবে না। এগুলোকে ভাত-রুটির মত শ্বেতসারজাতীয় খাবারের মধ্যে ধরা হয়।

ভাত, রুটি ও অন্যান্য শ্বেতসারজাতীয় খাবার

অনেকে ধারণা করেন যে ওজন কমাতে হলে ভাত-রুটি খাওয়া একেবারে ছেড়ে দিতে হবে — এই ধারণাটি ভুল। পরিমিত পরিমাণে যদি তুলনামূলকভাবে পুষ্টিকর ও কম ক্যালরির শ্বেতসারগুলো খাওয়া যায়, তাহলে সেগুলো পেট দীর্ঘক্ষণ ভরা রাখতে এবং ওজন কমাতে সহায়তা করবে।

সাদা চাল ও ময়দার বদলে বেছে নিন লাল চাল বা লাল আটার রুটি। এগুলোতে সাধারণ চাল বা আটার তুলনায় পুষ্টি উপাদানের পরিমাণ অনেক বেশি। এছাড়া এগুলোতে প্রচুর পরিমাণে আঁশ বা ফাইবার থাকে, যা পেট ভরা রাখতে সাহায্য করে।

আজ থেকেই যদি মনে হয় যে আপনি খাদ্যাভ্যাসে একটা পরিবর্তন আনবেন, মেশিনে ভাঙ্গানো রিফাইন্ড গ্রেইনের বদলে হোলগ্রেইন বা গোটা শস্যদানা বেশী খাবেন, তাহলে আপনার জন্য ৩টি পরামর্শ—

আস্তে আস্তে শুরু করবেন। প্রথমে নতুন কিছু খেলে সেটার স্বাদ ভালো না-ই লাগতে পারে। একেবারে পুরোটা না বদলে অল্প অল্প করে বদলাতে পারেন। সাদা ভাতের সাথে কিছু লাল চালের ভাত মিশিয়ে খেতে পারেন। রুটি খেলে একটা সাদা আটার রুটি, তার সাথে একটা লাল আটার রুটি খেতে পারেন। ধীরে ধীরে আপনি হয়তো সেই স্বাদে অভ্যস্ত হয়ে যাবেন।

ভাত-রুটি ছাড়াও অন্যান্য হোলগ্রেইন খেতে পারেন। যেমন, পাস্তা খেতে চাইলে প্যাকেটে হোলগ্রেইন লেখা দেখে পাস্তা কিনতে পারেন।

লাল আটা আর লাল চাল খেলেই যে পরিমাণে বেশী খাওয়া যাবে, তা কিন্তু না। সুষম খাবারের অংশ হিসেবে আপনি লাল চাল আর লাল আটা খাবেন। পুরো প্লেট ভাত নিয়ে অল্প একটু তরকারি দিয়ে না খেয়ে চেষ্টা করবেন প্রতি বেলায় প্লেটের অর্ধেক শাকসবজি ফলমূল দিয়ে ভরতে।

প্রোটিন বা আমিষজাতীয় খাবার

প্রোটিন বা আমিষজাতীয় খাবার লম্বা সময় ধরে পেট ভরা রাখতে সাহায্য করে। প্রোটিনজাতীয় খাবার বেছে নেওয়ার সময় কম চর্বিযুক্ত খাবারগুলো বেছে নিন। প্লেটের চারভাগের একভাগ ভরবেন এসব খাবার দিয়ে। এরকম কিছু খাবার হলো—

মটরশুঁটি, শিম ও অন্যান্য বীনস

বিভিন্ন ধরনের ডাল, যেমন: মসুর, মুগ, মটর, ছোলা বা মাষকলাই,

\* মাছ।

\* চর্বিছাড়া মাংস।

\* চামড়া ছাড়ানো মুরগির মা।

\* লো-ফ্যাট দুধ, দই, পনির ও অন্যান্য দুগ্ধজাত খাবার।

\* ডিম।

\* টোফু।

রাতের খাবার

রাতের খাবারের ক্ষেত্রে পরিমাণটা ঠিক দুপুরের খাবারের মতই হবে। তবে দুপুরে প্রাণিজ প্রোটিন খেলে রাতে চেষ্টা করুন উদ্ভিজ্জ প্রোটিন খেতে। এতে আপনার বিভিন্ন ধরনের পুষ্টি উপাদান প্রাপ্তি নিশ্চিত হবে। তাছাড়া সবজি কম খেতে ইচ্ছে করলে, বা মিষ্টি কিছু খেতে ইচ্ছে করলে একটি ফল খেয়ে নিতে পারেন।

ID: 688

Context: ১ সপ্তাহে ওজন কমাতে উপায়

Question: ১ সপ্তাহে ওজন কমাতে কি কি খাবার এড়িয়ে চলবেন?

Answer:

বেশি ফ্যাট বা চর্বিযুক্ত খাবার: অলিভ অয়েল, অন্যান্য তেল, ঘি কিংবা বাটার – এগুলো সবই চর্বিবহুল উপকরণ, আর চর্বিবহুল মানেই ক্যালরিবহুল। স্বাভাবিকভাবেই ভাজাপোড়া, চিপস, কেক-পেস্ট্রি, পরোটা, পোলাও-বিরিয়ানি ইত্যাদিকে আমরা ক্যালোরিবহুল খাবার হিসেবে ধরি। তবে বাড়িতে রান্না করার সময় যদি তরকারি বা শাকসবজিতে ব্যবহৃত তেলের পরিমাণ মাথায় না রাখা হয়, তাহলে সেসব ‘স্বাস্থ্যকর’ খাবারও চর্বি ও ক্যালরিবহুল হয়ে যাবে। এ ব্যাপারে বিশেষভাবে সচেতন থাকতে হবে।

নাস্তায় দোকানের জেলি, চিনিযুক্ত ব্রেকফাস্ট সিরিয়াল (কর্ণ ফ্লেক্স, ফ্রুট লুপস, চকোজ ইত্যাদি) খাবার তালিকা থেকে বাদ দিন।

দোকানের প্রসেসড খাবার বা রেস্টুরেন্টের খাবারগুলো সুস্বাদু করার জন্য এগুলোতে প্রচুর ফ্যাট, লবণ ও চিনি ব্যবহার করা হয়। ওজন কমাতে চাইলে এগুলো এড়িয়ে চলতে হবে।

‘লিকুইড ক্যালরি’ থেকে সাবধান থাকতে হবে। দোকানের জুস, কোক বা অন্যান্য কোমল পানীয়, স্মুদি, কোল্ড কফি, মিল্কশেক ইত্যাদিতে প্রচুর ক্যালরি থাকে। অনেকসময় পুরো একবেলার খাবারের সমান ক্যালরি থাকে এক গ্লাস মিল্কশেকে, যা শেষ করতে হয়তো পাঁচ মিনিট সময়ও লাগে না। তাই ওজন কমাতে চাইলে এগুলো পরিহার করাই ভালো।

চা-কফি খাওয়ার অভ্যাস থাকলে তাতে অতিরিক্ত চিনি মিশিয়ে খাওয়ার অভ্যাস বাদ দেওয়ার চেষ্টা করুন।

এই সপ্তাহের কাজগুলো শেষ হলে আপনি ওজন কমানোর ২য় সপ্তাহের কার্যক্রম শুরু করতে পারেন।

ID: 689

Context: ওজন নিয়ন্ত্রণে আনার জন্য গুরুত্বপূর্ণ বিষয়

Question: ১ সপ্তাহে ওজন নিয়ন্ত্রণে আনার জন্য কোন বিষয়গুলো জানা গুরুত্বপূর্ণ?

Answer:

আঁশ বা ফাইবারযুক্ত খাবারের যত উপকার-

খাওয়ার সময় পর্যাপ্ত পরিমাণে ফাইবারযুক্ত খাবার খেলে পেট অনেকক্ষণ ভরা থাকবে। এভাবে আপনি ক্যালরি গ্রহণের মাত্রা আপনার দৈনিক ক্যালরিসীমার মধ্যেই সীমিত রাখতে পারবেন। আঁশযুক্ত খাবার আপনার পেটকে ভালো রাখে, কোষ্ঠকাঠিন্য দূর করে আর কোলেস্টেরলের মাত্রা কমাতে সাহায্য করে। আমাদের প্রত্যেকের দৈনিক ৩০ গ্রাম করে ফাইবার খাওয়া উচিত। কিন্তু বাস্তবে বেশিরভাগ মানুষেরই প্রতিদিন এর চেয়ে অনেক কম ফাইবার খাওয়া হয়।

ID: 690

Context: দ্রুত ওজন না কমানো

Question: কেন দ্রুত ওজন কমাবেন না?

Answer:

গবেষণায় দেখা গেছে, নতুন কোনো অভ্যাস তৈরি করতে গড়ে ১২ সপ্তাহ সময় লাগে। আমাদের এই গাইডটি আপনাকে প্রতিদিনের ক্যালরি নিয়ন্ত্রণে রাখার মাধ্যমে ওজন কমাতে এবং কমিয়ে ফেলা ওজন স্থিতিশীল রাখতে সাহায্য করবে। এভাবে আপনি সপ্তাহে ০.৫ থেকে ১ কেজি (১ থেকে ২ পাউন্ড) করে ওজন কমাতে পারবেন। এই হারে ওজন কমানো সবচেয়ে নিরাপদ, স্থিতিশীল ও কার্যকর।

খুব অল্প সময়ের মধ্যে দ্রুত ওজন কমাতে চেষ্টা করলে গুরুত্বপূর্ণ নানা পুষ্টি উপাদানের অভাব, পিত্তথলিতে পাথর হওয়া সহ বিভিন্ন ধরনের স্বাস্থ্য জটিলতা তৈরি হতে পারে।

ID: 691

Context: ১২ সপ্তাহে ওজন কমানোর উপায়

Question: ১২ সপ্তাহে ওজন কমানোর উপায়: দ্বিতীয় সপ্তাহ

Answer:

ওজন কমানোর ২য় সপ্তাহে পৌঁছাতে পারায় আপনাকে অভিনন্দন। সামনের সপ্তাহগুলোতেও ওজন কমানোর ১ম সপ্তাহের উপদেশ অনুযায়ী স্বাস্থ্যকর খাবারের অভ্যাস গড়ে তোলা চালিয়ে যেতে হবে। এই সপ্তাহ থেকে খাবারের পাশাপাশি শারীরিক পরিশ্রম এবং ব্যায়ামের দিকেও মনোযোগ দিতে হবে। এই দুইয়ের ভারসাম্য আপনার ওজন কমিয়ে আনতে সহায়তা করবে।

আপনি প্রথম সপ্তাহ থেকে শুরু না করে থাকলে, ১২ সপ্তাহে ওজন কমানোর উপায় এর প্রথম সপ্তাহের কার্যক্রম দেখুন।

ID: 692

Context: ২ সপ্তাহে দরকারি অভ্যাসগুলো

Question: ২ সপ্তাহে কোন অভ্যাসগুলো রপ্ত করবেন?

Answer:

এখন থেকে প্রতি সপ্তাহে কমপক্ষে ১৫০ মিনিট করে ব্যায়াম করার অভ্যাস গড়ে তুলুন। আপনার যদি একেবারেই শারীরিক পরিশ্রম করার অভ্যাস না থাকে, তাহলে আস্তে আস্তে প্রতিদিনের ব্যায়ামের পরিমাণ বাড়ান। এভাবে কয়েক সপ্তাহের মধ্যে সাপ্তাহিক ১৫০ মিনিটের লক্ষ্যে পৌঁছানো সম্ভব হবে।

২. সপ্তাহের সাতদিনের মধ্যে কোন দিনগুলোতে ব্যায়াম করবেন, দিনের কোন সময়ে কোন ধরনের ব্যায়াম করবেন, বাড়িতে ব্যায়াম করবেন নাকি পার্কে বা জিমে গিয়ে ব্যায়াম করবেন — এগুলো আগেভাগেই ঠিক করে রাখুন। যদি বিশেষ জুতা, ম্যাট বা অন্যান্য সামগ্রী প্রয়োজন হয়, তাহলে সেগুলো আগেই জোগাড় করে রাখুন। তাহলে ব্যায়াম না করার জন্য অজুহাত দেওয়ার উপায় থাকবে না।

৩. ব্যায়ামের পরে ২ গ্লাস পানি পান করে ফেলুন। এতে শরীর থেকে বেরিয়ে যাওয়া পানির অভাব পূরণ হবে। অন্যদিকে ক্ষুধা নিবারণ হবে, ফলে ব্যায়ামের পরপর বেশি খাবার খেয়ে ফেলার সম্ভাবনা কমে যাবে।

৪. খাবার তৈরি করার সময় ভেজে খাওয়ার বদলে সেদ্ধ, ভাপে সেদ্ধ, গ্রিল বা পানিতে পোঁচ করে খাওয়ার অভ্যাস করুন। ডিম, মাছ, মাংস বা সবজি — সবই এভাবে খাওয়া যাবে। ভেজে খাওয়া খাবারে প্রচুর পরিমাণে তেল ব্যবহৃত হয়, যা অত্যন্ত ক্যালরিবহুল। অন্যদিকে গ্রিল, স্টিম বা সেদ্ধ করে খাওয়ার প্রক্রিয়ায় তেলের অতিরিক্ত ক্যালরি যুক্ত হয় না।

ID: 693

Context: ওজন কমানোর জন্য ব্যায়াম

Question: ২ সপ্তাহে ওজন কমানোর জন্য কি কি ব্যায়াম করবেন?

Answer:

যেসকল ব্যায়াম ও শারীরিক কসরতের মাধ্যমে ওজন কমানো যেতে পারে তার কয়েকটি হচ্ছে—

\* হাঁটা

\* সাইকেল চালানো

\* বাগান করা

\* সাঁতার

\* নাচ

\* ব্যাডমিন্টন, ফুটবল, ইত্যাদি খেলাধুলা

\* ভারোত্তোলন

\* ইয়োগা বা যোগব্যায়াম এবং অন্যান্য স্ট্রেচিং এক্সারসাইজ

\* জিমে গিয়ে বিভিন্ন ধরনের ব্যায়াম করা

আপনার কোনো শারীরিক অসুস্থতা থাকলে কিংবা আগে থেকে হাত-পা, হাঁটু, মেরুদণ্ড বা কোমরে আঘাত অথবা কোনো সমস্যার ইতিহাস থাকলে ব্যায়ামের পরিকল্পনা করার সময় ডাক্তারের সাথে কথা বলে নিন।

ID: 694

Context: ওজন কমানোর জন্য ব্যায়াম

Question: ২ সপ্তাহে ওজন নিয়ন্ত্রণে যেভাবে ব্যায়াম করতে পারেন

Answer:

গবেষণায় প্রমাণ পাওয়া গেছে, যারা স্বাস্থ্যসম্মত ডায়েট মেনে চলার পাশাপাশি নিয়মিত ব্যায়াম করেন, তারা ওজন কমাতে বেশি সফল হন। কমানো ওজন ফেরত আসা প্রতিরোধ করতেও এই দুইয়ের সমন্বয় অধিক কার্যকর।

তবে অনেকেরই ব্যায়াম করার অভ্যাস থাকে না। তাই নতুন করে ব্যায়াম শুরু করাটা চ্যালেঞ্জিং হতে পারে। ধীরে ধীরে দৈনিক পরিশ্রমের মাত্রা বাড়াতে হবে। প্রতিদিনের রুটিনে একটু একটু করে শারীরিক পরিশ্রম অন্তর্ভুক্ত করা যায়। এর উদাহরণ হতে পারে লিফটের বদলে সিঁড়ির ব্যবহার, কম দূরত্বের পথ রিক্সায় চড়ার বদলে হেঁটে অতিক্রম করা, বাসে যাতায়াত করলে এক স্টপ আগে নেমে বাকি পথ হেঁটে যাওয়া, ইত্যাদি। এভাবে কিছুটা অভ্যাস হয়ে গেলে নিয়ম করে ব্যায়াম শুরু করা যায়। এক্ষেত্রে সাপ্তাহিক লক্ষ্য হলো কমপক্ষে ১৫০ মিনিট মাঝারি তীব্রতার ব্যায়াম করা।

মাঝারি তীব্রতার ব্যায়াম বলতে কী বোঝায়?

মাঝারি তীব্রতার শারীরিক কর্মকাণ্ডের সময় হৃৎস্পন্দন বা হার্টবিট বেড়ে যায়। একই সাথে শ্বাসপ্রশ্বাস দ্রুততর হয় এবং শরীর গরম হয়ে ওঠে। নিজে নিজে ব্যায়াম করার সময় মাঝারি তীব্রতায় পৌঁছেছেন কি না তা বোঝার একটা উপায় হলো, এরকম ব্যায়ামের সময় কথা বলা যাবে, কিন্তু গান গাওয়া সম্ভব হবে না।

মাঝারি তীব্রতার ব্যায়ামের উদাহরণের মধ্যে রয়েছে দ্রুত হাঁটা, সাঁতার কাটা এবং সাইকেল চালানো। এছাড়া নতুন করে যারা শারীরিক পরিশ্রম শুরু করছেন, তাদের জন্য নিচের দুটি পদ্ধতি বেশ কার্যকর।

১. নির্দিষ্ট নিয়মমাফিক দৌড়ানো যেতে পারে। দৌড়ানোর জন্য আমাদের ৯ সপ্তাহে দৌড়ানোর অভ্যাস তৈরি করার উপায় অনুসরণ করতে পারেন। এই গাইডে জীবনে কখনও দৌড়ায় নি এমন পূর্ণবয়স্ক মানুষ কীভাবে নয় সপ্তাহের মধ্যে পাঁচ কিলোমিটার দৌড়ানোর অভ্যাস করতে পারেন তা সহজে তুলে ধরা হয়েছে।

২. বাড়িতে বসে কোন আলাদা যন্ত্রের সাহায্য ছাড়াই ফ্রি হ্যান্ড ব্যায়াম করতে পারেন। ইউটিউব বা গুগলে নিচের শব্দগুলো লিখে খুঁজলেই এ জাতীয় ব্যায়ামের নির্দেশনাযুক্ত অনেক ভিডিও পেয়ে যাবেন। এমন কিছু শব্দ হলো—

Pushup

Pullup

Plank

Squat

তবে যে পদ্ধতিই বেছে নেওয়া হোক, তা যেন উপভোগ করার মত হয়। উপভোগ্য না হলে এগুলো দীর্ঘমেয়াদি অভ্যাসে পরিণত করা সম্ভব হবে না। ব্যায়ামের সবগুলো অপশনের মধ্যে যেগুলো ব্যক্তিগতভাবে পছন্দ হয়, সেগুলো ঘুরেফিরে করা যেতে পারে। এতে একঘেয়েমি আসবে না।

নতুন করে ব্যায়াম করা শুরু করলে বা শারীরিক পরিশ্রমের পরিমাণ বাড়িয়ে দিলে ক্ষুধা কিছুটা বেড়ে যেতে পারে। এমনটা হওয়া স্বাভাবিক, এতে চিন্তার কিছু নেই। ব্যায়ামের কারণে শরীর স্বাভাবিকের তুলনায় বেশি ক্যালরি খরচ করে, তাই সেই ঘাটতি পূরণ করতে হবে।

তবে বিশেষভাবে সতর্ক থাকতে হবে যেন ব্যায়ামের পর ক্যালরিবহুল খাবার (চিনি দেওয়া জুস,শরবত, মিল্কশেক, ভাজাপোড়া, কেক-বিস্কুট, ইত্যাদি) খাওয়া না হয়। এগুলো খেলে ওজন কমার বদলে উল্টো বেড়ে যেতে পারে। তাই ক্যালরির পরিমাণ কম থাকলেও সহজে পেট ভরায় এমন খাবার বেছে নিতে হবে। এসব খাবারের উদাহরণ হলো: ফল (যেমন আপেল বা কলা), টক দই, সেদ্ধ ডিম, সামান্য টক দই দিয়ে লাল আটার তৈরি একটি ছোট রুটি, ইত্যাদি।

যেভাবে দৈনন্দিন জীবনে ব্যায়াম অন্তর্ভুক্ত করতে পারেন

শারীরিক পরিশ্রমের মাধ্যমে ক্যালরি খরচ হয়, আর যথেষ্ট পরিমাণ ক্যালরি খরচ করার মাধ্যমে ওজন কমিয়ে আনা যায়। কীভাবে দৈনিক শারীরিক পরিশ্রমের পরিমাণ বাড়িয়ে সহজেই ওজন কমানো যায়, তা নিয়ে ৯টি টিপস নিচে তুলে ধরা হলো—

১) আরও হাঁটুন: শারীরিক পরিশ্রমের পরিমাণ বাড়ানোর সবচেয়ে সহজ এবং কার্যকর উপায়গুলোর মধ্যে একটি হলো হাঁটা। হাঁটাহাঁটিকে নিয়মিত অভ্যাসে পরিণত করতে হবে। এজন্য কোন গ্রুপের সাথে মিলে হাঁটতে পারেন। কোন সঙ্গীকে নিয়ে হাঁটলে তা যেমন উপভোগ্য হবে, তেমনি একজন আরেকজনকে নিয়মিত হাঁটার অনুপ্রেরণা দিতে পারবেন। বাড়িতে, ছাদে, বা বাইরে ফুটপাথ বা মাঠে একা একা গান শুনতে শুনতে হাঁটতে পারেন।

২) সিঁড়ি ব্যবহার করুন: লিফট ব্যবহার না করে সিঁড়ি দিয়ে উঠানামা করুন। বিল্ডিং অনেক লম্বা হলে গন্তব্যের কয়েক তলা আগে নেমে পড়ে সিঁড়ি দিয়ে বাকিটুকু অতিক্রম করা যায়।

৩) দৌড়ানো শুরু করুন: দৌড়ানোর জন্যও কোন সঙ্গীকে নিয়ে দৌড়ানো যেতে পারে। সঙ্গী একাধিক হলে প্রতিযোগিতা করে দৌড়ানো যায়। এক্ষেত্রে ‘কাউচ টু ফাইভ কে’ প্রোগ্রামটি অনুসরণ করে আগামী নয় সপ্তাহের মধ্যে একটানা পাঁচ কিলোমিটার দৌড়ানোর অভ্যাস করতে পারবেন।

৪) পার্কে বা ছাদে ব্যায়াম করুন: খালি হাতে বা ব্যায়াম করার উপকরণসহ কোনো পার্কে গিয়ে, এমনকি বাসার ছাদেও ব্যায়াম করতে পারেন। পরিবেশে পরিবর্তন এলে পুরো প্রক্রিয়ায় নতুন করে আগ্রহ বাড়তে পারে।

৫) যাতায়াতের মাঝেও ব্যায়াম করুন: বাসে বা গনপরিবহনে যাতায়াত করলে এক স্টপ আগে নেমে বাকি পথ হেঁটে যাওয়া যায়। কম দূরত্বের পথ রিক্সায় চড়ার বদলে হেঁটে অতিক্রম করুন। সাইকেল চালিয়ে যাতায়াত করলে সাপ্তাহিক ব্যায়ামের লক্ষ্যের সিংহভাগই পূরণ করা সম্ভব।

৬) গাড়ি পার্কিং-এ কৌশলী হোন: গাড়ি ব্যবহার করে যাতায়াতে অভ্যস্ত হলে গাড়ি পার্ক করার সময় খানিকটা দূরে পার্ক করা যেতে পারে। এভাবে বাকি রাস্তা হেঁটে অতিক্রম করার সুযোগ ও অভ্যাস তৈরি হবে।

৭) অফিসেও ব্যায়াম করুন: অফিসে যদি বসে কাজ করতে হয়, তাহলে ১ ঘণ্টা পরপর কাজের রুম বা ফ্লোরের চারিদিকে কয়েকবার ঘুরে আসুন। কাছাকাছি করিডোর থাকলে সেখানে কয়েক মিনিট হেঁটে আসা যায়। ৫০০ মিলি বা ১ লিটারের পানিসহ বোতল ডাম্বেল হিসেবে ব্যবহার করে হাত ও শরীরের উপরের অংশের ব্যায়ামও করা যেতে পারে। এছাড়া লাঞ্চের বিরতির সময়ও কিছুক্ষণ হেঁটে বা ব্যায়াম করে এরপর খাবার খেতে পারেন।

৮) পরিবারকে অন্তর্ভুক্ত করুন: পরিবারের সবাইকে নিয়ে স্বাস্থ্যসম্মত জীবনযাপনের অভ্যাস করলে তা অধিক উপভোগ্য হয়, একে অপরকে নিয়মিত শরীরচর্চা করার জন্য উৎসাহ দেওয়া যায়। নিয়মিত ব্যায়াম করছেন কি না সে ব্যাপারে জবাবদিহিতার জন্য পরিবারের একজন সদস্যকে দায়িত্ব দিন। এটি মেনে চললে ব্যায়াম করা ছেড়ে দেওয়ার সম্ভাবনা কমে আসে। সবাই একসাথে সাঁতার কাটতে পারেন, পার্কে যেতে পারেন বা বাগান করতে পারেন। শিশুদেরকেও এভাবে ব্যায়ামের অভ্যাস করানো যায়।

৯) বাগান করুন: বাড়ির পাশে জায়গা থাকলে সেখানে বাগান করুন। বাগানের কাজে বেশ ক্যালরি খরচ হয়। জায়গা না থাকলে ছাদে কিংবা বাড়ির বারান্দায় টবে গাছ লাগিয়ে সেগুলোর যত্ন নিতে পারেন।

এই সপ্তাহের কাজগুলো শেষ হলে আপনি ওজন কমানোর ৩য় সপ্তাহের কার্যক্রম শুরু করতে পারেন।

ID: 695

Context: ওজন নিয়ন্ত্রণে দরকারি বিষয়

Question: ২ সপ্তাহে ওজন নিয়ন্ত্রণে যা জেনে রাখা ভালো

Answer:

:\* ব্যায়ামের বহুমুখী উপকারিতাঃ

শারীরিক পরিশ্রম করা হয়ে ওঠে না এমন ব্যক্তিদের জন্য ব্যায়ামের অপ্রত্যাশিত উপকারিতা রয়েছে। নতুন করে ব্যায়ামের অভ্যাস গড়ে তোলার ফলে আত্মবিশ্বাস বাড়ে, আত্মমর্যাদাবোধ উন্নত হয়। এই সাফল্য আপনাকে মানসিকভাবে চাঙ্গা করবে এবং ওজন কমানো সহ জীবনের অন্যান্য ক্ষেত্রে সাফল্য আনার প্রেরণা যোগাবে। এভাবে ব্যায়ামের মাধ্যমে শরীরের যত্নের পাশাপাশি মানসিক স্বাস্থ্যের উন্নতি ঘটে।

:\* পেডোমিটারের ব্যবহারঃ

স্মার্টফোন এবং স্মার্টওয়াচ ব্যবহারকারীরা ‘পেডোমিটার’ ব্যবহার করতে পারেন। এটি অ্যাপ হিসেবে ডাউনলোড করা যায়, আবার স্বতন্ত্র যন্ত্র হিসেবেও পাওয়া যায়। পেডোমিটারের মাধ্যমে প্রতিদিন কী পরিমাণ হাঁটা বা শারীরিক পরিশ্রম হচ্ছে তার একটি হিসাব পাওয়া যায়। গড় হিসাব বের করে শারীরিক পরিশ্রমের পরিমাণ ক্রমান্বয়ে বাড়িয়ে প্রতিদিনের শরীরচর্চার লক্ষ্য নির্ধারণ করা যায়।

ID: 696

Context: ১২ সপ্তাহে ওজন কমানোর উপায়

Question: ১২ সপ্তাহে ওজন কমানোর উপায়: তৃতীয় সপ্তাতাহে কি করবেন?

Answer:

ওজন কমানোর তৃতীয় সপ্তাহে পদার্পণ করায় আপনাকে অভিনন্দন!

\*স্বাস্থ্যকর ডায়েট এবং ব্যায়ামের অভ্যাস গড়ে তোলার মাধ্যমে ওজন কমানোর যে যাত্রা শুরু হয়েছে, এই সপ্তাহেও সেই অভ্যাসগুলোর চর্চা চালিয়ে যেতে হবে। স্বাস্থ্যকর খাবার বেছে নেওয়া বা শরীরচর্চা যতটা চ্যালেঞ্জিং মনে হচ্ছিলো, তা এ সপ্তাহে আরও সহজে আয়ত্তে চলে আসবে।

\*গত সপ্তাহে হয়তো অনেকে প্রথমবারের মত শরীরচর্চা করা শুরু করেছেন বা অনেকদিন পর ব্যায়াম করেছেন। এ কারণে শরীরে একটু ব্যথা থাকতে পারে, তবে দুশ্চিন্তার কিছু নেই। আগামী কয়েকদিনের মধ্যে এটি পুরোপুরি ঠিক হয়ে যাবে।

\*গত সপ্তাহে মোট ১৫০ মিনিট বা আড়াই ঘণ্টা ব্যায়ামের লক্ষ্য পূরণ করতে না পারলেও ঘাবড়ে যাবেন না। আস্তে আস্তে ব্যায়ামের সময় বাড়ান। ব্যায়াম শুরু করে তা নিয়মিত চালিয়ে যাওয়া গুরুত্বপূর্ণ। সময়ের সাথে সম্পূর্ণ প্রক্রিয়াটি সহজ হয়ে আসবে। এই সপ্তাহে ওজন কমানোর ব্যায়াম এবং স্বাস্থ্যকর সকালের নাস্তার আরও কিছু টিপস নিয়ে আলোচনা করা হবে।

\*আপনি প্রথম সপ্তাহ থেকে শুরু না করে থাকলে, ১২ সপ্তাহে ওজন কমানোর উপায় এর প্রথম সপ্তাহের কার্যক্রম দেখুন।

ID: 697

Context: ৩ সপ্তাহে ওজন কমানোর উপায়

Question: ৩ সপ্তাহে অভ্যাসগুলো কি ভাবে শুরু করবেন?

Answer:

১. বাড়িতে ওজন মাপার যন্ত্র থাকলে প্রতিদিন সকালে ঘুম থেকে উঠে ওজন মাপবেন। গবেষণায় দেখা গেছে, যারা প্রতিদিন এভাবে ওজন পরিমাপ করে, তাদের মধ্যে ওজন কমানোর জন্য স্বাস্থ্যকর খাবার ও ব্যায়ামের অভ্যাস মেনে চলার সম্ভাবনা বেশি।

২. ব্যায়ামের রুটিন অনুযায়ী একটি চার্ট বানান। প্রতিদিনের লক্ষ্য পূরণ করার পর চার্টে টিক (✓) চিহ্ন দিন। এটি প্রতিদিন ব্যায়াম করার জন্য অনুপ্রেরণা হিসেবে কাজ করবে।

৩. সারাদিনে, অর্থাৎ তিনবেলার খাবার এবং স্ন্যাকস হিসেবে কী খাবেন তা সকালেই নির্ধারণ করে ফেলুন। এতে বাজার করতে সুবিধা হবে, আর ক্ষুধা লাগলে অস্বাস্থ্যকর খাবার খেয়ে ফেলার সম্ভাবনা কমে আসবে।

৪. চা-কফি খাওয়ার অভ্যাস থাকলে এই সপ্তাহ থেকে চিনি ছাড়া খাওয়া শুরু করুন। এভাবে সারাদিনে চিনি থেকে আসা বেশ অনেকগুলো ক্যালরি এড়িয়ে ফেলা সম্ভব হবে।

ID: 698

Context: ৩ সপ্তাহে ব্যায়াম

Question: কিভাবে ৩ সপ্তাহে ব্যায়াম করা চালিয়ে যাবেন?

Answer:

নতুন করে ব্যায়াম করা শুরু করলে সারা শরীরে ব্যথা হওয়া খুবই স্বাভাবিক। তবে এই ব্যথার কারণে ব্যায়াম করার উদ্যম হারিয়ে ফেলা যাবে না। অভ্যাস না থাকার কারণে গত সপ্তাহে ব্যায়াম করতে শারীরিকভাবে বেশ কষ্ট হয়ে থাকতে পারে। তবে শরীরচর্চা চালিয়ে গেলে আগামী সপ্তাহ শেষেই হয়তো এই ব্যথা থেকে মুক্তি পাওয়া যাবে। তাই নিজেকে ব্যায়াম চালিয়ে যেতে উদ্বুদ্ধ করতে হবে।

ব্যায়াম করা চালিয়ে যাওয়া সহজ করার জন্য নিচে ৭টি টিপস তুলে ধরা হলো—

১. নিজেকে অনুপ্রেরণা দিন

ব্যায়ামের মূল লক্ষ্য হলো স্বাস্থ্যকর জীবনযাপনের মাধ্যমে ওজন কমিয়ে আনা – এ ব্যাপারটি নিজেকে বারবার মনে করিয়ে দিতে হবে। ব্যায়াম যে পুরোপুরি অভ্যাসের ব্যাপার সেটি বুঝতে পারলে শরীরচর্চাকে আর কঠিন কোনো চ্যালেঞ্জ মনে হবে না।

২. রুটিন মেনে চলুন

সপ্তাহের শুরুতেই ঠিক করে নিন আগামী সপ্তাহে কখন, কোথায়, কীভাবে ব্যায়াম করবেন। এভাবে প্রতিদিনের স্বাভাবিক কাজকর্মের মত ব্যায়ামও রুটিনের একটি অংশ হয়ে যাবে। বাইরে গিয়ে দৌড়ানোর বা শরীরচর্চা করার পরিকল্পনা থাকলে আগের দিন রাতে ঘুমানোর আগে জামাকাপড়, পানির বোতল ও ব্যাগ গুছিয়ে রাখা যেতে পারে।

৩. অন্যদের সাথে লক্ষ্য শেয়ার করুন

নিজের অগ্রগতি ও লক্ষ্য কোনো আত্মীয়, ভালো বন্ধু বা কাছের সহকর্মীর সাথে শেয়ার করতে পারেন। এটি আপনাকে লক্ষ্যে স্থির থাকতে সাহায্য করবে।

৪. সঙ্গী বানিয়ে নিন

বাড়ির অন্যান্য সদস্যও যদি আপনার সাথে ব্যায়াম এবং স্বাস্থ্যকর খাবার খাওয়ার অভ্যাস শুরু করে, তাহলে ওজন কমানোর প্রক্রিয়াটি অনেকটাই সহজ হয়ে যাবে। এতে একেকজনের জন্য একেক রকম রান্না করার ঝামেলা থাকবে না, অন্যের অস্বাস্থ্যকর খাদ্যাভ্যাসে প্রভাবিত হওয়ার সম্ভাবনাও কমে যাবে। এছাড়া প্রথম কয়েক সপ্তাহে ব্যায়াম করার কষ্টও ভাগাভাগি করে নেওয়া যাবে। পরিবারের সদস্য ছাড়া কোনো বন্ধুকেও ওজন কমানোর সঙ্গী বানিয়ে নিতে পারেন।

৫. পরিবর্তনের মানসিকতা রাখুন

যেকোনো এক ধরনের ব্যায়াম বা খাবার ভালো নাও লাগতে পারে। তাই বলে স্বাস্থ্যকর খাবার খাওয়া বা শরীরচর্চা করা একেবারেই ছেড়ে দেওয়া ঠিক নয়। জিমে যেতে ভালো না লাগলে সাইক্লিং, দৌড় বা সাঁতার বেছে নেওয়া যেতে পারে; খাবারের ক্ষেত্রেও তাই।

৬. নিজেকে পুরস্কার দিন

ছোট ছোট লক্ষ্য নির্ধারণ করুন। কয়েকটি ছোট লক্ষ্য পূরণ করতে পারলে নিজেকে পুরস্কার দিন। যেমন পরপর দুই সপ্তাহ ব্যায়াম এবং স্বাস্থ্যকর খাবার খাওয়ার লক্ষ্য পূরণ করতে পারলে নিজেকে ছোট কোনো উপহার দিন। তবে উপহার হিসেবে ‘চিট ডে’ বা অস্বাস্থ্যকর খাবার খাওয়ার ইচ্ছা থেকে বেরিয়ে আসাই ভালো। নিজেকে দেওয়ার মতো পুরস্কার হতে পারে—

\*নতুন পোশাক।

\*জিমে যাওয়ার অনুসঙ্গ।

\*দৌড়ানোর জুতা।

\*অনেকদিনের পরিকল্পনা থাকলেও সময়ের অভাবে পড়া হয় না এমন বই পড়া বা মুভি দেখা

চুল কাটা।

\*একটু দূরে কোথাও ঘুরে আসা

৭. হাল ছাড়বেন না

সপ্তাহের কোনো একদিন ব্যায়াম বাদ গেলে বা একবেলা অস্বাস্থ্যকর খাবার খেয়ে ফেললে হতাশ হবেন না। বাকি বেলায় আবার নিজের ওজন কমানোর অভ্যাসগুলো চালিয়ে যান। হতাশ হয়ে পরের বেলা বা পরেরদিন পুরনো অস্বাস্থ্যকর অভ্যাসে ফেরত গেলে ওজন কমানো কঠিন হয়ে পড়বে।

ID: 699

Context: ৩ সপ্তাহে ওজন কমানোর খাবার

Question: ৩ সপ্তাহে ওজন কমানোর সকালের নাস্তা কি খাবে?

Answer:

\*ব্যায়াম করতে চাইলে ঘুম সকালবেলা থেকে আগেভাগে উঠে পড়ুন। সারারাত না খেয়ে থাকার পর সকালে খালিপেটে ব্যায়াম করা শুরু করলে মাথা ঘুরানো বা ঝিমিয়ে পড়ার মত সমস্যা হতে পারে। ব্যায়ামও চলবে মন্থর গতিতে। তাই সকালে আগে উঠে নাস্তা করে নিন। নাস্তার ১ ঘণ্টার মধ্যে ব্যায়াম করার পরিকল্পনা থাকলে ভারী নাস্তা না করাই ভালো।

\*ব্যায়ামের পর প্রয়োজনবোধে হালকা কোন খাবার, যেমন সেদ্ধ ডিম, একটি মালটা বা একটা কলা খেয়ে নিতে পারেন। নাস্তায় কী ধরনের খাবার খাওয়া যায় তা নিয়ে বিস্তারিত জানতে ওজন কমানোর প্রথম সপ্তাহ নিয়ে লেখা আর্টিকেলটি পড়তে পারেন।

\*সকালের নাস্তায় ওটসঃ

সকালের নাস্তায় ওটস হতে পারে ওজন কমানোর গুরুত্বপূর্ণ একটি হাতিয়ার। এর স্বাদ আমরা সাধারণত নাস্তায় যেসব খাবার খাই তা থেকে একটু ভিন্ন, তবে সময়ের সাথে আপনি এই স্বাদে অভ্যস্ত হয়ে যাবেন। ওটসে প্রচুর আঁশ বা ফাইবার থাকে, যা খাবার ধীরে ধীরে হজমে সাহায্য করে। এতে ক্যালরির পরিমাণও তুলনামূলকভাবে কম। স্টিল কাট ওটস বিভিন্ন সুপারশপ ও কাঁচাবাজারে পাওয়া যায়। আধা কাপ দুধ দিয়ে সহজেই আধা কাপ ওটস রান্না করে খাওয়া যায়। এর সাথে একটি আপেল বা কলা, কিংবা কিছু কিশমিশ যোগ করে নিলে স্বাদ এবং পুষ্টিগুণ দুটোই বাড়বে, পেট অনেকক্ষণ ভরে থাকবে, দুপুরের খাবারের আগে আর ক্ষুধা লাগবে না — সব মিলিয়ে অতিরিক্ত ক্যালরি খাওয়া থেকে বিরত থাকা সহজ হবে।

এই সপ্তাহের কাজগুলো শেষ হলে আপনি ওজন কমানোর ৩য় সপ্তাহের কার্যক্রম শুরু করতে পারেন।

ID: 700

Context: ৩ সপ্তাহে ওজন নিয়ন্ত্রন

Question: ৩ সপ্তাহে ওজন নিয়ন্ত্রণে কি জানা গুরুত্বপূর্ণ?

Answer:

\*নিয়মিত ব্যায়াম করুন।

সুস্থ থাকতে এবং শরীরকে ফিট রাখতে একজন পূর্ণবয়স্ক মানুষের ১৫০ মিনিট অ্যারোবিক ব্যায়াম করা উচিত। অ্যারোবিক ব্যায়ামের মধ্যে রয়েছে হাঁটা, সাঁতার, দৌড়, সাইকেল চালানো ও টেনিস বা ব্যাডমিন্টন খেলা।

এছাড়াও সপ্তাহে দুই বার স্ট্রেংথ ট্রেনিং করা উচিত, যা মাংশপেশিকে শক্তিশালী করে তোলে। এর মধ্যে রয়েছে ভার উত্তোলন, যোগব্যায়াম বা ইয়োগা, বাগানে কাজ করা এবং পুশ আপ। ইউটিউব বা গুগলে নিচের শব্দগুলো লিখে খুঁজলেই স্ট্রেংথ ট্রেনিং-এর নির্দেশনাযুক্ত এমন অনেক ভিডিও পেয়ে যাবেন। এমন কিছু শব্দ হলো—

Pushup

Pullup

Pl

Squat

ID: 701

Context: ১২ সপ্তাহে ওজন কমানোর উপায়

Question: ১২ সপ্তাহে ওজন কমানোর উপায়: চতুর্থ সপ্তাহে কি করবেন ?

Answer:

ওজন কমানোর চতুর্থ সপ্তাহে পদার্পণ করায় আপনাকে অভিনন্দন। অতিরিক্ত ওজন কমিয়ে ফেলার ডায়েট মেনে চলার পাশাপাশি নিয়মিত ব্যায়াম করার অভ্যাস চালিয়ে যাওয়া এখন হয়তো আগের চেয়ে অনেকটাই সহজ হয়ে এসেছে।

\*এ সপ্তাহেও স্বাস্থ্যকর খাবারগুলো পরিমিত পরিমাণে খাওয়ার চর্চা চালিয়ে যান। সাথে ব্যায়ামের প্রতি বাড়তি যত্ন নিন। গত সপ্তাহে যদি আড়াই ঘণ্টার ব্যায়ামের লক্ষ্য পূরণে সফল না হয়ে থাকেন, তাহলে এই সপ্তাহে সেই লক্ষ্য পূরণ করে ফেলুন।

\*বিগত কয়েক সপ্তাহ ধরে অনেকে নতুন করে ব্যায়াম করছেন। এ কারণে হয়তো ক্ষুধা কিছুটা বেড়ে গেছে, প্রতিবেলার খাবারের পাশাপাশি দিনে দুই-একবার স্ন্যাকসজাতীয় হালকা কোনো কিছু খাওয়া হচ্ছে। এই সপ্তাহে এসব হালকা নাস্তার লোভ সামলানোর টিপস এবং বিভিন্ন ধরনের খাবার খাওয়ার তীব্র আকাঙ্ক্ষা মোকাবেলার উপায় তুলে ধরা হয়েছে।

\*আপনি প্রথম সপ্তাহ থেকে শুরু না করে থাকলে “১২ সপ্তাহে ওজন কমানোর উপায়”-এর প্রথম সপ্তাহের কার্যক্রম দেখুন।

ID: 702

Context: ৪র্থ সপ্তাহে দরকারি অভ্যাসগুলো

Question: ৪র্থ সপ্তাহে কি অভ্যাসগুলো শুরু করবেন?

Answer:

১. মিল প্ল্যানিং করুন। মিল প্ল্যানিং অর্থ আগে থেকে কী কী খাবেন তা ঠিক করে রাখা। আগামী ৭ দিন তিন বেলায় কী কী খাবেন তার একটা খসড়া তৈরি করুন। প্ল্যান করার সময় বিগত সপ্তাহগুলোর স্বাস্থ্যকর ডায়েট ও খাবারের পরিমাণ নিয়ে দেওয়া পরামর্শগুলো মাথায় রাখুন।

২. ক্ষুধা লাগলে হালকা কিছু খেয়ে নিলে কোনো ক্ষতি নেই। তবে একটু পর পর কিছু না কিছু খাওয়ার প্রবণতা থেকে বেরিয়ে আসতে হবে। তাই তিন বেলার খাবারের পাশাপাশি হালকা নাস্তায় এ সপ্তাহে কোন দিন কী খেতে চান তা ভেবে রাখুন। এতে ক্ষুধা লাগলে অস্বাস্থ্যকর খাবার খেয়ে ফেলার সম্ভাবনা কমে আসবে।

৩. এবার এ সপ্তাহের মিল প্ল্যানের খসড়া অনুযায়ী সাপ্তাহিক বাজারের তালিকা তৈরি করে ফেলুন এবং সেই অনুযায়ী বাজার করুন। এর ফলে ক্রেভিং হলেও উপকরণ হাতের কাছে না থাকায় অস্বাস্থ্যকর খাবার খাওয়ার সম্ভাবনা কমে আসে। কারণ বাজারে গিয়ে সেই খাবার বা খাবারের উপকরণ কিনে আনার চেয়ে বাড়িতে থাকা পুষ্টিকর খাবার খাওয়াই সহজ মনে হতে পারে। এছাড়া সময় ও অর্থ সাশ্রয় হয়।

৩. হালকা নাস্তা হিসেবে কাজে যাওয়ার সময় একটা বক্সে ফল, শশা, গাজর বা টমেটো কেটে সাথে নিয়ে যেতে পারেন। বিরতির সময় সেটা খেয়ে নেয়া যাবে। আবার ৭-৮ টা বাদাম একটা প্যাকেট করে সাথে রাখতে পারেন।

এছাড়া নাস্তাটি ঘরে তৈরি কোন স্বাস্থ্যকর ও মুখরোচক খাবারও হতে পারে। সপ্তাহের শুরুতে প্রতিদিনের স্ন্যাকস পরিকল্পনা করে সে অনুযায়ী সব গুছিয়ে রাখলে, বা সাথে খাওয়ার মত কিছু থাকলে হয়তো পুরি-সিঙ্গারা, চিপস-চককোকের মত অস্বাস্থ্যকর নাস্তার প্রতি আকর্ষণ ঠেকানো কিছুটা সহজ হবে।

ID: 703

Context: ৪র্থ সপ্তাহে ওজন কমাতে খাবার

Question: ৪র্থ সপ্তাহে ওজন কমাতে কি হালকা খাবার খাবেন?

Answer:

তিনবেলার খাবারের মাঝে ক্ষুধা লাগলে যদি আপনি একটি স্বাস্থ্যকর নাস্তা বেছে নেন, তাহলে তা আপনার ওজন কমাতে সাহায্য করতে পারে। কারণ এতে ব্যায়ামের পর বা দুইবেলার খাবারের মাঝের সময়টায় দুর্বল লাগবে না। তাছাড়া দুপুরে বা রাতে বেশি খাবার খেয়ে ফেলার প্রবণতা, বা কোনো অস্বাস্থ্যকর খাবার খাওয়ার তীব্র আকাঙ্ক্ষা প্রতিরোধ করা সম্ভব হবে।

আমাদের স্বাস্থ্যকর নাস্তা তালিকায় কিছু কম ক্যালরিযুক্ত নাস্তার নাম উল্লেখ করা হলো। এগুলো পরিমিত পরিমাণে খেলে পুষ্টি পাওয়া যাবে, পেট ভরবে এবং ওজনও বাড়বে ও না।

যেমন ;শসা

গাজর

টমেটো

১টি আপেল

১টি মাল্টা

৩/৪ কাপ টক দই (চিনি ছাড়া)

আধা কাপ সেদ্ধ ছোলা

১টি সেদ্ধ ডিম

১টি মাঝারি কলা

৭-৮ টা বাদাম

\* খাবারের লোভ সামলানোর টিপস ;

ক্ষুধা লাগলে প্রথমে দুই গ্লাস পানি খেয়ে নিন, এরপর এসব নাস্তা খান। এগুলো পেট পুরোপুরি ভরিয়ে ফেলার উদ্দেশ্যে খাবেন না, নাস্তা হিসেবে সাময়িকভাবে ক্ষুধা মেটানোর জন্য খাবেন।

এছাড়া অস্বাস্থ্যকর নাস্তার বিকল্প হিসেবে একই ধরনের স্বাস্থ্যকর খাবার বেছে নিতে পারেন। যেমন— চকলেট বা মিষ্টির বদলে মাঝারি আকারের দুটি খেজুর বেছে নিন। খাবার খাওয়ার পর ডেজার্ট খাওয়ার অভ্যাস থাকলে ১ টেবিল চামচ কিশমিশ বেছে নিতে পারেন।

ID: 704

Context: ৪র্থ সপ্তাহে খাবারের চাহিদা

Question: ৪র্থ সপ্তাহে ক্রেভি কিভাবে সামলাবেন?

Answer:

অনেক সময় আমাদের কোনো খাবার খাওয়ার তীব্র আকাঙ্ক্ষা সৃষ্টি হয়। ইচ্ছাশক্তি থাকলেও ক্রেভিং হলে সেই লোভ

সংবরণ করা বেশ চ্যালেঞ্জিং হয়ে পড়ে।

কিছু বিষয় এই তীব্র আকাঙ্ক্ষার পেছনে কাজ করতে পারে। যেমন—

\*আবেগপ্রবণ অবস্থা

\*মানসিক চাপ

\*একঘেয়েমি বা বোরড হওয়া

\* অনেকদিনের পুরনো অভ্যাস

\*হীনমন্যতা

\*খাওয়ার তীব্র আকাঙ্ক্ষা বা ক্রেভিংস সামলাতে নিচের ৮টি টিপস মেনে চলুন—

\*বেশিক্ষণ ক্ষুধা পেটে থাকবেন না।

ক্ষুধা লাগলে ক্রেভিং বেড়ে যেতে পারে। তাই ক্ষুধা লাগলে শরীরে শক্তি যোগাতে হালকা কোনো খাবার খেয়ে নিন। উপরে উল্লেখিত স্বাস্থ্যকর নাস্তার তালিকা থেকে আপনার পছন্দের খাবারটি বেছে নিতে পারেন।

\*পানি পান করু।.

পানি পান করলে পেট ভরে, তাই পানি খাওয়ার মাধ্যমে অনেকের জন্য ক্রেভিং সামলানো বেশ সহজ হয়ে যায়। পানির বদলে চিনি ছাড়া চা-কফির মতো গরম কোনো পানীয়ও এক্ষেত্রে কাজ করতে পারে।

\*অন্য কাজে মনোযোগ দিন।

যেই খাবার খাওয়ার তীব্র আকাঙ্ক্ষা তৈরি হয়, সেই সংক্রান্ত বিভিন্ন চিন্তা মাথায় ঘোরাঘুরি করতে পারে। তাই সাময়িকভাবে নিজেকে অন্য কোনো কাজে ব্যস্ত রাখুন। হাঁটতে বের হয়ে যান, সময় নিয়ে গোসল করুন বা গান শুনুন। অনেকদিন ধরে যোগাযোগ করা হয় না এমন বন্ধুকে ফোন করে খোঁজখবর নিতে পারেন।

\*সুগার-ফ্রি চুইংগাম।

সুগার-ফ্রি চুইং গাম চিবানোর মাধ্যমে অনেকে এসব ক্ষুধা মোকাবেলা করতে সফল হন। তবে অতিরিক্ত চুইং গাম চিবানো যাবে না। দিনে ২০টির বেশি চুইং গাম চিবানোর ফলে আপনি অসুস্থ হয়ে যেতে পারেন।

\*দাঁত ব্রাশ করুন।

টুথপেস্ট দিয়ে দাঁত ব্রাশ করতে পারেন। ব্রাশ করার পর মুখ পরিষ্কার ও ফ্রেশ লাগে। এভাবে কেউ কেউ ক্রেভিং থেকে মুক্তি পেয়ে থাকেন।

\*প্রলোভন কমানোর ব্যবস্থা নিন।

হাতের নাগালে বা চোখের সামনে যদি অস্বাস্থ্যকর খাবার না থাকে, তাহলে সেগুলোর ক্রেভিং হওয়ার সম্ভাবনাও কমে যায়। তাই এগুলো কেনা থেকে বিরত থাকুন। একান্ত প্রয়োজন না থাকলে খাবার অর্ডার করার অ্যাপস ফোন থেকে আনইন্সটল করে ফেলুন।

\*নিজেকে সময় বেঁধে দিন।

ক্রেভিং সাধারণত ক্ষণস্থায়ী হয়। তাই মাত্র ৩০ মিনিটের জন্য ক্রেভিং সামলানোর চেষ্টা করে দেখুন। এই সময়ে অন্য কোনো কাজে মনোনিবেশ করুন। হয়তো আধা ঘণ্টা পর আপনার সেই খাবার খাওয়ার তীব্র আকাঙ্ক্ষা চলে যাবে।

\*পরিমিত পরিমাণে ক্রেভিং মেটান।

যদি সেই তীব্র আকাঙ্ক্ষা কোনোভাবেই দূর করা না যায় তাহলে খাবারটি খেতে পারেন। তবে অবশ্যই সামান্য পরিমাণে খাবেন, যেন ক্রেভিং মিটে যায়। পেট ভরানোর জন্য না খেয়ে এভাবে মানসিক তৃপ্তির জন্য খেলে ক্যালরির পরিমাণ নিয়ন্ত্রণ করা যাবে। দিনের বাকি খাবারগুলো তুলনামূলকভাবে কম ক্যালরিযুক্ত হলে আপনার ওজন কমানোর পথে নিজেকে ধরে রাখা সহজ হবে।

ID: 705

Context: ৪র্থ সপ্তাহে ওজন নিয়ন্ত্রন

Question: ৪র্থ সপ্তাহে ওজন নিয়ন্ত্রণে কি জানা গুরুত্বপূর্ণ?

Answer:

১। বাড়িতে থাকা সব ধরনের খাবার, বিশেষ করে প্যাকেটজাত খাবারের একটি তালিকা তৈরি করুন। অস্বাস্থ্যকর নাস্তাগুলো কোথায় আছে তা খুঁজে বের করুন। কেক-মিষ্টি, চকলেট, বিস্কুট, চিপস-চানাচুর, আইসক্রিম, ভাজাপোড়া, নিমকি ও অন্যান্য স্ন্যাকস – যেগুলোতে ফ্যাট, চিনি ও লবনের পরিমাণ অনেক বেশি কিন্তু পুষ্টি একেবারেই কম – এগুলোকে একত্র করুন।

এবার ৩টি কাজ করতে পারেন—

এগুলো বাসা থেকে বের করে ফেলুন।

সম্ভব হলে দোকানে ফেরত দিয়ে নিত্য প্রয়োজনীয় অন্য জিনিস কিনুন।

যদি বাড়িতেই রাখতে হয় তাহলে হাতের নাগালের বাইরে রাখুন, যেন সহজেই এগুলো খেয়ে ফেলা ঠেকানো যায়।

ফ্রিজে রাখতে হলে ভেতরের দিকে, স্বাস্থ্যকর খাবারগুলোর পেছনে রাখুন। এতে ক্ষুধা লাগলে স্বাস্থ্যকর খাবারগুলো খাওয়ার সম্ভাবনা বাড়বে, আর অস্বাস্থ্যকর স্ন্যাকস খাওয়ার সম্ভাবনা কমে যাবে।

২। ব্যায়ামকে দৈনন্দিন জীবনের অংশ বানিয়ে ফেললে নিজের অজান্তেও ক্যালরি খরচ হবে। ফলে ওজন কমানো আরও সহজ হয়ে যাবে। নিচের অ্যাকশন পয়েন্টগুলো থেকে একেকদিন একেকটি পয়েন্ট বেছে নিতে পারেন।

\*আজকে আমি ১০,০০০ কদম হাঁটব।

\*আজকে আমি বাসে/রিকশায়/গাড়িতে না চড়ে হেঁটে বা সাইকেল চালিয়ে যাওয়া আসা করব।

\*আজকে বন্ধুদের সাথে হাঁটতে বের হবো।

\*আজকে টিভি দেখার সময়ে বসে না থেকে এক জায়গায় দাঁড়িয়ে পা নেড়ে নেড়ে হাঁটবো।

এই সপ্তাহের কাজগুলো শেষ হলে আপনি ওজন কমানোর ৫ম সপ্তাহের কার্যক্রম শুরু করতে পারেন।

ID: 714

Context: এলার্জি সংক্রমন

Question: এলার্জি কি ছোঁয়াচে?

Answer:

এলার্জি ছোঁয়াচে নয়। এটি শরীরের একটি বিশেষ প্রতিক্রিয়া। আমাদের রোগ প্রতিরোধ ব্যবস্থা যখন ক্ষতিকর নয় এমন জিনিসকেও ভুলে শত্রু ভেবে বসে তখন শরীরে এলার্জির লক্ষণ দেখা দেয়। ভিন্ন ভিন্ন মানুষের ভিন্ন ভিন্ন জিনিসে এলার্জি থাকতে পারে।

ID: 715

Context: এলার্জির ঔষধ

Question: এলার্জির ঔষধ বেশি খেলে কী হয়?

Answer:

এলার্জির চিকিৎসায় বিভিন্ন ধরনের ঔষধ ব্যবহার করা হয়। এর মধ্যে একটি হলো স্টেরয়েড জাতীয় ঔষধ। এগুলো সাদা রঙের গোল গোল ছোটো বড়ি হিসেবে কিনতে পাওয়া যায়।স্টেরয়েড শরীরের রোগ প্রতিরোধ ব্যবস্থাকে দুর্বল করে দেওয়ার মাধ্যমে এলার্জির লক্ষণ কমিয়ে আনে। তবে দীর্ঘদিন ধরে এসব ঔষধ সেবন করলে ইনফেকশন, গ্যাস্ট্রিকের সমস্যা, বদহজম, হাড় ক্ষয়, ডায়াবেটিস ও উচ্চ রক্তচাপের মতো বিভিন্ন স্বাস্থ্য জটিলতা দেখা দিতে পারে। তাই ডাক্তারের সুনির্দিষ্ট পরামর্শ ছাড়া স্টেরয়েড ব্যবহার করা একেবারেই উচিত নয়।

ID: 716

Context: এলার্জি হলে করণীয়

Question: আমার শরীরে ছোটো ছোটো গোটা গোটা এলার্জি,হলে কী করণীয়?

Answer:

খাদ্যাভ্যাস ও জীবনযাত্রায় কিছু বিধিনিষেধ মেনে চললে এলার্জি অনেকাংশেই নিয়ন্ত্রণে রাখা সম্ভব। প্রয়োজনে চিকিৎসকের পরামর্শ অনুযায়ী অ্যান্টিহিস্টামিন জাতীয় ঔষধ সেবন করা যেতে পারে। তবে এলার্জির কারণেই এসব গোটা হচ্ছে কি না সেটি খুঁজে বের করা জরুরি।

ID: 717

Context: এলার্জির কারণে শ্বাসকষ্ট

Question: এলার্জির কারণে কি শ্বাসকষ্ট হয়?

Answer:

এলার্জির কারণে শ্বাসকষ্ট হতে পারে। ইতোমধ্যে অ্যাজমার মতো শ্বাসতন্ত্রের রোগ থাকলে রোগের তীব্রতা বেড়ে যেতে পারে।

ID: 732

Context: ডিজিটাল থার্মোমিটারে জর মাপা

Question: ডিজিটাল থার্মোমিটারে কীভাবে জ্বর মাপে?

Answer:

নিচের ধাপগুলো অনুসরণ করে ডিজিটাল থার্মোমিটারের সাহায্যে তাপমাত্রা মাপতে পারেন—

১. থার্মোমিটারের সামনের অংশ ভালোমতো সাবান ও ঠান্ডা পানি দিয়ে ধুয়ে শুকিয়ে নিন।

২. নির্দেশিকা অনুযায়ী থার্মোমিটার অন করুন।

৩. থার্মোমিটারের সামনের অংশ জিহ্বার নিচে ও মুখের যতটা সম্ভব ভেতরের দিকে ঢোকান।

৪. এবার মুখ ভালোমতো বন্ধ করুন। এমনভাবে বন্ধ করবেন যেন দুই ঠোঁট দিয়ে থার্মোমিটার সম্পূর্ণ চেপে থাকে।

৫. থার্মোমিটারের ‘বিপ’ বা নির্দিষ্ট শব্দ হওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করুন।

৬. শব্দ শোনার পর থার্মোমিটার মুখ থেকে বের করে তাপমাত্রা একটা ডায়েরিতে লিখে রাখুন। সাথে তারিখ ও সময় লিখে রাখতে পারলে ভালো হয়।

৭. থার্মোমিটার বগলে দিয়েও তাপমাত্রা মাপতে পারেন। সেক্ষেত্রে এমনভাবে বগল ভাঁজ করবেন যেন থার্মোমিটার বগলে আঁটসাঁট হয়ে থাকে।

ID: 838

Context: গর্ভাবস্থায় পেটে বা শরীরে হালকা চুলকানি

Question: চুলকানি হলে কখন ডাক্তারের কাছে যেতে হবে?

Answer:

গর্ভাবস্থায় পেটে বা শরীরে হালকা চুলকানি হলে তা সাধারণত আপনার কিংবা গর্ভের শিশুর জন্য ক্ষতিকর নয়। তবে নিচের লক্ষণগুলোর কোনোটি দেখা গেলে দ্রুত ডাক্তারের কাছে যাওয়া জরুরি—

1. একটা নির্দিষ্ট সময়ে (সন্ধ্যার পরে) চুলকানি বেড়ে গেলে

2. চুলকানির কারণে অনেক অস্বস্তি হলে

3. শরীরের অন্যান্য জায়গায় চুলকানি হলেও হাত ও পায়ের তালুতে বেশি চুলকালে

4. চুলকানির সাথে অন্য কিছু লক্ষণ দেখা গেলে

5. একটানা অনেকদিন ধরে চুলকানি থাকলেএর কারণ হলো, এগুলো গর্ভাবস্থার বিশেষ লিভারের রোগ অথবা অন্য কোনো চর্মরোগের লক্ষণ হতে পারে। সময়মতো সঠিক চিকিৎসা না করালে তা মা ও গর্ভের শিশুর জন্য মারাত্মক হতে পারে।

ID: 961

Context: গর্ভাবস্থায় কোনো খাবারের প্রতি তীব্র আকাঙ্ক্ষা

Question: গর্ভাবস্থায় সাধারণত কোনো সময় থেকে কোনো খাবারের প্রতি তীব্র আকাঙ্ক্ষা বেশি থাকে?

Answer:

গর্ভাবস্থায় সাধারণত নির্দিষ্ট কোনো সময় থেকে কোনো খাবারের প্রতি তীব্র আকাঙ্ক্ষা/আসক্তি শুরু হয় না। একেকজনের ক্ষেত্রে একেকসময় ও একেক খাবারের প্রতি এই লক্ষণ দেখা দেয়। আবার কারও কারও এধরনের কোনো লক্ষণই দেখা দেয় না।বেশিরভাগ ক্ষেত্রে গর্ভধারণের প্রথম ত্রৈমাসিকের মধ্যেই নির্দিষ্ট কোনো খাবার খাওয়ার তীব্র ইচ্ছা শুরু হতে দেখা যায়। এমনকি কারও কারও ক্ষেত্রে গর্ভধারণের প্রথম পাঁচ সপ্তাহের মধ্যেই এই লক্ষণ দেখা দিতে পারে।পরবর্তী তিন মাস, অর্থাৎ গর্ভধারণের চতুর্থ, পঞ্চম ও ষষ্ঠ মাসে ধীরে ধীরে এই লক্ষণের তীব্রতা বাড়তে থাকে। তবে গর্ভধারণের শেষের ত্রৈমাসিকের মধ্যে, অর্থাৎ সপ্তম, অষ্টম ও নবম মাসের মধ্যে নির্দিষ্ট কিছু খাওয়ার এমন তীব্র ইচ্ছা তেমন একটা থাকে না বললেই চলে।

ID: 973

Context: গর্ভাবস্থায় পাইলস হলে করণীয়

Question: গর্ভাবস্থায় পাইলস হলে করণীয় কি?

Answer:

১. ব্যথার জায়গাটি কুসুম গরম পানিতে ভিজিয়ে রাখা যায়। ছোট বাচ্চাদের গোসল করানো হয় এমন ছোট আকারের একটি পাত্রে কুসুম গরম পানি নিয়ে সেখানে বসতে পারেন। দিনে ৩ বার পর্যন্ত এটি করা যায়। অন্য সময়ে কোথাও বসতে গেলে একটি বালিশ ব্যবহার করে সেটার ওপর বসা যেতে পারে।২. একটা প্যাকেটে কিছু বরফ নিয়ে সেটা তোয়ালে দিয়ে পেঁচিয়ে মলদ্বারের ফোলা অংশের ওপরে লাগানো যায়। এতে আরাম পাওয়া যাবে।৩. বিছানায় শুয়ে পা উঁচু করে রাখলে মলদ্বারে রক্ত চলাচল সহজ হবে ও ব্যথা উপশম হবে। শোবার সময় পায়ের নিচে বালিশ দিতে পারেন। এছাড়া খাটের পায়ার নিচে কোন কিছু দিয়ে খাটের এক পাশ উঁচু করে সেদিকে পা দেওয়া যেতে পারে।৪. মলদ্বার সবসময় পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন ও শুকনো রাখতে হবে। মলত্যাগের পর জোরে ঘষাঘষি না করে আলতোভাবে জায়গাটি পরিষ্কার করে নিতে হবে। টয়লেট পেপার হালকা ভিজিয়ে তারপর সেটা দিয়ে মুছতে পারেন।৫. পায়খানার সময়ে ভেতর থেকে মাংসপিণ্ড বের হয়ে আসলে জোরে চাপাচাপি না করে আলতোভাবে ঢুকিয়ে দেয়ার চেষ্টা করতে হবে। এক্ষেত্রে পিচ্ছিল জেলি অথবা তেল জাতীয় কিছু আঙুলে মেখে নিয়ে তারপর চেষ্টা করলে ব্যথা কম লাগবে।

ID: 1134

Context: রোটা ভাইরাস

Question: রোটা ভাইরাস কি?

Answer:

রোটা ভাইরাস এক প্রকারের ছোঁয়াচে ভাইরাস যা খাদ্যনালীতে সংক্রমণ ঘটায়, এবং এর ফলে বমি এবং পেট খারাপ হয়। এই অবস্থা ছোট বাচ্চা এবং শিশুদের মধ্যে খুবই সাধারণ। যদিও, প্রতিষেধক এবং ব্যক্তিগত পরিচ্ছন্নতা বজায় রাখার মাধ্যমে এই রোগ প্রতিরোধ করা সম্ভব। এই ভাইরাসের সংক্রমণ বাচ্চাদের মধ্যে পেট খারাপ হওয়ার একটা খুব সাধারণ কারণ।

ID: 1135

Context: রোটা ভাইরাস এর সঙ্গে জড়িত প্রধান লক্ষণ এবং উপসর্গগুলি

Question: রোটা ভাইরাস এর সঙ্গে জড়িত প্রধান লক্ষণ এবং উপসর্গগুলি কি কি?

Answer:

দূষিত জল বা খাদ্য গ্রহণ করার প্রায় দুই দিন বাদে বাচ্চাদের মধ্যে রোটাভাইরাসের লক্ষণগুলি প্রকট হয়। লক্ষণগুলি হলো: \*জ্বর।

\*পেট খারাপ।

\*বমি।

\*পেটে ব্যাথা।

\*খিদে কমে যাওয়া।

\*ডিহাইড্রেশন।

\*মূত্রের পরিমাণ কমে যাওয়া।

\*মুখ এবিং গলা শুকিয়ে যাওয়া।

\* মাথা ঘোরা।

অস্বস্তি বোধ হওয়া বা বিরক্তিভাব।যে সব বাচ্চাদের এই লক্ষণগুলির ইতিহাস আছে তারাও রোটা ভাইরাসে আক্রান্ত হতে পারে রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা না থাকার জন্য। যদিও, এই ভাইরাসে প্রথম আক্রান্ত হলে সেই সংক্রমণ অনেক বেশি গুরুতর।

ID: 1136

Context: রোটা ভাইরাস সংক্রমনের কারন

Question: রোটা ভাইরাস সংক্রমনের কারন কি কি?

Answer:

রোটাভাইরাস খুবই ছোঁয়াচে রোগ যা নিচে উল্লেখ করা মধ্যমে ছড়ায়:আক্রান্ত কোনও বাচ্চার মলের সঙ্গে সরাসরি সংস্পর্শ।

আক্রান্ত ব্যক্তির সংস্পর্শে গেলে।

প্রসাধন দ্রব্যাদী, বিছানা, খাদ্য থেকে।

পরিচ্ছন্নতা না বজায় রাখলে।

ID: 1137

Context: রোটাভাইরাস নির্ণয় এবং চিকিৎসা

Question: রোটাভাইরাস কিভাবে নির্ণয় এবং চিকিৎসা করা হয়?

Answer:

এর গুরুতর পর্যায়ে, রোটাভাইরাস থেকে ডিহাইড্রেশন- সম্পর্কিত জটিলতার সৃষ্টি করে। মানুষের মলে অবস্থিত ভাইরাসের চিহ্নিতকরণের মাধ্যমে এই রোগ নির্ণয় করা হয়। রোগ নির্ণয় করার জন্য চিকিৎসক মল পরীক্ষার পরামর্শ দিতে পারেন। রোগ সম্পর্কে নিশ্চিত হতে পরবর্তীকালে এনজাইম ইমিউনো ইমিউনোঅ্যাসে এবং রিসার্ভ ট্রান্সক্রিপটেজ পলিমারেজ চেন-রিঅ্যাকশন (পিসিআর) রোগ নির্ণয়ে সাহায্য করতে পারে।

ID: 1138

Context: রোটাভাইরাস এর চিকিৎসা

Question: রোটাভাইরাস এর চিকিৎসা কি?

Answer:

রোটাভাইরাস সংক্রমণের ক্ষেত্রে প্রতিকারের চেয়ে প্রতিরোধ ভাল। অতএব, জনবহুল জায়গা পরিত্যাগ করার এবং নিজেকে পরিচ্ছন্ন রাখার উপদেশ দেওয়া হয়। সংক্রমণ এড়াতে, আক্রান্ত রোগীর বিছানা বা জামাকাপড় না ছোঁয়াই ভালো। শরীর থেকে বেড়িয়ে যাওয়া লবন এবং জলের ঘাটতি পূরণ করতে ওরাল রিহাইড্রেশন সলিউশনের ব্যবহার করুন, যেমন বাড়িতে তৈরি করা লেমোনেড, ঘোল, নারকেল জল, চিনির দ্রবন (এক লিটার ফুটন্ত জলে ৬ চা চামচ চিনি এবং অর্ধেক চা চামচ আয়োডাইজড লবন দিয়ে বানানো)। সম্পূর্ণ সুস্থ হওয়া পর্যন্ত বাইরের খাদ্য এড়িয়ে চলাই ভালো।রোটা ভাইরাসে সংক্রমণের চিকিৎসা তার লক্ষণের উপর নির্ভর করে হয় এবং এক্ষেত্রে চিকিৎসক সম্পূর্ণ বিশ্রাম নেওয়ার পরামর্শ দিতে পারেন। নিজেকে হাইড্রেটেড রাখা এবং কাঁচা খাদ্য এড়িয়ে চলাই ভালো।ভাইরাসের বিরুদ্ধে সর্বোত্তম সুরক্ষা পেতে শিশুদের দুটি টিকা দেওয়া যেতে পারে।রোটা টেক্স (আরভি5) যা বাচ্চাকে 2,4 এবং 6মাসে দেওয়া হয়।

রোটারিক্স (আরভি1) ২ এবং 4 মাসের বাচ্চাদের জন্য।।

ID: 1139

Context: রোজাসিয়া

Question: রোজাসিয়া কি?

Answer:

রোজাসিয়া বা অ্যাকনে রোজাসিয়া এক ধরনের ত্বকের রোগ যা সাধারণত ত্বকের চামড়াকে প্রভাবিত করে। মুখকে স্থায়ীভাবে লাল করার জন্য ক্যাপিলারিগুলি (সূক্ষ্ম নল) বড় হয়। অনুরূপভাবে, কপাল, গাল এবং থুতনিতে ব্রণর মতো হলুদ রঙের পিম্পেল বা ফুস্কুড়ি দেখা যায়। অনেক সময় একে ব্রণর সাথে গুলিয়ে ফেলা হতে পারে; যদিও, এটা উল্লেখ করা জরুরী যে ব্রণর মতো রোজাসিয়ার জন্য মুখে কোনও দাগ হয় না।সাধারণত 30-50 বছর বয়সী মহিলাদের মধ্যে এই অবস্থাটি হয়ে থাকে, যার কারণে মুখ লাল হয়ে যায়। অবস্থার অগ্রগতির সঙ্গে সঙ্গে মুখের লালভাব বৃদ্ধি পেতে থাকে যেহেতু ক্যাপিলারিগুলি বড় হয়। পুরুষদের ক্ষেত্রে, এর ফলে নাকও লাল হয়ে যায়।

ID: 1140

Context: রোজাসিয়া প্রধান লক্ষণ এবং উপসর্গগুলি

Question: রোজাসিয়া এর সাথে যুক্ত প্রধান লক্ষণ এবং উপসর্গগুলি কি কি?

Answer:

মুখ লাল হয়ে যাওয়া দেখেই সাধারণত এই রোগের নির্ণয় করা হয়। কোনও কোনও ক্ষেত্রে, চোখও প্রভাবিত হয় এবং রক্তরাঙা ও বালি বালি হয়ে যায়। অন্যান্য উপসর্গগুলির মধ্যে রয়েছে:কপাল, গাল এবং থুতনি লাল হয়ে যাওয়া।

\* ফ্লাশিং।

\* হঠাৎ পুঁজ ভর্তি ফুস্কুড়ি হওয়া।

\* ফর্সা মহিলাদের ক্ষেত্রে রক্ত ধমনীগুলি দৃশ্যমান হওয়া।

\* খড়খড়ে এবং ত্বকের রঙ অসম হওয়া।

\* রাইনোফাইমা বা নাকের চামড়া মোটা হয়ে যাওয়া।

\* মুখ জ্বালা করা।

\* মুখে দাগ হওয়া।

ID: 1141

Context: রোজাসিয়া এর প্রধান কারণগুলি

Question: রোজাসিয়া এর প্রধান কারণগুলি কি কি?

Answer:

এই রোগটি সাধারণত মুখের উপরে হয় যা মাইটের ফলে হতে পারে। এই রোগ হওয়ার অন্যান্য সাম্ভাব্য কারণগুলি হল:রক্ত ধমনীর অস্বাভাবিকতা।

ক্যাফিনযুক্ত পানীয় বা গরম পানীয় যেমন কফি বা স্যুপ।

\* ইউভি রে এক্সপোজার।

\* মানসিক চাপ।

\* রেড ওয়াইন বা অন্যান্য মদ।

\* অতিরিক্ত গরম।

\* অতিরিক্ত পরিশ্রম।

\* ওষুধ।

ID: 1142

Context: রোজাসিয়া এটি কিভাবে নির্ণয় এবং চিকিৎসা করা

Question: রোজাসিয়া এটি কিভাবে নির্ণয় এবং চিকিৎসা করা হয়?

Answer:

শারীরিক পরীক্ষা এবং সম্পূর্ণ মেডিকেল ইতিহাস নেওয়ার মাধ্যমে রোজাসিয়ার নির্ণয় করা হয়। রক্ত পরীক্ষার মাধ্যমে লুপাস এরিথেমাটোসাসের মতো একই লক্ষণযুক্ত রোগের থেকে রোজাসিয়াকে আলাদা করে চিহ্নিত করা হয়। তাই, চিকিৎসকের কাছে গেলে এই রোগের অন্তর্নিহিত কারণ চিহ্নিত করা আরও সহজ হতে পারে।তবে, সাধারণ মানুষ ব্রণ, সেবোরিক ডার্মাটাইটিস এবং পেরিওরাল ডার্মাটাইটিসের উপসর্গগুলির সঙ্গে এই রোগের উপসর্গগুলিকে গুলিয়ে ফেলতে পারে।এই রোগের চিকিৎসাগুলির মধ্যে রয়েছে:অন্তর্নিহিত কারণগুলি এড়িয়ে চলা।

\* নিয়মিত মুখ পরিষ্কার করা।

\* সান্সক্রিন লোশনের ব্যবহার।

\* ফোটোথেরাপি।

\* ডক্সিসাইক্লিন এবং মাইনোসাইক্লিনের মতো অ্যান্টিবায়োটিক।

\* ক্রিম এবং লোশনের মাধ্যমে টপিক্যাল চিকিৎসা।

\* ডায়াথার্মি।

\* লেজার চিকিৎসা।

\* আইসোট্রেটিনয়েনের প্রয়োগ।

\* সার্জারি বা অস্ত্রোপচার।

ID: 1143

Context: চোখ লাল হওয়া

Question: চোখ লাল হওয়া কি?

Answer:

চোখ লাল হওয়া হল একটি উপসর্গ যাতে বোঝা যায় যে চোখে কোন সমস্যা হয়েছে যা সাধারণত ছোট কোন সমস্যাই হয়ে থাকে। যাইহোক, কখনো কখনো এর সাথে ব্যথা দেখা দিতে পারে এবং যা বড় কোন সমস্যার সংকেত হতে পারে। এটি কনজাঙ্কটিভাইটিস নামক সংক্রমণের ফলে চোখ ফুলে যাওয়া/প্রদাহের কারণে হতে পারে, আবার চোখের ভিতরে রক্তপাত হলে হতে পারে যাকে সাবকনজাঙ্কটিভাল হ্যামারেজ বলা হয়।

ID: 1144

Context: চোখ লাল হওয়া এর সাথে যুক্ত প্রধান লক্ষণ ও উপসর্গগুলি

Question: চোখ লাল হওয়া এর সাথে যুক্ত প্রধান লক্ষণ ও উপসর্গগুলি কি কি?

Answer:

চোখ লাল হওয়ার সাথে যুক্ত প্রধান লক্ষণ ও উপসর্গগুলির মধ্যে রয়েছে:ব্যথা।

\* চোখে ফোলাভাব।

\* চোখে চুলকানি, কখনো কখনো চোখ থেকে জলও পড়ে।

\* প্রচন্ড মাথাব্যথা।

\* আলোর প্রতি সংবেদনশীলতা।

\* গুরুতর ক্ষেত্রে, চোখে দেখতেও সমস্যা হতে পারে।

ID: 1145

Context: চোখ লাল হওয়া এর প্রধান কারণগুলি

Question: চোখ লাল হওয়া এর প্রধান কারণগুলি কি কি?

Answer:

চোখ লাল হওয়ার কারণগুলির মধ্যে রয়েছে:চোখের মধ্যে বাইরের পদার্থ প্রবেশ করা, অ্যালার্জি বা ইমিউনোলজিক প্রতিক্রিয়া।

\* তীক্ষ্ণ বা ভোঁতা কিছুর আঘাত লাগা।

\* রাসায়নিকে পোড়া।

\* চোখের ভিতরে রক্তবাহগুলির ফেটে যাওয়া।

\* ভাইরাসঘটিত সংক্রমণ অথবা ব্যাকটেরিয়াঘটিত সংক্রমণ।

\* বিভিন্ন সমস্যাগুলি, যেমন কনজাঙ্কটিভাইটিস, ক্যালেজিয়ন এবং ক্যারাটাইটিস।

\* গ্লুকোমা, ইউভিয়াইটিস এবং কর্নিয়াল আলসারের ক্ষেত্রে যন্ত্রণাদায়ক লাল চোখ দেখা যায়।

\* অ্যাস্পিরিন অথবা ওয়ারফেরিনের মতো ওষুধগুলি।

রক্তপাত, যেমন সাবকনজাঙ্কটিভাল হ্যামারেজের ক্ষেত্রে, যেটি হল একটি চিকিৎসাগত জরুরি অবস্থা।

ID: 1146

Context: চোখ লাল হওয়া নির্ণয় এবং চিকিৎসা

Question: চোখ লাল হওয়ার কিভাবে নির্ণয় এবং চিকিৎসা করা হয়?

Answer:

ডাক্তার উপসর্গগুলির সম্পূর্ণ ইতিহাস নিয়ে থাকেন, যার মধ্যে রয়েছে কতক্ষণ চোখ লাল থাকে এবং কতটা লাল থাকে এবং কোন ব্যথা আছে কিনা বা থাকলেও কতটা ব্যথা আছে। ডাক্তার তারপর চোখের সম্পূর্ণ পরীক্ষা করেন এইগুলি জানার জন্য: দৃষ্টিশক্তি।

\* চোখের বাইরের পেশীর সঞ্চালণের ক্ষমতা।

\* চোখের ভিতরের চাপ।

\* স্লিট-ল্যাম্প টেস্ট।

\* কর্নিয়ায় আঁচড়ের দাগ, ঘর্ষণ অথবা এডিমা/ফোলাভাব আছে কিনা।

\* চোখের পাতা এবং অশ্রুথলিগুলির পরীক্ষা।চোখ লাল হওয়ার সমস্যায় ব্যবস্থা নেওয়া পুরোপুরি এর কারণের উপর নির্ভর করে এবং যার মধ্যে থাকতে পারে:বাড়িতে নেওয়ার ব্যবস্থাগুলি, যেমন:

ঠান্ডা সেঁক অথবা বন্ধ চোখের উপর দিনে কয়েকবার ধোয়া কাপড় ব্যবহার করা।

\* চোখে হাত দেওয়ার আগে হাত পরিষ্কার করা এবং প্রতিদিন পরিষ্কার, পরিচ্ছন্ন বিছানা এবং তোয়ালে ব্যবহার করা।

\* অ্যালার্জির কারণস্বরূপ অনুঘটকগুলি অথবা অস্বস্তি সৃষ্টিকারী পদার্থগুলি থেকে দূরে থাকা।

\* যদি চোখে কোন বাইরের পদার্থ প্রবেশ করে থাকে তা বার করে দেওয়া।

\*ওষুধ দ্বারা সমস্যাটির সমাধানের উপায়গুলির মধ্যে রয়েছে:

সংক্রমণ হলে অপথ্যালমিক অ্যান্টিবায়োটিক ব্যবহার।

\* অ্যালার্জির জন্য অ্যান্টিহিস্টামাইন/ভেসোকনস্ট্রিকটর ওষুধের ব্যবহার।

\* শুষ্ক চোখের জন্য প্রদাহনাশক ওষুধ, কৃত্রিম চোখের জল এবং পিচ্ছিলকারক মলমের ব্যবহার।

\* গ্লুকোমার ক্ষেত্রে রক্তচাপ কমানোর ওষুধের ব্যবহার।

\* গুরুতর ক্ষেত্রে অস্ত্রোপচারের প্রয়োজন হয়।

ID: 1165

Context: প্যারালাইসিস

Question: প্যারালাইসিস কি?

Answer:

প্যারালাইসিস হল একটা অবস্থা যেখানে শরীরের কিছু বা সমস্ত অঙ্গের সাময়িক বা সম্পূর্ণ সঞ্চালণ বন্ধ হয়ে যায়। এটা হয় মস্তিষ্ক এবং শরীরের পেশিসমূহের মধ্যে সংকেতপ্রেরণ পদ্ধতির আদান-প্রদানগত সমস্যার কারণে। এটি হতে পারে কোনও রোগের কারণে, যেমন পোলিও, স্নায়ুর ব্যাধি অথবা অন্য কারণের জন্য।

ID: 1166

Context: প্যারালাইসিস প্রধান লক্ষণ এবং উপসর্গগুলি

Question: প্যারালাইসিস প্রধান লক্ষণ এবং উপসর্গগুলি কি কি?

Answer:

মূল উপসর্গ হল শরীরের কিছু অঙ্গ বা শরীরের সমস্ত অঙ্গ নড়াচড়া করার অক্ষমতা। এটির সুত্রপাত হয়তো আস্তে আস্তে বা হঠাৎ করে হয়। উপসর্গগুলি হয়তো মাঝে মাঝে দেখা দিতে পারে। মুখ্যভাবে আক্রান্ত অঙ্গগুলি হল:মুখের অংশ।

পায়ের উপরের দিক।

একটা পায়ের উপরের বা নীচের দিক (মোনোপ্লেজিয়া)।

শরীরের একটা দিক (হেমিপ্লেজিয়া)।

দুটো পায়েরই নীচের দিকে (প্যারাপ্লেজিয়া)।

চার হাত-পা (কোয়াড্রিপ্লেজিয়া)।শরীরের সমস্ত আক্রান্ত অঙ্গ কঠিন অথবা আলগা বোধ হতে পারে, সেখানে সংবেদনের অভাব দেখা দিতে পারে বা কখনও কখন সেগুলি বেদনাদায়কও হয়ে উঠতে পারে।

ID: 1167

Context: প্যারালাইসিস এর প্রধান কারণগুলি

Question: প্যারালাইসিস এর প্রধান কারণগুলি কি কি?

Answer:

প্যারালাইসিসের অন্তর্নিহিত কারণগুলি অনেক এবং এটা সাময়িক বা দীর্ঘকালের জন্য হতে পারে। প্রধান কারণগুলি হল:দেহের এক দিকে হঠাৎ করে দুর্বলতা (স্ট্রোক বা অস্থায়ী ইসচেমিক আক্রমণ)।

অল্পক্ষণের জন্যপ্যারালাইসিস ঘুম থেকে ওঠার পর বা ঘুমোতে যাওয়ার আগে (স্লিপ প্যারালাইসিস)।

দুর্ঘটনার কারণে, স্নায়ুর ক্ষতি হওয়া বা মস্তিষ্কে আঘাত পাওয়া।

মুখের প্যারালাইসিস (বেল’স পালসি) মস্তিষ্কে ক্ষতের কারণে।প্যারালাইসিসের কিছু সাধারণ কারণ হল:মস্তিষ্কে আঘাত বা মেরুদণ্ডে আঘাত।

স্ট্রোক।

মাল্টিপল স্ক্লেরোসিস।

পোলিও।

সেরিব্রাল পালসি।

মস্তিষ্কে বা মেরুদণ্ডে টিউমার।

ID: 1168

Context: প্যারালাইসিস নির্ণয় এবং চিকিৎসা

Question: প্যারালাইসিস কিভাবে নির্ণয় করা হয় এবং এর চিকিৎসা কি?

Answer:

প্যারালাইসিস প্রাথমিকভাবে উপসর্গ দেখে নির্ণয় করা হয়। শারীরিক পরীক্ষার উপর ভিত্তি করে, ডাক্তার কি ধরণের প্যারালাইসিস হয়েছে তা নির্ণয় করেন। ইমেজিং পদ্ধতি, যেমন এমআরআই এবং সিটি স্ক্যান হয়তো করানো হবে মস্তিষ্কের এবং মেরুদণ্ডের বিশদ চিত্র পাওয়ার জন্য এবং স্নায়ুর অবস্থাও পরীক্ষা করে দেখা হয়।কোন নির্দিষ্ট ওষুধ দেওয়া হয় না। প্যারালাইসিসের চিকিৎসা সাধারণত নির্ভর করে অন্তর্নিহিত কারণের উপর। ওষুধের ব্যবহার ছাড়াই যেসকল পদ্ধতি ব্যবহার করা হয় সেগুলি হল:ফিজিওথেরাপি: যাতে পেশির জোড় বাড়ে এবং পেশির ভর বাড়ে।

চলাচল করার জন্য সাহায্য: উইলচেয়ার এবং ব্রেসেস সাহায্য করে রোগীকে স্বাধীনভাবে চলাফেরা করতে।

কাজের মাধ্যমে থেরাপি: দৈনন্দিন কাজগুলির দ্বারা সাহায্য।প্যারালাইসিস হল এমন একটা অবস্থা যা জীবনের মান কমিয়ে দেয় এবং সেই ব্যক্তির আত্ম মর্যাদাও আঘাতপ্রাপ্ত হয়, তাই এর জন্য চাই যথাযথ সমর্থন এবং যত্ন।

ID: 1169

Context: ওভারিয়ান ক্যান্সার বা ডিম্বাশয়ের ক্যান্সার

Question: ওভারিয়ান ক্যান্সার বা ডিম্বাশয়ের ক্যান্সার কি?

Answer:

মহিলাদের ডিম্বাণু (ওভাম) সৃষ্টিকারক অঙ্গ (ওভারি)-এর টিস্যুর ক্যান্সারকে ওভারিয়ান ক্যান্সার বলে। ওভারিয়ান টিউমার বিনাইন (ক্যান্সারবিহীন) অথবা ম্যালিগন্যান্ট (ক্যান্সারযুক্ত) হতে পারে। গাইনোলজিকাল বা স্ত্রীরোগসম্বন্ধীয় ক্যান্সারের মধ্যে এটি সবচেয়ে বিপজ্জনক এবং সাধারণত বয়স্ক মহিলাদের মধ্যে দেখা যায়।

ID: 1170

Context: ওভারিয়ান ক্যান্সার বা ডিম্বাশয়ের ক্যান্সার এর প্রধান লক্ষণ ও উপসর্গগুলি

Question: ওভারিয়ান ক্যান্সার বা ডিম্বাশয়ের ক্যান্সার এর প্রধান লক্ষণ ও উপসর্গগুলি কি কি?

Answer:

ওভারিয়ান বা ডিম্বাশয়ের ক্যান্সার খুব ধীর গতিতে বিকশিত হয় বলে প্রাথমিক পর্যায়ে সনাক্ত করা খুব মুশকিল। কিছু সাধারণ লক্ষণ ও উপসর্গগুলি হলো:অনিয়মিত ঋতুস্রাব অথবা ঋতু প্রবাহ ও চক্রে পরিবর্তন।

\* যৌনমিলনের সময় ব্যথা।

\* বুকজ্বালা।

\* পিঠ ও পেলভিক বা শ্রোণীচক্রে ব্যথা।

\* শ্রোণী অঞ্চল ফুলে ওঠা।

\* ক্ষুধামান্দ্য।

\* ওজন হ্রাস।

\* বমিভাব।

\* কোষ্ঠকাঠিণ্য।

\* পেটফাঁপা।

\* শ্বাসকষ্ট।

\* ক্লান্তি।

\* ঘনঘন প্রস্রাব।ইরিটেবল বাওয়েল সিনড্রোম (আইবিএস) ওভারিয়ান ক্যান্সারের লক্ষণ ও উপসর্গগুলি অনুকরণ করে।

ID: 1171

Context: ওভারিয়ান ক্যান্সার বা ডিম্বাশয়ের ক্যান্সার এর প্রধান কারণগুলি

Question: ওভারিয়ান ক্যান্সার বা ডিম্বাশয়ের ক্যান্সার এর প্রধান কারণগুলি কি কি?

Answer:

বেশিরভাগ ওভারিয়ান ক্যান্সারের প্রকৃত কারণ পরিষ্কারভাবে বোঝা যায় না। সাধারণ কিছু বিপজ্জনক কারণ হলো:জিনগত পরিবর্তন বংশগতভাবে দেহে আসা (উদাহরণস্বরূপ, বিআরসিএ1/2, এইচএনপিসিসি)।

সন্তান হয়নি এমন মহিলা।

মানসিক চাপ।

বন্ধ্যাত্বের চিকিৎসায় ব্যবহৃত ওষুধের পার্শ্ব-প্রতিক্রিয়া।

ডিম্বাশয় অথবা স্তন ক্যান্সার থাকার পারিবারিক ইতিহাস।

অন্যান্য ঝুঁকিপূর্ণ কারণগুলির মধ্যে রয়েছে ধূমপান, পশ্চিমী খাদ্যাভাস, স্থুলকায় রোগ, ডিওড্রেন্ট ব্যবহার, ট্যালকম পাউডার ব্যবহার, পরিবেশ দূষণ, দারিদ্রতা এবং শৈশবস্থা থেকে খারাপ খাদ্যাভাস।

ID: 1172

Context: ওভারিয়ান ক্যান্সার বা ডিম্বাশয়ের ক্যান্সার নির্ণয় ও চিকিৎসা

Question: ওভারিয়ান ক্যান্সার বা ডিম্বাশয়ের ক্যান্সার কিভাবে নির্ণয় ও চিকিৎসা করা হয়?

Answer:

ওভারিয়ান ক্যান্সারের নির্ণয়ের জন্য চিকিৎসকেরা বিভিন্ন পদ্ধতি গ্রহণ করেন, যেমন:তলপেট এবং পেলভিকের আল্ট্রাসাউন্ড

ডিম্বাশয় সংক্রান্ত কোনওরকম অসুখের ক্ষেত্রে আলট্রাসাউন্ডকে সর্বাধিক প্রাধান্য দেওয়া হয় প্রথম টেস্ট হিসেবে।

সিটি স্ক্যান

বড়ো আকারের টিউমার সনাক্ত করতে ব্যবহৃত হলেও, এতে কিন্তু ছোটো আকারের টিউমার ধরা পড়ে না।

এমআরআই স্ক্যান

এটি মস্তিষ্ক ও মেরুদণ্ডে ক্যান্সার ছড়িয়েছে পড়া সনাক্ত করতে সাহায্য করে।

রক্তপরীক্ষা

সিএ-125 পরীক্ষা করা হয় সিএ-125 এর মাত্রা জানার জন্য, যা ডিম্বাশয়ের ক্যান্সারযুক্ত কোষগুলি উৎপন্ন করে।ক্যান্সার নির্ণয় হলে, এর চিকিৎসা নিম্নলখিত উপায়ে করা হয়:কেমোথেরাপি।

অপারেশন।

রেডিয়েশন থেরাপি।এছাড়াও, আকুপাংচার, ভেষজ ওষুধ, ধ্যান এবং যোগব্যায়ামের মতো কিছু পরিপূরক চিকিৎসা পদ্ধতি রয়েছে, যা প্রচলিত চিকিৎসার সঙ্গেই ব্যবহৃত হয়।

ID: 1173

Context: রিকেট রোগ

Question: রিকেট রোগ কি?

Answer:

রিকেট হলো একটি রোগ যা ভিটামিন ডি এবং ক্যালসিয়ামের অভাবের কারণে হয়। এটি হাড়ের স্বাস্থ্যের উপর ভীষণ বড় প্রভাব ফেলে, পাশাপাশি শিশুদের এবং বয়ঃসন্ধিদের মধ্যে বৃদ্ধি এবং বিকাশে, এমন কি বয়সকালেও মারাত্মক প্রমাণিত হয়েছে কারণ এটি হাড়কে নরম, দুর্বল করে দেয় এবং হাড়ের বৃদ্ধি খুব বেদনাদায়ক হয় এবং এর ফলে অঙ্গবিকৃতিও হয়। এই অবস্থাকে শিশুদের মধ্যে হলে রিকেট এবং প্রাপ্তবয়স্কদের মধ্যে হলে অষ্টিওমেলাসিয়া বলা হয়।

ID: 1174

Context: রিকেট এর প্রধান লক্ষণ এবং উপসর্গগুলি

Question: রিকেট এর প্রধান লক্ষণ এবং উপসর্গগুলি কি কি?

Answer:

প্রাথমিক ক্লিনিক্যাল লক্ষণ এবং উপসর্গের মধ্যে থাকে হাড়ে ব্যাথা, কঙ্কাল বিকৃতি, দাঁতে সমস্যা, হাতের কনুই থেকে কব্জি পর্যন্ত এবং হাঁটুতে, কস্টোকোন্ড্রাল জংশনে (যেখানে পাঁজর বুকের সাথে সংযুক্ত থাকে) দুর্বল বৃদ্ধি প্রকাশিত হয়, এই জায়গাগুলোতে দ্রুত হাড়ের বৃদ্ধি এবং বিকাশ এবং ভঙ্গুর হাড় দেখা যায়। ফন্টানেল্লে (শিশুদের মাথার উপরের নরম অংশ) বন্ধ হতে সময় নেয় এবং সদ্যজাতদের মধ্যে কপালের হাড়ে গোলাকার ফোলা অংশ দেখা যায়। একটু বড় শিশুদের মধ্যে কাইফোসিস বা স্কোলিওসিস (মেরুদন্ড সামনের দিকে বা পাশের দিকে বাঁকা থাকে) থাকতে পারে।কঙ্কাল সংক্রান্ত বিষয় ছাড়া অন্যান্য উপসর্গের মধ্যে রয়েছে ব্যাথা, জ্বালা, অঙ্গ সঞ্চানলে বিলম্ব এবং কম বৃদ্ধি। রিকেট রোগ অনেক সময় কঙ্কাল সংক্রান্ত ডিসপ্লেসিয়াসের সাথে ভুল হতে পারে, কারণ এদের ক্লিনিক্যাল বৈশিষ্ট্যগুলি একইরকম।

ID: 1175

Context: রিকেট এর প্রধান কারণগুলি

Question: রিকেট এর প্রধান কারণগুলি কি কি?

Answer:

রিকেট রোগের খুব সাধারণ কারণ হলো ভিটামিন ডি এবং ক্যালসিয়ামের অভাব। নিচে উল্লেখ করা এই ঘাটতিগুলি সবচেয়ে সাধারণ কারণ:পুষ্টির অভাব।

ভিটামিন ডি এর শোষণে অক্ষমতা।

সূর্যরশ্মিতে ত্বকের অপর্যাপ্ত প্রকাশ।

গর্ভাবস্থা।

অকালজাত বা সময়ের আগে হওয়া।

স্থূলতা।

কিডনি এবং লিভারে রোগ।

নির্দিষ্ট কিছু অ্যান্টিকনভালস্যান্টস (খিঁচুনির জন্য) বা অ্যান্টিরেট্রোভাইরাল (এইচআইভির জন্য) ওষুধক্যালসিয়াম এবং ফসফেট ঘাটতির কারণে খনিজকরণের ত্রুটিগুলিকে যথাক্রমে ক্যালসিপেনিক এবং ফসফোপেনিক রিকেট হিসেবে শ্রেণীবদ্ধ করা হয়। খনিজকরণের ত্রুটি, ভিটামিন ডি থেকে বিচ্ছিন্ন অথবা দ্বিতীয় পর্যায়ভুক্ত ঘাটতি, বৃদ্ধির প্লেটের নীচে হাড়ের কোষে অস্টিওড (অখনিজ উপাদান) সঞ্চয় করে। এই কারণে নির্দিষ্ট সময়ের পর হাড় দুর্বল হয়ে যায় এবং বেঁকে যায়।

ID: 1176

Context: রিকেট নির্ণয় এবং চিকিৎসা

Question: রিকেট কিভাবে নির্ণয় এবং চিকিৎসা করা হয়?

Answer:

ভিটামিন ডি এর ঘাটতি নির্ণয়ের ক্ষেত্রে ল্যাবরেটরি পরীক্ষায় ক্যালসিয়াম, ভিটামিন ডি এর মাত্রা, ক্ষারীয় ফসফাটেজ, ফসফরাস এবং প্যারাথাইরয়েড হরমোনের মাত্রা জানার জন্য রক্ত পরীক্ষা করা হয় । যেখানে হাড়ের মধ্যের পরিবর্তন দেখা যায়, তার জন্য এক্স-রে পরীক্ষার পরামর্শ দেওয়া হয়।হাড়ের বায়োপসি প্রয়োজন হতে পারে এবং রিকেট বা অস্টিওম্যালাসিয়া নির্ণয়ের জন্য এটি হল সবচেয়ে সঠিক পদ্ধতি।অভাবের প্রকৃতি এবং তীব্রতা নির্ধারণ করে ভিটামিন ডি-এর যথাযথ ডোজ এবং যতক্ষণ না এক্স-রের ফলাফল স্বাভাবিক হয় ততক্ষণ ক্যালসিয়াম সম্পূরক দেওয়া হয়।প্রতিরোধমূলক ব্যবস্থা:কয়েকটি সহজ ব্যবস্থা রিকেট রোগ প্রতিরোধ করতে সাহায্য করতে পরে। আপনি অবশ্যই:স্বাস্থ্যকর খাদ্য গ্রহণ করুন যাতে দুগ্ধজাত খাবার এবং ডিম অন্তর্ভুক্ত থাকে।

বাইরে সময় কাটান, বিশেষ করে সকালের রোদে।

ডাক্তারের সাথে পরামর্শের পর ভিটামিন ডি-এর সম্পূরক গ্রহণ করুন।

ID: 1177

Context: বমি বমি ভাব

Question: বমি বমি ভাব কি?

Answer:

বমি বমি ভাব এবং বমি হল খুবই সাধারণ লক্ষণ যা মূলত নাড়িভুঁড়ির রোগের সাথে সম্পর্কিত, কিছু অবস্থা খুবই যন্ত্রণাদায়ক এবং কিছু ওষুধের পার্শ্বপতিক্রিয়ার ফলে হয়। অনেক সময়, এই উপসর্গগুলি সাধারণ অ্যানেস্থিয়ার পরবর্তী প্রভাব হিসাবে দেখা যায়। বমি করা হল মুখ দিয়ে পেটের খাবার বার করে পেট খালি করে দেওয়া যেখানে বমি বমি ভাব হল একটি অস্বস্তিকর অনুভূতি যা বমি করার আগে অভিজ্ঞতা করা হয়। দুটো অবস্থাই সারানো যায় এবং সাধারণত এই রোগ খুব গুরুতর স্বাস্থ্যের সমস্যা বোঝায় না।

ID: 1178

Context: বমি বমি ভাব এর প্রধান লক্ষণ এবং উপসর্গগুলো

Question: বমি বমি ভাব এর সাথে জড়িত প্রধান লক্ষণ এবং উপসর্গগুলো কি কি?

Answer:

বমি বমি ভাব এবং বমি করা হল কোন রোগের অবস্থা কে চিহ্নিতকরণ করা। যদিও, বমি বমি ভাব এবং বমির ক্ষেত্রে নিম্নলিখিত উপসর্গগুলি দেখা যায়:দ্রুত নাড়ির স্পন্দন।

শুকনো মুখ।

অজ্ঞান হয়ে যাওয়া বা মাথা ঘোরা।

হালকা মাথাচাড়া।

বিহ্বলতা।

তলপেটে ব্যথা।

ID: 1179

Context: বমি বমি ভাব এর প্রধান কারণগুলি

Question: বমি বমি ভাব এর প্রধান কারণগুলি কি কি?

Answer:

বমি বমি ভাব এবং বমি করা অনেকগুলো কারণের জন্য হতে পারে যেমন:মোটর সিকনেস বা সী সিকনেস।

পেটের সংক্রমণ।

গলব্লাডারে প্রদাহ।

মাইগ্রেন।

ভার্টিগো।

ব্রেন ইনজিউরি বা ব্রেন টিউমার।

পেটের আলসার।

হাইপারঅ্যাসিডিটি।

গর্ভাবস্থায় প্রথম তিনমাস।

ভয়।

অপ্রীতিকর গন্ধ।

খাওয়া দাওয়ার ব্যাধি।

খাদ্যে বিষক্রিয়া।

ওষুধের পার্শ্ব প্রতিক্রিয়া।

সাধারণ অ্যানাস্থেসিয়া।

কেমোথেরাপি এবং রেডিয়েশন থেরাপি।

ID: 1180

Context: বমি বমি ভাব নির্ণয় এবং চিকিৎসা

Question: বমি বমি ভাব কিভাবে নির্ণয় এবং চিকিৎসা করা হয়?

Answer:

বমি বমি ভাব এবং বমি করার অনেক কারণ হতে পারে, তাই নির্দিষ্ট কারণ খুজে বার করাটা জরুরী সফলভাবে চিকিৎসা করার জন্য। এই উপসর্গগুলি কি কারণে দেখা দিচ্ছে তা বোঝার জন্য রোগীর চিকিত্‍সাগত ইতিহাস এবং তার ব্যক্তিগত ইতিহাস সাহায্য করে, আর সাধারণত অন্য নির্দিষ্ট উপসর্গগুলিও রোগের অন্তরনিহিত কারণ বুঝতে সাহায্য করে। ইমেজ স্টাডিং, রক্ত পরীক্ষা বা কোন নির্দিষ্ট রোগের জন্য পরীক্ষা করা যেতে পারে যাতে আমরা রোগের অবস্থা জানতে পারি।বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই, বমি স্ব সীমিত এবং পেটের সব জিনিস বেড়িয়ে যাওয়ার পরে বন্ধ হয়ে যায় কিন্তু কিছু ক্ষেত্রে চিকিৎসার প্রয়োজন পরে। চিকিৎসার মধ্যে শুধু বমি বমি ভাবের এবং বমি করার যত্ন নেওয়াই নয় বরং অন্তরনিহিত কারণের চিকিৎসা করাও হয়। সাধারণত নিম্নলিখিত চিকিৎসার পদ্ধতির উপদেশ দেওয়া হয়।অ্যান্টি নসিয়া এবং অ্যান্টি এমেটিক ওষুধ। যদি আপনি গর্ভবতী হন, তাহলে আপনি নিজের গায়নোকোলজিস্টের পরামর্শ নিয়ে তবে ওষুধ খাবেন।

অ্যান্টি-মোশান অসুস্থতার প্রতিরধকারক ওষুধ।

যে তরল ক্ষয় হয়েছে তার ভরণ করার জন্য, মৌখিক হাইড্রেশনের মিশ্রণ বা স্যালাইনের মাধ্যমে রিহাইড্রেশন থেরাপি দেওয়া হয়।

কিছু প্রাকৃতিক টোটকা যেমন আদার ছোট টুকরো বা লবঙ্গ মুখে রাখলে বমি বমি ভাব থেকে রেহাই দিতে পারে।বমি বমি ভাব এড়াতে অল্প অল্প করে খাওয়া এবং খাবার খাওয়ার পর জল খাওয়া, খাওয়ার সময় জল খাওয়ার থকে বেশি সাহয্য করবে। যদি বমি করা ওষুধের মধ্যমে নিয়ন্ত্রণ না করা যায় এবং দীর্ঘদিন ধরে থাকে, তাহলে বিলম্ব না করে ডাক্তার দেখান।

ID: 1181

Context: ক্লান্তি

Question: ক্লান্তি কি?

Answer:

ক্লান্তিকে সবথেকে ভালো বর্ণনা করা যায় আলস্য ও অবসাদ হিসাবে। যাদের মধ্যে এই উপসর্গগুলো এবং নিদ্রালুভাব দেখতে পাওয়া যায় তাদেরকে ক্লান্তিগ্রস্ত বলা যায়। এই নিষ্ক্রিয়তা এবং আলস্য হতে পারে মানসিক অথবা শারীরিক, যা ঐ ব্যক্তির অন্তর্নিহিত শারীরিক বা মানসিক সমস্যার ইঙ্গিত হতে পারে।

ID: 1182

Context: ক্লান্তির প্রধান লক্ষণ

Question: ক্লান্তির প্রধান লক্ষণ এবং উপসর্গগুলো কি কি?

Answer:

ক্লান্তিগ্রস্ত ব্যক্তি সাধারণত একটু অন্যমনস্ক থাকেন এবং খুব ধীরে চলাফেরা করেন। অন্যান্য যে উপসর্গ দেখা যেতে পারে সেগুলি হল মেজাজের দ্রুত পরিবর্তন, শ্রান্তি, জীবনীশক্তির অভাব এবং দুর্বল চিন্তাশক্তি লক্ষ্য করা যায়। এছাড়া ক্লান্তিগ্রস্ত ব্যক্তির মধ্যে তৎপরতার অভাবও দেখতে পাওয়া যায়।

ID: 1183

Context: ক্লান্তির প্রধান কারণগুলি

Question: ক্লান্তির প্রধান কারণগুলি কি কি?

Answer:

শারীরিক কিছু অসুস্থতা, যেমন জ্বর বা ফ্লু, দুর্বলতা এবং ক্লান্তিভাব সাধারণভাবেই দেখতে পাওয়া যায়। এছাড়াও অন্য যেসব অসুখের ক্ষেত্রে এটি দেখা যায় সেগুলি হল:হাইপারথাইরয়েডিসম বা উচ্চ-থাইরয়েডের সমস্যা।

হাইপোথাইরয়েডিসম বা নিম্ন-থাইরয়েডের সমস্যা।

স্ট্রোক।

গর্ভাবস্থা।

অত্যধিক মদ্যপান।

জ্বর।

মেনিনজাইটিস।

মস্তিষ্কে আঘাত।

কিডনির সমস্যা।

লাইম রোগ।

শরীরে জলশুন্যতা, কম ঘুম বা অসম্পূর্ণ পুষ্টি।

মানসিক সমস্যা, যেমন, বিষণ্ণতা, উদ্বেগ, গর্ভাবস্থা-পরবর্তীকালীন বিষণ্ণতা বা প্রি-মেনস্ট্রুয়্যাল সিনড্রোম বা মাসিকচক্রের পূর্ববর্তীকালীন সমস্যা।

অ্যান্টিডিপ্রেসেন্ট ও অন্যান্য কিছু ওষুধের পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া।

ID: 1184

Context: ক্লান্তি নির্ণয় এবং চিকিৎসা

Question: কিভাবে ক্লান্তি নির্ণয় করা হয় এবং এর চিকিৎসা কি?

Answer:

ক্লান্তি নির্ণয়ের জন্য রোগীর সম্পূর্ণ চিকিৎসাগত ইতিহাস ও শারীরিক পরীক্ষা প্রয়োজনীয়। হৃদযন্ত্র ও ফুসফুসের পরীক্ষাও করা হতে পারে। এছাড়াও চিকিৎসক রোগীর মানসিক সচেতনতা ও অন্ত্রের শব্দ ও ব্যথার পরীক্ষা করতে পারেন। সম্ভাব্য কোন অসুখের জন্য রোগী ক্লান্তিতে ভুগছেন তা জানতে একাধিক টেস্ট ও ইমেজিং স্টাডি বা প্রতিবিম্বকরণ করা হয়ে থাকে।ক্লান্তির চিকিৎসা করার আগে, এর অন্তর্নিহিত কারণ নির্ণয় করা প্রয়োজন। কারণ জানা গেলে তার উপর নির্ভর করে এর চিকিৎসা শুরু করা যায়। চিকিৎসক এর জন্য ওষুধ দিতে পারেন, যেমন মানসিক সমস্যার কারণে ক্লান্তি হলে এন্টিডিপ্রেসেন্ট দেওয়া হয়। যথেষ্ট জলপান, পরিমিত ঘুম, সুষম খাদ্যগ্রহণ ও মানসিক চাপ কমানোর মতো কিছু সহজ পদ্ধতি ক্লান্তি নিয়ন্ত্রণে সাহায্য করে।

ID: 1185

Context: সংক্রমণ (ইনফেকশন)

Question: সংক্রমণ (ইনফেকশন) কি?

Answer:

যখন রোগ-সৃষ্টিকারী জীবণু আপনার শরীরে আক্রমণ করে তখন তারা তাদের সংখ্যা গুণ করে বা বাড়িয়ে তুলে নানা রকম উপসর্গ এবং প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করে, একে সংক্রমণ (ইনফেকশন) বলে। সংক্রমণ (ইনফেকশন) ব্যাকটেরিয়া, ছত্রাক, ভাইরাস এবং পরজীবীর কারণে হয়, যা (শরীরের) ভিতরে ও বাইরে হতে পারে। বেশিরভাগ প্যাথোজেন ব্যাপক বর্ণের বা ধারার রোগ সৃষ্টি করতে পারে। সংক্রমণগুলি প্রাথমিকও হতে পারে, যা বর্তমান স্বাস্থ্য সমস্যার কারণ, অথবা দ্বিতীয় পর্যায়ভুক্তও হতে পারে, যেখানে পূর্বে সংক্রমণ বা কোন ধরনের আঘাতের কারণে রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা কমে যাওয়ার ফলে সংক্রমণ তৈরী হয়।

ID: 1186

Context: সংক্রমণ (ইনফেকশন) এর প্রধান লক্ষণ এবং উপসর্গগুলি

Question: সংক্রমণ (ইনফেকশন) এর প্রধান লক্ষণ এবং উপসর্গগুলি কি কি?

Answer:

সংক্রমণের উপসর্গগুলি সাধারণত সংক্রমণের স্থানের উপর এবং যে ক্ষুদ্র জীবাণু এই সংক্রমণের কারণ তার উপর নির্ভর করে। প্রধান উপসর্গগুলি হল:ফুলে যাওয়া এবং লাল হয়ে যাওয়া।

ব্যথা।

জ্বর।

পেট খারাপ।

লাল লাল ফুসকুড়ি।

নাক দিয়ে জল পড়া বা সর্দি।

কাশি।

নড়াচড়া বা চলাফেরা করতে অসুবিধা।

স্মৃতিশক্তি কমে যাওয়া বা নষ্ট হয়ে যাওয়া।

ID: 1187

Context: সংক্রমণ (ইনফেকশন) এর প্রধান কারণগুলি

Question: সংক্রমণ (ইনফেকশন) এর প্রধান কারণগুলি কি কি?

Answer:

রোগ সৃষ্টিকারী জীবাণুগুলি হল ব্যাকটেরিয়া, ছত্রাক, ভাইরাস এবং প্যারাসাইট বা পরজীবী, যেমন দাদ, কেঁচোকৃমি, উকুন, মাছি এবং এঁটেল পোকা। নীচের আলোচনা হিসাবে সংক্রমণ অনেক উপায়ে ছড়ায়:ব্যক্তি থেকে ব্যক্তি।

পশু থেকে ব্যক্তি।

মায়ের থেকে গর্ভে থাকা শিশুর মধ্যে।

দূষিত খাদ্য এবং জল থেকে।

পোকার কামড় থেকে।

সংক্রামিত ব্যক্তি ছুঁয়েছে এরকম কোনো জিনিস ব্যবহার করলে।

ইয়াট্রোজেনিক সংক্রমণ (সংক্রামিত চিকিৎসার যন্ত্রপাতির কারণে)।

নসকমিয়াল সংক্রমণ (হাসপাতাল থেকে আসা)।

ID: 1188

Context: সংক্রমণ (ইনফেকশন) নির্ণয় এবং চিকিৎসা

Question: সংক্রমণ (ইনফেকশন) কিভাবে নির্ণয় এবং চিকিৎসা করা হয়?

Answer:

নির্ণয় পরীক্ষাগুলির মধ্যে রয়েছে ডাক্তার দ্বারা করা আপনার চিকিৎসার ইতিহাস। সাধারণত নিম্নলিখিত রোগনির্ণয়সংক্রান্ত পরীক্ষাগুলি করার পরামর্শ দেওয়া হয়:শারীরিক পরীক্ষা।

মাইক্রোবায়োলজিকাল পরীক্ষা।

ল্যাবরেটরি পরীক্ষা, যেমন রক্তের নমুনা, মূত্র, মল, গলার ভিতর এবং সেরিব্রোস্পাইনাল ফ্লুইড পরীক্ষা।

ছবি পরীক্ষা, যেমন এক্স-রে এবং এমআরআই।

বায়োপসি।

পিসিআর (পলিমেরেজ চেইন রিঅ্যাকশন) ভিত্তিক পরীক্ষা।

ইমিউনোঅ্যাসেস : ইএলআইএসএ (এনজাইম-লিংকড ইম্মুনোসরবেন্ট অ্যাসে) বা আরআইএ (রেডিও ইমিউনো অ্যাসে)।একবার যদি আপনার সংক্রমণ সৃষ্টি করা জীবাণুর পরিচয় পাওয়া যায়, তাহলে চিকিৎসা সহজ হয়ে যায়। সংক্রমণের জন্য নিম্নলিখিত চিকিৎসাগুলি সহজেই করা যায়:ওষুধ দ্বারা চিকিৎসা:

অ্যান্টিবায়োটিক।

অ্যান্টিভাইরাল ড্রাগস।

এন্টিপ্রোটোজোয়াল ড্রাগস।

অ্যান্টিফাঙ্গালস।

টিকাকরণ।

বিকল্প ওষুধ:

গ্রীন টি, ক্যানবেরি জুস, আদা এবং রসুনের মত প্রাকৃতিক প্রতিকার যা সংক্রমণকে বিরুদ্ধে লড়াই করার দাবি করে।যদিও প্রাকৃতিক প্রতিকার এবং বিকল্প চিকিৎসা, বিশেষ করে আয়ুর্বেদিক ওষুধ দ্বারা সংক্রমণগুলির চিকিৎসা করা যায়, তবুও সংক্রমণের কোনো উপসর্গ লক্ষ্য করলে ডাক্তারের পরামর্শ নেওয়াটাই শ্রেয়। অ্যান্টিবায়োটিকে ক্ষুদ্র জীবাণুগুলির বাধা রদ করার জন্য প্রয়োজনীয় অ্যান্টিবায়োটিকের নিয়ামকগুলি ব্যবহার করা এবং এটি সম্পূর্ণ করা গুরুত্বপূর্ণ। সব সংক্রমণের চিকিৎসার প্রয়োজন নেই, কিছু কিছু নিজেই সেরে যায়। কিন্তু গুরুতর সংক্রমণের জন্য ডাক্তারের পরামর্শ এবং ঠিক সময় চিকিৎসার প্রয়োজন। পরিচ্ছন্নতা, স্বাস্থ্যবিধি এবং সঠিক স্বাস্থ্যব্যবস্থা বজায় রাখলে তা সংক্রমণের প্রেষণ রদ করতে পারে, যার ফলে সংক্রামক রোগ বিস্তার সীমিত হয়।

ID: 1189

Context: কলোরেক্টাল ক্যান্সার (মলদ্বারের ক্যান্সার

Question: কলোরেক্টাল ক্যান্সার (মলদ্বারের ক্যান্সার) কি?

Answer:

কলোরেক্টাল ক্যান্সার বৃহদান্ত্র, কোলন বা মলদ্বার অথবা উভয়কেই প্রভাবিত করে, এবং কোলন অথবা মলদ্বারের ভিতরের আস্তরণে প্রোট্রুশন হিসাবে শুরু হয়। কোলন, মল থেকে অতিরিক্ত জল শোষণ করে, এবং মলদ্বার থেকে মল না বেরোনো পর্যন্ত মল সংরক্ষণ করে।ভোজনপ্রণালী এবং কম স্থূলতার হারের কারণে অন্য দেশগুলির তুলনায় ভারতে কলোরেক্টাল ক্যান্সারের হার কম বলে মনে করা হয়, তবে বেঁচে থাকার হার পাঁচ বছরের কম হয়।

ID: 1190

Context: কলোরেক্টাল ক্যান্সার এর প্রধান লক্ষণ এবং উপসর্গগুলি

Question: কলোরেক্টাল ক্যান্সার এর প্রধান লক্ষণ এবং উপসর্গগুলি কি কি?

Answer:

দেখা যাওয়া সাধারণ উপসর্গগুলি নিম্নে দেওয়া হল:দীর্ঘ দিন ধরে হওয়া পাতলা পায়খানা বা কোষ্ঠকাঠিন্য মত আন্ত্রিক অভ্যাসের পরিবর্তন।

অসম্পূর্ণ মলত্যাগের একটি অনুভূতি।

ক্ষুদ্র আকারের মল।

কোলন বা মলদ্বারে রক্তপাতের কারণে গাঢ় রঙের মল।

পেট ব্যথা।

দুর্বলতা।

অপ্রত্যাশিত ভাবে ওজন কমা।সাধারণত, উপসর্গগুলি পরের পর্যায়ে প্রকাশমান হতে শুরু করে এবং তার পাশাপাশি পরিস্থিতির তীব্রতা এক ব্যক্তি থেকে অন্য ব্যক্তিতে পরিবর্তিত হয়।এই উপসর্গগুলি ক্রোনের রোগ, আলসারেটিভ কোলাইটিস, অর্শ এবং সংক্রমণের মতো অবস্থায় দেখা যায়।

ID: 1191

Context: কলোরেক্টাল ক্যান্সার এর প্রধান কারণগুলি

Question: কলোরেক্টাল ক্যান্সার এর প্রধান কারণগুলি কি কি?

Answer:

সঠিক কারণটি খুঁজে পাওয়া যায় নি, কিন্তু এইগুলোর ক্ষেত্রে কলোরেক্টাল ক্যান্সারের বাড়ার ঝুঁকি আরও বেশি:50 বছরের বেশি বয়সী পুরুষদের।

ব্যক্তিটির পরিবারে যখন কলোরেক্টাল ক্যান্সার চলতে থাকে।

খুব মোটা মানুষের।

সিগারেট ধূমপায়ীদের।

যারা মদ খায়।

লাল এবং প্রক্রিয়াজাত মাংস ভোক্তাদের।

কম ফাইবার খাওয়া ব্যক্তিদের।

যারা অলস জীবনযাপন করে।

অঙ্গ প্রতিস্থাপন করার জন্য যে মানুষ ইমিউনোসাপ্রেসেন্ট ওষুধগুলি অনুসরণ করছেন তাদের।

ডায়াবেটিস মেলিটাসের সাথে ইনসুলিন প্রতিরোধ এবং এইচআইভি সংক্রমণের মত রোগ আছে যাদের।

প্রোস্টেট ক্যান্সার হওয়া ব্যক্তি যে আগে থেকে রেডিয়েশন থেরাপির, ই.জিতে আছেন।

পূর্বে গলব্লাডার অপসারণ হওয়া ব্যক্তির।

পূর্বে করোনারি হার্ট ডিজিজ হওয়া ব্যক্তির।যদি আপনার ঝুঁকির বিষয় থাকে যে আপনার ক্যান্সার বিকাশ হতে পারে তবে এটা হওয়া আবশ্যক নয়; কিন্তু ঝুঁকির বিষয় সম্ভাবনা বৃদ্ধি করে।

ID: 1192

Context: কলোরেক্টাল ক্যান্সার নির্ণয় এবং চিকিৎসা

Question: কলোরেক্টাল ক্যান্সার কিভাবে নির্ণয় এবং চিকিৎসা করা হয়?

Answer:

যদি আপনার রক্তাক্ত মল বা রেক্টাল রক্তপাত হয় তবে অবিলম্বে আপনার ডাক্তারের থেকে পরামর্শ নিন, যা একটি স্বাভাবিক অবস্থা নয়।আপনার ডাক্তার কোন পিন্ড বা অস্বাভাবিকতা খুঁজে পেতে একটি রেকটাল পরীক্ষা করবেন। আপনার হিমোগ্লোবিন, লোহিত রক্তের কোষ (যা রক্ত ক্ষরণের কারণে কমে যেতে পারে) এবং অন্যান্য কোষের সংখ্যা পরীক্ষা করার জন্য তিনি রক্ত পরীক্ষা এবং লিভার ও কিডনি পরীক্ষা করবেন। রোগের পুনরাবৃত্ত হওয়ার ক্ষেত্রে, রক্তে নির্দিষ্ট অ্যান্টিজেনের মাত্রা খুঁজে বের করার জন্য পরীক্ষা করা হয়। কোলোনোস্কোপি, কলোরেক্টাল ক্যান্সারের জন্য একটা স্ক্রীনিং পরীক্ষা যা পলিপস সনাক্ত করার জন্য করা হয়। ক্যান্সার অন্যান্য অঙ্গ প্রভাবিত করেছে কিনা তা সনাক্ত করার জন্য কখনও কখনও বুকের এক্সরে, আল্ট্রাসোনোগ্রাফি এবং সিটি স্ক্যান করা হয়।সার্জারি হল প্রথম চিকিৎসার বিকল্প। কেমোথেরাপিউটিক ওষুধ চিকিৎসার জন্য দেওয়া হয়। বিশেষ ক্ষেত্র ছাড়া রেডিয়েশন থেরাপি ব্যাপকভাবে ব্যবহার করা হয় না। ইমিউনোথেরাপি ক্যান্সারের উচ্চ পর্যায়ে ব্যবহৃত হয়।

ID: 1193

Context: অন্ত্র অসংযম বা অন্ত্র আন্দোলন

Question: অন্ত্র অসংযম বা অন্ত্র আন্দোলন কাকে বলে?

Answer:

অন্ত্র অসংযম বলতে এমন একটি অবস্থাকে বোঝায় যেখানে একজন মলের বা মলত্যাগের বেগকে ধরে রাখতে পারে না। এইভাবে, অন্ত্র খালি করার কাজটি অনিচ্ছুকভাবে বা দূর্ঘটনাক্রমে ঘটে যেতে পারে। এই ঘটনাটি বয়ষ্ক, বিশেষত বয়ষ্ক মহিলাদের মধ্যে দেখা যায়। এটি মাঝে মাঝে ঘটতে পারে বা অবস্থা মারাত্মক জায়গায় পৌঁছাতে পারে, তখন ডাক্তারের সাথে পরামর্শ করা প্রয়োজন। এই অনিচ্ছুকভাবে ঘটা ঘটনা অস্বস্তিকর পরিস্থিতিতে পরার ভয়ে সামাজিক জীবন থেকে একজনকে আলাদা করে দিতে পারে।

ID: 1194

Context: অন্ত্র আন্দোলন এর সাথে যুক্ত প্রধান লক্ষণ ও উপসর্গগুলি

Question: অন্ত্র আন্দোলন এর সাথে যুক্ত প্রধান লক্ষণ ও উপসর্গগুলি কি কি?

Answer:

দুই ধরণের অন্ত্র অসংযম আছে ও ধরণ অনুযায়ী উপসর্গগুলিও বদলায়।তাড়নাযুক্ত ফিকাল ইনকন্টিনেন্স

আপনি মল ত্যাগ করার তাগিদ অনুভব করবেন, কিন্তু টয়লেটে পৌঁছানো পর্যন্ত তা আটকে রাখতে পারবেন না।

অন্ত্র ফিকাল ইনকন্টিনেন্স

এই ধরণটিতে, আপনি মলত্যাগ না হয়ে যাওয়া পর্যন্ত কোনও তাগিদ অনুভব করতে পারবেন না।বারবার বাতকর্মের ইচ্ছা (গ্যাস) নিরোধ করতে অসুবিধা এবং মলের বিন্দু বা দাগ অন্ত্র ফিকাল ইনকন্টিনেন্সের একটি উপসর্গ।

ID: 1195

Context: অন্ত্র আন্দোলন এর প্রধান কারণগুলি

Question: অন্ত্র আন্দোলন এর প্রধান কারণগুলি কি কি?

Answer:

অন্ত্র অসংযমের বিভিন্ন কারণগুলি হল:পেট খারাপ।

মারাত্মক কোষ্ঠকাঠিন্য।

সার্জারি বা আঘাতের কারণে পায়ুগত পেশীর দূর্বলতা।

মলদ্বার বা পায়ুর স্নায়ু সার্জারি বা আঘাতে ক্ষতিগ্রস্ত হলে।

অর্শ/পাইলস।

পায়ুর ঝুলে যাওয়া।

মহিলাদের ক্ষেত্রে যোনির মধ্য দিয়ে পায়ুর বহির্মুখ প্রকাশ।

গ্যাস্ট্রোইনটেস্টাইনাল অংশে সমস্যা, যেমন, ক্রোনের রোগ, আলসারেটিভ কোলাইটিস, ও ইনফ্লেমেটরি বা প্রদাহী অন্ত্রের রোগ।

রোগের অবস্থা, যেমন, ডায়াবেটিস বা বহুমুত্ররোগ, পারকিনসনিজম, স্ট্রোক, স্মৃতিভ্রংশ, এবং মাল্টিপল স্কলেরোসিস।

স্বাভাবিক প্রসব।

অলস জীবনযাপন।

ID: 1196

Context: অন্ত্র আন্দোলন এর রোগ নির্ণয় ও চিকিৎসা

Question: অন্ত্র আন্দোলন এর রোগ নির্ণয় ও চিকিৎসা কিভাবে হয়?

Answer:

আপনার ডাক্তার রোগের উপসর্গগুলির পূর্ব ইতিহাস ও অন্যান্য শারীরিক অবস্থা সম্বন্ধে জানতে চাইতে পারেন, সাথে শারীরিক পরীক্ষাও করতে পারেন। কতটা ঘন ঘন ও মারাত্মকভাবে অবস্থাটি ঘটে থাকে তার উপর নির্ভর করে ডাক্তার অন্যান্য উপসর্গগুলির পরীক্ষা করতে দিতে পারেন, যেমন অ্যানোস্কপি (মলদ্বারের ভিতরের অংশ দেখার জন্য), অ্যানোরেকটাল মেনোমেট্রি (পায়ুর পেশীতে কোনও দূর্বলতা আছে কি না, তা জানার জন্য), এন্ডোঅ্যানাল আলট্রাসোনোগ্রাফি, এবং ডিফিকোগ্রাফি (অঙ্গ সমূহের প্রতিবিম্বকরণ এটা জানার জন্য যে পায়ু, মলদ্বার, অথবা এর পেশীতে কোনও সমস্যা আছে কিনা)।এর চিকিৎসাগুলি হল:খাদ্যতালিকায় পরিবর্তন, তন্তুময় বা আঁশালো খাবার খাওয়া এবং প্রচুর জল পান।

জীবনশৈলীতে পরিবর্তন

পেশীগুলিকে শক্তিশালী করতে শরীরচর্চা।

প্রতিদিন নির্দিষ্ট সময়ে মলত্যাগের অভ্যাস গড়ে তোলা।

অভ্যন্তরীণ কারণগুলির চিকিৎসায় ওষুধ খাওয়া।

অবস্থার গুরুত্ব ও কারণ অনুযায়ী সার্জারি করা হয়ে থাকে।

ID: 1197

Context: ব্যাকটেরিয়াল ইনফেকশন বা জীবাণুঘটিত সংক্রমণ

Question: ব্যাকটেরিয়াল ইনফেকশন বা জীবাণুঘটিত সংক্রমণ কি?

Answer:

স্বাভাবিকভাবে, শরীরের মধ্যে উপস্থিত, ব্যাকটেরিয়া কোনও ক্ষতির করণ হয় না কিন্তু এখানে পরিবেশের মধ্যে শরীরের বাইরেও কিছু অন্যান্য ব্যাকটেরিয়া উপস্থিত আছে। এই ব্যাকটেরিয়া শরীরের প্রবেশ করে সংক্রমণ সৃষ্টি করে এবং একে প্যাথোজেনিক ব্যাকটেরিয়া বলা হয়। নির্দিষ্ট পরিস্থিতিতে, অভ্যন্তরীণ সিম্বাওটিক ব্যাকটেরিয়াও দুর্বল অনাক্রম্যতা এবং তাদের অত্যধিক বৃদ্ধি কারণে সংক্রমণ ঘটাতে পারে। ব্যাকটেরিয়ার মাধ্যমে সংক্রামিত হতে পারে এমন অঙ্গগুলি হল ফুসফুস, গলা, অন্ত্র ও চামড়া। ব্যাকটেরিয়াল ইনফেকশন একজন সংক্রমিত ব্যক্তির থেকে একটি সুস্থ ব্যক্তির মধ্যে ছড়িয়ে যেতে পারে। সুতরাং, নিজের এবং আশেপাশের স্বাস্থ্য বজায় রাখতে এবং সংক্রমণ ছড়ানো আটকাতে সমস্ত প্রয়োজনীয় সতর্কতা নেওয়া উচিত।

ID: 1198

Context: ব্যাকটেরিয়াল ইনফেকশন এর প্রধান লক্ষণ এবং উপসর্গগুলি

Question: ব্যাকটেরিয়াল ইনফেকশন এর প্রধান লক্ষণ এবং উপসর্গগুলি কি কি?

Answer:

ব্যাকটেরিয়াল ইনফেকশনের উপসর্গগুলি সংক্রামিত জায়গাটা এবং সংক্রমণের তীব্রতার উপর ভিত্তি করে পরিবর্তিত হয়। ব্যাকটেরিয়াল ইনফেকশনের সাধারণ উপসর্গগুলি হল:কাশি।

জ্বর।

মাথা ব্যাথা।

শরীর ঠান্ডা হয়ে যাওয়া।

ঘাম।

পেশী ব্যথা।

ক্লান্তি।

শ্বাস নিতে অসুবিধা।

সংক্রমণের জায়গায় ব্যথা এবং অস্বস্তি।

সংক্রমণের জায়গায় ফোলা এবং লালভাব।

খিদে হারানো।

ID: 1199

Context: ব্যাকটেরিয়াল ইনফেকশন এর প্রধান কারণগুলি

Question: ব্যাকটেরিয়াল ইনফেকশন এর প্রধান কারণগুলি কি কি?

Answer:

সাধারণ সংক্রমণ-সৃষ্টিকারী ব্যাকটেরিয়াগুলি হল:স্ট্রেপ্টোকক্কাস

স্টেফাইলোকক্কাস

ই.কোলাই

ক্লেবসিয়েল্লা

সিউডোমোনাস

মাইকোব্যাকটেরিয়ামব্যাকটেরিয়াল ইনফেকশনের ঝুঁকি বাড়তে পারে এমন বিষয়গুলি হল:কাটা এবং ক্ষত।

ব্যাকটেরিয়াল ইনফেকশনের সাথে যুক্ত কোনো ব্যক্তির সাথে ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ।

সংক্রামিত খাদ্য এবং জল খাওয়া।

সংক্রামিত কোনো ব্যক্তির মলের সংস্পর্শে আসা।

সংক্রামিত ব্যক্তির হাঁচির সময় নির্গত কণায় শ্বাস নেওয়া।

পরোক্ষ ভাবে সংক্রমণ যেমন, সংক্রামিতের উপরিভাগ ছোঁয়া।

ID: 1200

Context: ব্যাকটেরিয়াল ইনফেকশন নির্ণয় এবং চিকিৎসা

Question: ব্যাকটেরিয়াল ইনফেকশন কিভাবে নির্ণয় এবং চিকিৎসা করা হয়?

Answer:

ডাক্তার নিম্নলিখিত পদ্ধতিতে এই রোগ নির্ণয় করেন:ব্যক্তির চিকিৎসার ইতিহাস সম্বন্ধে খোঁজ নেওয়া।

ব্যক্তির শারীরিক পরীক্ষা।

রেডিওগ্রাফিক ফলাফল।

রক্ত এবং প্রস্রাব পরীক্ষার মত ল্যাব টেস্ট।ব্যাকটেরিয়ার ধরন এবং আক্রান্ত অংশটির ওপর ভিত্তি করে ব্যাকটেরিয়াল ইনফেকশনের সঠিক চিকিৎসা করা হয়। সাধারণত ব্যাকটেরিয়াল ইনফেকশনের চিকিৎসার জন্য ডাক্তারের পরামর্শে টপিকাল, মৌখিক, বা ইনজেকশনযোগ্য অ্যান্টিবায়োটিক থেরাপি করা হয়। যদি আগে দেওয়া ওষুধ যথেষ্ট পরিমান ব্যাকটেরিয়া সরাতে না পারে তবে কখনও কখনও ডাক্তারকে অ্যান্টিবায়োটিক পরিবর্তন করতে হয়।

ID: 1201

Context: অ্যাসপারগার সিনড্রোম বা অটিজম

Question: অ্যাসপারগার সিনড্রোম বা অটিজম কি?

Answer:

অ্যাসপারগার সিনড্রোম (এ এস) একটা বেড়ে ওঠায় সমস্যা জনিত রোগ যার ফলে ভাষাগত এবং মনোভাব আদানপ্রদান জনিত বিকলতা ও তার সাথে পুনরাবৃত্তিমূলক বা নিয়ন্ত্রনমূলক ভাবনাচিন্তার ধরণ ও আচরণ দেখা যায়। এটি একটি সামান্য ধরণের অটিজম স্পেকট্রাম ডিসঅর্ডার এবং এর বৈশিষ্ট্য হল স্নায়বিক অকার্যকারিতা যা স্কুলে যাওয়া বাচ্চাদের মধ্যে দেখা যায়।

ID: 1202

Context: অ্যাসপারগার সিনড্রোমের প্রধান লক্ষন ও উপসর্গগুলি

Question: অ্যাসপারগার সিনড্রোমের প্রধান লক্ষন ও উপসর্গগুলি কি?

Answer:

একটা বস্তুর বা বিষয়ের উপর অত্যধিক আগ্রহ ও অন্যান্য সবকিছুর প্রতি অনাগ্রহ অ্যাসপারগার সিনড্রোমের এক ধরণের উপসর্গ।

অন্যান্য সাধারণ উপসর্গগুলি হলো:

সম্পর্ক তৈরীতে অসুবিধা।

ভালো পারস্পরিক সংযোগ স্থাপনের ক্ষমতা থাকা সত্বেও ভাব বিনিময়ে সমস্যা।

অনুচিত সামাজিক ও আবেগ সংক্রান্ত ব্যবহার।

পুনরাবৃত্তিমূলকভাবে কাজকর্ম বা আচরণ করার জন্য জেদ প্রকাশ।

খারাপ বা অপটু অঙ্গ সঞ্চালন ক্ষমতা।(আরো পড়ুন: অবসেসিভ কমপালসিভ ডিসঅর্ডার)

ID: 1203

Context: অ্যাসপারগার সিনড্রোমের প্রধান কারনগুলি

Question: অ্যাসপারগার সিনড্রোমের প্রধান কারনগুলি কি কি?

Answer:

অ্যাসপারগার সিনড্রোমের প্রধান কারণ মূলত জিনগত, জীববিজ্ঞান সম্পর্কিত, এবং পরিবেশগত।

যেসব শিশুর ভাইবোনদের অ্যাসপারগার সিনড্রোম আছে তাদের এই অসুখ হবার সম্ভাবনা আছে।

কিছু বিশেষ ওষুধ থেকে এই রোগের ঝুঁকি বেড়ে যায়, যেমন, ভ্যাল্প্রোইক অ্যাসিড এবং থ্যালিডোমাইড, যা গর্ভাবস্থায় খাওয়া হয়।

বিলম্বিত গর্ভধারণ শিশুর অ্যাসপারগার সিনড্রোম হওয়ার বিপদ বাড়িয়ে দেয়।(আরো পড়ুন: ডাউন সিনড্রোমের কারণ)

ID: 1204

Context: অ্যাসপারগার সিনড্রোম নির্ণয় করা হয় ও এর চিকিৎসা

Question: অ্যাসপারগার সিনড্রোম কিভাবে নির্ণয় করা হয় ও এর চিকিৎসা কি?

Answer:

শিশু চিকিৎসক দ্বারা শিশুর দক্ষতা ও যোগ্যতা পরীক্ষা দ্বারা এই রোগ নির্ণয় করা সম্ভব, রোগ নির্ণয় করার সময় স্পীচ থেরাপিস্ট ও সাইকোলজিস্ট বা মনোবিদের সাহায্যও নেওয়া হয়।

সামাজিক ও আবেগগত প্রশ্নাবলীর সহায়তায়, ভাব আদান-প্রদান করার ক্ষমতা, শেখার ক্ষমতা, নড়াচড়া করার ক্ষমতা, এবং বিশেষ আগ্রহ প্রভৃতি দেখা হয়।

অ্যাসপারগার সিনড্রোমে আক্রান্ত শিশুর নিজের ভাষাগত দক্ষতা সঠিকভাবে বিকশিত হয় না এবং আই কিউ অটিজম স্পেকট্রাম রোগে আক্রান্ত শিশুদের তুলনায় মাঝারি বা তুলনায় বেশী হয়।বাস্তবে, অ্যাসপারগার সিনড্রোমের চিকিৎসায় আসল সমস্যাগুলির উপর জোর দেওয়া হয়, যার মধ্যে আছেস্পীচ থেরাপি সহ ভাব আদান-প্রদানের দক্ষতা।

অকুপেশনাল থেরাপি সহ অঙ্গ সঞ্চালনের দক্ষতা।

চিন্তাজনক ও পুনরাবৃত্তিমূলক কর্মসূচিতে লক্ষ্য দেওয়া।

কার্যকরী চিকিৎসার মধ্যে সামাজিক দক্ষতার প্রশিক্ষন, বুদ্ধিমত্তাযুক্ত আচরণগত থেরাপি, এবং উদ্বেগ রোধের ও মনোযোগ সম্পর্কিত সমস্যার ওষুধ দেওয়া হয়।অ্যাসপারগার সিনড্রোম সম্পুর্ণ সারে না, কিন্তু সহযোগিতা, বোঝাপড়া, এবং প্রশিক্ষণ দীর্ঘ সময় পর্যন্ত উন্নত জীবনযাপন করতে সাহায্য করতে পারে।(আরো পড়ুন: এ ডি এইচ ডি চিকিৎসা)

ID: 1209

Context: মলদ্বারে ফিস্টুলা

Question: মলদ্বারে ফিস্টুলা কি?

Answer:

মলদ্বারে ফিস্টুলা হলো একটা অস্বাভাবিক ছোট নালী যেটা মলাশয় এবং মলদ্বারের চামড়ার মাঝে তৈরি হয়। মলদ্বারের গ্রন্থিতে পূঁজ হলে তা ফিস্টুলা তৈরি করে। মলাশয় এবং পায়ুর মধ্যের নালীটা হল মলদ্বারের নালী যেখানে অনেকগুলি মলদ্বারের গ্রন্থি রয়েছে। এই গ্রন্থিগুলিতে সংক্রমণ হলে তা পূঁজ গঠনের কারণ হতে পারে, যা নলটির মাধ্যমে পায়ুতে যায়, ফলে নালীটা খুলে যায়।

ID: 1210

Context: মলদ্বারে ফিস্টুলা এর প্রধান লক্ষণ এবং উপসর্গগুলি

Question: মলদ্বারে ফিস্টুলা এর প্রধান লক্ষণ এবং উপসর্গগুলি কি কি?

Answer:

মলদ্বারের আশেপাশে ব্যথা এবং জ্বালা হল এর প্রধান উপসর্গ। কোথাও বসতে গেলে বা হাঁটাচলা করলে বা একটি অন্ত্র আন্দোলনের সময় (মলত্যাগ করার সময়) অবিরাম কম্পিত ব্যথা; পায়ুর চামড়ার কাছাকাছি একটি বোঁটকা গন্ধ; পূঁজ বেরোনো বা মলের মধ্যে রক্ত; মলদ্বারের আশেপাশে ফোলা ভাব এবং লাল হওয়া; জ্বর, শরীর ঠান্ডা হয়ে যাওয়া, ক্লান্তি এবং সাধারণত অসুস্থ অনুভব করা হল আরো কিছু উপসর্গ।

ID: 1211

Context: মলদ্বারে ফিস্টুলা এর প্রধান কারণগুলি

Question: মলদ্বারে ফিস্টুলা এর প্রধান কারণগুলি কি কি?

Answer:

মলদ্বারে অধিমাংসের কারণে সাধারণত মলদ্বারে ফিস্টুলা বৃদ্ধি পায়। পূঁজ বের করার পর যদি এই অধিমাংস ঠিকভাবে না সারে তখন এইগুলি হয়। খুব কম ক্ষেত্রে, তা ক্রোহন’স ডিজিজ, যক্ষারোগ, ডাইভারটিকিউলাইটিস, যৌন সংক্রামিত রোগ, মানসিক আঘাত, বা ক্যান্সারের মতো অবস্থাও ঘটাতে পারে।

ID: 1212

Context: মলদ্বারে ফিস্টুলা নির্ণয় এবং চিকিৎসা

Question: মলদ্বারে ফিস্টুলা কিভাবে নির্ণয় এবং চিকিৎসা করা হয়?

Answer:

অ্যানোরেক্টাল উপসর্গ এবং চিকিৎসার ইতিহাসের একটি সতর্ক পর্যবেক্ষণ এই রোগটি নির্ণয় করতে সাহায্য করবে। ডাক্তার আপনাকে জ্বর, দুর্বলতা, ফোলাভাব এবং লালচে ভাবের মতো লক্ষণগুলির সন্ধান করতে পরীক্ষা করবে। কিছু অধিমাংস মলদ্বারের ত্বকের উপর আচমকা বাহ্যিকভাবে দেখা যেতে পারে। শারীরিক পরীক্ষার সময় রক্ত অথবা পূঁজ বেরোতে দেখা যেতে পারে। পূঁজ অথবা রক্ত বেরোচ্ছে কিনা দেখার জন্য ডাক্তাররা জায়গাটাতে চাপ দিতে পারেন। একটি ফিস্টুলা প্রোব, অ্যানোস্কোপ এবং ইমেজিং স্টাডিজ (আল্ট্রাসাউন্ড, এমআরআই বা সিটি স্ক্যান) ব্যবহার করা যেতে পারে। ডিজিটাল রেকটাল পরীক্ষা বেদনাদায়ক হতে পারে এবং পূঁজ মুক্ত করতে পারে। ফিস্টুলা অনেক সময় তৎক্ষণাৎ বন্ধ হয়ে যায়, কিন্তু মাঝে মাঝে আবার দেখা দিতে পারে তাই সেক্ষেত্রে রোগ নির্ণয় করা আরো কঠিন হয়ে যায়।এর চিকিৎসার জন্য আজ পর্যন্ত কোন ওষুধ অথবা ড্রাগ পাওয়া যায় নি। বেশিরভাগ ক্ষেত্রে সার্জারির মাধ্যমে ফিস্টুলার চিকিৎসা করা হয়। এটা নিজে থেকে ঠিক হয় না। চিকিৎসার জন্য সার্জারির সাথে এন্টিবায়োটিক ব্যবহার করা হয়। সার্জিকাল চিকিৎসার বিকল্পগুলি নিচে দেওয়া হল:ফিস্টুলটোমি

এই পদ্ধতিতে সম্পূর্ণ ফিস্টুলাটা কেটে ফেলা হয় এবং অন্যান্য ক্ষত গুলোর মতো সারতে দেওয়া হয়।

সিটোন পদ্ধতি

সিটোন নামক একটি পাতলা অস্ত্রোপচারের রাবারকে ফিস্টুলায় আটকানো হয় এবং এর অন্য প্রান্তের সাথে বলয় আকারে যোগ করা হয়। ক্ষত সারানোর জন্য এটা কয়েক সপ্তাহের জন্য আটকানো হয়, এর সাথে সাথে ফিস্টুলার চিকিৎসার জন্য অন্যান্য প্রয়োজনীয় অস্ত্রোপচার পদ্ধতি অনুসরণ করা হয়।

অন্যান্য কৌশল

অন্যান্য পদ্ধতি, যেমন আঠা, টিস্যু, বা একটি বিশেষ প্লাগের ব্যবহার করেও ফিস্টুলা সারানো যায়।

রিকন্সট্রাক্টিভ সার্জারি

সম্পূর্ণভাবে ফিস্টুলা বন্ধ করার পদ্ধতি।

ID: 1213

Context: এনাল ক্যান্সার

Question: এনাল ক্যান্সার কি?

Answer:

এনাল ক্যান্সার হল গ্যাস্ট্রোইনটেস্টাইনাল সিস্টেমের একটি বিরল ম্যালিগন্যান্সি বা খারাপ অবস্থা । এর ফলে শতকরা খুব অল্প (1.5%) হারে গ্যাস্ট্রোইনটেস্টাইনাল ক্যান্সার হয়, কিন্তু এই ক্যান্সারের প্রকোপ যথেষ্টভাবে যে বাড়ছে তার প্রমাণ পাওয়া গেছে। এনাল ক্যান্সার হল মলদ্বারের ক্যান্সার অথবা এনাল ক্যানেল, যেটি পায়ুর একদম শেষ ভাগ।

ID: 1214

Context: এনাল ক্যান্সার এর প্রধান লক্ষণ এবং উপসর্গগুলো

Question: এনাল ক্যান্সার এর প্রধান লক্ষণ এবং উপসর্গগুলো কি কি?

Answer:

সাধারণ লক্ষণ এবং উপসর্গ গুলি হল:

মলদ্বার থেকে রক্তপাত এবং ব্যথা।

ফিস্টুলাসের উপস্থিতি (এনাল ক্যানাল অথবা পায়ুনালী এবং নিতম্বের ত্বকের মধ্যে অস্বাভাবিক সরু নালীর মতো সংযোগ) বা লিউকোপ্লাকিয়ার (সাদা, পুরু, নন-স্ক্রাপেবেল প্যাচ বা কঠিন হয়ে যাওয়া অংশ) উপস্থিতি।

শারীরিক পরীক্ষা করার সময় সহজে সনাক্ত করা যায় এমন স্ফীত লিম্ফ নোড।

পায়ুর প্রান্তে ক্যান্সারে যে সকল ঘায়ের বৈশিষ্টগুলি প্রকাশ পায় তা হল, উত্থিত, শক্ত (একটি দৃঢ় ভিত্তি যুক্ত) এবং উন্নীত কিনারা দেখা যায়।

বিরল লক্ষণ এবং উপসর্গগুলো হল:

মলদ্বারে একটি মাংসপিন্ডের উপস্থিতি।

চুলকানি এবং তার সাথে তরলের নির্গমণ।

পেশীচক্র (স্ফিঙ্কটার), যা মল নির্গমণ নিয়ন্ত্রণ করে তার কার্যক্ষমতা কমে যাওয়া, ফলে পায়ুর মল ধরে রাখার ক্ষমতা হারিয়ে যায়।

লিভার বা যকৃৎ-এর আকৃতি বেড়ে যাওয়া।

প্রাথমিক পর্যায়ের পায়ুর ক্যান্সার-এর অনাসন্ন বিস্তার।

ID: 1215

Context: এনাল ক্যান্সার হওয়ার প্রধান কারণগুলি

Question: এনাল ক্যান্সার হওয়ার প্রধান কারণগুলি কি কি?

Answer:

সবচেয়ে সাধারণ কারণ

মানব প্যাপিলোমাভাইরাসের সংক্রমণ, একটি যৌনবাহিত রোগ, যা ধীরে ধীরে এনাল ক্যান্সারের কারণ হয়ে দাঁড়ায়।

ঝুঁকির কারণগুলি হল:

দুর্বল রোগ প্র্রতিরোধক ক্ষমতা

অ্যাকুয়ার্ড ইমিউনোডেফিসিয়েন্সি সিনড্রোম (এইডস)।

দুর্বল রোগ প্রতিরোধক ক্ষমতা বা রোগ প্রতিরোধক ক্ষমতা দীর্ঘস্থায়ীভাবে অকার্যকরী থাকা।

বয়স এবং লিঙ্গ

বয়স্ক পুরুষ ও মহিলাদের এটা বেশি হয়ে থাকে।

চিকিৎসাগত অবস্থা

সার্ভিক্স, স্ত্রীযোনিদ্বার বা যোনির ক্যান্সার।

আগে থেকেই দীর্ঘস্থায়ী প্রদাহজনক আন্ত্রিক রোগ থাকলে।

জীবনযাত্রা

ধূমপান।

একাধিক সঙ্গীর সাথে সহবাস করা।

সমকামীতা, বিশেষ করে পুরুষদের মধ্যে।

ID: 1216

Context: এনাল ক্যান্সার নির্ণয় এবং চিকিৎসা

Question: কিভাবে এনাল ক্যান্সার নির্ণয় এবং চিকিৎসা করা হয়?

Answer:

রোগ নির্ণয়

এনাল ক্যান্সার শুধুমাত্র চিকিৎসাকেন্দ্রে উপস্থিত হয়ে এবং উপসর্গের ভিত্তিতে নির্ণয় করা যায় না। টিউমারের পরীক্ষা করার জন্য অচেতন করার পর শারীরিক পরীক্ষার পাশাপাশি, ডাক্তার এনাল ক্যান্সার সনাক্ত করার জন্য নিচের পরীক্ষাগুলি করার পরামর্শ দেন:

এন্ডো-এনাল আল্ট্রাসাউন্ড ইমেজিং

ম্যাগনেটিক রেসোনেন্স ইমেজিং (এম আর আই)

কম্পিউটেড টোমোগ্রাফি (সি টি) স্ক্যান/পজিট্রন এমিশন টোমোগ্রাফি (পি ই টি) স্ক্যান

চিকিৎসা

বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই এনাল ক্যান্সারের প্রাথমিক চিকিৎসা করা হয় রেডিওথেরাপি দিয়ে, সঙ্গে কেমোথেরাপি অথবা কেমোথেরাপি ছাড়া। বয়স্ক ও দুর্বল রোগীদের জন্য, কেমোথেরাপি এবং অ্যান্টিবায়োটিক প্রফিল্যাক্সিস উন্নত করা জরুরি।

রেডিওথেরাপি করার ক্ষেত্রে অসুবিধা হল রেডিওনেক্রসিস (বিকিরণ-এর কারণে টিস্যুর ক্ষতি বা নষ্ট হওয়া), যার কারণে অস্ত্রপ্রচার একটি নিরাপদ বিকল্প হয়ে ওঠে। আক্রমনাত্মক ক্যান্সারের ক্ষেত্রে অ্যাবডোমিনোপেরিনিয়াল এক্সিশন বা ছেদন(মলদ্বার অপসারণ, যেখানে মলাশয় এবং মলদ্বারের একটা অংশ কেটে বাদ দিয়ে দেওয়া) করা হয়। মারাত্মক ধরণের ক্যান্সারের ক্ষেত্রে বা যেসব ক্যান্সারের বারবার পুনরাবৃত্তি হওয়ার সম্ভাবনা থাকে, তাদের ক্ষেত্রে টিউমার এর অংশটা কেটে বাদ দেওয়াটাই হল উপযুক্ত চিকিৎসা।

ইনগুইনাল লিম্ফ নোডের জন্য রেডিয়েশন থেরাপি প্রয়োজনীয়। রেডিয়েশন থেরাপির ফলে অবনতি বা ব্যর্থতার ক্ষেত্রে, লিম্ফ নোডের অপসারণে অস্ত্রপ্রচার প্রয়োজন হয়।

বারবার হওয়া এনাল ক্যান্সার এর জন্য অ্যাবডোমিনোপেরিনিয়াল রেসেক্শন বা অংশ ছেদনের সাথে একটি কলোসটমি (কোলন বা মলাশয় কেটে বাদ দেওয়া) প্রয়োজন।

ইনট্রা-অপারেটিভ রেডিওথেরাপি এবং ব্র্যাকিওথেরাপি (তেজস্ক্রিয় ইমপ্লান্টগুলি বসানো) মলদ্বারে ক্যান্সারের চিকিৎসা হওয়ার পর তার পুনরাবৃত্তির সম্ভাবনা কমায়।

অন্যান্য চিকিৎসার বিকল্পগুলি হল ফটোডাইনামিক (একটি নির্দিষ্ট তরঙ্গদৈর্ঘ্যের আলো ব্যবহার করে) থেরাপি এবং ইমিউনোথেরাপি।

ID: 1221

Context: উইলমস টিউমার

Question: উইলমস টিউমার কি?

Answer:

উইলমস টিউমার হলো এক ধরনের এমব্রায়োনাল বা ভ্রূণ সংক্রান্ত রেনাল বা কিডনির ক্যান্সার। এটি শিশুদের মধ্যে দেখা দেওয়া সবচেয়ে সাধারণ নিরেট প্রাণঘাতী নিওপ্লাজম (ক্যান্সারযুক্ত টিউমার)। ডাক্তার ম্যাক্স উইলমস নামে এক সার্জন এই অবস্থাটিকে প্রথমবার বর্ণণা করেছিলেন, তবে ভিন্ন নামে এবং প্রথমদিকে এটি কিডনির কনজেনিটাল সার্কোমা নামে পরিচিত ছিল।

ID: 1222

Context: উইলমস টিউমার এর প্রধান লক্ষণ এবং উপসর্গগুলি

Question: উইলমস টিউমার এর প্রধান লক্ষণ এবং উপসর্গগুলি কি কি?

Answer:

প্রায় সবসময়ই শিশু 10 বছর বয়সে পৌঁছানোর আগেই টিউমারটি হতে দেখা যায়। উইলমস টিউমারের সাধারণ উপসর্গগুলি হলো:\* তলপেটে প্রতীয়মান পিণ্ডের উপস্থিতি।

\* তলপেটে ব্যথা।

\* ক্ষুধামান্দ্য।

\* বমনেচ্ছা।

\* বমি।

\* হেমাচুরিয়া (প্রস্রাবে রক্তের উপস্থিতি)।

\* হেপাটোমেগালি (লিভার বাড়া)।

\* অ্যাসাইটিস (তলপেটে তরল জমা)।

\* কনজেস্টিভ হার্ট ফেইলিওর।

\* রক্তচাপ বৃদ্ধি।

\* ডিসমরফিজম (অস্বাভাবিক শারীরিক গঠন)।

\* প্যালোর।

ID: 1223

Context: উইলমস টিউমার এর প্রধান লক্ষণ এবং উপসর্গগুলি প্রধান কারণগুলি

Question: উইলমস টিউমার এর প্রধান লক্ষণ এবং উপসর্গগুলি প্রধান কারণগুলি কি কি?

Answer:

উলিমস টিউমার হলো একটি বিরল রোগ এবং জিনগত কারণ এক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। উইলমস টিউমারের প্যাথোজেনেসিস বোঝার ক্ষেত্রে সাবস্ট্যান্টিয়াল জেনেটিক্স এবং আণবিক গবেষণার অবদান রয়েছে। ক্রোমোজোম 11-য় পরিবর্তন উলিমস টিউমারের সঙ্গে যুক্ত।

ID: 1224

Context: উইলমস টিউমার নির্ণয় ও চিকিৎসা

Question: উইলমস টিউমার কিভাবে নির্ণয় ও চিকিৎসা করা হয়?

Answer:

উইলমস টিউমার নিম্নলিখিত উপায়ে নির্ণয় করা হয়: \* তলপেটের উপরের অংশে ফোলাভাবের উপস্থিতি।

\* চিকিৎসাগত ইতিহাস এবং পারিবারিক ইতিহাস।

\* তলপেট এবং শ্রোণীর আলট্রাসোনোগ্রাফি।

\* শিশুদের মধ্যে হাইপোগ্লাইকেমিয়া (রক্তে শর্করা কম)।

\* কম্পিউটেড টোমোগ্রাফি (সিটি) স্ক্যান।

\* কমপ্লিট ব্লাড কাউন্ট (সিবিসি)।

\* রেনাল (কিডনি) ফাংশন টেস্ট।

\* মূত্র বিশ্লেষণ।

\* লিভারের ফাংশন টেস্ট। উইলমস টিউমারের চিকিৎসার মধ্যে রয়েছে অস্ত্রোপচার, কেমোথেরাপি এবং রেডিওথেরাপি। অস্ত্রোপচারের ভূমিকাটি জটিল, কারণ এতে টিউমারটি ফেটে যাওয়ার সম্ভাবনা থাকে।ট্র্যান্সপেরিটোনিয়াল রেডিক্যাল রিমুভাল, এক ধরণের অস্ত্রপচার যাতে পেট কেটে কিডনিকে বাদ দেওয়া হয়, এটি ইউনিল্যাটেরাল রেনাল টিউমারের জন্য সবথেকে পছন্দের অস্ত্রোপচারের পদ্ধতি। অনেক ক্ষেত্রে কিডনি আংশিক বাদ দেওয়া এবং কেটে দেওয়াও হয়। একবার বাদ দেওয়া হলে খুব দ্রুত সুস্থ হয়ে যায়। একটা কিডনির উপর যাতে চাপ না পড়ে এবং সেই কারণে যাতে কোনও জটিলতা না হয়, তার জন্য ডায়ালিসিসের প্রয়োজন হতে পারে।

ID: 1225

Context: ওয়েস্ট সিন্ড্রোম (ইনফ্যান্টাইল স্পাসম

Question: ওয়েস্ট সিন্ড্রোম (ইনফ্যান্টাইল স্পাসম) কি?

Answer:

ওয়েস্ট সিন্ড্রোম প্রথমবার চিহ্নিত এবং বর্ণনা করেছিলেন ডাক্তার ওয়েস্ট। এটি মৃগী/ ইনফ্যান্টাইল স্পাসম বা শৈশবস্থায় খিঁচুনি, বৌদ্ধিক বিকলাঙ্গতা এবং অস্বাভাবিক ধরণের মস্তিষ্কের তরঙ্গ প্রকৃতি, প্রভৃতি একগুচ্ছ উপসর্গের সম্ভার হিসাবে বর্ণনা করা যায়ইয়,স্পাসম বা খিঁচুনি সাধারণত জন্মের পরই শুরু হয়ে যায়, সেই কারণে, একে ইনফ্যান্টাইল স্পাসম বা শৈশবস্থার খিঁচুনি বলে।

ID: 1226

Context: ওয়েস্ট সিন্ড্রোম সঙ্গে জড়িত প্রধান লক্ষণ ও উপসর্গগুলি

Question: ওয়েস্ট সিন্ড্রোম সঙ্গে জড়িত প্রধান লক্ষণ ও উপসর্গগুলি কি কি?

Answer:

উপসর্গগুলি মৃদু চোখ পিটপিটানি থেকে শুরু করে সারা শরীর অর্ধেক বেঁকে যাওয়া পর্যন্ত ভিন্ন মাত্রার হতে পারে। চিকিৎসাগত সাধারণ লক্ষণ ও উপসর্গুলি হল: \* অনৈচ্ছিক পেশীতে খিঁচুনি, যা 15-20 সেকেন্ড ধরে চলে এবং সব মিলিয়ে 15-20 মিনিট স্থায়ী হতে পারে।

\* শরীর সামনের দিকে ঝুঁকে যাওয়া।

\* শরীর, হাত, পা শক্ত হয়ে যাওয়া।

\* হাত ও পা বাইরের দিকে নিক্ষিপ্ত অবস্থানে থাকা।

\* খিটখিটেভাব।

\* ধীর বিকাশ।

\* মাথা, ঘাড় ও ধড়ের অনৈচ্ছিক সংক্ষেপণ।

ID: 1227

Context: ওয়েস্ট সিন্ড্রোম সঙ্গে জড়িত প্রধান লক্ষণ ও উপসর্গগুলি

Question: ওয়েস্ট সিন্ড্রোম সঙ্গে জড়িত প্রধান লক্ষণ ও উপসর্গগুলি প্রধান কারণগুলি কি কি?

Answer:

মস্তিষ্কের ক্ষতি করে এরকম যেকোনও ধরনের অবস্থা থেকে এই রোগ দেখা দিতে পারে। ওয়েস্ট সিন্ড্রোমের বিভিন্ন পরিকাঠামোগত, বিপাকীয় এবং জিনগত কারণ রয়েছে। ইডিওপ্যাথিক ইনফ্যান্টাইল স্পাসমের ক্ষেত্রে কারণ এখনও অজানা। উপসর্গযুক্ত শিশুদের অর্ধেকের মধ্যেই পরিকাঠামোগত ক্রুটি জন্মপূর্ব অবস্থায় উপস্থিত থাকে। 70-75 শতাংশ ক্ষেত্রে নির্দিষ্ট কারণ নির্ধারণ করা যায়নি। টিউবেরাস স্কেলেরোসিস নামক জিনগত রোগও ওয়েস্ট সিন্ড্রোমের কারণ হতে পারে। ডাউন সিন্ড্রোম, স্টার্জ-ওয়েবার সিন্ড্রোম, সংক্রমণ, ফিনাইলকিটোনিউরিয়া থেকেও ওয়েস্ট সিন্ড্রোম হতে পারে।

ID: 1228

Context: ওয়েস্ট সিন্ড্রোম নির্ণয় এবং চিকিৎসা করা

Question: ওয়েস্ট সিন্ড্রোম কিভাবে নির্ণয় এবং চিকিৎসা করা হয়?

Answer:

ওয়েস্ট সিন্ড্রোম নির্ণয়ের জন্য শারীরিক পরীক্ষা এবং পুঙ্খানুপুঙ্খ স্পাসম বা খিঁচুনির চিকিৎসা সংক্রান্ত ইতিহাস পর্যবেক্ষণ করা হয়, তারপর নিম্নলিখিত পরীক্ষাগুলি করা হয়:ইলেক্ট্রোএনসেফালোগ্রাফি (ইইজি)।

ব্রেন স্ক্যান, যেমন – কম্পিউডেট টোমোগ্রাফি (সিটি) এবং ম্যাগনেটিক রিজোনেন্স ইমেজিং (এমআরআই)।

রক্ত পরীক্ষা, মূত্র পরীক্ষা এবং লাম্বার পাংচারের মাধ্যমে সংক্রমণ নির্ধারণ করা।

ত্বকের পরীক্ষা করার জন্য উড’স ল্যাম্প টেস্ট করা হয় ক্ষত চিহ্নিত করার জন্য এবং তা টিউবেরাস স্কেলেরোসিস কি না সে ব্যাপারে নিশ্চিত হওয়ার উদ্দেশ্যে।

জিনগত মিউটেশন বা পরিব্যাক্তি চিহ্নিত করতে মলিকিউলার জেনেটিক টেস্টের সাহায্য নেওয়া হতে পারে।ওয়েস্ট সিন্ড্রোমের চিকিৎসায় অ্যান্টিকনভালসেন্টের ব্যবহারে খুবই কম কার্যকারিতা দেখা গিয়েছে। তবে, অ্যাড্রেনোকর্টিকোট্রোপিক হরমোন, কর্টিকোস্টেরয়েড এবং অ্যান্টিএপিলেপ্টিক বেশ কার্যকরী হিসেবে প্রমাণিত। কর্টিকোস্টেরয়েড সাধারণত সবচেয়ে বেশি ব্যবহৃত হয়। প্রাকৃতিক কর্টিকোট্রোফিনের তুলনায় সিন্থেটিক এসিটিএইচ (টেট্রাকোসাক্ট্রিন)-এর অনেক বেশি পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া রয়েছে। কর্টিকোস্টেরয়েডের তুলনায় টিউবেরাস স্কেলেরোসিসের চিকিৎসায় অ্যান্টিএপিলেপ্টিক ওষুধ বেশি কার্যকরী হিসেবে প্রমাণিত। ইনফ্যান্টাইল স্পাসমের মতো রিফ্র্যাক্টরি এপিলেপ্সি বা দুরারোগ্য মৃগীর ক্ষেত্রে কিটোজেনিক খাদ্যাভাস একটি উপযোগী চিকিৎসা পদ্ধতি।

ID: 1229

Context: দুর্বলতা

Question: দুর্বলতা কি?

Answer:

শরীরের এক বা একাধিক মাংসপেশীর কর্মক্ষমতা হ্রাস পাওয়াকে দুর্বলতা বলে। কিছু ব্যক্তি শুধুমাত্র দুর্বল লাগার অনুভূতি উপলব্ধি করেন, কিন্তু শারীরিকভাবে কোনওরকম শক্তিক্ষয় উপলব্ধি করেন না, উদাহরণ হিসেবে, ব্যথার জন্য দুর্বলতা বোধ হওয়ার কথা বলা যেতে পারে। আবার কিছু মানুষ কর্মক্ষমতা হ্রাসের ব্যাপারটি শুধুমাত্র শারীরিক পরীক্ষার সময় বুঝতে পারেন, একে “অবজেক্টিভ উইকনেস” বলে।

ID: 1230

Context: দুর্বলতার প্রধান লক্ষণ ও উপসর্গগুলি

Question: দুর্বলতার প্রধান লক্ষণ ও উপসর্গগুলি কি কি?

Answer:

দুর্বলতার সঙ্গে যুক্ত লক্ষণ ও উপসর্গগুলি হল:

\* অসাড়ভাব।

\* প্রচণ্ড মাথাযন্ত্রণা।

\* বিভ্রান্তিবোধ।

\* হাঁটতে সমস্যা।

\* ক্লান্তি।

\* মাংসপেশীতে ব্যথা অনুভব করা অথবা ব্যথাভাব।

\* তন্দ্রালুভাব।

\* মাথা ঘোরা।

\* খিদে কমে যাওয়া।

\* শ্বাস নিতে সমস্যা।

ID: 1231

Context: দুর্বলতার প্রধান কারণগুলি

Question: দুর্বলতার প্রধান কারণগুলি কি কি?

Answer:

শারীরিক দুর্বলতার অন্তর্নিহিত কারণ হল নির্দিষ্ট স্বাস্থ্য সংক্রান্ত সমস্যা যেমন:

\* শরীরে সোডিয়াম ও পটাশিয়ামের মাত্রাল্পতা।

\* শ্বাসযন্ত্র অথবা মূত্রলানীর সংক্রমণ।

\* থাইরয়েড হরমোনের স্বল্প বা উচ্চমাত্রা।

\* গুলেন-বার সিন্ড্রোম।

\* মাইস্টিনিয়া গ্রাভিস (একটি দীর্ঘস্থায়ী রোগ, যা মাংসপেশীকে দু্র্বল করে দেয়)।

\* স্ট্রোক।

\* অসুস্থ থাকার কারণে অক্ষমতা, বিশেষত বয়ষ্ক ব্যক্তিদের ক্ষেত্রে।

\* ইন্টেনসিভ কেয়ার ইউনিট (আইসিইউ) মায়োপ্যাথি (আইসিইউতে লম্বা সময় থাকার কারণে মাংসপেশীর ক্ষয়)।

\* মাস্কুলার ডিস্ট্রফি, হাইপোক্যালিমিয়া (পটাশিয়ামের মাত্রাপ্লতা) এবং অ্যালকোহলিক মায়োপ্যাথির মতো সাধারণ মায়োপ্যাথি (মাংসপেশীর টিস্যু বা শরীরকলার রোগ)।

\* পোলিও।

\* দৈহিক পরিশ্রম।

\* কম ঘুম হওয়া।

\* অনিয়মিত ব্যায়াম।

\* জ্বরের মতো অসুখে ভোগা।

\* অসম্পূর্ণ পুষ্টি।

ID: 1232

Context: দুর্বলতা নির্ণয় এবং চিকিৎসা

Question: দুর্বলতা কিভাবে নির্ণয় করা হয় এবং এর চিকিৎসা কি?

Answer:

নিম্নলিখিত পদ্ধতিগুলি দুর্বলতা নির্ণয়ে ব্যবহৃত হয়:শারীরিক পরীক্ষা: চলন ক্ষমতা, তৎপরতা এবং করোটির স্নায়ুর কার্যকারিতা পরীক্ষা করা হয়।

কর্মক্ষমতা পরীক্ষা: দুর্বলতার বিরুদ্ধে প্রতিরোধ, পেশীর দৃশ্যমান সঙ্কোচন, মাধ্যাকর্ষণ শক্তির প্রতিকূলে অঙ্গপ্রত্যঙ্গ সঞ্চালন, প্রতিবর্তী ক্রিয়া এবং অনুভূতির মতো পরিমাপকগুলি দ্বারা পরীক্ষা করা হয়।

হাঁটাচলার ভঙ্গিমা পর্যবেক্ষণ করা হয়।

দুর্বলতার কারণ অনুসন্ধানে চিকিৎসাজনিত ইতিহাস যাচাই করা হয়।দুর্বলতার অন্তর্নিহিত কারণের চিকিৎসা প্রদানের মাধ্যমে দুর্বলতার চিকিৎসা করা হয়। গুরুতর দুর্বলতা সমস্যায় ভোগা মানুষদের প্রয়োজন পড়লে হাসপাতালে ভর্তি করার পরামর্শ দেওয়া হয়। মাংসপেশীর কার্যক্ষমতার ক্ষয় কমাতে রোগীদের সাহায্যার্থে অকুপেশনাল থেরাপি এবং ফিজিক্যাল থেরাপি করানোরও পরামর্শ দেওয়া হয়।

ID: 1233

Context: উচ্চ রক্তচাপ

Question: উচ্চ রক্তচাপ কি ?

Answer:

যদিও উচ্চ রক্তচাপ অথবা হাইপারটেনশন হল একটা বহুল পরিচিত স্বাস্থ্য সমস্যা, কিন্তু রক্তচাপ মাত্রায় কোনরকমের অবনতিও (হাইপোটেনশন হিসাবেও যা পরিচিত) আপনার স্বাস্থ্যে কখনও কখনও সমস্যা ঘটাতে পারে। রক্তচাপ হচ্ছে এমন চাপ যা হার্ট বা হৃৎপিণ্ডের সংকোচন (সিস্টোলি) এবং শিথিলকরণ বা প্রসারণের (ডায়াস্টোলি) সময় রক্তবাহী নালীগুলির (ধমনীগুলি) দেয়ালে রক্ত প্রয়োগ করে। দুটো সংখ্যা ব্যবহার করে রক্তচাপের রিডিং (ব্যাখ্যা) নির্দেশ করা হয় এবং স্বাভাবিক মূল্যমান 120/80 mm পারদের হিসাবে উপস্থাপিত করে। যদি রক্তচাপের রিডিং 90/60 mm পারদের হিসাবে বা তার নীচে হয়, সেটাকে নিম্ন রক্তচাপ হিসাবে গণ্য করা হয়। নিম্ন রক্তচাপ হয়তো কিছু মানুষের পক্ষে সাধারণ হতে পারে এবং লক্ষ্য করা নাও হতে পারে, কিন্তু অন্যদের ক্ষেত্রে মাথা ঘোরা, অজ্ঞান হওয়া (সিনকোপ), অথবা ঘূর্ণিরোগের (মাথা ঝিমঝিম করা) মত উপসর্গের অভিজ্ঞতা হতে পারে। সাধারণতঃ, রক্তচাপ মাত্রায় হ্রাস বা অবনতি কোনও আঘাত, রক্তক্ষয়, তরলক্ষয়, অথবা কোনও ওষুধের কারণে হতে পারে। নিম্ন রক্তচাপের উপসর্গগুলি যদি গুরুতর হয়, সেক্ষেত্রে একটা পুঙ্ক্ষানুপুঙ্ক্ষ মূল্যায়ন এবং অন্তর্নিহিত কারণের চিকিৎসার জন্য একজন ডাক্তারকে দেখানোই ভাল। নিম্ন রক্তচাপের চিকিৎসা হচ্ছে প্রধানতঃ লবণ এবং চিনির দ্রবণ বা তরল গ্রহণের পরিমাণ বাড়ানো। যদি কোনও অন্তর্নিহিত সমস্যা থাকে যা নিম্ন রক্তচাপ ঘটাচ্ছে, সেই অন্তর্নিহিত কারণের চিকিৎসা সাধারণতঃ রক্তচাপকে স্বভাবিক অবস্থায় ফিরিয়ে আনে।

ID: 1243

Context: ভার্টিগো

Question: ভার্টিগো কি?

Answer:

ভার্টিগো মাথা ঘোড়া, ভারসাম্য হারানো বা বিচলিত হওয়ার একটি সংবেদন। যখন মোটর সংবেদন প্রভাবিত হয় তখন ভার্টিগো হয়ে থাকে। এটি কোনো গুরুতর অন্তর্নিহিত রোগ বা ব্যাধির সাথে যুক্ত থাকতে পারে যা ভারসাম্য, প্রোপ্রিয়োসেপশন বা দৃষ্টির সংবেদনশীল ক্রিয়াকলাপকে প্রভাবিত করে। যেসব ব্যক্তির ভার্টিগো থাকে তারা মাথা ঘোড়া এবং মাথা ঘুরে পড়ে যাওয়ার সংবেদন অনুভব করেন।

ID: 1244

Context: ভার্টিগোর প্রধান লক্ষণ এবং উপসর্গগুলি

Question: ভার্টিগোর প্রধান লক্ষণ এবং উপসর্গগুলি কি কি?

Answer:

ভার্টিগোর সঙ্গে যুক্ত প্রধান লক্ষণ এবং উপসর্গগুলি হল:

\* টিনিটাস (কানের মধ্যে বোঁ বোঁ করা)।

\* শ্রবণশক্তি হারানো।

\* মাথা ঘোড়ার সময় বমি বমি ভাব।

\* শ্বাস প্রশ্বাসের ধরন এবং হৃদস্পন্দনের পরিবর্তন।

\* ঘাম হওয়া।

\* হাঁটতে না পারা।

\* সতর্কতায় পরিবর্তন।

\* চোখের নড়াচড়ায় অস্বাভাবিকতা।

\* দ্বিগুন দেখা।

\* মুখে প্যারালাইসিস।

\* কথা বলতে সমস্যা।

\* হাত অথবা পায়ে দুর্বলতা।

ID: 1245

Context: ভার্টিগোর প্রধান লক্ষণ এবং উপসর্গগুলির প্রধান কারণগুলি

Question: ভার্টিগোর প্রধান কারণগুলি কি কি?

Answer:

নীচে দেওয়া যেকোন অবস্থার কারণে ভার্টিগো হতে পারে:

\*ডায়াবেটিস মেলিটাস।

\*অ্যাথেরোস্ক্লেরোসিস।

\*খিঁচুনি।

\*মেনিয়ারের রোগ।

\*রক্ত নালীর ব্যাধি।

ID: 1246

Context: ভার্টিগোর নির্ণয় এবং চিকিৎসা

Question: ভার্টিগোর কিভাবে নির্ণয় এবং চিকিৎসা করা হয়?

Answer:

মস্তিষ্কের বৈদ্যুতিক কার্যকলাপ পরিমাপ করার জন্য ডাক্তার মস্তিষ্কের একটি কম্পিউটেড টোমোগ্রাফি (সিটি) স্ক্যান এবং ম্যাগনেটিক রেসোনেন্স ইমেজিং (এমআরআই), ইলেক্ট্রোনিস্টাগমোগ্রাফি (চোখের গতিবিধির পরিমাপ), রক্ত পরীক্ষা এবং একটি ইলেক্ট্রোএন্সেফ্যালোগ্রাম (ইইজি) করার পরামর্শ দিতে পারেন। চিকিৎসক ডায়াবেটিস, হৃদ রোগ, বা অন্য কোনো ব্যাধি ভার্টিগোর কারণ হয়ে উঠছে কিনা খুঁজে বার করার জন্য চিকিৎসা ইতিহাস খুঁটিয়ে দেখতে পারেন।কারণ নির্ধারিত হওয়া পর ভার্টিগোর চিকিৎসা শুরু করা হয়। ভার্টিগোর জন্য যে সাধারণ চিকিৎসা পদ্ধতিগুলির পরামর্শ দেওয়া হয় সেগুলি হল:

\* উদ্বেগ না হওয়ার ওষুধ।

\* পেশীর রিলাক্সেন্টস।

\* গেইট (হাঁটার পদ্ধতি) স্থির রাখার জন্য ব্যায়াম।

\* খাপ খাওয়ানোর জন্য ব্যায়াম।

\* সংবেদনশীল সংগঠনর জন্য প্রশিক্ষণ।

\* স্থিতিশীল বা প্রগতিশীল ভারসাম্য বজায় রাখার ব্যায়াম ভারসাম্য ভালো করতে সাহায্য করে।

\* কানালিথ রিপোজিশনিং ট্রিটমেন্ট (সিআরটি/CRT) - এই চিকিৎসাটি সবচেয়ে সাধারণ প্রকার ভার্টিগোর (বিনাইন প্যারক্সিস্মল পজিশনাল ভার্টিগো) জন্য দেওয়া হয়।

\* এরোবিক কন্ডিশনিং - একটি পদ্ধতি যেখানে একটানা ছন্দোবদ্ধ গতিবিধি ফুসফুস এবং হৃদযন্ত্রের পেশীগুলিতে কার্যকরভাবে রক্ত পাম্প করতে সহায়তা করে, যা পেশী এবং অঙ্গগুলিতে বেশি পরিমাণ অক্সিজেনের সরবরাহ হচ্ছে কিনা তা নিশ্চিত করে।

ID: 1302

Context: স্ট্রোক

Question: স্ট্রোক কি?

Answer:

স্ট্রোক একটি সম্ভাব্য মারাত্মক স্নায়ু সম্পর্কিত শারীরিক অবস্থা , যা যখন মস্তিষ্কের কোনো এক অংশে রক্ত সরবরাহ বন্ধ হয়ে যায় তখন ঘটে। দ্রুত এবং সক্রিয় চিকিৎসা পদ্ধতি মস্তিষ্ককে দ্বীর্ঘস্থায়ী ক্ষতি এবং অক্ষমতা থেকে বাঁচাবে।

ID: 1303

Context: স্ট্রোক রোগের প্রধান লক্ষণ এবং উপসর্গগুলি

Question: স্ট্রোক রোগের প্রধান লক্ষণ এবং উপসর্গগুলি কি?

Answer:

লক্ষণ এবং উপসর্গগুলি পরিবর্তন হয় এবং হটাৎ ঘটে এবং প্রতিটি ব্যক্তির ক্ষেত্রে আলাদা হয়। এগুলিকে এফ.এ.এস.টি হিসাবে চিহ্নিত করা হয় :মুখ (ফেস ) - চোখ বা ঠোঁটের সাথে মুখও একদিকে বেঁকে যায় এবং হাসতে অক্ষম হয়ে পরে।

হাত (আর্মস)- দুর্বলতা বা অবসতার কারণে দুটো হাতই তুলতে অক্ষম।

বক্তৃতা (স্পিচ) - জেগে থাকা অবস্থায় কথা বলতে অক্ষম।

সময় (টাইম) - তৎক্ষণাৎ চিকিৎসা ব্যবস্থার জন্য কল করুন।অন্যান্য উপসর্গগুলোর অন্তর্ভুক্ত হলো :কোনো এক দিকের বা কোনো বিশেষ অঙ্গের সম্পূর্ণ প্যারালাইসিস যেমন মুখের এক পাশের।

আবঝা দৃষ্টি বা অন্ধ হয়ে যাওয়া।

ঝিমুনি বা মাথা ঘোরা।

ধন্দ।

ভারসাম্য এবং সমন্বয়ের সমস্যা।

কিছু গিলতে সমস্যা।

চেতনা হারিয়ে ফেলা।

শরীরের এক বা দুই পাশে অবসতা।

ID: 1304

Context: স্ট্রোক রোগের প্রধান কারণ

Question: স্ট্রোক রোগের প্রধান কারণ কি ?

Answer:

মস্তিষ্কে রক্ত সরবরাহের ব্লকেজের ফলে ইসকেমিক স্ট্রোক হয়। রক্তনালীর দেওয়ালে ভেতর থেকে প্লেক (কলেস্টেরল এবং ক্যালসিয়াম) জমা হওয়ার কারণে ব্লকেজ হয়।

মস্তিষ্কে কোনো একটি ধমনী ফেটে যাওয়ার কারণে হেমোরেজিক স্ট্রোক (সেরেব্রাল বা ইন্ট্রাক্রেনিয়াল) হয়। হেমারেজ স্ট্রোকের আরেকটি প্রধান কারণ হলো উচ্চ রক্ত চাপ।

ধমনীর আংশিক ব্লকেজের কারণে ট্রানসিয়েন্ট ইসকেমিক আক্রমণ , যাকে মিনি স্ট্রোক বা ওয়ার্নিং স্ট্রোকও বলে , হয়। এটি একঘন্টার কম সময় অবধি স্থায়ী থাকে এবং একটি আসন্ন গুরুতর স্ট্রোকের সতর্কতার সংকেত।

ID: 1305

Context: স্ট্রোক রোগের নির্ণয় এবং চিকিৎসা

Question: স্ট্রোক রোগের নির্ণয় এবং চিকিৎসা কিভাবে হয় ?

Answer:

আপনার চিকিৎসা ইতিহাস , পারিবারিক ইতিহাস এবং শারীরিক পরীক্ষার ওপর ভিত্তি করে , ডাক্তার নির্ণয় করতে পারবেন। তিনি মুখ, হাত এবং পায়ের অবসতাও পরীক্ষা করবেন ; ঝাপসা দৃষ্টি ; ধন্দ; এবং কথা বলতে সমস্যা এগুলোও পরীক্ষা করবেন। রক্ত পরীক্ষা , পাল্স রেট এবং রক্ত চাপের পরীক্ষা, সিটি স্ক্যান , সিটি এনজিওগ্রাম , এমআরআই স্ক্যান , গ্রাস পরীক্ষা , ক্যারোটিড আল্ট্রাসাউন্ড এবং ইলেক্ট্রোকার্ডিওগ্রাম পরিচালনা করা যেতে পারে।ইসকেমিক স্ট্রোকের চিকিৎসার মধ্যে রয়েছে থ্রোম্বোলিসিস, থ্রমবেকটমি, অ্যান্টিপ্লেটেলেট থেরাপি, অ্যান্টিকোয়াগুলেন্ট থেরাপি , অ্যান্টিহাইপারটেনসিভ ড্রাগস্ , স্ট্যাটিনস এবং ক্যারোটিড এন্ডারটেরেক্টমি।অস্ত্রোপচারের দ্বারা মস্তিষ্ক থেকে রক্ত অপসারণ করা হয় এবং মস্তিষ্কের মধ্যে উচ্চ চাপকে নিয়ন্ত্রণ করা হয় এবং এই ভাবে হেমোরেজিক স্ট্রোকের চিকিৎসা করা হয়।

ID: 1306

Context: নাক ডাকা

Question: নাক ডাকা কি?

Answer:

ঘুমানোর সময় নাকে বাতাস চলাচলে বাধা সৃষ্টি হওয়ার ফলে নাক ডাকা হয়। সাধারণত যাদের গলা ও নাকের টিস্যু খুব বেশি পরিমাণে বা টিস্যুগুলি ফাঁপা অবস্থায় থাকার জন্য কম্পন সৃষ্টি হয়,যা পড়ে নাকডাকার সময় শব্দের সৃষ্টি ঘটায়।

ID: 1307

Context: নাক ডাকার প্রধান লক্ষণ ও উপসর্গগুলি

Question: নাক ডাকার প্রধান লক্ষণ ও উপসর্গগুলি কি কি ?

Answer:

নাকডাকার ফলে ঘুমের ব্যাঘাত ঘটে, দিনের বেলা ঘুম পাওয়া,মনোযোগের অভাব ও কামশক্তি কমে যায়। এর কারণে মানসিক ক্ষতি ও হার্ট অ্যাটাকের ঝুঁকি বেড়ে যায়।

ID: 1308

Context: নাক ডাকার প্রধান কারণ

Question: নাক ডাকার প্রধান কারণ কি কি ?

Answer:

নাকডাকা অতি সাধারণ ব্যাপার এবং এটি কোন গুরুতর কারণের জন্য হয়না। অপনার ঘুমানোর সময় জিভ,গলা,মুখ,ফুসফুসে বায়ু চলাচলের পথটি শিথিল ও সরু হয়ে যায়। আপনার শ্বাস নেওয়ার সময় যখন শরীরের এই অংশগুলিতে কম্পন হয়, তখন এর ফলে নাকডাকে। নাকডাকার কিছু সাধারণ কারণগুলি হলঃঅ্যালার্জি বা সাইনাস সংক্রমণ।

নাকের গঠনগত ত্রুটি যেমন নাকের পর্দাটির বিভাজন বা নাসারন্ধ্রে পলিপের কারণে বাধা।

স্থুলতা।

মোটা বা পুরু জিভ।

গর্ভাবস্থা।

জিনগত ত্রুটি।

মদ্যপান ও ধূমপানের মতো নেশা।

টনসিল ও গলরসগ্রন্থির বৃদ্ধি পাওয়া।

বিশেষ কিছু ওষুধের ব্যবহার।

ID: 1309

Context: নাক ডাকা নির্ণয় ও চিকিৎসা

Question: কিভাবে নাক ডাকা নির্ণয় ও চিকিৎসা করা হয় ?

Answer:

নাকডাকার কারণ জানার জন্য চিকিৎসক আপনার নাক ও মুখ পরীক্ষা করবেন। আপনার সঙ্গী সবথেকে ভালোভাবে আপনার নাকডাকার ধরনটি বিশ্লেষণ করতে পারবে। নাকডাকার কারণটি যদি স্পষ্ট না হয় সেক্ষেত্রে আপনার চিকিৎসক একজন বিশেষজ্ঞের পরামর্শ নিতে বলবেন। বাড়িতে বা গুরুতর ক্ষেত্রে পরীক্ষাগারে ঘুমের একটি পরীক্ষা করার জন্য আপনার মতামত নেওয়া হবে। ঘুমের পরীক্ষা করতে, আপনার শরীরের বিভিন্ন অংশে সেন্সর লাগিয়ে দেওয়া হবে যা আপনার মস্তিষ্কের তরঙ্গের, হৃদস্পন্দনের এবং নিশ্বাসের গতি, নথিভুক্ত করবে। সাধারণ বাড়িতে পলিসনোগ্রাফির মাধ্যমে ঘুমের পরীক্ষা করার সময় অবসট্রাকটিভ স্লিপ আপ্নিয়া নির্ণয় হতে পারে। স্লিপ ডিসঅর্ডার অবসট্রাকটিভ স্লিপ আপ্নিয়ার একটি অংশ যা স্বাস্থ্যকেন্দ্রে বা পরীক্ষাগারে ঘুমের পরীক্ষা করার ফলে ধরা পড়ে।যদি ঘুমের পরীক্ষা করে নাকডাকার কারণ চিহ্নিত করতে না পারা যায় সেক্ষেত্রে উপযুক্ত কারণ নির্ণয়ের জন্য বুকের এক্স-রে, সিটি ও এমআরআই স্ক্যান করতে বলা হয়।একটি নির্দিষ্ট চিকিৎসা দ্বারা নাকডাকা সম্পূর্ণভাবে বন্ধ করা সম্ভব নয় তবে নির্দিষ্ট কিছু চিকিৎসার দ্বারা শ্বাস গ্রহণের বন্ধ অংশগুলি পরিষ্কার করে অস্বস্তিকে কমাতে সাহায্য করবে।জীবন শৈলীর পরিবর্তন, ধূমপান ছেড়ে দেওয়া ও মদ্যপান এড়িয়ে চলা ও স্বস্তিদায়ক ওষুধগুলি ঘুমানোর আগে গ্রহন করলে নাকডাকা কমবে। নাকের স্প্রে, স্ট্রিপ বা ক্লিপ, মুখের যন্ত্র, বিশেষ লুব্রিকেনট স্প্রে, এবং নাকডাকা কমাতে সাহায্যকারী বালিশ ও পোশাক নাকডাকা কমাতে সাহায্য করবে।চিকিৎসক যে সংশোধনগুলির পরামর্শ দেবেন সেগুলি হল:কন্টিনিউয়াস পসিটিভ এয়ারওয়ে প্রেসার (সিপিএপি)।

লেসার – এসিসটেড ওভুলোপ্যালাটোপ্লাষ্টি (এলএইউপি)।

পালাট্যাল ইমপ্ল্যানটস।

সোনোপ্লাষ্টি – অতিরিক্ত টিস্যুর নিষ্কাশনে স্বল্প মাত্রার রেডিও ফ্রিক্যুয়েন্সির ব্যবহার।

দাঁতের মধ্যে বা নীচের চোয়ালে – অঞ্চল সেট করার জন্য সঠিক মাপের যন্ত্র স্থাপন।

অস্ত্রোপচার পদ্ধতির মধ্যে ওভুলোপ্যালাটোফ্যারিঙ্গপ্লাষ্টি (ইউপিপিপি), থার্মাল অ্যাব্লেসন প্যালাটোপ্ল্যাসটি (টিএপি), টনসিল্যাকটোমি ও অ্যাডিনিওডেকটোমির ব্যবহার।নাকডাকা এড়াতে আপনি পিঠের ওপর ভর দিয়া না শুয়ে পাশ ফিরে, আপনার মাথাটি উঁচু করে শুতে এবং নাকডাকা রোধ করে এমন মুখের যন্ত্র ব্যবহার করতে চেষ্টা করুন।

ID: 1310

Context: ঘুমের ক্ষতি (স্লিপ ডিপ্রাইভেশন)

Question: ঘুমের ক্ষতি (স্লিপ ডিপ্রাইভেশন) কি?

Answer:

ঘুমের ক্ষতি (স্লিপ ডিপ্রাইভেশন) বলতে পর্যাপ্ত ঘুমের অভাবকে নির্দেশ করে, যা বিভিন্ন কারণবশত ঘটতে পারে। এটি কোন রোগ নয় তবে বিভিন্ন রোগ বা জীবনধারার পরিস্থিতির উপসর্গগুলি ঘুমের অভ্যাসের ব্যাঘাত ঘটায়। ঘুমের অভাবের ফলে বিভিন্ন শারীরিক সমস্যা দেখা দিতে পারে তাই দ্রুত বিষয়টি সংশোধন করা উচিত।

ID: 1311

Context: ঘুমের ক্ষতি (স্লিপ ডিপ্রাইভেশন) র সাথে জড়িত প্রধান লক্ষণ ও উপসর্গগুলি

Question: ঘুমের ক্ষতি (স্লিপ ডিপ্রাইভেশন) র সাথে জড়িত প্রধান লক্ষণ ও উপসর্গগুলি কি কি?

Answer:

ঘুমের ক্ষতি (স্লিপ ডিপ্রাইভেশন) সাথে জড়িত যে বিশেষ লক্ষণ ও উপসর্গগুলি দেখতে পাওয়া যায় সেগুলি হল:

১।ঘুমাতে অসুবিধা হওয়া।

২।অস্বস্তিকর বা বিরক্তিকর আচরণ।

৩।মনোযোগের অভাব হওয়া।

৪।তাড়াতাড়ি ঘুম থেকে উঠে পরা।

৫।ঘন ঘন দিনের বেলায় ঘুম পাওয়া।

৬।ঘুম থেকে ওঠার পরেও সতেজতার অভাব অনুভব হওয়া।

৭।সিদ্ধান্ত গ্রহণে ও চিন্তনে বাধা সৃষ্টি।

৮।নাকডাকা।

৯।পাঁচটি সাধারণ স্লিপ ডিসঅর্ডার যা দেখতে পাওয়া যায় তার মধ্যে রয়েছে:ঘুমানোয় অসুবিধা বা ইনসোমনিয়া।

১০।শ্বাস প্রশ্বাস বাধাপ্রাপ্ত হওয়া বা স্লিপ আপ্নিয়া।

১১। দিনের বেলায় অতিরিক্ত ঘুমানো।

১২।বিশ্রামহীনতা জন্য পায়ের নড়াচড়ায় অনিয়ন্ত্রন।

১৩।স্লিপ ডিসঅর্ডারে ঘন ঘন চোখের নড়াচড়া।

ID: 1312

Context: ঘুমের ক্ষতি (স্লিপ ডিপ্রাইভেশন) র প্রধান কারণগুলি

Question: ঘুমের ক্ষতি (স্লিপ ডিপ্রাইভেশন) র প্রধান কারণগুলি কি কি?

Answer:

ঘুমের ছন্দের ব্যঘাতের সাথে বিভিন্ন কারণ জড়িত। প্রধান কারণগুলি হল:

১।কর্মস্থলে অনিয়মিত বা রাত্রে কাজ করা।

২।অতিরিক্ত সময় ধরে কাজ করা।

৩।অ্যাজমা বা হাঁপানি রোগ।

৪।অবসাদ বা উদ্বিগ্নতা।

৫।মদ্যপানের অভ্যাস।

৬।মানসিক চাপ।

৭।বিশেষ কিছু ওষুধের ব্যবহার।

৮।বংশগত ইতিহাস।

৯।বার্ধক্যজনিত অবস্থা।

ID: 1313

Context: ঘুমের ক্ষতি (স্লিপ ডিপ্রাইভেশন) নির্ণয় ও চিকিৎসা

Question: ঘুমের ক্ষতি (স্লিপ ডিপ্রাইভেশন) কিভাবে নির্ণয় ও চিকিৎসা করা হয়?

Answer:

চিকিৎসক আপনার পূর্বে ঘটা ঘুমের ভঙ্গিমার বিষয় এবং আপনার পরিবারের সদস্যদের কাছ থেকে রাতে আপনি কোন পর্যায়ে ঘুমাচ্ছন্ন থাকেন সে বিষয়েও জিজ্ঞাসাবাদ করতে পারেন। আপনার ঘুমের ভঙ্গিমা এবং সংগৃহীত তথ্য অনুযায়ী পরিস্থিতি নির্ণয় করার জন্য একটি ঘুমের সময় তালিকার ব্যবহার করা হতে পারে।ঘুমের ওষুধের দ্বারা ঘুমের ক্ষতি পরিচালিত হতে পারে, কিন্তু যদি এগুলি কম কার্যকারী হয় তাহলে ওষুধ বিহীন পদ্ধতির প্রচেষ্টা করা হতে পারে যেগুলি নীচে দেওয়া হলো:

ID: 1314

Context: স্ব-যত্ন টিপস গুলো কি কি

Question: স্ব-যত্ন টিপস গুলো কি কি ?

Answer:

\* নিজেকে আরামদায়ক একটি ঘুমের ভঙ্গিমায় সন্নিবেশিত করা।

\* সমস্ত বৈদ্যুতিক যন্ত্রাংশের সুইচ বন্ধ করে দেওয়া ও বিছানা থেকে সেগুলি দূরে রাখা উচিত।

\* ঘুমাতে সাহায্যকারী কোন আরামদায়ক পদ্ধতি গ্রহন করা।

\* সঠিক সময় ঘুমাতে যাওয়া ও ঘুম থেকে ওঠার জন্য একটি বিশেষ সময়সূচী পালন করা।

\* ঘুমাতে সাহায্য করবে এমন হালকা কিছু খাবার খাওয়া ও দুধ পান করা।

\*রাতে ঘুমাতে যাওয়ার আগে ডিনারে কখনও বেশি খাবার বা পানীয় গ্রহন করবেন না।

\* বিছানায় ঘুমাতে গিয়ে যাতে অসুবিধা না হয় সেজন্য মোবাইল ফোন ও ল্যাপটপের ব্যবহার এড়িয়ে চলা।

\* ধূমপান ও মদ্যপানের মতো অন্যান্য পানীয় যেমন চা ও কফি এগুলো সন্ধ্যা থেকে এড়িয়ে চলা।

\* ঘুমের ওষুধের প্রতি নির্ভরশীলতা এড়িয়ে চলা।

\* শোয়ারঘরে, বিশেষত বিছানায়, ঘুমানো ছাড়া অন্য যাবতীয় কাজ এড়িয়ে চলা।

ID: 1315

Context: স্লিপ অ্যাপনিয়া

Question: স্লিপ অ্যাপনিয়া কি?

Answer:

স্লিপ অ্যাপনিয়া এমন একটি ঘুমের অসুখ যাতে ব্যক্তির ঘুমানোর সময় শ্বাস নেওয়া ক্রমাগত বন্ধ হয়ে যায় ও পুনরায় শুরু হয়। অবস্ট্রাক্টিভ স্লিপ অ্যাপনিয়া সাধারণ অবস্থা, যেখানে নাক থেকে শ্বাসনালীর মধ্যেকার শ্বাসপথের উপরিভাগের কোনও একটি অংশ অবরুদ্ধ হয়ে যাওয়ার ফলে আপনি নাক ডাকেন। সেন্ট্রাল স্লিপ অ্যাপনিয়া এমন একটি অবস্থা, যেখানে মস্তিষ্ক থেকে শ্বাস নেওয়ার সঙ্কেত শ্বাস-প্রশ্বাসের পেশীতে পাঠানো হয় না। মনে রাখা রাখা জরুরি, স্লিপ অ্যাপনিয়ায় আক্রান্ত সবাই রাতে নাক ডাকে না এবং বিপরীতও হতে পারে।

ID: 1316

Context: স্লিপ অ্যাপনিয়ার প্রধান লক্ষণ ও উপসর্গগুলি

Question: স্লিপ অ্যাপনিয়ার প্রধান লক্ষণ ও উপসর্গগুলি কি কি?

Answer:

যেহেতু উপসর্গগুলি রাতে ঘুমানোর সময় ঘটে, তাই সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের পক্ষে নিজের সমস্যা বোঝা মুশকিল। এর সাথে জড়িত কিছু উপসর্গগুলি:

১। রাতে ঘুমানোর সময় শ্বাস নিতে সমস্যা হওয়ায় দিনেরবেলা ঘুমিয়ে পড়া।

২।ঘুমানোর সময় হাঁপানো ও শ্বাসরুদ্ধ হওয়া।

৩।মুখের শুষ্কতা এবং সকালে মাথাযন্ত্রণা।

৪।জোরে নাক ডাকা।

৫।অত্যধিক খিটখিটে এবং বদমেজাজি হয়ে পড়া।

৬।সারাদিন ধরে ঝিমুনিভাব।

ID: 1317

Context: স্লিপ অ্যাপনিয়ার প্রধান কারণ

Question: স্লিপ অ্যাপনিয়ার প্রধান কারণ কি?

Answer:

স্লিপ অ্যাপনিয়া অন্তর্নিহিত চিকিৎসাজনিত কারণের ফলে হয়, যেমন:

১।বিশেষত গলা ও বুকের চারপাশের অঞ্চলে স্থুলতা।

২।বড টনসিলের বৃদ্ধি পাওয়া।

৩।স্নায়বিক-পেশীগত রোগ।

৪।কিডনির বিকলতা অথবা হৃদযন্ত্রের বিকলতা।

৫।জিনগত অসুখ।

৬।স্বাভাবিক সময়ের আগে জন্মগ্রহণ।

ID: 1318

Context: স্লিপ অ্যাপনিয়া নির্ণয় ও চিকিৎসা

Question: স্লিপ অ্যাপনিয়ার কিভাবে নির্ণয় ও চিকিৎসা করা হয়?

Answer:

আপনার সঙ্গে এক বিছানায় ঘুমোন এমন ব্যক্তির দেওয়া আপনার ঘুমের বিশদ বিবরণ এবং বিস্তারিত শারীরিক পরীক্ষার ভিত্তিতে চিকিৎসক মূল্যায়ন করবেন। কোনও স্লিপ সেন্টারে শ্বাস-প্রশ্বাস ও শারীরিক ক্রিয়াকলাপের ওপর সারারাত তদারকি স্লিপ অ্যাপনিয়ার নিশ্চয়তা নির্ণয়ে সহায়ক হতে পারে। নকচারনাল পলিসোমনোগ্রাফি টেস্ট (ঘুম পর্যবেক্ষণ) করা হয় ঘুমের সময় আপনার নিশ্বাসের গতিবিধি, রক্তে অক্সিজেনের মাত্রা এবং হৃদযন্ত্র, ফুসফুস এবং মস্তিষ্কের কার্যকর্ম পর্যবেক্ষণের জন্য। চিকিৎসক হোম স্লিপ টেস্টেরও পরামর্শ দিতে পারেন।ছোটোখাটো ক্ষেত্রে, ওজন কমানো অথবা ধূমপান ত্যাগের মতো জীবনশৈলীতে পরিবর্তন আনার পরামর্শ দেওয়া হয়। গুরুতর ক্ষেত্রে, অবিরাম সঠিক বায়ুপথের চাপ বা কন্টিনিউয়াস পজিটিভ এয়ারওয়ে প্রেসার (সিপিএপি) বজায় রাখার জন্য মাস্ক দেওয়া হয়। জিভ সঠিক স্থানে রাখার জন্য মৌখিক যন্ত্র ব্যবহৃত হয়। বায়ু প্রবেশ পথের বাধা সরাতে গলার পিছনে টিস্যু বাদ দিতে অথবা চোয়ালের স্থান পরিবর্তন করতে অস্ত্রোপচারের পরামর্শ দেওয়া হয়।

ID: 1323

Context: বিশ্রামহীনতা বা অস্থিরতা

Question: বিশ্রামহীনতা বা অস্থিরতা কি?

Answer:

একই জায়গায় থেকে একটি কাজ স্থিরভাবে ক্রমাগত না করতে পারার অক্ষমতাকে অস্থিরতা বলে। এটির বিশদ লক্ষণ ও উপসর্গগুলি বিভিন্ন ব্যক্তিদের মধ্যে বিস্তীর্ণভাবে ভিন্ন আকারে প্রকাশ পায়। এটি শারীরিক ও মানসিক উভয় ক্ষত্রেই প্রভাব ফেলে।

ID: 1324

Context: বিশ্রামহীনতা বা অস্থিরতার সাথে জড়িত প্রধান লক্ষণ ও উপসর্গগুলি

Question: বিশ্রামহীনতা বা অস্থিরতার সাথে জড়িত প্রধান লক্ষণ ও উপসর্গগুলি কি কি?

Answer:

প্রধানত, অস্থিরতা অধিক কাজকর্ম করার মতো দেখায়। অর্থাৎ একজন ব্যক্তি একই স্থানে বেশিক্ষণ একনাগারে বসে থাকতে পারে না এবং বার বার স্থান পরিবর্তনের প্রয়োজন অনুভব করেন।

এইধরনের অস্থির ব্যক্তিকে কোন দীর্ঘ সময়ের কথোপকথন বা কাজে জড়িত রাখা খুব কঠিন বিষয়।

যে সকল ব্যক্তির মধ্যে অস্থিরতা আছে সেই ব্যক্তিরা বসে থাকার সময় পায়ে বেদনাদায়ক শির টেনে ধরা অনুভব করতে পারেন।

হাত পায়ে ঝিনঝিন ধরা, অবশ ও কম্পনের মতো সংবেদনশীলতা ও আরও কিছু অন্যান্য লক্ষণ দেখা দিতে পারে।

ঘুমের সময় বার বার উদ্বিগ্নতা ও বিভ্রান্তির জন্য, অস্থির ব্যক্তির ঘুমাতে সমস্যা হয়।

গুরুতর ক্ষেত্রে, কেউ কেউ বুক ধরপরের সাথে অতিরিক্ত ঘেমে যাওয়া অনুভব করেন।

ID: 1325

Context: বিশ্রামহীনতা বা অস্থিরতার প্রধান কারণগুলি

Question: বিশ্রামহীনতা বা অস্থিরতার প্রধান কারণগুলি কি কি?

Answer:

সাধারণত বেশিরভাগ ক্ষেত্রে অস্থিরতার কারণগুলি ওষুধের সাথে সম্পর্কিত। এটেনসন ডিফিকট হাইপারএকটিভিটি ডিসর্ডার (এডিএইচডি) ও অ্যাস্থমা ইত্যাদি রোগ ঘুমের ওষুধ ও বমি কমানোর ওষুধের পার্শ্ব প্রতিক্রিয়ার সাথে জড়িত।

অস্থিরতার আরেকটি সাধারণ কারণ ক্যাফিনের আসক্তি বা এর অত্যধিক ব্যবহার, চা বা কফি মত উপাদানে প্রচুর মাত্রায় ক্যাফিন থাকে।

স্ক্রিতজোফ্রেনিয়া, এডিএইচডি, স্মৃতিভ্রংশ ও উদবিগ্নতার মতো নিউরোলজিক্যাল অবস্থার সাথে অস্থিরতার বিষয় জড়িত।

ব্যক্তির মধ্যে হাইপারথাইরয়েডিজম এর হরমোনাল অস্বাভাবিকতাও অস্থিরতা বৃদ্ধির অন্যতম কারণ।

ID: 1326

Context: বিশ্রামহীনতা বা অস্থিরতা নির্ণয় ও চিকিৎসা

Question: কিভাবে বিশ্রামহীনতা বা অস্থিরতা নির্ণয় ও চিকিৎসা করা হয়?

Answer:

বিভিন্ন কারনের সাথে অস্থিরতা জড়িত। একজন বিশেষজ্ঞ পূর্ব চিকিৎসার তথ্য ও উপসর্গগুলির ওপর ভিত্তি করেই রোগটি নির্ণয় করেন।

নির্ণয়ে পৌঁছানোর জন্য চিকিৎসকের কাছে আপনার জীবনধারা ও কি কি ওষুধ গ্রহণ করছেন বা কোন শারীরিক পরীক্ষা করেছেন কিনা সে সম্পর্কে জানানো অতি গুরুত্বপূর্ণ।

ফার্মাসোলজিক্যাল ম্যানেজমেন্টের পরিবর্তে, তুলনামূলক ভাবে জীবনশৈলী ও অভ্যাস পরিবর্তনের মাধ্যমেও অস্থিরতার চিকিৎসা করা সম্ভব।

চিকিৎসক আপনাকে সামঞ্জস্যপূর্ণ ঘুমের সময়সূচি বজায় রাখতে এবং রাতে পর্যাপ্ত বিশ্রাম নিতে পরামর্শ দেবেন।

অস্থিরতার উন্নতিসাধনে চিকিৎসক আপনাকে ক্যাফেন স্বল্প পরিমানে গ্রহণের পরামর্শ দেবেন।

যদি ওষুধের কারণে এই অবস্থা সৃষ্টি হয় তবে ওষুধের ডোজ বন্ধ বা সংশোধন করার আগে আপনার চিকিৎসকের সাথে পরামর্শ করা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ, কারণ এটি শরীরের ওপর অকল্পনীয় পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া ঘটাতে পারে।

এডিএইচডি ও স্ক্রিতজোফ্রেনিয়ার মতো স্বাস্থ্য পরিস্থিতির ক্ষেত্রে উপযুক্ত ঘুমের ওষুধ বা নিদ্রা আকর্ষণকারী ওষুধ দেওয়া হতে পারে।

ID: 1327

Context: বিশ্রামহীন পায়ের সিন্ড্রোম (রেস্টলেস লেগ সিনড্রো

Question: বিশ্রামহীন পায়ের সিন্ড্রোম (রেস্টলেস লেগ সিনড্রোম) কি?

Answer:

বিশ্রামহীন পায়ের সিন্ড্রোমটি স্নায়ু তন্ত্রের সাথে জড়িত অবস্থায় থাকে এবং ক্রমাগত পায়ের নড়াচড়ার ফলে এই ঘটনাটি ঘটে। এটির ফলে থাই, পায়ের ডিমেও বিরলভাবে, হাতে, বুকে একটি অস্বস্তিকর সংবেদনশীলতা বা ভর না দিতে পারা বা চাপের সৃষ্টি হয় যা সন্ধ্যের পর বা রাতে পরিস্থিতিকে আরও জটিল করে তোলে।

ID: 1328

Context: বিশ্রামহীন পায়ের সিন্ড্রোম (রেস্টলেস লেগ সিনড্রো র প্রধান লক্ষণ ও উপসর্গগুলি

Question: বিশ্রামহীন পায়ের সিন্ড্রোম (রেস্টলেস লেগ সিনড্রো র প্রধান লক্ষণ ও উপসর্গগুলি কি কি?

Answer:

উপসর্গগুলি খুব অস্বস্তিকর যা প্রতিদিন বা কোন কোন দিন হালকা থেকে মাঝারি হতে পারে।

এগুলি হল: পায়ে বেদনাদায়ক খিল ধরা, চুলকানো, প্রলম্বন, ভর দেওয়া, তীব্র যন্ত্রণা, জ্বালা বা ঢিপ ঢিপ করার মতো সংবেদনশীলতার সৃষ্টি (বিশেষত পায়ের ডিমে),

মনে হয় যেন,পায়ের রক্তবাহী নালিগুলি ঠাণ্ডা জল দ্বারা পরিপূর্ণ হয়ে গেছে।

দীর্ঘ সময় বসে থাকা অসুবিধাজনক হয়ে ওঠে।

ঘুমের সময় প্রতি 20 থকে 40 সেকেন্ডে স্বল্পভাবে অঙ্গ প্রতঙ্গের নড়াচড়ার পুনরাবৃত্তি (পিএলএমএস), অপ্রত্যাশিত ঝাঁকুনি বা হালকা টান ধরা।

জেগে থাকা বা বিশ্রামের সময় হঠাৎ অনিচ্ছাকৃত ভাবে পায়ের নড়াচড়া।

ID: 1329

Context: বিশ্রামহীন পায়ের সিন্ড্রোম (রেস্টলেস লেগ সিনড্রো র প্রধান লক্ষণ ও উপসর্গগুলি র প্রধান কারণ

Question: বিশ্রামহীন পায়ের সিন্ড্রোম (রেস্টলেস লেগ সিনড্রো র প্রধান লক্ষণ ও উপসর্গগুলি র প্রধান কারণ কি কি?

Answer:

এটির প্রধান কারণ এখনও নিশ্চিতভাবে জানা যায়নি তবে মনে করা হয় এটি বংশগত বা জিনগত কারনের সাথে জড়িত। এর সাথে জড়িত থাকতে পারে এমন কিছু কারণগুলি হল:পেশীর কার্যকলাপ ও নড়াচড়ার নিয়ন্ত্রিত করার জন্য ডোপামিনের মাত্রা হ্রাস পাওয়া যা নিউরোট্রান্সমিটার নামে পরিচিত।

আয়রনের অভাবে অ্যানিমিয়া, ক্রনিক কিডনি ডিজিজ, ডায়াবেটিস বা গর্ভাবস্থার মতো অনন্তৰ্নিহিত কিছু স্বাস্থ্য পরিস্থিতি।

বিশেষত এর সাথে জড়িত নির্দিষ্ট কিছু ওষুধ, ধূমপান, ক্যাফেইন, মদ্যপান, স্থুলতা, দুশ্চিন্তা ও স্বল্প ব্যায়ামের অভ্যাস।

ID: 1330

Context: বিশ্রামহীন পায়ের সিন্ড্রোম (রেস্টলেস লেগ সিনড্রোম ] নির্ণয় ও চিকিৎসা

Question: বিশ্রামহীন পায়ের সিন্ড্রোম (রেস্টলেস লেগ সিনড্রো র কিভাবে এটি নির্ণয় ও চিকিৎসা করা হয়?

Answer:

উপসর্গের বিস্তারিত ইতিহাস, তাদের মনে হওয়া তীব্রতা, সময়ের সাথে তাদের উপস্থিতি, কিভাবে তারা স্বস্তি পাবে, অস্বস্তি বা দুশ্চিন্তাজনক উপসর্গগুলির কারণে ঘুমাতে সমস্যা ও অন্যান্য কারণগুলি থেকে এটি নির্ধারণ সম্পূর্ণ হয়। শারীরিক পরীক্ষার মাধ্যমে এটি সঞ্চালিত হয়। এগুলি হল:অ্যানিমিয়া, কিডনি সমস্যা ও ডাইয়াবেটিস আছে কিনা খুঁজে বের করতে রক্ত পরীক্ষা করা হয়।

বেছানায় শুয়ে শরীরের অঙ্গ প্রতঙ্গগুলি নাড়াচাড়া না করেও অনিচ্ছাকৃত নড়াচড়া পর্যবেক্ষণের জন্য ইমোবিলেসন পরীক্ষা যা ঘুমের পরীক্ষার সাথে জড়িত।

ঘুমানোর সময় মস্তিষ্ক তরঙ্গ ও হৃদস্পন্দন, ও নিশ্বাসের হার পর্যবেক্ষণের জন্য পলিসোনগ্রাফি করা হয়।বিশ্রামহিন পায়ের সিন্ড্রোমের সাথে জড়িত ব্যবস্থাপনা গুলি হল:মৃদু ক্ষেত্রে জীবনশৈলীর উন্নইয়নের সাথে জড়িত ব্যবস্থাপনা গুলি হল:

১।উপরে আলোচিত বিষয়গুলি এড়িয়ে চলা।

২।ভালো ঘুমানোর অভ্যাস করা।

৩।নিয়মিত ব্যায়ামের অভ্যাস করা।

৪।পর্যায়ক্রমে জড়িত থাকা চিকিৎসাগুলি হল:

৫।পায়ে ম্যাসেজ করা, ঠাণ্ডা বা গরম সেঁক দেওয়া বা গরম জলে স্নান করা।

৬।মনকে এর থেকে দূরে সরাতে নিজেকে কাজের মধ্যে ব্যস্ত রাখা, যেমন বই পড়া।

৭।শিথিল বা প্রসারনে সহায়ক ব্যায়াম করা।

৮।চিকিৎসার সাথে যে ওষুধগুলি ব্যবহার করা হয় সেগুলি হল:

৯।ডোপামেন এগনিসটস, যার সাথে জড়িত রোপিনিরোলে,প্রেমিপেক্সলে বা রোটিগোটিনের মত চামড়ার দাগ।

১০।ব্যথা কমানোয় সহায়ক ওষুধগুলির মধ্যে কোডিয়েন, গাবাপেন্টিন দেওয়া হয়।

১১।টেমাজপাম ও লোপ্রাযোলেমের মতো ওষুধগুলি ঘুম সংক্রান্ত সমস্যার সমাধানে ব্যবহৃত হয়।

এই অবস্থা যদি আয়রনের অভাবের কারণে হয়, তাহলে আয়রন সম্পুরকের দ্বারা সমাধান করা হয় ও গর্ভাবস্থার জন্য হলে, এটি নিজে থেকেই ভালো হয়ে যায়।

ID: 1331

Context: রেনড ফেনোমেনন (রেনড’স সিন্ড্রোম)

Question: রেনড ফেনোমেনন (রেনড’স সিন্ড্রোম) কি?

Answer:

রেনড ফেনোমেনন (আরপি/RP) একটি এমন সমস্যা যাতে অতিরিক্ত ঠান্ডা আবহাওয়া অথবা মানসিক চাপের কারণে কম পরিমাণে রক্ত পরিবাহিত হওয়ার জন্য হাতের আঙ্গুলের এবং পায়ের আঙ্গুলের রঙের পরিবর্তন (সাদা, নীল এবং লাল) হয়। এটি অভ্যন্তরীণ কারণগুলির উপর ভিত্তি করে প্রাথমিক বা গৌণ সমস্যা হিসাবে বিবেচিত হতে পারে।

ID: 1332

Context: রেনড ফেনোমেনন এর প্রধান লক্ষণ ও উপসর্গগুলি

Question: রেনড ফেনোমেনন এর প্রধান লক্ষণ ও উপসর্গগুলি কি কি?

Answer:

এই রোগের উপসর্গগুলি থেমে থেমে প্রকাশ পায়। যখন একজন ব্যক্তি রোগটির একটি পর্বের অভিজ্ঞতা অর্জন করেন তখন এইসবগুলি অনুভব করেন।শরীরের আক্রান্ত স্থানে এইসকল সংবেদনগুলি অনুভব করা যায়:

১।ব্যথা।

২।পিন বা সুঁচ ফোটানোর মত অনুভূতি।

৩।শিরশিরে অনুভূতি।

৪।অস্বস্তি।

৫।রঙের পরিবর্তন যা এই রোগের বৈশিষ্ট্য অনুযায়ী নীল, সাদা বা লাল বর্ণ ধারণ করে।

৬।শরীরের আক্রান্ত অংশটি আন্দোলনে সমস্যা তৈরি হয়।

ID: 1333

Context: রেনড ফেনোমেনন এর প্রধান কারণগুলি

Question: রেনড ফেনোমেনন এর প্রধান কারণগুলি কি কি?

Answer:

রেনড ফেনোমেননের সাধারণ কারণ হল আক্রান্ত ব্যক্তিদের পায়ের আঙ্গুলে ও হাতের আঙ্গুলে মাত্রাতিরিক্ত সংবেদনশীল রক্তবাহ ধমনীগুলির উপস্থিতি। প্রাথমিক পর্যায়ের রেনড ফেনোমেনন হল ইডিওপ্যাথিক (অর্থাৎ এর কারণ জানা নেই), অন্যদিকে গৌণ পর্যায়ের কারণগুলির মধ্যে রয়েছে:

১।অটোইমিউন রোগ এবং আর্থারাইটিসের মত কিছু অবস্থা।

২।ফ্রস্টবাইট অথবা তুষারস্পর্শে দেহের প্রদাহ।

৩।কিছু ওষুধ, যেমন বিটা ব্লকারস এবং কিছু কেমোথেরাপির ওষুধ।

৪।যান্ত্রিক কম্পন।

৫।অথেরোস্ক্লেরোসিস (ধমনী সরু এবং শক্ত হয়ে যাওয়া)।

৬।ধূমপান।

ID: 1334

Context: রেনড ফেনোমেনন নির্ণয় এবং চিকিৎসা

Question: রেনড ফেনোমেনন এর প্রধান কারণগুলি কিভাবে নির্ণয় এবং চিকিৎসা করা হয়?

Answer:

সম্পূর্ণ চিকিৎসাগত ইতিহাস ও সম্পূর্ণ শারীরিক পরীক্ষা করার পর এই রোগটি নির্ণয় করা হয়, এই পরীক্ষাগুলি অনুসরণ করা হয়:অটোইমিউনিটির উপস্থিতি আছে কিনা জানতে রক্ত পরীক্ষা করা হয়।

নেইলফোল্ড ক্যাপিলারোস্কপি নামক একটি পরীক্ষা করা হয় হাতের আঙ্গুলের নখের নিচে রক্তবাহগুলির অবস্থা জানার জন্য।

হাতের আঙ্গুলের নখের কলাগুলির আনুবীক্ষণিক পরীক্ষা।

ঠান্ডার প্রতি সংবেদনশীলতার পরীক্ষা।এই রোগের চিকিৎসায় যেসকল ব্যবস্থাগুলি নেওয়া হয় তার মধ্যে রয়েছে:জীবনধারার কিছু পরিবর্তন, যেমন:

রোগের আক্রমণের প্রথম লক্ষণ দেখা দিলেই যত তাড়াতাড়ি সম্ভব হাত ও পা ঈষদুষ্ণ জলে ডুবিয়ে রাখতে হবে।

হাত ও পা গরম রাখার জন্য ঠান্ডা আবহাওয়ায় গ্লাভস বা মোজা ও হাত-পা উষ্ণ রাখার পরিধান ব্যবহার করতে হবে।

এই রোগের অনুঘটকগুলি, যেমন মানসিক চাপ এবং কিছু ওষুধ থেকে দূরে থাকতে হবে।

রেনড ফেনোমেনন রোগটির প্রকোপ বন্ধ করতে ধূমপান ত্যাগ করা একটি গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ।

ওষুধপত্র:

রক্তচাপের ওষুধ, যেমন ক্যালসিয়াম চ্যানেল ব্লকারস এবং অ্যাঞ্জিওটেন্সিন-রিসেপ্টর ব্লকারস, যা রক্তবাহগুলিকে বিস্তৃত করে আক্রান্ত স্থানে রক্ত সঞ্চালণ বাড়াতে সাহায্য করে, সেটিও ব্যবহার করা যেতে পারে।

জটিলতা (আলসার বা ঘা) থেকে মুক্তি পেতে সিল্ডেনাফিল অথবা প্রস্টাসাইক্লিন্স দেওয়া যেতে পারে।

উপসর্গগুলি থেকে মুক্তি পেতে যেসব ওষুধ দেওয়া হয় সেগুলি হল:

সাময়িকভাবে ব্যবহারের ক্রিম।

সিলেক্টিভ-সেরোটোনিন-রিয়াপ্টেক ইনহিবিটর (এসএসআরআই)।

কোলেস্টেরল কম করার (স্টেটিন) ওষুধ।

ID: 1335

Context: সিউডোমোনাস ইনফেকশন বা সংক্রমণ

Question: সিউডোমোনাস ইনফেকশন বা সংক্রমণ কাকে বলে?

Answer:

সিউডোমোনাস প্রজাতির ব্যাকটেরিয়াগুলি যে ব্যাকটেরিয়াল সংক্রমণ সৃষ্টি করে তাকে সিউডোমোনাস সংক্রমণ বলে। পরিবেশে যথেষ্ট পরিমাণে ছড়িয়ে থাকা এই ব্যাকটেরিয়া একটি অত্যন্ত সাধারণ সংক্রামক জীবাণু হিসাবে কাজ করে। সিউডোমোনাসের 200টি প্রজাতি আছে। কিন্তু তাদের মধ্যে শুধুমাত্র তিনটি প্রজাতিই মানুষের মধ্যে রোগসৃষ্টি করে বলে জানা যায়, এগুলি হল পি.এরুজিনোসা, পি.ম্যালেই এবং পি.সিউডোম্যালেই। সিউডোমোনাসের এই সমস্ত প্রজাতিগুলির মধ্যে পি.এরুজিনোসা মানুষের সংক্রমণ ঘটানোর জন্য সবথেকে বেশি দায়ী।

ID: 1336

Context: সিউডোমোনাস ইনফেকশন বা সংক্রমণ এর প্রধান লক্ষণ ও উপসর্গগুলি

Question: সিউডোমোনাস ইনফেকশন বা সংক্রমণ এর প্রধান লক্ষণ ও উপসর্গগুলি কি?

Answer:

শরীরের কোন অঙ্গটি প্রভাবিত হয়েছে তার উপর নির্ভর করে সিউডোমোনাস সংক্রমণের বিভিন্ন উপসর্গ দেখা যায়, যেমন:

\*মূত্রনালী মূত্রে রক্তের উপস্থিতি, মূত্রত্যাগের সময় জ্বালা ও ব্যথার অনুভূতি, ঘোলা রঙের মূত্র।

\*কানে ব্যথা,

\*শোনার সমস্যা

\*কান থেকে হলুদ/সবুজ ক্ষরণ এবং কানে অস্বস্তি বা চুলকানি।

\*মাথা যন্ত্রণা, জ্বর,

\*গলা ব্যথা,

\*ত্বকে ফুসকুড়ি

\*ঘাড়ের লসিকা গ্রন্থি ফুলে ওঠা।

ID: 1337

Context: সিউডোমোনাস ইনফেকশন বা সংক্রমণ এর প্রধান কারণগুলি

Question: সিউডোমোনাস ইনফেকশন বা সংক্রমণ এর প্রধান কারণগুলি কি?

Answer:

যে কারণগুলি একজন ব্যক্তির মধ্যে সিউডোমোনাস সংক্রমণের প্রবণতা বৃদ্ধি করে সেগুলি নিচে দেওয়া হল:অস্ত্রোপচার বা পোড়ার ক্ষত।

ইউরিনারি ক্যাথেটার জাতীয় যন্ত্রের ব্যবহার।

কৃত্রিম শ্বাসযন্ত্র ব্যবহারকারী ব্যক্তি।

কোন রোগ বা ইমিউনোসাপ্রেস্যান্ট থেরাপির ফলে রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা দুর্বল হয়ে যাওয়া।

ID: 1338

Context: সিউডোমোনাস ইনফেকশন নির্ণয় এবং চিকিৎসা

Question: সিউডোমোনাস ইনফেকশন কিভাবে নির্ণয় করা হয় এবং এর চিকিৎসা কি?

Answer:

বিস্তৃত ইতিহাস এবং শারীরিক পরীক্ষার পরে এই সংক্রমণ নির্ণয়ের জন্য সাধারণত টিস্যু বায়োপ্সি, কমপ্লিট ব্লাড কাউন্ট, বুকের এক্স-রে, ইউরিন মাইক্রোস্কোপি ও কালচার প্রভৃতি পরীক্ষাগুলি করা হয়ে থাকে। নিচের নির্ণয় প্রক্রিয়াগুলি এই ব্যাকটেরিয়াল সংক্রমণের ক্ষেত্রে কার্যকরী:ফ্লুওরেসিন টেস্ট

উডের অতিবেগুনি আলোর তলায় পর্যবেক্ষণ করলে আক্রান্ত অঞ্চলগুলি জ্বলজ্বল করবে।

পায়োসায়ানিন ফরমেশন

বেশিরভাগ ক্ষেত্রে পায়োসায়ানিন তৈরি হয় যার ফলে পুঁজের রং হয় নীলচে সবুজ।সিউডোমোনাস সংক্রমণের চিকিৎসা হল:ক্ষতের ডিব্রাইডমেন্ট (মৃত টিস্যু সরিয়ে ফেলা)।

ইমিউনোথেরাপি, এর মধ্যে আছে টিকাকরণ।

অ্যান্টিবায়োটিক জাতীয় ওষুধ। সাধারণত যে অ্যান্টিবায়োটিকগুলি দেওয়া হয় তা হল:

কারবেনিসিলিন

টবরামাইসিন

জেন্টামাইসিন

সিলভার সালফাডায়াজিন

সিপ্রোফ্লক্সাসিনসিউডোমোনাস সংক্রমণ প্রতিরোধের উপায়গুলি হল:যথাযথ নির্বিজকরণ প্রণালী মেনে চলা।

যথাযথ বিচ্ছিন্নকরণ পদ্ধতির ব্যবহার।

ক্যাথেটার ও অন্যান্য যন্ত্রগুলিকে পর্যাপ্ত পরিমাণে পরিষ্কার রাখা।

ক্ষতের চিকিৎসায় টপিক্যাল অ্যান্টিব্যাকটেরিয়াল ক্রিম ও লোশনের ব্যবহার।

ID: 1359

Context: পলিসিস্টিক ওভারিয়ান সিনড্রোম (পিসিওএস

Question: পলিসিস্টিক ওভারিয়ান সিনড্রোম (পিসিওএস) কাকে বলে?

Answer:

মহিলাদের মধ্যে হরমোনের ভারসাম্যহীনতার কারণে সৃষ্ট একগুচ্ছ উপসর্গের সমষ্টিকে বলে পলিসিস্টিক ওভারিয়ান সিনড্রোম, যাকে ছোট করে পিসিওএস বলা হয়। এটি সাধারণত 18-35 বছর বয়সী প্রজনন বয়সের সময়ের মধ্যে যে মহিলারা আছেন তাদের মধ্যে দেখতে পাওয়া যায়। রোগটির একটি বিশিষ্ট উপসর্গ থেকে এর নামের উৎপত্তি হয়েছে। আক্রান্ত রোগিণীর অন্তত একটি ওভারি বা ডিম্বাশয়ে 12 বা তার বেশি ফলিকল তৈরি হয় (সবসময় নয়), এবং ফলিকল স্টিমুলেটিং হরমোন (এফ এস এইচ) ও লিউটিনাইজিং হরমোন (এল এইচ) প্রভৃতি হরমোনের মাত্রায় পরিবর্তন দেখা যায়।

ID: 1360

Context: পলিসিস্টিক ওভারিয়ান সিনড্রোম (পিসিওএস] এর প্রধান লক্ষণ ও উপসর্গগুলি

Question: পলিসিস্টিক ওভারিয়ান সিনড্রোম (পিসিওএস] এর প্রধান লক্ষণ ও উপসর্গগুলি কি?

Answer:

এই রোগের উপসর্গগুলি হলো- এমেনোরিয়া যার অর্থ হলো ঋতুস্রাব না হওয়া।

\* ডিসমেনোরিয়া যার অর্থ হলো যন্ত্রণাদায়ক ঋতুস্রাব।

\* অনিয়মিত ঋতুস্রাব।

\* হিরসুটিজম যার অর্থ হলো দেহে ও মুখে অতিরিক্ত লোমের উপস্থিতি।

পিম্পল বা ব্রণ।

\* কোমরের কাছে ব্যথা।

\* গর্ভধারণের সমস্যা।

\* স্থূলত্ব, যাতে পেটে চর্বিসঞ্চয়ের সম্ভাবনা থাকে।

\* পেরিফেরাল ইনসুলিন প্রতিরোধ।

\* বন্ধ্যাত্ব।

রোগীর পরিবারে মাসিকসংক্রান্ত সমস্যা, এড্রেনাল এনজাইমের অভাব, বন্ধ্যাত্ব, স্থূলত্ব এবং মেটাবলিক সিনড্রোম বা ডায়াবিটিসের ইতিহাস থাকতে পারে। অথবা, রোগী অতিরিক্ত রক্তপাত বা দীর্ঘস্থায়ী ঋতুস্রাবের অভিযোগ করতে পারে।

ID: 1361

Context: পলিসিস্টিক ওভারিয়ান সিনড্রোম (পিসিওএস] এর প্রধান কারন গুলি

Question: পলিসিস্টিক ওভারিয়ান সিনড্রোম (পিসিওএস] এর প্রধান কারন গুলি কি কি ?

Answer:

পিসিওএস রোগটির জিনগত প্রবণতা দেখতে পাওয়া যায়, এবং বাবা ও মা দুজনের থেকেই অটোজমাল ডমিনেন্ট জিন হিসাবে এটি পরবর্তী প্রজন্মে বাহিত হয়। রোগীদের শরীরে অধিক মাত্রায় এন্ড্রোজেন (পুরুষ হরমোন) উপস্থিত থাকে, বিশেষত টেস্টোস্টেরন। এই হরমোনগুলি ডিম্বাণুচক্রের বিন্যাসে ব্যাঘাত ঘটায় এবং বিভিন্ন উপসর্গের সৃষ্টি করে। হরমোনগুলির ফলে ফলিকলের বিকাশ বাধাপ্রাপ্ত হয়। এই অপরিণত ফলিকলের জন্যই ডিম্বাশয়কে দেখে মনে হয় তা তরলপূর্ণ সিস্টে ভর্তি।

ID: 1362

Context: কিভাবে পলিসিস্টিক ওভারিয়ান সিনড্রোম (পিসিওএস] নির্ণয় করা হয় এবং এর চিকিৎসা

Question: কিভাবে পলিসিস্টিক ওভারিয়ান সিনড্রোম (পিসিওএস] নির্ণয় করা হয় এবং এর চিকিৎসা কি?

Answer:

এই রোগটি নির্ণয়ের জন্য পুঙ্খানুপুঙ্খ চিকিৎসার ইতিহাস সংগ্রহ ও শারীরিক পরীক্ষার দরকার। ল্যাবরেটরি পরীক্ষার মধ্যে আছে থাইরয়েডের ক্রিয়ার পরীক্ষা; এফএসএইচ, প্রোলাক্টিন এবং এলএইচ মাত্রা; টেস্টোস্টেরন ও রক্তশর্করার মাত্রা। এগুলির আগে, আল্ট্রাসোনোগ্রাফীর মত নন-ইনভেসিভ ইমেজিং প্রক্রিয়া ব্যবহার করা যেতে পারে। ডিম্বাশয়ে সিস্টগুলির উপস্থিতি দেখতে লাগে অনেকটা মুক্তোর মালার মত।

এর চিকিৎসা হল রোগীকে আরো স্বাস্থ্যকর জীবনযাপনে উৎসাহী করে তোলা। স্বাস্থ্যকর খাদ্যাভ্যাস, ওজনহ্রাস, নিয়মিত শরীরচর্চা প্রভৃতি পরিবর্তনের মাধ্যমে হরমোনের ভারসাম্য ফিরিয়ে আনতে সাহায্য করে। এছাড়াও চিকিৎসক হরমোন থেরাপির নির্দেশ দিতে পারেন। প্রাকডায়াবিটিস অথবা ইনসুলিন প্রতিরোধের ক্ষেত্রে মেটফর্মিন জাতীয় ইনসুলিন সেনসিটাইজিং ওষুধও সাহায্য করে।

ID: 1363

Context: ব্রণ (পিম্পল)

Question: ব্রণ (পিম্পল) কি?

Answer:

ব্রণ হল ত্বকের সাধারণ একটি সমস্যা, এর বৈশিষ্ট্য হল ক্ষত সৃষ্টি করা যা পিম্পল এবং ব্ল্যাকহেড বা হোয়াইটহেড নামেও পরিচিত যাতে খুব সাধারণত মুখ,কাঁধ, গলা, পিঠ এবং বুক আক্রান্ত হয়। এই সমস্যার কারণে স্থায়ী দাগ থেকে যেতে পারে ত্বকের উপরে এবং ত্বকের রুপ নষ্ট করে দেয় যদিও এটি স্বাস্থ্যের গুরুত্বর কোন ক্ষতি করে না। ব্রণ বিশেষ করে মহিলাদের মধ্যে এবং বিশেষত বয়ঃসন্ধিকালে দেখা যায়।

ID: 1364

Context: ব্রণ (পিম্পল) প্রধান লক্ষণ এবং উপসর্গগুলি

Question: ব্রণ (পিম্পল) প্রধান লক্ষণ এবং উপসর্গগুলি কি কি?

Answer:

যেসকল আকারে ব্রণ ত্বকে প্রকাশ পায় সেগুলি হল:হোয়াইটহেড বা ব্ল্যাকহেড বা ছোট ফোলাভাব (প্যাপুলস) সৃষ্টি।

একটি ছোট ফুসকুড়ি (পাস্টুল) বা নীচের দিকে লালচে রঙের এরকম ব্রণ এবং যাতে পূঁয ভর্তি থাকে।

যন্ত্রণাদায়ক ছোট গোলাকার পিন্ড (গুটি) যা ত্বকের গভীরে অবস্থিত এবং ক্ষতচিহ্নের সৃষ্টি করে।

গর্ত বা সিস্ট যা মূলত পুঁজ দিয়ে ভর্তি থাকে এবং নিরাময় হয়ে ত্বকে ক্ষতচিহ্ন তৈরী করতে পারে।

ID: 1365

Context: ব্রণ (পিম্পল) প্রধান কারণগুলি

Question: ব্রণ (পিম্পল) প্রধান কারণগুলি কি কি?

Answer:

একাধিক কারণ রয়েছে ব্রণ হওয়ার জন্য, সেগুলি হল:পি.অ্যাকনেস ব্যাকটেরিয়ার দ্রুত বৃদ্ধি।

পুরুষ (অ্যান্ড্রোজেন) এবং মহিলাদের (ইস্ট্রোজেন) শরীরে যৌন হরমোনের পরিবর্তন, ফলে লোমকূপে প্রদাহ তৈরী হয় এবং প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি হয়।

জন্মনিয়ন্ত্রক ওষুধের ব্যবহারের পরিবর্তন (শুরু করা বা বন্ধ করা) এবং গর্ভাবস্থার কারণে শরীরে হরমোনের পরিবর্তন হয়।

পলিসিস্টিক ওভারিয়ান রোগ (পিসিওডি)।

জীবনশৈলীগত কারণগুলি হল:

\* মানসিক চাপ।

\* অস্বাস্থ্যকর খাদ্যতালিকা।

\* শরীরচর্চার অভাব।

ID: 1366

Context: ব্রণ (পিম্পল) নির্ণয়

Question: ব্রণ (পিম্পল) কিভাবে নির্ণয় করা হয়?

Answer:

আক্রান্ত অংশের সম্পূর্ণ পরীক্ষা ব্রণ নির্ণয়ে সাহায্য করে। ব্রণ হওয়ার কারণ নির্ণয় করার জন্য নীচে উল্লেখিত পরীক্ষার পরামর্শ দেওয়া হয়:

রক্ত পরীক্ষা, পাশাপাশি পিসিওএস সনাক্ত করার জন্য আল্ট্রাসাউন্ড স্ক্যানের ব্যবহার।ব্রণ নিরাময় করতে দীর্ঘ চিকিৎসা চালাতে হয় যেখানে সেরে উঠতে অনেক সময় লাগে এবং মূলত প্রয়োজন ঠিকমত ত্বকের যত্ন নেওয়া।ব্রণ নিয়ন্ত্রণ করতে কার্যকর কিছু পদ্ধতি চিকিৎসক নির্ধারণ করেন, যেগুলি হল:অ্যান্টিবায়োটিকের ব্যবহার : যা সেবনের মাধ্যমে বা সাময়িকভাবে ( সরাসরি ত্বকে প্রয়োগ করা) প্রয়োগের দ্বারা ত্বকে প্রদাহের প্রভাব কমাতে এবং ব্রণ সৃষ্টিকারী ব্যাকটেরিয়া কমাতে সাহায্য করে।

স্যালিসিলিক অ্যাসিড এবং বেনজয়েল পারক্সাইডের সাময়িক প্রয়োগ হালকা ব্রণর চিকিৎসায় সাধারণত ব্যবহৃত হয়।

আইসোট্রেটিনোইন ট্যাবলেট: গুরুতর ব্রণর ক্ষেত্রে এটির ব্যবহার সর্বাধিক ফলপ্রসু চিকিৎসা, লোমকূপকে উন্মুক্ত করতে এবং পুনরায় প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি হওয়া প্রতিরোধ করতে ব্যবহৃত হয়, যার ফলে তৈলাক্তভাব কম হয় এবং ত্বককে শীতলতা প্রদান করে।

আলো বা বায়োফোটোনিক থেরাপি ব্যবহার করা হয় হালকা থেকে মাঝারি প্রদাহজনক ব্রণের চিকিৎসায়।

হরমোন- নিয়ন্ত্রণ থেরাপি যেখানে ইস্ট্রোজেনের মাত্রা লঘু থেকে লঘুতর থাকে এবং মহিলাদের ব্রণের চিকিৎসায় এন্ড্রোজেননাশক গর্ভনিরোধক ওষুধ দেওয়া হয়ে থাকে।

সাময়িকভাবে বা সেবনের দ্বারা রেটিনোয়েডের ব্যবহার লোমকূপ উন্মুক্ত করতে এবং পাশাপাশি নতুন প্রতিবন্ধকতা দূর করার চিকিৎসায় ব্যবহার হয়।

রেটিনয়েড সাথে বেনজয়েল পারক্সাইডের সংযোজিত থেরাপিও ব্যবহার করা যেতে পারে।

ID: 1367

Context: ব্রণ (পিম্পল) কিভাবে নির্ণয়

Question: ব্রণ (পিম্পল) কিভাবে নির্ণয় কি কি ?

Answer:

হালকা ‘সাবান মুক্ত’ মুখে ব্যবহারের ক্লেনজার দিয়ে প্রতিদিন দুবার মুখ পরিষ্কার করা।

মুখ পরিষ্কার করার জন্য পছন্দ করুন এমন ক্লেনজার যাতে রুক্ষ পদার্থ (ক্ষয়কারী ঘর্ষক) এবং অ্যালকোহল ব্যবহার করা হয় নি।

মুখ পরিষ্কার করার ক্লেনজারে পিএইচ মাত্রা সঠিক অনুপাতে থাকতে হবে।

ত্বকের ক্ষুদ্র গর্ত (লোমকূপ) বন্ধ করে না এমন পরীক্ষিত এবং যাচাই করা দ্রব্য ব্যবহার করা উচিত।

ID: 1368

Context: ব্রণ (পিম্পল) নির্ণয় এবং চিকিৎসা

Question: কিভাবে ব্রণ (পিম্পল) নির্ণয় করা হয় এবং এর চিকিৎসা কি?

Answer:

একজন বিশেষজ্ঞ বর্তমান উপসর্গ ও নাসিকাগহ্বর বা নাকের ভিতরটি পরীক্ষা করার পরেই নির্ণয় করতে সক্ষম হন রোগটির। অধিকাংশ ব্রণ কিছুদিন পর, নিজে থেকেই ভালো হয়ে যায়। ব্রণ ভালো হতে 7-10 দিন সময় লাগতে পারে। তবে, যদি স্থানটিতে পুঁয হয়, বা ব্যক্তির শরীরে যদি জ্বর থাকে তাহলে চিকিৎসকের পরামর্শ নেওয়া দরকার। বিশেষত 5 দিন অ্যান্টিবায়োটিক খেতে দেওয়া হয় এক্ষেত্রে। অধিকাংশ ক্ষেত্রে অ্যান্টিবায়োটিকের দ্বারাই এটি ভালো হয় যায় ,তবে,কিছু ক্ষেত্রে পুঁজ বের করতে হয়। চিকিৎসা না হলে সংক্রামিত ফুসকুড়ি ঝুঁকিপূর্ণ হতে পারে ও যেহেতু মস্তিষ্কের সাথে কিছু নাকের শিরা যুক্ত তাই, রক্ত জমাট বাঁধার সমস্যা হতে পারে। বার বার নাকে খোঁচানো এড়িয়ে চলা, একজন অভিজ্ঞ ব্যক্তির সাহায্যে শরীরের লোম তোলা, ব্যথা কমানোর জন্য গরম সেঁক নেওয়া, প্রাথমিকভাবে নাকের ভিতর নারকেল তেল দেওয়া যাতে স্বস্তি বা আরাম পাওয়া যায় প্রভৃতি হল নিজস্ব কিছু যত্ন নেওয়ার উপায়সমূহ।

ID: 1381

Context: পেলাগ্রা

Question: পেলাগ্রা কাকে বলে?

Answer:

পেলাগ্রা একপ্রকার পুষ্টিজনিত অসুখ যা নিয়াসিনের (ভিটামিন বি কমপ্লেক্স শ্রেণীর একটি ভিটামিন) অভাবে ঘটে। অপর্যাপ্ত খাদ্যগ্রহণ বা পাকতন্ত্রে ত্রুটিপূর্ণ শোষণের ফলে নিয়াসিনের অভাব ঘটতে পারে। এটি একটি সামগ্রিক অসুস্থতা যা ত্বক, পাকনালি ও স্নায়ুতন্ত্রকে প্রভাবিত করে। রোগটির প্রভাব মূলত এদের মধ্যে দেখতে পাওয়া যায় কারণ এই টিস্যুগুলিতে গুরুতর কোষ বিপর্যয় ঘটে।

ID: 1382

Context: পেলাগ্রার এর প্রধান লক্ষণ ও উপসর্গগুলি

Question: পেলাগ্রার এর প্রধান লক্ষণ ও উপসর্গগুলি কি?

Answer:

পেলাগ্রার সবথেকে পরিচিত উপসর্গগুলিকে প্রায়শই 3ডি নামে ডাকা হয়, এগুলি হল ডায়রিয়া, ডিমেনশিয়া এবং ডার্মাটাইটিস। ডার্মাটাইটিস অনেকটা রোদে পোড়ার মত দেখতে হয়, এবং সূর্যের সংস্পর্শে এটি বৃদ্ধি পায়। এতে আক্রান্ত ত্বকে লালভাব এবং চুলকানি থাকে। এর প্রভাব দেহের দুইপাশে সুষমভাবে দেখতে পাওয়া যায়। পাকতন্ত্র সম্পর্কিত উপসর্গগুলি হল পেটে অস্বস্তি, বমিভাব, ডায়রিয়া যাতে জলের মতো, বিরল ক্ষেত্রে রক্তসহ, পায়খানা হয়। স্নায়ুতন্ত্রের উপসর্গগুলি হল বিভ্রান্তি, স্মৃতি লোপ, ডিপ্রেশন বা অবসাদ, এবং কিছু ক্ষেত্রে হ্যালুসিনেশন। রোগটি যত অগ্রসর হয় রোগী ক্রমশ বিচলিত ও বিকারগ্রস্ত হয়ে ওঠে, চিকিৎসা না করলে এর ফলে মৃত্যুও ঘটতে পারে।

ID: 1383

Context: পেলাগ্রার এর প্রধান কারণগুলি

Question: পেলাগ্রার এর প্রধান কারণগুলি কি?

Answer:

পেলাগ্রা প্রধানত খাদ্যে নিয়াসিনের অভাবের কারণে ঘটে। এটি সাধারণত হায়দ্রাবাদে বসবাসকারী দরিদ্র মানুষদের মধ্যে দেখতে পাওয়া যায় যাদের মূল খাদ্য জোয়ার। জোয়ার একটি ভুট্টাজাতীয় খাদ্য যা শরীরে নিয়াসিনের শোষণে বাধা দেয়। এই রোগটির গৌণ কারণের মধ্যে আছে পাচনতন্ত্রের কিছু সমস্যা যাতে যথেষ্ট পরিমাণ নিয়াসিন গ্রহণ করলেও তার শোষণ হয়না। এছাড়াও মদ্যপান, কিছু ওষুধের ব্যবহার এবং লিভার ক্যান্সারও এই সমস্যার কারণ হতে পারে।

ID: 1384

Context: পেলাগ্রার নির্ণয় এবং চিকিৎসা

Question: কিভাবে পেলাগ্রার নির্ণয় করা হয় এবং এর চিকিৎসা কি?

Answer:

পেলাগ্রা নির্ণয়ের জন্য কোন নির্দিষ্ট ল্যাবরেটরি পরীক্ষা নেই। সুতরাং এর নির্ণয় নির্ভর করে রোগীর ইতিহাস, ভৌগোলিক অবস্থান ও প্রেক্ষাপটের উপর। কোন কোন ক্ষেত্রে মূত্র পরীক্ষায় ক্ষয়প্রাপ্ত নিয়াসিনের বর্জ্য পদার্থ পাওয়া যায় যা এই রোগের নির্ণয়ে সাহায্য করতে পারে।পেলাগ্রার চিকিৎসার জন্য এর কারণগুলির চিকিৎসা করা প্রয়োজন। অপর্যাপ্ত খাদ্যগ্রহণের ফলে হওয়া পেলাগ্রা নিয়াসিন সরবরাহের মাধ্যমে সহজেই নিরাময় সম্ভব। চিকিৎসা শুরুর কয়েক দিন থেকে কয়েক সপ্তাহের মধ্যে রোগীর অবস্থার উন্নতি দেখা যায়। কিন্তু ত্বকের সমস্যার উপশমে একাধিক মাস লেগে যায়। নিজের যত্ন নেওয়ার জন্য রোগীর কিছু নির্দিষ্ট পদ্ধতি অনুসরণ করা প্রয়োজন, যেমন ত্বককে নিয়মিত আর্দ্র রাখা এবং বাইরে বেরোলে সবসময় সানস্ক্রিনের ব্যবহার করা। অন্যান্য কারণে সৃষ্ট পেলাগ্রার সেই অনুযায়ী চিকিৎসা হয়, তবে ইনট্রাভেনাস নিয়াসিন প্রয়োগ এদের ক্ষেত্রেও উপকারী। এই রোগের ফলে মৃত্যু ঘটতে পারে যদি 4-5 বছর একে অবহেলা করা হয়।

ID: 1393

Context: ওভার অ্যাক্টিভ ব্লাডার সিন্ড্রোম বা অতিসক্রিয় মূত্রাশয় রোগ

Question: ওভার অ্যাক্টিভ ব্লাডার সিন্ড্রোম বা অতিসক্রিয় মূত্রাশয় রোগ কি?

Answer:

অতিসক্রিয় মূত্রাশয় রোগ বলতে সেই অবস্থাকে বোঝায়, যেখানে কোনও ব্যক্তি মূত্র ত্যাগ করার হঠাৎ এবং অনিবার্য তাড়না অনুভব করেন। এই তাড়না দিনে যেকোনও সময় অনুভূত হতে পারে। এই রোগটি খুবই সাধারণ এবং কোনও ব্যক্তির দৈনিক জীবনে অসুবিধা এবং সামাজিক পরিস্থিতিতে অস্বস্তির সৃষ্টি করতে পারে।

ID: 1394

Context: ওভার অ্যাক্টিভ ব্লাডার সিন্ড্রোম বা অতিসক্রিয় মূত্রাশয় রোগ এর প্রধান লক্ষণ এবং উপসর্গগুলি

Question: ওভার অ্যাক্টিভ ব্লাডার সিন্ড্রোম বা অতিসক্রিয় মূত্রাশয় রোগ এর সাথে জড়িত প্রধান লক্ষণ এবং উপসর্গগুলি কি কি?

Answer:

অতিসক্রিয় মূত্রাশয় রোগে নিন্মলিখিত উপসর্গগুলি লক্ষ্য করা যেতে পারে:মূত্রত্যাগের করার তীব্র তাড়না: এই তাড়না অনিবার্য হতে পারে এবং চেপে রাখা খুবই কঠিন। এর ফলে অনিচ্ছাকৃতভাবে কিছুটা প্রস্রাব বেরিয়ে যায়, যা আর্জেন্সি ইউরিনারি ইনকন্টিনেন্স নামে পরিচিত।

বারবার প্রস্রাব করা: অতিসক্রিয় মূত্রাশয়ের কারণে কোনও ব্যক্তির স্বাভাবিকের চেয়ে বেশিবার প্রস্রাব হতে পারে। (আরও পড়ুন: বারবার মূত্রত্যাগ করার কারণ এবং প্রতিকার)।

ঘুমে ব্যাঘাত: হঠাৎ করে মূত্রত্যাগ করার তাড়নার ফলে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিকে রাত্রিবেলা বারবার ঘুম থেকে উঠতে হতে পারে। এতে ঘুমে ব্যাঘাত ঘটতে পারে।

যদি সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি মানসিক চাপ ও উদ্বিগ্নতা উপলব্ধি করেন তাহলে অতিসক্রিয় মূত্রাশয় রোগ আরও খারাপ আকার নিতে পারে।

ID: 1395

Context: ওভার অ্যাক্টিভ ব্লাডার সিন্ড্রোম এর প্রধান কারণ

Question: ওভার অ্যাক্টিভ ব্লাডার সিন্ড্রোম এর প্রধান কারণ কি?

Answer:

অতিসক্রিয় মূত্রাশয় রোগের অন্তর্র্নিহিত কারণ মূত্রাশয়ের পেশীগুলির অতিরিক্ত সংকোচন, যা বারবার প্রস্রাব করার তাড়না উৎপন্ন করে। তবে, ঠিক কি কারণে পেশীগুলির সংকোচনে অস্বাভাবিকতা আসে, তা এখনও পরিষ্কার নয়।দেখা গিয়েছে, এই রোগে আক্রান্ত ব্যক্তিদের মূত্রাশয় মস্তিস্কে বার্তা পাঠাতে পারে যে মূত্রাশয় বরে উঠেছে, কিন্তু আদৌ তা ভর্তি হয়নি।কিছু কিছু ক্ষেত্রে, অতিসক্রিয় মূত্রাশয় রোগ মস্তিষ্কের কোনও রোগের কারণে হতে পারে, যেমন:পারকিনসন রোগ।

মাল্টিপল স্ক্লেরোসিস।

সুষুম্নাকাণ্ডে আঘাত।

ID: 1396

Context: অতিসক্রিয় মূত্রাশয় রোগ নির্ণয় এবং চিকিৎসা

Question: অতিসক্রিয় মূত্রাশয় রোগ কিভাবে নির্ণয় এবং চিকিৎসা করা হয়?

Answer:

অতিসক্রিয় মূত্রাশয় রোগ নির্ণয়ের জন্য চিকিৎসক সাধারণত উপসর্গ সম্পর্কে জানতে চান এবং তারপর সংক্রমণের কোনও লক্ষণ আছে কিনা তা জানতে, শারীরিক পরীক্ষা করেন অথবা মূত্র পরীক্ষা করান। মূত্র প্রবাহের গতি এবং সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি মূত্রাশয় সম্পূর্ণরূপে খালি করছে কিনা, তা মূল্যায়ন করার জন্য ফ্লো টেস্ট করা হতে পারে।এই রোগের চিকিৎসার জন্য ব্লাডার ট্রেনিং করানো হয়, এর ফলে কোনও ব্যক্তি মূত্রাশয়ের গতিবিধির উপর কিছু মাত্রায় নিয়ন্ত্রণ আনতে পারেন এবং মূত্রত্যাগের তাড়নাকে খানিকটা বিলম্বিত করা যায়। ওষুধ দেওয়া হতে পারে, কিন্তু পেলভিক ব্যায়াম করা, ক্যাফেন ও অ্যালকোহল বর্জন আর অতিরিক্ত ওজন কমানোর মতো জীবনযাত্রায় কিছু পরিবর্তন এই রোগের পরিচালনায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।কিছু ক্ষেত্রে সার্জারি সুপারিশ করা যেতে পারে।

ID: 1405

Context: নিউরোএন্ডোক্রাইন টিউমার

Question: নিউরোএন্ডোক্রাইন টিউমার কি ?

Answer:

নিউরোএন্ডোক্রাইন টিউমার কার্সিনয়েড নামেও পরিচিত, একাধিক কোষের এই টিউমার হরমোন নিঃসরণের পাশাপাশি স্নায়ুর বৈশিষ্ট্যসূচক, এদের নিউরোএন্ডোক্রাইন কোষ বলা হয়। এই টিউমারের বৃদ্ধি খুব ধীরে হয়। শরীরের যে কোনও অঙ্গে এটি বিকশিত হতে পারে। এটি ম্যালিগন্যান্ট (ক্যান্সারযুক্ত) অথবা বিনাইন (ক্যান্সারবিহীন) হতে পারে।

ID: 1406

Context: নিউরোএন্ডোক্রাইন টিউমার এর প্রধান লক্ষণ ও উপসর্গগুলি

Question: নিউরোএন্ডোক্রাইন টিউমার এর প্রধান লক্ষণ ও উপসর্গগুলি কি কি?

Answer:

টিউমারের অবস্থানের ওপর নির্ভর করে উপসর্গ ভিন্ন হতে পারে। অবস্থান নির্বিশেষে নিচে কিছু সাধারণ উপসর্গ উল্লেখ করা হল, যা অবস্থান নির্বিশেষে হয়:গরম বের হওয়া (মুখ ও ঘাড়ে ঘাম ছাড়াই)।

ডায়রিয়া।

শ্বাস নিতে অসুবিধা।

উচ্চ রক্তচাপ।

ক্লান্তি, দুর্বলতা।

তলপেটে ব্যথা, টান ধরা, পেটভার অনুভব।

অস্বাভাবিকভাবে ওজন বৃদ্ধি অথবা হ্রাস।

শ্বাসের সময় সাঁইসাঁই শব্দ, কাশি।

পায়ের পাতা ও গোড়ালিতে ফোলাভাব।

চামড়ায় ক্ষত, চামড়ায় ফ্যাকাশে ছোপ।

রক্তে শর্করার মাত্রা বেশি অথবা কম।

ID: 1407

Context: নিউরোএন্ডোক্রাইন টিউমার এর প্রধান কারণগু

Question: নিউরোএন্ডোক্রাইন টিউমার এর প্রধান কারণগুলি কি কি?

Answer:

নিউরোএন্ডোক্রাইন টিউমারের সঠিক কারণ এখনও জানা যায়নি। নিউরোএন্ডোক্রাইন টিউমারের বিকাশের সম্ভাবনা বৃদ্ধি পায় যদি নিম্নোলিখিত বংশগত অবস্থাগুলি থাকে:মাল্টিপল এন্ডোক্রাইন নিওপ্লাসিয়া টাইপ 1।

নিউরোফাইব্রোমাটোসিস টাইপ 1।

ভন হিপেল-লিনডাউ সিন্ড্রোম।

ID: 1408

Context: নিউরোএন্ডোক্রাইন টিউমার নির্ণয় ও চিকিৎসা

Question: কিভাবে নিউরোএন্ডোক্রাইন টিউমার নির্ণয় ও চিকিৎসা করা হয়?

Answer:

নিউরোএন্ডোক্রাইন রোগের নির্ণয় করা হয় নিম্নলিখিত পরীক্ষাগুলির মাধ্যমে করা হয়:রক্ত পরীক্ষা।

টিস্যুর বায়োপসি।

জিনগত পরীক্ষা এবং কাউন্সেলিং।

স্ক্যান, যার মধ্যে রয়েছে:

আলট্রাসাউন্ড

কম্পিউটারাইজড টোমোগ্রাফি

ম্যাগনেটিক রিজোনেন্স ইমেজিং

পজিট্রন এমিসন টোমোগ্রাফি

অক্ট্রিওটাইড স্ক্যান - এই ধরনের স্ক্য়ানে একটি মৃদু তেজস্ক্রিয় তরল শিরার মধ্যে ইনজেকশন দিয়ে প্রবেশ করানো হয় এবং ক্যামেরার সাহায্যে ক্যান্সারযুক্ত কোষগুলি সনাক্ত করা হয়

লেপ্রস্কপি

নিউক্লিয়ার মেডিসিন ইমেজিংঅবস্থান, টিউমারের প্রবলতা এবং রোগীর সামগ্রিক স্বাস্থ্যের উপর নিউরোএন্ডোক্রাইন রোগের চিকিৎসা নির্ভর করে। এই রোগের জন্য যে চিকিৎসাগুলি উপলব্ধ, তা হল:অস্ত্রোপ্রচার: স্থানীয় কোনও অঙ্গে হওয়া বা লোকালাইজড টিউমার অস্ত্রোপ্রচার করে বাদ দেওয়া যেতে পারে এবং এটি চিকিৎসার প্রথম ধাপ হিসেবে বিবেচিত।

কেমোথেরাপি, হরমোন থেরাপি/ও টার্গেটেড থেরাপি ব্যবহৃত হয় জটিল ও গুরুতর নিউরোএন্ডোক্রাইন টিউমারের চিকিৎসায়।

ওষুধ প্রয়োগ: সোমাটোস্ট্যাটিন অ্যানালগ (অস্ট্রিওটাইড বা ল্যানরিওটাইড) অনেক হরমোনের বৃদ্ধি আটকে দেয় এবং উপসর্গগুলির তীব্রতা হ্রাস করে রোগের অগ্রগতিকে ত্বরান্বিত করে দেয়।

রেডিওথেরাপি: এক্স-রে অথবা গামা রশ্মির সাহায্যে রক্ত সরবরাহ বন্ধ করে দিয়ে টিউমার হ্রাস করা করা অথবা তার বৃদ্ধি আটকে দেওয়া হয়।

ID: 1409

Context: স্নায়ুর দুর্বলতা

Question: স্নায়ুর দুর্বলতা কি ?

Answer:

স্নায়ু আপনার শরীরে সংকেত প্রেরণের কাজ করে। স্নায়ু রোগ অথবা স্নায়ুতে আঘাত, তার স্বাভাবিক কাজকর্মের ওপর প্রভাব ফেলে এবং তার ফলে স্নায়ুর দুর্বলতা দেখা দেয়। স্নায়ুর দুর্বলতা আপনার শরীরের অংশগুলির কার্যকারিতার বিস্তৃত পরিসরের উপর প্রভাব ফেলে এবং এর ফলে সেগুলি বিকলাঙ্গ অবস্থায় পৌঁছাতে পারে।

ID: 1410

Context: স্নায়ুর দুর্বলতার প্রধান লক্ষণ ও উপসর্গগুলি

Question: স্নায়ুর দুর্বলতার প্রধান লক্ষণ ও উপসর্গগুলি কি কি ?

Answer:

স্নায়ুর দুর্বলতার প্রধান লক্ষণ ও উপসর্গগুলি নিম্নলিখিত:ব্যথা।

তীক্ষ্ণ কিছু ফোটা বা সুড়সুড়ির মতো অনুভূতি।

সংবেদনশীলতা।

সংবেদনের অনুভূতি।

ক্লান্তি।

পেশীতে দুর্বলতা।

ফুট ড্রপ (পায়ের সামনের অংশ উঁচু করতে অক্ষ্মতা)।

ID: 1411

Context: স্নায়ুর দুর্বলতার প্রধান কারণগুলি

Question: স্নায়ুর দুর্বলতার প্রধান কারণগুলি কি কি?

Answer:

স্নায়ুর দুর্বলতার অসংখ্য অন্তর্নিহিত কারণ থাকতে পারে। সেগুলি হল:স্নায়ুতে আঘাত।

ডায়াবেটিস।

এইচআইভি সংক্রমণ।

মাল্টিপল স্ক্লেরোসিস।

ক্যান্সার চিকিৎসা।

টিউমার ও ভাস্কুলেচার (রক্তবাহিকা)-এর কারণে স্নায়ু সংকোচন।

পারকিনসন রোগ।

স্ট্রোক।

কুষ্ঠ।

ID: 1412

Context: স্নায়ুর দুর্বলতা নির্ণয় ও চিকিৎসা

Question: কিভাবে স্নায়ুর দুর্বলতা নির্ণয় ও চিকিৎসা করা হয় ?

Answer:

এর লক্ষণ ও উপসর্গগুলি নির্দেশ করে যে এটি স্নায়ুতন্ত্রের সাথে জড়িত। তবে, স্নায়ুর দুর্বলতার উপসর্গ খুব সুস্পষ্ট নয়; তাই চিকিৎসাগতভাবে রোগ নির্ণয় করা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। আপনার চিকিৎসাজনিত, পরিবারিক ও পেশাগত ইতিহাস গুরুত্বপূর্ণ তথ্য দিতে পারে ডাক্তারকে, যা অন্তর্নিহিত কারণ নির্ণয়ে সাহায্য করতে পারে। নিম্নলিখিত রোগ নির্ণয় পরীক্ষাগুলি করা হতে পারে:ইলেক্ট্রোডায়গনস্টিক টেস্টস।

সেনসরি অ্যান্ড মোটর নার্ভ কন্ডাকশন।

এফ রেসপন্স।

এইচ রিফলেক্স।

নিডল ইলেক্ট্রোমায়োগ্রাফি।

রক্ত পরীক্ষা।

অটোইমিউন ডিসঅর্ডার।

এইচআইভি।

সিএসএফ পরীক্ষা (সেরিব্রোস্পাইনাল ফ্লুয়িড)।স্নায়ুর দুর্বলতা এক বা একাধিক অন্তর্নিহিত অবস্থার বা ব্যাধির ফলে হতে পারে। তাই, চিকিৎসা মূলত অন্তর্নিহিত কারণগুলির নিরাময়কে লক্ষ্যে রেখে করা হয়। উপলব্ধ চিকিৎসা বিকল্পগুলি নিম্নলিখিত:ব্যথা নিয়ন্ত্রক ওষুধ:ওপিঅয়েডস।

স্টেরয়েড বিহীন প্রদাহ-রোধী ওষুধ (এনএসএআইডিএস)।

ক্যাপসাইসিন প্যাচ।

অ্যান্টি-ডিপ্রেসান্ট বা অবসাদ নিরাময়কারী ওষুধ।

স্নায়ু মেরামত ও উদ্দীপনার জন্য কাইনেটিক থেরাপি।

ইলেক্ট্রোস্টিমুলেশন:

ট্রান্সকুটানিয়াস ইলেক্ট্রোস্টিমুলেশন (টিসিইএস)।

ইলেক্ট্রোআকুপাংচার।

ম্যাগনেটোথেরাপি: এনজাইম্যাটিক স্টিমুলেশন, রক্তসঞ্চালন বৃদ্ধির মাধ্যমে পালসড ম্যাগনেটিক ফিল্ড স্নায়ু পুনর্নিমাণ করে।

বায়ো লেসার স্টিমুলেশন: স্নায়ুর মেরামতিতে লেসার রেডিয়েশন ব্যবহৃত হতে পারে।

মুখের পক্ষাঘাতের চিকিৎসায় মুখমণ্ডলের নিউরোমাস্কুলার নিরোধক কৌশল।

পেশী মজবুত করতে ফিজিকাল থেরাপি অনুশালীন।

স্নায়ুকে শান্ত এবং শক্তিশালী করতে যোগা এবং ধ্যান।

অস্ত্রোপ্রচার সংক্রান্ত পদক্ষেপ।স্নায়ুর দুর্বলতার পরিচালনায় স্বাস্থকর জীবনশৈলী ও সুষম খাদ্য গ্রহণ করা গুরুত্বপূর্ণ।

ID: 1413

Context: সর্দি কাশি থেকে প্রতিরোধের উপায়

Question: প্রচুর সর্দি লেগেছে , নাক দিয়ে অনেক পানি ঝরছে , কীভাবে সর্দি দূর করা যায় ?

Answer:

নাক দিয়ে পানি ঝরা, হাঁচি-কাশি, সামান্য জ্বর, ঠান্ডা লাগা-অতি সাধারণ অথচ খুবই ছোঁয়াচে । আবহাওয়া পরিবর্তনের সময় কমবেশি প্রায় সকলেরই এই সমস্যা হয়। তাই, এ থেকে মুক্তির প্রাকৃতিক টিপস্ দেওয়া হল। প্রতিকার:- ১. রাতে শোবার আগে সরষের তেল বা ঘি হালকা গরম করে শুঁকলে সর্দি-ঠান্ডা দূর হয় এবং প্রতিরোধ করে। ২. রাতে খাবার সঙ্গে রসুন খেলেও সর্দি-ঠান্ডা দুর হয়। ৩. সকালে চারটি তুলসী পাতা এবং চারটি গোল মরিচ খেলে ঠান্ডা লেগে আসা জ্বর উপশম হয়। ৪. পুদিনাপাতা, তুলসী পাতা, কাঁচা আদা, মধু মিশিয়ে খেলে ঠান্ডা লাগা দ্রুত ভাল হয়।

ID: 1414

Context: সর্দি কাশি থেকে প্রতিরোধের উপায়

Question: সর্দি কাশি থেকে প্রতিরোধের উপায় কী?

Answer:

১. যাদের ঠান্ডা লেগেছে, তাদের কাছ থেকে দূরে থাকুন। কারণ, এর ভাইরাস নিঃশ্বাসের সঙ্গে, এমনকি হাতের মাধ্যমেও ছড়ায়। ২. পর্যাপ্ত খাওয়া-দাওয়া করলে ও ঘুমালে শরীরে রোগ-প্রতিরোধক্ষমতা বাড়ে। ৩. আপনার ঘরের তাপমাত্রা বেশি শুষ্ক করবেন না ৷ বেশি আর্দ্রও করবেন না। এতে রোগ-প্রতিরোধে সক্ষম হওয়া যায় সহজেই। ৪. নিয়মিত লেবু খান। লেবুতে আছে প্রচুর পরিমানে ভিটামিন সি ৷ যা ঠান্ডা লাগা প্রতিরোধ করে।

ID: 1415

Context: সর্দি কাশি থেকে প্রতিরোধের উপায়

Question: অনেক ঠাণ্ডা লেগেছে, এখন কী করবো?

Answer:

নাক দিয়ে পানি ঝরা, হাঁচি-কাশি, সামান্য জ্বর, ঠান্ডা লাগা-অতি সাধারণ অথচ খুবই ছোঁয়াচে । আবহাওয়া পরিবর্তনের সময় কমবেশি প্রায় সকলেরই এই সমস্যা হয়। তাই, এ থেকে মুক্তির প্রাকৃতিক টিপস্ দেওয়া হল। প্রতিকার:- ১. রাতে শোবার আগে সরষের তেল বা ঘি হালকা গরম করে শুঁকলে সর্দি-ঠান্ডা দূর হয় এবং প্রতিরোধ করে। ২. রাতে খাবার সঙ্গে রসুন খেলেও সর্দি-ঠান্ডা দুর হয়। ৩. সকালে চারটি তুলসী পাতা এবং চারটি গোল মরিচ খেলে ঠান্ডা লেগে আসা জ্বর উপশম হয়। ৪. পুদিনাপাতা, তুলসী পাতা, কাঁচা আদা, মধু মিশিয়ে খেলে ঠান্ডা লাগা দ্রুত ভাল হয়।

ID: 1416

Context: সর্দি কাশি থেকে প্রতিরোধের উপায়

Question: ঠাণ্ডা লাগা থেকে কীভাবে রেহাই পাবো?

Answer:

১. যাদের ঠান্ডা লেগেছে, তাদের কাছ থেকে দূরে থাকুন। কারণ, এর ভাইরাস নিঃশ্বাসের সঙ্গে, এমনকি হাতের মাধ্যমেও ছড়ায়। ২. পর্যাপ্ত খাওয়া-দাওয়া করলে ও ঘুমালে শরীরে রোগ-প্রতিরোধক্ষমতা বাড়ে। ৩. আপনার ঘরের তাপমাত্রা বেশি শুষ্ক করবেন না ৷ বেশি আর্দ্রও করবেন না। এতে রোগ-প্রতিরোধে সক্ষম হওয়া যায় সহজেই। ৪. নিয়মিত লেবু খান। লেবুতে আছে প্রচুর পরিমানে ভিটামিন সি ৷ যা ঠান্ডা লাগা প্রতিরোধ করে।

ID: 1417

Context: সর্দি কাশি থেকে প্রতিরোধের উপায়

Question: ঠান্ডায় নাক বন্ধ হয়ে গেলে কিছুই ভালো লাগে না, এমনকি মুখে কোন খাবারের স্বাদও ঠিক করে ভালো লাগে না, সমাধান কী?

Answer:

কিছু ঘরোয়া উপায় আছে যেসব খুব সহজেই এ বিরক্তি থেকে আমাদের বাঁচাতে পারে। যেমন, ১. উঁচু হয়ে শোন # ঠান্ডা ঠান্ডা আবহাওয়ায় নাক বন্ধ ভাব রোধ করতে শোয়ার সময় মাথাকে উঁচু করে শোবেন। এতে মিউকাস কম তৈরি হয়। সবচেয়ে ভালো হয়, ছাদ বা সিলিংয়ের দিকে মুখ করে শুইলে। ২. পেঁয়াজ # নাক বন্ধ রোধে পেঁয়াজ একটি ভালো সামাধান। পেঁয়াজ নাকের সর্দি বের করে দিতে অনুঘটক হিসেবে কাজ করে। নাকের বন্ধভাব রোধে খোসা ছাড়িয়ে পেঁয়াজ কেটে পাঁচ মিনিট নাকের কাছে রাখুন। বিশেষজ্ঞরা বলেন, এটি সাময়িকভাবে হলেও নাক বন্ধভাব দূর করতে সাহায্য করবে। ৩. ঝাল জাতীয় খাবার খান # হ্যাঁ, নাক বন্ধ রোধে ঝাল জাতীয় খাবার বেশ উপকারি।এ ক্ষেত্রে ঝাল মরিচ খেতে পারেন। এর মধ্যে থাকা ক্যাপসেসিন নাকের পথ পরিষ্কার করে নাক বন্ধ হওয়া রোধে সাহায্য করবে। ৪. গরম ব্যাভারেজ # গরম চা অথবা কফি নাক বন্ধ রোধে ভালো কাজ করে। চা,কফির গরম ভাপ মিউকাসকে পাতলা করে। বিশেষ করে গরম চা খেলে ঠান্ডায় ভালো বোধ করবেন। ৫. ভাপ নেওয়া # গরম পানির মধ্যে কয়েক ফোঁটা মেনথল যোগ করুন। এরপর আপনার মাথাকে একটি তোয়ালে দিয়ে ঢাকুন এবং গরম পানির ভাপ নিন। এমনভাবে মাথা ঢাকুন যেন বাষ্প বাইরে বেরিয়ে না যায়। তবে যেহেতু গরম পানির ব্যাপার তাই কাজটি করার সময় একটু সতর্ক থাকুন। এই পদ্ধতিগুলো প্রাথমিকভাবে নাক বন্ধ রোধে সাহায্য করে। তবে বেশি সমস্যা হলে চিকিৎসকের পরামর্শ নিয়ে নাক পরিষ্কারের ড্রপ ব্যবহার করতে পারেন।

ID: 1418

Context: সর্দি কাশি থেকে প্রতিরোধের উপায়

Question: কোন সর্দি,কাশি ছাড়াই গলায় সবসময় কফ জমে থাকে। কি করব?

Answer:

আপনি রাতে খাটি সরষের তেল আঙ্গুল দিয়ে নাকে টানবেন, হাতে মাখিয়ে পেটের নাভিতে মাখবেন একটু গলায় নিবেন । আর সব শেষে তেল টা আপনি পায়ের তলায় এবং মাথার চাদিতে মেখে ঘুমাবেন । আশা করি ফল পাবেন । উপকার হবে ভাল থাকবেন আর কফ ভালো করতে খাটি মধু খান ভালো হয়ে যাবে এছাড়া চা খাবেন আদা দিয়ে।

ID: 1419

Context: সর্দি কাশি থেকে প্রতিরোধের উপায়

Question: গলায় শুকনো কাশি, কাশলে কফ আসে না। কি করতে পারি?

Answer:

আপনি দিনে কয়েকবার কয়েকটি তুলসী পাতা চিবান ও আস্তে আস্তে এর রস খাবেন। লং চিবাতে পারেন এটাও গলা ফ্রি করতে সাহায্য করবে। এছাড়াও ডাক্তারের পরামর্শ নিতে পারেন।

ID: 1420

Context: সর্দি কাশি থেকে প্রতিরোধের উপায়

Question: আমার গলায় প্রায় ০১ বছর যাবৎ কফ জমে আছে, মাঝে মধ্যে প্রচন্ড কাশি হয়, কি করলে আমি এই সমস্যা থেকে আরোগ্য লাভ করতে পারি?

Answer:

আপনি প্রতিদিন সকালে খালি পেটে পরিমান মতো তুলসী পাতার রস আর আদার রস মিশিয়ে খাবেন।

ID: 1421

Context: হাল্কা হাল্কা জ্বরভাব এর কারণ

Question: আমার বিকালে হাল্কা হাল্কা জ্বরভাব হয়, এর কারণ কী?

Answer:

জ্বর কোন রোগ নয়, এটা রোগের লক্ষণ। বহিরাগত প্যাথোজেনের আক্রমণ, শ্বাসনালীর সংক্রামণ, মূত্রনালিতে সংক্রামণ ইত্যাদি কারণে জ্বর দেখা যায়। বেশিদিন ধরে জ্বর থাকলে অবশ্যই চিকিৎসকের পরামর্শ গ্রহণ করা উচিত।

ID: 1462

Context: এনজাইনা

Question: এনজাইনা কী?

Answer:

যেসব ধমনী আপনার হৃতপিন্ডকে রক্ত সরবরাহ করে,কোনো কারণে সেগুলোর রক্ত প্রবাহ যদি আংশিক ভাবে বাধাগ্রস্ত হয়,তাহলে আপনার বুকে ব্যথা হবে যাকে বিজ্ঞানের ভাষায় এনজাইনা বলা হয়।

ID: 1463

Context: বুকে ব্যাথা

Question: বুকে ব্যাথা কখন গুরুতর সমস্যা হয়ে দাঁড়ায়?

Answer:

সাধারণত আপনর বদহজম হবার মত মৃদু কিন্তু অস্বস্তিকর একটি অনুভূতি হবে। কিন্তু যদি আপনার প্রচন্ড ব্যথা হয়,সাধারনত বুকের মাঝখানে (তাছাড়াও আপনার বাহু ,চোয়াল,ঘাড় এবং পেট এও অনুভূত হতে পারে),তাহলে বুঝতে হবে সমস্যা গুরুতর।

ID: 1464

Context: বুকে ব্যাথা

Question: বুকে ব্যাথা গুরুতর কিছু হয়েছে কিনা, বুঝবো কীভাবে?

Answer:

সাধারণত আপনর বদহজম হবার মত মৃদু কিন্তু অস্বস্তিকর একটি অনুভূতি হবে। কিন্তু যদি আপনার প্রচন্ড ব্যথা হয়,সাধারনত বুকের মাঝখানে (তাছাড়াও আপনার বাহু ,চোয়াল,ঘাড় এবং পেট এও অনুভূত হতে পারে),তাহলে বুঝতে হবে সমস্যা গুরুতর।

ID: 1465

Context: বুকে ব্যাথার কারণ

Question: বুকে ব্যাথার কারণ কী?

Answer:

এনজাইনা সাধারনত দুশ্চিন্তা বা শারীরিক পরিশ্রমের পার্শপ্রতিক্রিয়া হিসেবে দেখা দেয় এবং ১০মিনিট এর ভেতর এর তীব্রতা কমে আসে। ওষুধ হিসেবে সাধারনত নাইট্রেট বড়ি বা স্প্রে ব্যবহার করা হয়ে থাকে।

ID: 1466

Context: বুকে ব্যাথা

Question: বুকে ব্যথার সাথে সাথে আর কোথায় ব্যাথা দেখা দিতে পারে?

Answer:

বুকে ব্যথায় শুধু আপনার বুকেই নয়, আপনার শরীরের উপরের অংশে ঘাড় থেকে পাঁজর পর্যন্তও ব্যথা হয়।

ID: 1467

Context: বুকে ব্যাথা বা এনজাইনা

Question: বুকে ব্যাথা বা এনজাইনা কিসের লক্ষণ?

Answer:

যদিও বুকে ব্যথা অনেক ধরনের অসুখেরই লক্ষণ হতে পারে, তারপরও এটাকে গুরুত্বের সাথে নেয়া উচিত, কারণ বুকে ব্যথা হার্ট অ্যাটাকেরও লক্ষণ।

ID: 1468

Context: বুকে ব্যাথা বা এনজাইনা

Question: বুকে ব্যাথা হলে কখন সাহায্য নিতে হবে?

Answer:

বুকে ব্যথা অনেক ধরনের অসুখেরই লক্ষণ হতে পারে। শারীরিক পরিশ্রমের কারণেও হতে পারে। বুকে ব্যথা হার্ট অ্যাটাকেরও লক্ষণ, সেক্ষেত্রে চিকিৎসকের নিকটাপন্ন হবেন।

ID: 1469

Context: বুকে ব্যাথা বা এনজাইনা

Question: বুকে ব্যথা হার্টের ব্যথা কিনা কীভাবে বুঝবো?

Answer:

শারীরিক পরিশ্রমের কারণে ব্যথাটা শুরু হয়, বিশ্রামে ব্যথা কমে যায় । হৃদরোগের ব্যথাটা খুব বেশী, জোরে হয় এবং মনে হয় চেপে আসছে। আপনার বুকে ব্যথার পাশাপাশি অন্য লক্ষণও দেখা দেয়, যেমন- দম ফুরিয়ে যাওয়া, বমি বমি ভাব, অনেক ঘামানো, হঠাৎ করে শির শির করে ব্যথা শুরু হয়ে হাতে ছড়িয়ে পড়া (সাধারণত বাঁ হাতে)ইত্যাদি। যেসব কারণে আপনার করোনারী হৃদ্রোগের সম্ভাবনা থাকতে পারে সেগুলো হলো- ধূমপান, উচ্চ রক্তচাপ বা হাইপার-টেনশন, ডায়াবেটিস, শরীরে বেশি মাত্রার কোলেস্টেরোল, স্থুলতা অথবা পরিবারে হৃদরোগের ইতিহাস ইত্যাদি।

ID: 1470

Context: বুকে ব্যাথা বা

Question: বুকে ব্যাথাই কি হার্ট অ্যাটাক?

Answer:

যদি শারীরিক পরিশ্রমের কারণে আপনার বুকে ব্যথা হয় এবং কাজকর্ম বন্ধ করে ফেললে ব্যথা কমে যায়, তবে আপনার অ্যানজাইনা হয়েছে। বুকের ব্যথা বা চাপা ভাবটা বুক থেকে আপনার বাঁ হাত, ঘাড় ও পিঠে ছড়িয়ে পড়বে।

ID: 1471

Context: হার্ট এটার্ক

Question: বুকে ব্যাথা থেকে হার্ট এটার্ক হয়েছে কিনা কীভাবে বুঝবো?

Answer:

হার্টে রক্তের সীমিত চলাচলের কারণে অ্যানজাইনা হয়। এর কারণ হচ্ছে আপনার হৃৎপিণ্ডে রক্ত সরবরাহ করে এমন তিনটি ধমনীই সরু হয়ে গিয়েছে। হার্ট পর্যাপ্ত অক্সিজেন পায় না বলে আপনার বুকে ব্যথা হয়। যদি উপরে বর্ণনা করা লক্ষণগুলো আপনার ক্ষেত্রে দেখা দেয়, কিন্তু ব্যথাটা ১৫-২০মিনিটের চাইতে বেশীক্ষণ থাকে, তবে আপনার হার্ট অ্যাটাক হচ্ছে। হার্ট অ্যাটাকের সময় আপনার মনে হবে আপনার বুকে খুব জোরে কিছু চাপ দিচ্ছে, বা ভারী কিছু আপনার বুকের উপর চারপাশ থেকে চাপ দিচ্ছে।

ID: 1472

Context: অ্যানজাইনা এবং হার্ট অ্যাটাকের মধ্যে প্রধান পার্থক্যগুলো

Question: অ্যানজাইনা এবং হার্ট অ্যাটাকের মধ্যে প্রধান পার্থক্যগুলো কী?

Answer:

অ্যানজাইনা মৃদু, অল্প সময়ের জন্য হয়, সাধারণত শারীরিক পরিশ্রমের জন্য হয়, হার্ট অ্যাটাক হলে ব্যথাটা ওষুধ (গ্লাইসেরিল ট্রাইনাইট্রাইট স্প্রে যেটা ব্যবহারে অ্যানজাইনার ব্যথা দ্রুত উপশম হয়) নেয়ার পরও থেকে যায়। বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই হার্ট অ্যাটাক বিশ্রামকালে অথবা ঘুমের মধ্যে হয়। এটা প্রচণ্ড ঘাম ও বমি বমি ভাব সহ অনেক লক্ষণের সাথেই হয়।

ID: 1473

Context: বুকে ব্যথা হওয়ার সাধারণ কারণগুলো

Question: বুকে ব্যথা হওয়ার সাধারণ কারণগুলো কী?

Answer:

বেশীরভাগ ক্ষেত্রেই বুকে ব্যথা হয় হার্ট সংক্রান্ত কারণে। বুকে ব্যথা হওয়ার সাধারণ কারণ গুলো হল: ১। বুকজ্বলা এবং গ্যাসট্রো-অসোফ্যাগাল রিফ্লাক্স ডিজিজ (জিওআরডি)- এই অসুস্থতায় আপনার পাকস্থলী যে এসিড ছাড়ে সেটি আপনার খাদ্যনালীতে চলে যায়। ২ অতিরিক্ত দুশ্চিন্তা। ৩ পেশীতে টান পড়লে। ৪ শিনায় ব্যথা

ID: 1474

Context: বুকে ব্যথা হওয়ার সাধারণ কারণগুলো

Question: শুয়ে থাকা অবস্থায় বুকে ব্যথা বাড়ে, এর কারণ কী হতে পারে?

Answer:

যদি শুয়ে থাকার ফলে আপনার বুকে ব্যথা বেড়ে যায় তবে এটা আপনার পাকস্থলী থেকে বের হয়ে আসা এসিড যা আপনার খাদ্যনালীতে চলে এসেছে, তার ফলে হতে পারে। এ সমস্যা কমবেশি অনেকেরই হয়, এবং একে বুকজ্বলা এবং গ্যাসট্রো-অসোফ্যাগাল ডিজিজ বলে। জীবনযাপনের ধরণ বদলে এবং দরকার পড়লে ওষুধের মাধ্যমে এই সমস্যা দূর করা সম্ভব। তবে খেয়াল রাখা উচিত যে হার্টের ব্যথা শুয়ে থাকা অবস্থায় হতে পারে। উদাহরণস্বরূপ, অ্যানজাইনা ডেকুবিটাস যা হার্ট ফেইলের মত অবস্থা, এতে বুকে চাপ পড়ে এবং সুঁই ফোটানোর মত ব্যথা হয়। তাই শুয়ে থাকা অবস্থায় আপনার যদি এমন ব্যথা হয় জা আপনি বুঝতে পারছেননা, আপনার উচিত চিকিৎসকের কাছে যাওয়া।

ID: 1475

Context: বুকে ব্যথা হওয়ার সাধারণ কারণগুলো

Question: বুকে ব্যথা হয়ে সাথে সাথে বুক নরম হয়ে যাওয়ার কী কারণ হতে পারে?

Answer:

বুকে ব্যথা হয়ে বুক নরম হয়ে যাওয়ার অনেক কারণ আছে। যদি বুকে ব্যথা হয়, বুক নরম হয়ে যায় কিন্তু কোন ফোলাফোলা ভাব না থাকে তবে এটি সম্ভবত আপনার বুকের পেশীতে টান পরার কারণে হয়েছে। এতে অনেক ব্যথা হয়, তবে বিশ্রাম নিলে ধীরে ধীরে ব্যথা কমে যায় এবং সময়ের সাথে আপনার পেশী ঠিক হয়ে যায়। যদি আপনার পাঁজরের কাছে ব্যথা, নরম ও ফোলাফোলা ভাব থাকে, তবে আপনার সম্ভবত কস্ট্রোকন্ড্রিটিস বা টিয়েটজা নামক সমস্যা হয়েছে। এটা হওয়ার কারণ হচ্ছে যে তরুণাস্থি দিয়ে পাঁজর আপনার বক্ষাস্থির সাথে যুক্ত সেখানে প্রদাহ হওয়া। কয়েক সপ্তাহ পর ব্যথার ওষুধের নিলে আপনার এই ব্যথা চলে যাবে। দুশ্চিন্তার কারণেও আপনার বুকে ব্যথা হতে পারে। আপনি দুশ্চিন্তা করার সাথে সাথে আপনার শারীরিক সমস্যা দেখা দিতে পারে যেমন- বুকে ব্যথা, দম ফুরিয়ে যাওয়া, প্যালপিটিশন। আপনার চিকিৎসক দুশ্চিন্তার কারণে হওয়া বুকে ব্যথার চিকিৎসা হিসেবে আপনাকে মনস্তাত্ত্বিক চিকিৎসা যেমন কাউন্সেলিং নিতে বলতে পারেন।

ID: 1476

Context: প্লুরিসি

Question: প্লুরিসি কী?

Answer:

প্লুরিসি হচ্ছে ফুসফুসের চারিদিকে যে দুই-স্তরের পর্দা থাকে সেখানে প্রদাহ হওয়া। এই দুটো স্তর পরস্পরের সাথে ঘর্ষণের ফলে তীক্ষ্ণ, ছুরিকাঘাতের মত ব্যথা হয়। নিশ্বাস নেয়ার সাথে বা লম্বা শ্বাস নিলে এই ব্যথাটা হয়। হালকা নিশ্বাস নিয়ে প্লুরিসির ব্যথা থেকে মুক্তি পাওয়া যায়। ব্যথাটা আইবুপ্রফেন দিয়ে কমানো যায়, এর মধ্যে আপনার চিকিৎসক প্লুরিসির কারণ খুঁজে বের করবেন।

ID: 1477

Context: শিঙ্গলেস

Question: শিঙ্গলেস কী?

Answer:

শিঙ্গলেস হচ্ছে স্নায়ু এবং তার আশেপাশের এলাকায় সংক্রমণ। এটি হার্পিস ভ্যারিসেলা-যোস্টার ভাইরাসের কারণে হয়, এই ভাইরাসের কারণে চিকেনপক্স হয়। শিঙ্গলস এর র‍্যাশ সাধারণত শরীরের ডান অথবা বাম পাশে হয়, কিন্তু শরীরের মধ্যবর্তী অংশে হয়না ( মধ্যবর্তী রেখা হচ্ছে শরীরের একটি কাল্পনিক রেখা যেটা আপনার দুই চোখের মাঝখান থেকে আপনার নাভির আগ পর্যন্ত কল্পনা করা একটি রেখা)।

ID: 1478

Context: স্তন-প্রদাহ

Question: স্তন-প্রদাহ কী?

Answer:

স্তন-প্রদাহ হচ্ছে সংক্রমণের কারণে স্তনে ব্যথা হওয়া এবং ফুলে যাওয়া, এটা বেশী হয় স্তন্যদানকালীন সময়ে। সংক্রমণ দূর করতে অ্যান্টিবায়োটিক নিতে বলা হয়। আপনাকে এর জন্য আপনার শিশুকে স্তন্যদানের পদ্ধতি পরিবর্তন করতে হতে পারে। আপনার চিকিৎসক আপনাকে এব্যাপারে আরও পরামর্শ দিবেন।

ID: 1479

Context: বুক ধড়ফড়

Question: বুক ধড়ফড় কী?

Answer:

আপনার হৃদস্পন্দন যখন বিশেষভাবে বেড়ে যায় তখন আপনার বুক ধড়ফড় করার অনুভূতি হয়। এটা সাধারণত ক্ষতিকারক নয় এবং কয়েক সেকেন্ড থেকে কয়েক মিনিটের মধ্যে থেমে যায়। কয়েক মুহূর্তের জন্য আপনার মনে হতে পারে যে আপনার হৃদপিণ্ড ধক ধক করছে, বা অনিয়মিতভাবে স্পন্দিত হচ্ছে। আপনার গলায় ও ঘাড়েও অস্বস্তিকর অনুভূতি হতে পারে। বুক ধড়ফড় করাটা ভীতিকর হতে পারে, তবে বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই এটি আপনার হৃদপিণ্ডের কোন সমস্যার লক্ষন নয়। তবে, বুক ধড়ফড় করার সাথে সাথে মাথা ঘোরা বা বুকে চাপ অনুভূত হলে তা হৃদরোগের উপসর্গ হতে পারে। যদি আপনার বুক ধড়ফড় করার সাথে অন্য কোন উপসর্গ দেখা দেয় তাহলে চিকিৎসকের কাছে যান।

ID: 1480

Context: বুক ধড়ফড় করার কারন

Question: বুক ধড়ফড় কেন করে?

Answer:

জীবনযাপনের ধরনের কারণে, আপনি কোন কারণে ভীত, উদ্বিগ্ন অথবা উত্তেজিত হলে অ্যাড্রেনালিন নামের একধরনের হরমোন নিঃসৃত হয়, যার প্রভাবে আপনার বুক ধড়ফড় করতে পারে। মশলাযুক্ত ভারি খাবার খেলে, অতিরিক্ত ক্যাফেইনযুক্ত পানীয় বা মদ পান করলে, ধূমপান করলে অথবা মাদক গ্রহন করলে বুক ধড়ফড় করতে পারে। যদি আপনার মনে হয় জীবন যাপনের ধরনের কারনে আপনার বুক ধড়ফড় করছে, তাহলে বিশ্রামের বিভিন্ন উপায়ের মাধ্যমে এবং ব্যায়ামের মাধ্যমে আপনার উপরের চাপ (stress levels) কমানোর চেষ্টা করুন। আপনি কফি এবং অন্যান্য শক্তিবর্ধক পানীয় পান করা ও মাদকদ্রব্য সেবন করাও এড়িয়ে চলুন। হঠাৎ আতঙ্কিত হওয়া (Panic attacks) বুক ধড়ফড় করার আরেকটি কারণ। বুক ধড়ফড় করার সাথে সাথে যদি আপনি দুশ্চিন্তা, মানসিক চাপ ও আতঙ্ক বোধ করেন তাহলে আপনি হয়ত প্যানিক অ্যাটাক বা হঠাৎ আতঙ্কে আক্রান্ত হয়েছেন। প্যানিক অ্যাটাকের কারণে আপনি উদ্বেগ, দুশ্চিন্তা বা ভয়ে অভিভুত হয়ে পড়তে পারেন, এবং আপনার বমি, ঘাম কাঁপুনি ও বুক ধড়ফড় হতে পারে। প্যানিক অ্যাটাক খুবই ভীতিকর ও প্রবল হতে পারে, কিন্তু সাধারণত এটি বিপদজনক নয়। ঔষধের পার্শ্বপতিক্রিয়ার ফলে বুক ধড়ফড় করতে দেখা যায়।

ID: 1483

Context: বুক ধড়ফড় করার কারন

Question: মেনোপোজ চলাকালীন অবস্থায় বুক ধড়ফড় করে কেন?

Answer:

নারীদের মাসিক , গর্ভাবস্থা অথবা মেনোপোজ চলাকালীন সময়ে হরমোনের পরিবর্তনের কারনে বুক ধড়ফড় করতে পারে। সাধারনত এগুলো অল্প সময় থাকে, এবং এর জন্য উদ্বিগ্ন হবার দরকার নেই।

ID: 1522

Context: দ্রুত ওজন কমানো

Question: দ্রুত ওজন কমানো কি উচিৎ?

Answer:

যখন নিজের ওজন কমাতে চেষ্টা করেন, তখন আপনি যত দ্রুত সম্ভব এর ফল পেতে চান। ওজন দ্রুত কমালে তা ভবিষ্যতে স্বাস্থ্যকর ওজন রক্ষায় আপনাকে সাহায্য করবে না। এর ফলে, আপনার স্বাস্থ্য ঝুঁকির সম্মুখিনও হতে পারে। সবচেয়ে ভাল উপায় হচ্ছে আপনার খাদ্যাভ্যাস এবং দৈহিক পরিশ্রমের কাজে একটি স্বাস্থ্যকর পরিবর্তন নিয়ে আসা, যা আপনাকে নিরাপদ এবং স্থায়ীভাবে ওজন কমাতে সাহায্য করবে ।

ID: 1523

Context: ওজন হ্রাসের নিরাপদ মাত্রা

Question: ওজন হ্রাসের নিরাপদ মাত্রা কিরুপ ?

Answer:

যদি আপনি ওজন কমানোর চেষ্টা করেন, তবে প্রতি সপ্তাহে ওজন কমানোর নিরাপদ মাত্রা হচ্ছে ০.৫ থেকে ১ কেজি। অর্থাৎ প্রতি সপ্তাহে ১ থেকে ২ পাউন্ড। এরচেয়ে দ্রুত ওজন হ্রাস পেলে আপনার স্বাস্থ্য পুষ্টিহীনতা, পিত্তাশয়ের পাথর, এবং দূর্বলতা অনুভবের মত ঝুঁকিতে পড়তে পারে।

ID: 1524

Context: দ্রুত ওজন হ্রাসের প্রতিক্রিয়াসমূহ

Question: দ্রুত ওজন হ্রাসের প্রতিক্রিয়াসমূহ কি কি?

Answer:

অতি উৎসাহী খাদ্যাভ্যাসের (এক্ষেত্রে কয়েক সপ্তাহের জন্য কেবল খাদ্যাভ্যাসে পরিবর্তন নিয়ে আসা) ফলে আপনার ওজন দ্রুত কমে গেলেও, তা ভবিষ্যতে স্বাস্থ্যকর ওজন রক্ষায় আপনাকে সাহায্য করবে না। তবে আপনি যদি দ্রুত ওজন কমাতে চান তবে তা আপনাকে পুষ্টিহীনতা, পিত্তাশয়ের পাথর, অবসাদ, সারাদিন ক্লান্ত থাকার দিকে ধাবিত করবে। এতে করে আপনার ত্বকের স্বাভাবিক উজ্জ্বলতাও হারিয়ে যেতে পারে।

ID: 1525

Context: ওজন হ্রাসের আদর্শ উপায়

Question: ওজন হ্রাসের আদর্শ উপায় কি?

Answer:

আপনার কতটুকু ওজন কমাতে হবে তা নির্ধারণ করুন এবং ব্যাক্তিগতভাবে প্রাত্যহিক ক্যালিরর একটি মাত্রা ঠিক করুন। স্বাস্থ্যকর উপায়ে ওজন হ্রাসের জন্য একটি স্বাস্থ্যকর ব্যায়াম পদ্ধতি অনুসরণ করুন এবং স্বাস্থ্যকর অভ্যাস গড়ে তুলুন।

ID: 1526

Context: ওজন বৃদ্ধির উপায়

Question: কিভাবে ওজন বৃদ্ধি করব ?

Answer:

৬-৭ মাসের পরিকল্পনা তৈরী করুন । নিয়মিত খেলাধুলা ও বায়াম করুন । জিমে গিয়ে free-hand, cardio, weight-training করুন, এতে মেটাবলিজম, ক্ষুধা ও রুচি বারবে। প্রচুর পানি পান করুন। একবারে বেশি না খেয়ে ঘন ঘন অল্প করে খান । খাদ্যে এই উপাদান গুলো যুক্ত করুন - (১) আমিষঃ মাংস, মাছ, ডিম, দুধ এবং বিভিন্ন দুগ্ধজাত পণ্য, সিমের বিচি বা ডালজাতীয় খবার এবং সয়া মিট (soya meat) (২) শ্বেতসার – আলু, ভাত, নুডলস, পাস্তা, রুটি , কলা , মধু (৩) চর্বি – সবধরনের তেল, মাখন, ননী, ঘী, বাদাম (৪) বিভিন্ন ধরনের শাকসব্জি ও ফলমূল ।

ID: 1527

Context: সঠিক ওজন এর গুরুত্ব

Question: সঠিক ওজন কেন গুরুত্বপূর্ণ?

Answer:

ওজন স্বাভাবিকের চাইতে কম হওয়াটা আপনার জন্য ভাল নয়। এটি বর্তমানে এবং ভবিষ্যতে আপনার স্বাস্থ্যের জন্য একটি দুঃসংবাদ। এর ফলাফলগুলোর মধ্যে রয়েছেঃ (১) শক্তিহীন হয়ে পড়া – ওজন কম হলে আপনি সবসময় ক্লান্ত বোধ করবেন। কোন কাজে মনোযোগ বসে না । (২) পুষ্টির ঘাটতি দেখা দেয়া – ওজন কম হলে সম্ভবত আপনার শরীরে প্রয়োজনীয় পুষ্টির অভাব রয়েছে।(৩) রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা দুর্বল হয়ে যাওয়া – ওজন কম হলে আপনার রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা সম্পূর্ণ কাজ করে না, তাই সর্দি-কাশি, জ্বর বা কোন ধরনের সংক্রমণে আপনি সহজেই আক্রান্ত হয়ে পড়েন।

ID: 1528

Context: সঠিক ওজন এর গুরুত্ব

Question: মেয়েদের সঠিক ওজন কেন গুরুত্বপূর্ণ?

Answer:

ওজন স্বাভাবিকের চাইতে কম হওয়াটা আপনার জন্য ভাল নয়। এটি বর্তমানে এবং ভবিষ্যতে আপনার স্বাস্থ্যের জন্য একটি দুঃসংবাদ। এর ফলাফলগুলোর মধ্যে রয়েছেঃ(১) শক্তিহীন হয়ে পড়া – ওজন কম হলে আপনি সবসময় ক্লান্ত বোধ করবেন। পরীক্ষার পড়া রিভাইজ দিতে গেলে, খেলতে গেলে বা সঙ্গীদের সাথে বেড়াতে গেলে এটা খুব একটা সাহায্য করে না। (২) পুষ্টির ঘাটতি দেখা দেয়া – ওজন কম হলে সম্ভবত আপনার শরীরে প্রয়োজনীয় পুষ্টির অভাব রয়েছে। অল্প বয়সী মেয়েদের জন্য ক্যালসিয়াম বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ, কারন এটি মজবুত ও সুস্থ হাড় গঠনে সহায়তা করে। আপনি যথেষ্ট পরিমাণে ক্যালসিয়াম না পেলে ভবিষ্যতে আপনার অস্টিওপোরসিস (একধরনের হাড়ের অসুখ) হওয়ার সম্ভাবনা বেড়ে যায়। সুস্বাস্থ্যের জন্য আয়রনও জরুরী। আপানার মাসিক শুরু হলে ঋতুস্রাবের সাথে অনেক আয়রন শরীর থেকে বের হয়ে যাবে। অন্যান্য ধরনের পুষ্টির ঘাটতির কারনে আপানার ত্বক ও চুল স্বাস্থ্যহীন হয়ে পড়তে পারে। (৩) রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা দুর্বল হয়ে যাওয়া – ওজন কম হলে আপনার রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা সম্পূর্ণ কাজ করে না, তাই সর্দি-কাশি, জ্বর বা কোন ধরনের সংক্রমণে আপনি সহজেই আক্রান্ত হয়ে পড়েন। (৪) মাসিক দেরিতে হওয়া বা বিঘ্নিত হওয়া– ওজন কম হওয়ার কারনে তা থেকে আপনার হরমোনের সমস্যা তৈরি হলে এমনটি হতে পারে। (৫) ভবিষ্যতে বাচ্চা নিতে গেলে সমস্যা হওয়া – ওজন কম হওয়ার কারনে আপনার মাসিক বন্ধ হয়ে গেলে পরে বাচ্চা নেয়ার সময় আপনার সমস্যা হতে পারে।

ID: 1529

Context: সঠিক ওজন এর খাবার

Question: সঠিক ওজন ধরে রাখতে কোন খাবার ভাল?

Answer:

(১) শাকঃ চিকিৎসকদের মতে যেসব খাবার পেটের চর্বি কমায় তার মধ্যে শাকসবজি অন্যতম। সকালে কিংবা দুপুরে শাকসবজি খান। অনেকের ক্ষেত্রে এই খাবার হজমে সমস্যা করে, সেক্ষেত্রে চিকিৎসকের পরামর্শ নিয়ে পরিমান বুঝে শাকসবজি খান। (২) ঝালঃ অনেকেই ঝাল খাননা। কিন্তু পেট কমাতে ঝালের ভূমিকা জানলে প্রতিদিন কমপক্ষে একটি ঝাল খাবেন। ঝাল ক্যালরি পুড়িয়ে দিতে সাহায্য করে। এছাড়াও শরীরে জমে থাকা চর্বি অক্সিডাইস করে । ফলে চর্বি জমে থাকতে পারে না । প্রচুর পরিমাণে ভিটামিন সি’থাকায় তার শরীরের জন্য উপকার করে। (৩) ফুলকপিঃ এতে প্রচুর ফাইবার । বিভিন্ন খনিজ লবণ ও ভিটামিন তো আছেই সঙ্গে রয়েছে ফটোকেমিক্যাল। আর এ কারণে শরীরের চর্বি জমতে দেয় না । তাই ফুলকপিতে ভরসা রেখে কমিয়ে ফেলুন ভুঁড়ি। তাই দেরি না করে শীতে বেশি বেশি ফুলকপি খান। (৪) গাজরঃ কম ক্যালরির খাবার এর মধ্য গাজর থাকবে প্রথম সারিতে। গাজরের রস নিয়ম মেনে খেতে পারলে আপনার পেট অবশ্যই কমবে। ওজন নিয়ন্ত্রণে রেখে চেহারাকে অনেক তাড়াতাড়ি সুন্দর ও উজ্জ্বল করতে পারে । (৫) মাশরুমঃ আপনি কি মাশরুম পছন্দ করেন? তাহলে ভুড়ি কমানোর ওষুধ আপনার হাতের মুঠোয়। মাশরুম রক্তে চিনির পরিমাণ নিয়ন্ত্রণে রাখে। এছাড়া এটি প্রোটিনের ভরপর । শরীরের মেটাবলিজম বাড়িয়ে চর্বি জমা রোধ করতে পারে সহজেই।(৬) কুমড়োঃ বেশি ফাইবার আর কম ক্যালরির খাবার হল কুমড়ো। পেটের মেদ কমাতে বিশেষজ্ঞরা উপদেশ দিয়ে নিয়মিত কুমড়ো খেতে, এছাড়া কুমড়োর অন্যতম বৈশিষ্ট্য হলো এটি ক্যান্সার প্রতিরোধক। আর এজন্য নিয়মিত খাবার তালিকায় রাখুন।(৭) শসাঃপুরোটাই ফাইবার আর পানিতে সমৃদ্ধ। আর ফাইবার অধিক পরিমাণে থাকার কারণে খিদেও কমায়। শরীরে ফ্যাট কমাতে খাবারের তালিকায় নিয়মিত শসা রাখুন।

ID: 1618

Context: উচ্চ রক্তচাপের ঝুকি

Question: উচ্চ রক্তচাপের কারনে কি কি ঝুকি আছে ?

Answer:

উচ্চ রক্তচাপের যদি চিকিত্সা করা না হয়, তাহলে তা হৃদরোগ বা স্ট্রোকের ঝুঁকি বৃদ্ধি করে। এই সমস্যা যে আছে, তা বোঝার একমাত্র উপায় হচ্ছে নিয়মিত আপনার রক্তচাপ পরিমাপ করা। সব প্রাপ্তবয়স্ক মানুষেরই উচিত তাদের রক্তচাপ প্রতি পাঁচ বছর অন্তর অন্তর পরিমাপ করে দেখা। যদি আপনি আপনার রক্তচাপ ইদানীং পরিমাপ করে না থাকেন, অথবা স্বাভাবিক অবস্থায় আপনার রক্তচাপ কি তা যদি আপনি না জেনে থাকেন, তাহলে এখনই এই ব্যাপারে আপনি আপনার ডাক্তারের সাথে কথা বলুন, এবং তাকে আপনার রক্তচাপ পরিমাপ করে দেখে দিতে বলুন।

ID: 1619

Context: রক্তচাপ

Question: রক্তচাপ কি?

Answer:

রক্ত প্রবাহের সময় রক্তনালীর গায়ে যে চাপ দেয় তাই রক্তচাপ । রক্তের চাপ পারদ (mmHg) এর মিলিমিটারে মাপা হয় এবং এর পরিমাপ দুইটিঃ– সিস্টোলিক চাপ – যখন আপনার হৃৎপিণ্ড রক্ত পাম্প করে সারা শরীরে পাঠায়, এটি হচ্ছে তখনকার রক্তের চাপ। ডায়াসটোলিক চাপ – দুই হৃদ স্পন্দনের মাঝখানে যখন আপনার হৃৎপিণ্ড বিশ্রাম নেয়, এটি হচ্ছে তখনকার রক্তের চাপ। এটি একটি আন্দাজ দেয় যে কত জোরালোভাবে আপনার ধমনীতে রক্ত প্রবাহের প্রতিফলন রোধ হচ্ছে। আপনার রক্ত চাপ “১৪০ বাই ৯০” হলে সিস্টোলিক চাপ ১৪০ mmHg এবং ডায়াসটোলিক চাপ ৯০ mmHg

ID: 1620

Context: রক্তচাপের ঝুঁকি

Question: কাদের রক্তচাপের ঝুঁকি সবচেয়ে বেশী ?

Answer:

আপনার বয়স বাড়ার সাথে সাথে উচ্চ রক্তচাপ হওয়ার সম্ভাবনা বাড়ে। উচ্চ রক্তচাপ হওয়ার কোনো সুস্পষ্ট কারণ প্রায়ই পাওয়া যায় না, কিন্তু আপনার ঝুঁকি বেশী থাকে যদি –\* আপনার ওজন অনেক বেশী হয় \* আপনার আত্মীয়স্বজনের উচ্চ রক্তচাপ আছে \* আপনি ধূমপান করেন \* আপনি আফ্রিকান বা ক্যারিবিয়ান বংশদ্ভুত \* অতিরিক্ত লবণ খান \* যথেষ্ট ফল এবং সবজি খান না \* যথেষ্ট ব্যায়াম করেন না \* খুব বেশী কফি (অথবা অন্যান্য ক্যাফিন জাতীয় পানীয়) পান করেন \* খুব বেশী মদ্য পান করেন \* ৬৫ বছরের বেশী বয়সী হন।

ID: 1621

Context: উচ্চ রক্তচাপের লক্ষণগুলো

Question: উচ্চ রক্তচাপের লক্ষণগুলো কি কি ?

Answer:

উচ্চ রক্তচাপের সাধারণত কোন সুস্পষ্ট লক্ষণ থাকে না এবং অনেক মানুষই জানেনা যে এটা তাদের আছে। এই উচ্চ রক্তচাপের যদি চিকিত্সা করা না হয়, তাহলে স্ট্রোক, হৃদরোগ ও কিডনি সমস্যা সহ অনেক গুরুতর রোগ হতে পারে। আপনার উচ্চ রক্তচাপ আছে কি না তা জানার একমাত্র উপায় হল নিয়মিত রক্তচাপ পরিমাপ করা। সব প্রাপ্তবয়স্ক মানুষেরই উচিত তাদের রক্তচাপ নিম্নতম প্রতি পাঁচ বছর অন্তর অন্তর পরিমাপ করে দেখা। একজন ব্যক্তির যদি অনেক বেশী উচ্চ রক্তচাপ থাকে তাহলে কোন কোন ক্ষেত্রে, তারা কিছু উপসর্গ অনুভব করতে পারেন , যেমন – (১) ক্রমাগত মাথা ব্যাথা (২) ঝাপসা দেখা বা একটি জিনিস দুইটি দেখা (৩) নাক দিয়ে রক্ত পরা (৪) শ্বাসকষ্ট । আপনি যদি লক্ষ্য করেন যে আপনার এই সব উপসর্গের কোনটি আছে, তাহলে দেরী না করে শীঘ্র আপনার ডাক্তারের সাথে দেখা করুন।

ID: 1622

Context: হৃদপিণ্ড এর কাজ

Question: হৃদপিণ্ড কিভাবে কাজ করে ?

Answer:

হৃদপিণ্ড হচ্ছে এক ধরনের মাংসপেশি যা সারা শরীরে রক্তসঞ্চালন করে এবং প্রতি মিনিটে প্রায় ৭০ বার স্পন্দিত হয়। রক্ত হৃদপিণ্ডের ডান অংশ থেকে বেরিয়ে ফুসফুসে গিয়ে অক্সিজেনের সাথে মেশে। অক্সিজেন মিশ্রিত রক্ত সেখান থেকে আবার হৃদপিণ্ডে ফিরে যায়, এবং সেখান থেকে ধমনির মাধ্যমে শরীরের বিভিন্ন অঙ্গ-প্রত্যঙ্গে ছড়িয়ে পড়ে। অঙ্গ-প্রত্যঙ্গসমুহ থেকে রক্ত শিরা-উপশিরার মাধ্যমে আবার হৃদযন্ত্রে ফিরে আসে এবং সেখান থেকে আবার ফুসফুসে যায়। এই পুরো প্রক্রিয়াটিকে রক্ত সঞ্চালন প্রক্রিয়া বলে।

ID: 1623

Context: হৃদরোগ হওয়ার কারণ

Question: হৃদরোগ কেন হয় ?

Answer:

হৃদপিণ্ডে রক্তসরবরাহকারি ধমনিসমুহে চর্বিযুক্ত পদার্থ জমে যাওয়ার কারনে হৃদপিণ্ডে রক্ত সরবরাহ ব্যাহত হওয়া বা বন্ধ হয়ে যাওয়াকে CHD বলে। সময়ের সাথে সাথে সাথে আপনার ধমনির গায় চর্বিজাতীয় পদার্থ জমতে পারে। এই প্রক্রিয়াকে atherosclerosis (অ্যাথেরোস্ক্লেরোসিস) বলে এবং জমে যাওয়া চর্বিকে বলে atheroma।

ID: 1624

Context: হার্ট এটাক

Question: হার্ট এটাক কাকে বলে ?

Answer:

হৃদপিন্ড কে সরবরাহকারী কোন ধমনী দিয়ে রক্ত সরবরাহ যদি পুরোপুরি বন্ধ হয়ে যায় তাহলে হৃতপিন্ড এর অংশ বিশেষ প্রচন্ড ভাবে ক্ষতিগ্রস্থ হয় এবং যেটার জন্য মৃত্যু ও হতে পারে। এটাকেই হার্ট এটাক বলা হয়ে থাকে। এ সময় রোগী কে সবচেয়ে দ্রুততম সময়ে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া উচিত।

ID: 1625

Context: হার্ট এটাক এর লক্ষণ

Question: হার্ট এটাক হলে সাধারনত কি কি লক্ষণ দেখা যায় ?

Answer:

অত্যাধিক ঘাম \* বুক ধরফর করা \* হাপানি \* মাথা ঘুরানো \* আপনার বদহজম এর মত অনুভূতি, বুক ব্যথা, জালাপরা এবং পেট ব্যথা অনুভূত হবে। তাছাড়াও আপনার বাম হাত,ঘাড় ও চওয়াল এও ব্যথা অনুভূত হতে পারে । ১৫মিনিটের বেশি সময় ধরে বুকে ব্যথা হলে হার্ট এটাক এর আশংকা করা হয়। মাঝে মাঝে হার্ট এটাক এর কোনো লক্ষণ প্রকাশ না ও পেতে পারে। এটা সাধারনত ডায়াবেটিস রোগীদের ক্ষেত্রে বেশি দেখা যায়।

ID: 1626

Context: বিশ্রামের সময় হার্ট এটাক

Question: বিশ্রামের সময় কি হার্ট এটাক হতে পারে ?

Answer:

হার্ট এটাক যেকোনো সময় হতে পারে,এমনকি আপনি বিশ্রামে থাকা অবস্থায়ও হতে পারে ।

ID: 1627

Context: হার্ট ফেলিউর

Question: হার্ট ফেলিউর কখন হয় ?

Answer:

হৃদরোগ এর একটি জটিলতা হচ্ছে হার্ট ফেলিউর যেখানে আপনার হৃতপিন্ড দুর্বল হয়ে পরে এবং সঠিকভাবে শরীরে রক্ত সরবরাহ করতে পারেনা। যার পরিক্রমায় আপনার ফুসফুসে পানি জমে এবং নিশাস নিয়া কঠিন হয়ে পরে । এটা হঠাত করেও হতে পারে(একিউট হার্ট ফেলিউর) আবার অনেকদিন ধরে,আসতে আসতেও হতে পারে(ক্রনিক হার্ট ফেলিউর)।

ID: 1628

Context: ধূমপান এবং হার্ট এটাক

Question: ধূমপান কি হার্ট এটাক কারন ?

Answer:

করোনারী হার্ট ডিজিজ হওয়ার প্রধান কারণগুলোর মধ্যে ধূমপান অন্যতম। আপনি যদি ধূমপান ত্যাগ করেন, এক বছর ধূমপান-মুক্ত থাকার পর আপনার হার্ট অ্যাটাক হওয়ার সম্ভাবনা একজন ধূমপায়ীর থেকে অর্ধেক হয়ে যায়।

ID: 1629

Context: অতিরিক্ত ওজন ও হৃদরোগ

Question: অতিরিক্ত ওজন কি হৃদরোগের কারন ?

Answer:

অতিরিক্ত ওজন হৃদরোগ হওয়ার ঝুঁকি বাড়ায়। অতিরিক্ত চর্বিজাতীয় খাবার পরিহার করে ফল ও সবজি জাতীয় খাবারকে প্রাধান্য দিয়ে আপনার সুষম খাবার খাবেন, সাথে দরকার অনুযায়ী শারীরিক পরিশ্রম করুন। আমাদের বিএমআই ক্যালকুলেটরে দেখুন আপনার ওজন নিয়ন্ত্রণে আছে নাকি আপনাকে আরও কিছু ওজন কমাতে হবে।

ID: 1630

Context: অতিরিক্ত লবণ গ্রহন এবং হৃদরোগ

Question: অতিরিক্ত লবণ গ্রহন কি হৃদরোগের কারন ?

Answer:

আপনার রক্তচাপ ঠিক রাখতে খাবারের সাথে অতিরিক্ত লবণ ব্যবহার বন্ধ করুন। প্রয়োজনে লবণ ব্যবহার কমিয়ে দিন, সম্ভব হলে একেবারে বন্ধ করে দিন। ধীরে ধীরে আপনি লবণ ছাড়াই অভ্যস্ত হয়ে যাবেন। প্রক্রিয়াজাত খাবারে অতিরিক্ত লবণ থাকে, এ ব্যাপারেও সতর্ক থাকুন। প্রক্রিয়াজাত খাবারের লেবেল এর দিকে খেয়াল রাখুন- যদি এতে প্রতি ১০০ গ্রামে ১.৫ গ্রামের চাইতে বেশী লবণ থাকে বা ০.৬ গ্রামের বেশী সোডিয়াম থাকে, তবে এতে অতিরিক্ত লবণ আছে।

ID: 1631

Context: হৃদরোগ থেকে মুক্ত থাকার করনীয়

Question: হৃদরোগ থেকে মুক্ত থাকার জন্য কি কি করনীয় ?

Answer:

সুস্থ জীবনযাপন পদ্ধতি আপনার হার্টকে সুস্থ রাখে। তাই আপনার হার্টকে ভাল রাখতে – শারীরিক পরিশ্রমের ব্যাপারে সক্রিয় হন \* ধূমপান পরিত্যাগ করুন \* ওজন নিয়ন্ত্রণে রাখুন \* অতিরিক্ত লবণ ত্যাগ করুন \* তেলযুক্ত মাছ খান ( শিং-মাগুর জাতীয় মাছ, ইলিশ, তেলাপিয়া- এ ধরনের মাছগুলো ওমেগা-৩ ফ্যাটের খুব ভাল উৎস যা হার্ট ডিজিজ থেকে আমাদের রক্ষা করে) \* হাঁটুন, দুশ্চিন্তা তাড়ান । চিন্তিত থাকলে এবং কাজের চাপ বেশী থাকলে আপনি দ্রুত হাঁটতে পারেন, এতে আপনার দুশ্চিন্তা দূর হবে। \* সম্পৃক্ত চর্বিও ত্যাগ করুন \* অ্যালকোহল ত্যাগ করুন

ID: 1632

Context: স্যাচুরেটেড ফ্যাট সমৃদ্ধ খাবার

Question: স্যাচুরেটেড ফ্যাট সমৃদ্ধ খাবার কি কি ?

Answer:

স্যাচুরেটেড ফ্যাট সমৃদ্ধ খাবারের মধ্যে লাল মাংস, ঘি, মাখন, পনির, কেক, ক্রিম , নারিকেল তেল দিয়ে বানানো খাবার

ID: 1633

Context: আন-স্যাচুরেটেড ফ্যাট সমৃদ্ধ খাবার

Question: আন-স্যাচুরেটেড ফ্যাট সমৃদ্ধ খাবার কি কি ?

Answer:

আন-স্যাচুরেটেড সমৃদ্ধ খাবারের মধ্যে মাছের তেল, বাদাম, সূর্যমুখী, জলপাই এবং অন্যান্য ভেজিটেবল অয়েল

ID: 1634

Context: হৃদরোগের ঝুঁকি এড়াতে করনীয়

Question: হৃদরোগের ঝুঁকি এড়াতে কি কি করনীয় ?

Answer:

স্বাস্থ্যসম্মত খাবার খাওয়া– কম তেল চর্বি ও বেশী আঁশযুক্ত খাবার, এবং প্রচুর পরিমাণে ফলমূল,শাক সবজি (দিনে ৫বার) আপনাকে রাখবে সুস্থ সবল এবং রোগ মুক্ত। স্যাচুরেটেড ফ্যাট কলেস্টেরল বাড়ায়,তাই এটা যত সম্ভব কম খাওয়া উচিত। চিনি ও কাঁচা লবন কম খাওয়া, কায়িক শ্রম, উচ্চতা অনুযায়ী ওজন নিয়ন্ত্রণ, ধূমপান ও এলকোহল ত্যাগ এবং নিয়মিত ঔষধ সেবন করুন

ID: 1635

Context: রক্তচাপ নিয়ন্ত্রণ

Question: কিভাবে রক্তচাপ নিয়ন্ত্রণ করা যায় ?

Answer:

একজন মানুষের স্বাভাবিক রক্তচাপ সর্বচ্চ ১৪০/৮৫ মিমি মার্কারি। রক্তচাপ নিয়ন্ত্রণ এ রাখতে আপনার নিয়মিত ব্যায়াম কর এবং তেল চর্বি লবণাক্ত খাবার কম খাওয়া উচিত। কোন ঔষধ থাকলে তাও নিয়মমাফিক সেবন করা উচিত।

ID: 1636

Context: হৃদরোগের লক্ষণসমূহ

Question: হৃদরোগের লক্ষণসমূহ কি কি ?

Answer:

হৃদরোগের প্রধান উপসর্গ বা লক্ষণসমূহ হচ্ছে বুকে ব্যাথা (যাকে ডাক্তারি ভাষায় এনজাইনা বলা হয়) এবং হার্ট এটাক। তাছাড়াও বুক ধরফর, অস্বাভাবিক হাপানি, হঠাত করে অত্যাধিক ঘাম হওয়া ইত্যাদিও হৃদরোগের লক্ষণ হতে পারে। এমনকি অনেক সময় কোনো লক্ষণ না থাকলেও আপনার হৃদরোগ থাকতে পারে ।

ID: 1637

Context: থ্রম্বসিস

Question: থ্রম্বসিস কি ?

Answer:

কোন রক্তবাহী ধমনি বা শিরাতে রক্ত জমাট বেধে গেলে সেটাকে থ্রম্বসিস বলা হয়। এরকম কোন থ্রম্বসিস যদি আপনার হৃৎপিণ্ডকে সরবরাহকারী কোন ধমনিতে হয়, তাহলে আপনার হৃৎপিণ্ডে রক্ত সরবরাহ কমে গিয়ে হার্ট অ্যাটাক হতে পারে। থ্রম্বসিস সাধারণত এথেরস্ক্লেরসিস এর জন্য এবং একই জায়গায় হয়ে থাকে যাকে ‘ফারিং অব দি করোনারী আরটারি’ বলা হয়।

ID: 1638

Context: অনিয়মিত হৃদ স্পন্দন

Question: কোন কোন কারণে হৃদপিণ্ড দ্রুত, জোরে জোরে বা অনিয়মিতভাবে স্পন্দিত হতে পারে ?

Answer:

● থায়রয়েড গ্রন্থি অত্যধিক সক্রিয় হলে ● রক্তে শর্করার পরিমান কমে গেলে ● রক্তস্বল্পতা (anaemia ) থাকলে ● রক্তচাপ কম হলে ● বেশি জ্বর (১০০º ফারেনহাইট বা ৩৮º সেলসিয়াসের বেশি) হলে ● শরীরে পানিশূন্যতা হলে ● হৃদরোগ হলে

ID: 1639

Context: হৃদরোগ

Question: কখন হৃদরোগ হতে পারে ?

Answer:

যদি আপনার ঘন ঘন বুক ধড়ফড় করে, বা এর সাথে মাথা ঘোরা বা বুকে চাপ অনুভব করেন তাহলে আপনার চিকিৎসকের শরণাপন্ন হন। আপনি হয়ত অনিয়মিত হৃদস্পন্দনের (arrhythmia) সমস্যায় ভুগছেন। চিকিৎসক আপনার হৃদপিণ্ডের স্পন্দনের গতি ও ছন্দ মাপার জন্য ইলেক্ট্রোকার্ডিওগ্রাম (ECG) করবেন। এর দ্বারা আপনার কোন সমস্যা আছে কি না এবং চিকিৎসার প্রয়োজন আছে কি না তা তাৎক্ষনিকভাবে বুঝা যাবে। তবে, পরীক্ষা করার সময় যদি আপনার বুক ধড়ফড় না করে তাহলে ECG-তে পুরোপুরি স্বাভাবিক রিপোর্ট আসবে। আরও পরীক্ষা করার প্রয়োজন হতে পারে যা, আপনার ডাক্তার ঠিক করবে। হৃদস্পন্দনের সবচেয়ে সাধারণ সমস্যাগুলোর একটি হচ্ছে অ্যাট্রিয়াল ফিব্রিলেশন (Atrial fibrillation), এবং এটি মস্তিস্কের রক্তক্ষরণ (stroke)-এর অন্যতম প্রধান কারন, যার ফলে রোগি চিরতরে পঙ্গু হয়ে যেতে পারে। যাদের বয়স ৫৫-এর উপরে তারা সাধারনত অ্যাট্রিয়াল ফিব্রিলেশনে আক্রান্ত হয়। এর ফলে দ্রুত, অনিয়মিত হৃদস্পন্দন হয়, যার ফলে বার বার বুক ধড়ফড় করে। এর সাথে সাথে আপনি মাথা ঘোরা, শ্বাস কষ্ট ও প্রবল ক্লান্তি অনুভব করতে পারেন। অ্যাট্রিয়াল ফিব্রিলেশনের কারণে সাধারণত জীবন সংশয় হয় না তবে, এটি অস্বস্তিকর হতে পারে এবং চিকিৎসা দরকার হতে পারে। অ্যাট্রিয়াল ফিব্রিলেশনের মতই আরেকটি অসুখ হচ্ছে সুপরাভেন্ট্রিকুলার ট্যাকিকার্ডিয়া বা SVT (Supraventricular tachycardia)। এর ফলেও হৃদপিণ্ড মাঝে মাঝে খুব দ্রুত স্পন্দিত হয়, কিন্তু তা সাধারনত একই ছন্দে চলতে থাকে এবং অনিয়মিতভাবে স্পন্দিত হয়না। SVT-এর আক্রমন সাধারণত বিপদজনক নয় এবং এটি কোন রকম চিকিৎসা ছাড়া নিজে নিজেই স্বাভাবিক হয়ে যায়। তবে এটি দীর্ঘ সময় ধরে হলে চিকিৎসকের শরণাপন্ন হওয়া উচিত। হৃদস্পন্দনের ছন্দের অন্যান্য সমস্যার কারণেও বুক ধড়ফড় করতে পারে, যা পরীক্ষার মাধ্যমে নিশ্চিত হওয়া সম্ভব। যদি আপনার চিকিৎসক আপনার হৃদপিণ্ডের সমস্যাটি সঠিকভাবে নির্ণয় করতে সমর্থ হন তবে সেটি কি ধরনের তা আপনাকে বুঝিয়ে বলতে বলুন। আপনি আমাদেরকেও আপনার পরীক্ষার রিপোর্টগুলো পাঠাতে পারেন এবং মায়া আপার (Maya Apa) পরামর্শ নিতে পারেন।

ID: 1640

Context: হৃদরোগের কারণ

Question: হৃদরোগের কারণ কি ?

Answer:

করোনারি হার্ট ডিজিজ এর প্রধান কারণ হচ্ছে করোনারি ধমনির দেয়াল এ প্লাক (plaque) জমা হওয়া। এই প্লাক একধরনের ফ্যাট যা সাধারণত কোলেস্টেরল এবং অন্যান্য জিনিস এর সংমিশ্রণ এর তৈরি, এবং একে মেডিকেল ভাষায় ‘এথেরমা’ বলা হয়। এথেরমা জমা হয়ে ধমনি সংকুচিত হয়ে তা দিয়ে স্বাভাবিক রক্ত প্রবাহ বন্ধ হয়ে যাওয়া কে ‘এথেরোসক্লেরোসিস’ বলে ।

ID: 1641

Context: হৃদরোগের কারণ

Question: কাদের হৃদরোগের হওয়ার সম্ভাবনা বেশী?

Answer:

যারা ধূমপায়ী \* যারা উচ্চ রক্তচাপ এ ভুগছেন \* যাদের রক্তে কোলেস্টেরল এর মাত্রা বেশি \* ডায়াবেটিস এর রোগী \* যারা শারীরিক পরিশ্রম কম করেন \* যারা অতিরিক্ত মোটা \* যাদের পরিবারে হৃদরোগের ইতিহাস আছে

ID: 1642

Context: কোলেস্টেরল এবং হৃদরোগের

Question: কোলেস্টেরল কি হৃদরোগের কারন?

Answer:

কোলেস্টেরল যকৃত দারা উৎপাদিত এক ধরনের ফ্যাট । এটি আমাদের সুস্থতার জন্য আবশ্যক কিন্তু রক্তে অতিমাত্রায় কোলেস্টেরল আপনার হৃদরোগের কারণ হতে পারে । রক্তে কোলেস্টেরল একধরনের প্রোটিনের ভেতর থাকে যাকে লাইপোপ্রোটিন বলা হয়।এই লাইপোপ্রোটিন দুই ধরনের হতে পারে- লো-ডেনসিটি লাইপোপ্রোটিন (এলডিএল) বা হাই-ডেনসিটি লাইপোপ্রোটিন(এইচডিএল)। এলডিএল,যাকে ‘খারাপ কোলেস্টেরল’ নামেও ডাকা হয়, তা কোলেস্টেরলকে যকৃত থেকে কোষ এ সরবরাহ করে। এলডিএল কোলেস্টেরল আমাদের রক্ত সরবরাহকারী ধমনির দেয়াল এ জমা হয়ে আমাদের হৃদরোগের সম্ভাবনা বাড়ায়। এইচডিএল, বা ‘ভালো কোলেস্টেরল’,কোষ থেকে যকৃতে কোলেস্টেরল নিয়ে যায় যেখানে যকৃত কোলেস্টেরলকে ভেঙ্গে ফেলে এবং শরীর থেকে বর্জ্য হিসেবে বের করে দেয়।

ID: 1643

Context: ধূমপান এবং হৃদরোগের

Question: ধূমপান কি হৃদরোগের কারন?

Answer:

ধূমপান স্বাস্থ্যের জন্য ক্ষতিকর আমরা সবাই জানি। তামাকে থাকা নিকোটিন এবং ধোঁয়ায় থাকা কার্বন মনো অক্সাইড আপনার হার্ট-বিট বাড়ায় এবং আপনার রক্ত ঘন করে তোলে যার জন্য রক্ত জমাট বাধার সম্ভাবনা বেরে যায়। এসব ছাড়াও অন্যান্য অনেক ক্ষতিকর পদার্থ থাকে যা সরাসরি যেসব ধমনি আপনার হৃৎপিণ্ড কে রক্ত সরবরাহ করে সেসব কে দুর্বল করে দেয়। একটি গবেষণায় বের হয়ে এসেছে যে ধূমপান আপনার হৃদরোগের আশংকা ২৪% বাড়িয়ে দেয়।

ID: 1644

Context: ডায়াবেটিস এবং হৃদরোগ

Question: ডায়াবেটিস কি হৃদরোগের কারন?

Answer:

ডায়াবেটিস আপনার ধমনির দেয়াল মোটা করে তোলে যা রক্ত সরবরাহকে বাধাগ্রস্ত করে তোলে এবং হৃদরোগের সম্ভাবনা বাড়িয়ে দেয়।

ID: 1657

Context: বেশি বয়সে সহবাস

Question: ৬০ বছরের চেয়ে বেশি বয়সের ব্যক্তিরাও কি সহবাস করেন?

Answer:

হ্যা, এটা সম্ভব। তবে এটা সম্পূর্ণরূপে সেই দম্পতির উপর নির্ভর করে।

ID: 1687

Context: -1

Question: মায়ের গর্ভে শিশুকে ঘিরে যে জলের মত আস্তরন থাকে সেটা কীভাবে তৈরি হয়?

Answer:

জলের মত সেই আস্তরন জরায়ুর ভিতরে তৈরী হয়। নিষিক্ত ডিম্বাণু যখন জরায়ুর ভিতরে স্থাপিত হয় তখন তার চার পাশে বিভিন্ন অ্যাামিনো এসিড ও তরল পদার্থ জমা হয়ে সেই জলের আস্তরন তৈরি করে।

ID: 1827

Context: রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা

Question: রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা কি?

Answer:

রোগপ্রতিরোধ ক্ষমতা দেহ কে বিভিন্ন রোগ থেকে সুরক্ষা প্রদান করে। রক্তের শ্বেতরক্তকনিকা দেহের রোগপ্রতিরোধ ক্ষমতা গড়ে তুলতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। দেহে কোন ভাইরাস, ব্যাকটেরিয়া বা প্যারাসাইট প্রবেশ করলে শ্বেতরক্তকণিকা ফ্যাগসাইটসিস প্রক্রিয়ায় এদেরকে ধ্বংস করে এবং দেহকে সুরক্ষা প্রদান করে।

ID: 1860

Context: নার্কোলেপ্সি

Question: নার্কোলেপ্সি কি?

Answer:

নার্কোলেপ্সি এমন একটি রোগ যা আপনার মস্তিষ্কের ঘুম থেকে ওঠা চক্রের নিয়ন্ত্রণযুক্ত ক্ষমতায় বাধা সৃষ্টি করে। একটি ব্যক্তি জেগে উঠার পরে বিশ্রান্ত বোধ করতে পারেন কিন্তু পরে সারা দিন ধরে নিদ্রালু অনুভব হয়। জানা যায় যে এই রোগটির দ্বারা প্রতি 2,000 জনের মধ্যে 1 জন নারী বা পুরুষ উভয়েই সমানভাবে প্রভাবিত হতে পারেন। এটি দৈনিক কাজকর্মে বাধা সৃষ্টি করে, এবং ব্যক্তিটি গাড়ী চালানো, খাওয়া ও কথা বলা ইত্যাদির মাঝেও ঘুমিয়ে পড়তে পারেন।

ID: 1861

Context: নার্কোলেপ্সির প্রধান কারণগুলি

Question: নার্কোলেপ্সির প্রধান কারণগুলি কি কি?

Answer:

যদিও নার্কোলেপ্সি হওয়ার সঠিক কারণ অজানা, তবুও একাধিক কারণগুলিকে নার্কোলেপ্সি ঘটার জন্য দায়ী বলে মনে করা হয়। নার্কোলেপ্সির সাথে ক্যাটাপ্লেক্সি যুক্ত প্রায় সমস্ত ব্যক্তিদের শরীরে হাইপোক্রেটিন নামক রাসায়নিকটি অতি স্বল্প মাত্রায় থাকে, যা অনিদ্রা ঘটায়। আবার ক্যাটাপ্লেক্সি ছাড়া নার্কোলেপ্সি যুক্ত ব্যক্তিদের হাইপোক্রেটিনের স্বাভাবিক মাত্রা থাকে।কম হাইপোক্রেটিনের মাত্রা থাকা ছাড়া, নার্কোলেপ্সি হওয়ার অন্যান্য বিষয়গুলি হল:মস্তিষ্কে আঘাত।

নার্কোলেপ্সির একটি পারিবারিক ইতিহাস।

অটোইমিউন অসুখ।

ID: 1862

Context: নার্কোলেপ্সি নির্ণয় ও চিকিৎসা

Question: নার্কোলেপ্সি কিভাবে নির্ণয় ও চিকিৎসা করা হয়?

Answer:

ব্যক্তির চিকিৎসার ইতিহাস নিয়ে স্বাস্থ্য পরীক্ষা করার পর, চিকিৎসক রোগটি নির্ণয় করতে যে দুটি বিশেষ পরীক্ষা পদ্ধতি করতে দিতে পারেন তা হল:পলিসোম্নগ্রাম: এটি সারারাত ধরে চলা শ্বাসপ্রশ্বাস, চোখের নড়াচড়া, ও মস্তিষ্ক এবং পেশীর গতিবিধির একটি ফলাফল দেয়।

অসংখ্য ঘুমের সুপ্তাবস্থা পরীক্ষা: এই পরীক্ষার মাধ্যমে দেখা হয় যে একজন ব্যক্তি কাজের মাঝখানে ও দিনে কতবার ঘুমাতে পারেন।যদিও নার্কোলেপ্সির সেরকম কোন প্রতিকার নেই, জীবনযাপনের পরিবর্তন ও ওষুধগুলি উপসর্গগুলিকে নিয়ন্ত্রণ করতে এবং অবস্থাটিকে ভাল করতে সাহায্য করে। সাধারণত চিকিৎসক অ্যান্টিডিপ্রেসেন্টস, অ্যাম্ফিটামিনের মত উত্তেজক ওষুধগুলি ব্যবহারের পরামর্শ দিয়ে থাকেন।নীচে দেওয়া জীবনযাত্রা পরিবর্তনের ফলে নার্কোলেপ্সির বিরুদ্ধে কিছু সাহায্য পাওয়া যেতে পারে:নিয়মিত ব্যায়াম।

হালকা কিছুক্ষণ ঘুমানো।

ঘুমাতে যাওয়ার আগে মদ্যপান বা ক্যাফিন এড়িয়ে চলা।

ধূমপান এড়িয়ে চলা।

বিছানায় যাওয়ার আগে শান্ত হওয়া।

ঘুমাতে যাওয়ার আগে ভারী বা বেশি খাবার খাওয়া এড়িয়ে চলা।

ID: 1870

Context: কুষ্ঠ রোগ

Question: কুষ্ঠ রোগ কি?

Answer:

কুষ্ঠ বা হ্যানসেন রোগটি ম্যাইকোব্যাকটেরিয়াম লেপরের কারণে সৃষ্ট ত্বক এবং স্নায়ুর সংক্রমণ বিশেষ। এই অবস্থায় ত্বক, শ্লৈষ্মিক ঝিল্লি, পেরিফেরাল স্নায়ু, চোখ এবং শ্বাসযন্ত্র প্রভাবিত হয়।ওয়ার্ল্ড হেলথ অর্গানাইজেশন (ডাব্লুএইচও) অনুসারে, কুষ্ঠ সম্ভবত শ্বাসযন্ত্রের মাধ্যমে এবং পোকামাকড়ের মাধ্যমে ছড়ায়, আবার অন্যদিকে বেশীরভাগ মানুষ মনে করেন সংক্রামিত ব্যক্তির সাথে ঘনিষ্ঠ যোগাযোগের মাধমেও ছড়ায়।

ID: 1871

Context: কুষ্ঠ রোগের প্রধান লক্ষণ ও উপসর্গগুলি

Question: কুষ্ঠ রোগের প্রধান লক্ষণ ও উপসর্গগুলি কি কি?

Answer:

এই অবস্থার উপসর্গগুলি স্পষ্ট দেখা যায় যা এই রোগকে সহজে সনাক্ত করতে সাহায্য করে:ফ্যাকাশে দাগ বা ছোপযুক্ত চামড়া, মূলত মসৃণ।

অসার ও বিবর্ণ ক্ষত যা পার্শ্ববর্তী এলাকার তুলনায় হালকা বর্ণের।

চামড়ার উপর ক্ষুদ্র উঁচু ফোঁড়া জাতীয় বস্তু।

শুষ্ক ও শক্ত চামড়া।

পায়ের পাতার নিচের অংশে ঘা।

মুখের বা কানের কিছু অংশ উঁচু হয়ে ফুলে যাওয়া।

চোখের পাতা ও ভ্রূ র সম্পূর্ণ বা আংশিক ক্ষতি বা নষ্ট হয়ে যাওয়া।অন্যান্য উপসর্গের মধ্যে রয়েছে:সংক্রামিত জায়গায় অসারভাব ও ঘাম হওয়া।

পঙ্গু হয়ে যাওয়া।

পেশীতে দুর্বলতা।

নার্ভের বা স্নায়ুর বৃদ্ধি, বিশেষত কনুই ও হাঁটুর চারপাশে।

মুখের নার্ভে বা স্নায়ুতে প্রভাব পরার দরুন অন্ধত্ব।পরবর্তী পর্যায়ে, এটির ফল যা হতে পারে:পা ও হাত অসমর্থ হয়ে যাওয়া।

আঙ্গুল ও পা ছোট হয়ে যাওয়া এবং শুকিয়ে যাওয়া।

পায়ের আলসার বা ঘা ভাল না হওয়া।

নাক বিকৃত হয়ে যাওয়া।

চামড়ায় জ্বালাভাব অনূভব করা।

ব্যথাযুক্ত বা সংবেদনশীল স্নায়ু।

ID: 1872

Context: কুষ্ঠ রোগের প্রধান কারণগুলি

Question: কুষ্ঠ রোগের প্রধান কারণগুলি কি?

Answer:

কুষ্ঠরোগটি ম্যাইকোব্যাকটেরিয়াম লেপরে নামক ব্যাকটেরিয়ার কারণে হয় যা সাধারণত আমাদের পরিবেশে থাকে। জিনগত পরিবর্তন এবং বৈচিত্র্য কুষ্ঠরোগের সম্ভাবনা বৃদ্ধি করে। একইভাবে, প্রতিরক্ষা পদ্ধতিতে পরিবর্তন এবং প্রদাহের ফলে এটি হওয়ার সম্ভাবনা বৃদ্ধি পায়। রোগটি দীর্ঘস্থায়ী সংক্রামিত ব্যক্তির সাথে দীর্ঘস্থায়ী যোগাযোগের কারণে বা বাতাসে নিঃশ্বাস নেওয়ার সময় নাসারন্দ্রের মাধ্যমে প্রবেশ করা ব্যাকটেরিয়ার কারনেও ছড়াতে পারে।

ID: 1873

Context: কুষ্ঠ রোগ নির্ণয় ও চিকিৎসা

Question: কুষ্ঠ রোগ কিভাবে নির্ণয় ও চিকিৎসা করা হয়?

Answer:

কুষ্ঠরোগ নির্ণয় করা হয় ত্বকের রঙের দ্বারা যা ত্বকের আসল রঙের চেয়ে গাঢ় বা হালকা হয়। এই ছোপগুলি লালচে হতে পারে।পরীক্ষার ফলাফল নিশ্চিত করতে, ডাক্তার একটি ত্বক বা নার্ভ বায়োপসি পরিচালনা করতে পারে।এই অবস্থায় এন্টিবায়োটিকের দ্বারা চিকিৎসা করা যাতে পারে, এই বহু-ড্রাগ থেরাপি অ্যান্টিবায়োটিক সহ্য করার ক্ষমতা এড়াতে গুরুত্বপূর্ণ। এর মধ্যে অন্তর্ভুক্ত ড্যাপসন, ক্লোফাজিমিন ও রিফাম্পিসিন।যদি এই ওষুধ থেকে অ্যালার্জি হয় তাহলে মিনোসাইক্লিন, ক্ল্যারিথ্রোমাইসিন ও অফ্লক্সাসিন কার্যকারী বিকল্প।সারহীনতা এড়াতে বিশেষ জুতাগুলি বেছে নিন যা পাটিকে সুরক্ষিত করে স্বাভাবিক গতিপথে আনবে। অস্ত্রোপচারের মাধ্যমে দৃশ্যমান বিকৃতির চিকিৎসা করা যেতে পারে এবং আত্মবিশ্বাস উন্নত করতে সাহায্য করে।সম্পূর্ণভাবে, এই রোগের চিকিৎসা করতে প্রায় এক বছরের উপর লাগবে। আপনার ডাক্তারের কাছ থেকে দ্রুত পরামর্শ নেওয়া গুরুত্বপূর্ণ। জোর করে সময় মতো চিকিৎসা করলে এটি সম্পূর্ণ নির্মূল হতে পারে।

ID: 1874

Context: জক ইচ

Question: জক ইচ কি?

Answer:

জক ইচ হল কুঁচকির এলাকার চারপাশের ত্বকের একটি ফাঙ্গাল সংক্রমণ। এটিকে দাদ বা চিকিৎসাগতভাবে, টিনিয়া ক্রুরিসও বলা হয়। এটি একটি খুবই সাধারণ ত্বকের সংক্রমণ এবং কুঁচকির এলাকায় ভাসাভাসাভাবে প্রভাব ফেলে। এটি জীবনের জন্য ঝুঁকিদায়ক অবস্থা নয় কিন্তু গুরুত্বপূর্ণ অস্বস্তি এবং সামাজের কাছে বিব্রতকর অবস্থা সৃষ্টি করতে পারে।

ID: 1875

Context: জক ইচের প্রধান লক্ষণ এবং উপসর্গগুলো

Question: জক ইচের প্রধান লক্ষণ এবং উপসর্গগুলো কি কি?

Answer:

জক ইচ কুঁচকির এলাকার চারপাশে প্রভাব ফেলে। যাইহোক, এটি ভিতরের উরু, নিতম্ব এবং কিছু ক্ষেত্রে, পেটে ছড়িয়ে পড়তে পারে। উপস্থে সাধারণত প্রভাব ফেলে না। এটি বেশিরভাগ খেলোয়াড় বা স্থূলকায় ব্যক্তিদের মধ্যে বারংবার হতে দেখা যায়। নিম্নলিখিত লক্ষণ এবং উপসর্গগুলি জক ইচের ইঙ্গিত দিতে পারে:প্রভাবিত ত্বকের রঙের পরিবর্তন হয়ে যায়, সাধারণত, প্রভাবিত জায়গায় লালচে ভাব দেখা দেয়।

বিজগুরির মতো দেখায়, যা আকারে গোল হয় (আরও পড়ুন: ত্বকের বিজগুরির চিকিৎসা)।

ক্ষতর জায়গাটা খুবই প্রবলভাবে চিহ্নিত হয়ে যায়।

ক্ষতিগ্রস্ত এলাকার সমকেন্দ্রিক বৃত্তের ভিতর স্বাভাবিক দেখতে চামড়া থাকতেও পারে।

ক্ষতটি একটু উঁচু দেখাবে।

ক্ষতটি সহ ফোস্কা হতে পারে।

চুলকুনি এবং অস্বস্তি সাধারণতভাবে দেখা যায়।

ব্যায়াম করলে উপসর্গগুলি আরও খারাপ হয়।এটি একটি পুনরাবৃত্তিমূলক সংক্রমণ এবং অতীতে যদি কেউ জক ইচে ভুগে থাকেন, তারা ভবিষ্যতেও সম্ভবত আক্রান্ত হতে পারেন। আবার, কিছু সময়, কুঁচকির এলাকার সংক্রমণটি পায়ের সংক্রমণের সাথে সংমিশ্রণে দেখা যায়।

ID: 1876

Context: জক ইচের প্রধান কারণগুলি

Question: জক ইচের প্রধান কারণগুলি কি কি?

Answer:

এটি হল একটি ফাঙ্গাল সংক্রমণ, যা ছোঁয়াচে। ত্বকের উপরিতলের উপর ছত্রাকের বৃদ্ধিটি যা আর্দ্র এবং উষ্ণ হয়। তাই, খুবই টাইট বা ভেজা অন্তর্বাস পড়লে তা ঝুঁকির বিষয় হতে পারে। অতিরিক্ত ওজনের ব্যক্তিদের যাদের ত্বকের ভাজ ছুঁতে থাকে, তাদেরও একটি বিশাল ঝুঁকি থাকে। সংক্রামিত টাওয়েল, চাদর ইত্যাদি ব্যবহার করার মাধ্যমে জক ইচ ছড়াতে পারে। যেহেতু এটি ভিষন ছোঁয়াচে তাই সংস্পর্শের মাধ্যমে আপনার শরীরের অন্য অংশেও ছড়িয়ে যেতে পারে। এই অবস্থাটি মহিলাদের থেকে পুরুষদের বেশি প্রভাবিত করে। যে ফাঙ্গিগুলি জক ইচের কারণ, সেইগুলি হল এপিডারমোফাইটন ফ্লকোসাম এবং ট্রাইকোফাইটন রুব্রাম।

ID: 1877

Context: জক ইচ নির্ণয় এবং চিকিৎসা

Question: জক ইচ কিভাবে নির্ণয় এবং চিকিৎসা করা হয়?

Answer:

রোগীর মেডিকেল ইতিহাস এবং প্রভাবিত জায়গাটা পরীক্ষা করে রোগ নির্ণয় করা হয়। তবুও, একটি পটাসিয়াম হাইড্রক্সাইড (কেওএইচ) স্লাইড তৈরি হতে পারে যা 4-6 সপ্তাহের মধ্যে ছত্রাকের ধরন নিশ্চিত করতে পারে। যেহেতু টিনিয়া ক্রুরিস হল একটি মৃদু সংক্রমণ তাই এটিতে সাধারণত দিনে 2-3 বার টপিকাল আন্টিফাঙ্গালস দিয়ে চিকিৎসা করা হয়। 3 থেকে 4 সপ্তাহের মধ্যে সাধারণত এই সংক্রমটি সম্পূর্ণভাবে সেরে যায়। এলাকাটিকে শুষ্ক রাখতে যত্ন নেওয়া উচিত এবং ভালো পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতার নিয়ম বজায় রাখা উচিত।

ID: 2047

Context: খাদ্যাভাসের ওপর গবেষণা

Question: বিভিন্ন ধরনের খাদ্যাভাসের ওপর গবেষণা রিপোর্ট কি?

Answer:

সাম্প্রতিককালের একাধিক গবেষণায় দেখা গেছে যারা প্রাকৃতিক ও সুষম খাদ্যে অভ্যস্ত তাদের মানসিক স্বাস্থ্য প্রক্রিয়াজাত খাবারে অভ্যস্ত ব্যাক্তিদের চেয়ে ভালো থাকে। এই গবেষণাগুলো করা হয়েছিল মূলত ভূমধ্যসাগরীয় খাদ্যাভাসকে প্রক্রিয়াজাত খাদ্যাভাসের সাথে তুলনা করে। ভূমধ্যসাগরীয় খাদ্যাভাসে প্রধানত রয়েছে স্বাস্থ্যকর চর্বিসমৃদ্ধ মাছ, অলিভ অয়েল এবং শাকসবজি। স্বাস্থ্যকর খাদ্য বিষণ্ণতা কমাতেও সাহায্য করে বলে দেখা গেছে।

ID: 2117

Context: অপুষ্টির সমস্যা

Question: অপুষ্টিতে ভুগলে কি সমস্যা হয়?

Answer:

অপুষ্টিতে ভুগলে যে কোনো সংক্রমণের সম্ভাবনা বেড়ে যায়। মাসিকের সময় অপরিষ্কার কাপড়

ব্যবহার করলে বা পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন না থাকলে প্রজননতন্ত্রের সংক্রমণ হতে পারে।

ID: 2124

Context: পুষ্টি নিয়ে মেনে চলার বিষয়

Question:

পরিবারে কি মেনে চলতে হবে পুষ্টি নিয়ে?

Answer:

■ শাকসবজি ও ফলমূল কাটার আগে নিরাপদ ও পরিষ্কার পানি দিয়ে ধুয়ে নিতে হবে

■ খাবারের পুষ্টিগুণ বজায় রাখতে অল্পতাপে, ঢাকনা দিয়ে রান্না করতে হবে এবং রান্নার শেষ দিকে আয়োডিনযুক্ত লবণ যোগ করতে হবে

■ দিনে অন্ততপক্ষে ২ লিটার (৮ গ্লাস) নিরাপদ পানি পান করতে হবে

■ সপ্তাহে ২টি আয়রন ফলিক এসিড ট্যাবলেট

■ ৬ মাস অন্তর কৃমিনাশক ট্যাবলেট খেতে হবে

: ভাতের সাথে লেবু ও কাঁচা মরিচ খাওয়ার অভ্যাস গড়ে তুলতে হবে

■ স্বাস্থ্যসম্মত পায়খানা ব্যবহার করতে হবে এবং জুতা বা স্যান্ডেল পরে পায়খানায় যেতে হবে

# খাবার তৈরি ও গ্রহণের আগে এবং শৌচকর্মের পরে পরিষ্কার পানি ও সাবান দিয়ে হাত ধুতে হবে ।

ID: 2125

Context: সুষম ও পুষ্টিকর খাবার

Question: সুষম ও পুষ্টিকর খাবার কি কি ?

Answer:

শর্করা জাতীয় খাবার :

ভাত, আটা বা ময়দার রুটি, পাউরুটি, আলু, মিষ্টিআলু, মুড়ি, চিড়া, খৈ, চিনি, মধু প্রভৃতি ।

চর্বি জাতীয় খাবার :

তেল, মাখন, ঘি, মাছ-মাংসের চর্বি প্রভৃতি ।

আমিষ জাতীয় খাবার :

ডিম, মাছ, মাংস, কলিজা, ছোটমাছ, দুধ, সয়াবিন ও অন্যান্য ডাল, বাদাম, সিমের বিচি প্রভৃতি।

ভিটামিন ও খনিজসমৃদ্ধ খাবার :

(শাক, সবজি ও ফল জাতীয় খাবার) কচুশাক, পুঁইশাক, কলমিশাক, পালংশাক, পাকা আম, পাকা তাল, পাকা পেঁপে, পাকা কাঁঠাল, আনারস, পেয়ারা, আমলকি, আমড়া, কলা, লেবু, গাজর, মিষ্টিকুমড়া, শিম, ছোটমাছ, দুধ, ডিম, কলিজা প্রভৃতি ।

ID: 2136

Context: কিশোর বান্ধব স্বাস্থ্যসেবা

Question: কিশোর বান্ধব স্বাস্থ্যসেবা কোথায় যেতে হবে?

Answer:

কৈশোরকালীন স্বাস্থ্য বিষয়ক তথ্য, সমস্যার সমাধান ও পরামর্শ পেতে

\* ইউনিয়ন স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ কেন্দ্ৰ

উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স \* মা ও শিশু কল্যাণ কেন্দ্ৰ

\* জেলা হাসপাতাল স্কুল হেলথ ক্লিনিক নির্দিষ্ট এনজিও ক্লিনিক

ID: 2137

Context: কৈশোরের খাবার

Question: কৈশোরে কি ধরনের খাবার খাওয়া উচিত?

Answer:

কৈশোরে অতিরিক্ত শক্তি এবং পুষ্টি যোগ করার জন্য আমিষ, ভিটামিন, খনিজ, ও লবণসমৃদ্ধ খাবার খেতে উত্তরণ দেওয়া হয়।

ID: 2138

Context: বয়স ও কাজ অনুযায়ী ক্যালরি গ্রহন

Question: ক্যালরি গ্রহণের জন্য বয়স ও দৈনন্দিন কাজের পরিমাণ কেমন হওয়া উচিত?

Answer:

বয়স এবং দৈনন্দিন কাজের পরিমাণ অনুযায়ী ক্যালরি গ্রহণ করা উচিত। ক্যালরি গ্রহণে বয়স কম করে সে কম ক্যালরি এবং বয়স বেশি এবং কাজ বেশি করে সে বেশি ক্যালরি গ্রহণ করতে পারে।

ID: 2139

Context: সুষম খাবার

Question: কোন ধরনের খাবারে আমিষ, ভিটামিন, খনিজ এবং লবণ পাওয়া যায়?

Answer:

আমিষ, ভিটামিন, খনিজ এবং লবণ সহিত খাবারে মাংস, মাছ, ডেয়রি প্রোডাক্ট, সবজি, ফল, এবং খনিজ-যুক্ত খাবার থাকতে পারে।

ID: 2162

Context: পুষ্টি

Question: পুষ্টি কি?

Answer:

পুষ্টি হলো একটি প্রক্রিয়া। এ প্রক্রিয়াতে খাদ্যবস্তু খাওয়ার পরে পরিপাক হয় এবং জটিল খাদ্য উপাদানগুলো ভেঙ্গে সরল উপাদানে পরিণত হয়। মানবদেহ এসব সরল উপাদান শোষণ করে নেয়। এসব খাদ্য উপাদান মানবদেহের শক্তি ও যথাযথ বৃদ্ধি নিশ্চিত করে, মেধা ও বুদ্ধি বাড়ায়, রোগ প্রতিরোধ করে, রোগ-ব্যাধি থেকে তাড়াতাড়ি সুস্থ হতে সাহায্য করে এবং সর্বোপরি কর্মক্ষম করে।

ID: 2163

Context: পুষ্টিকর খাদ্য

Question: পুষ্টিকর খাদ্য কাকে বলে?

Answer:

যেসব খাদ্য খেলে শরীরে তাপ ও শক্তি উৎপাদিত হয়, দেহের গঠন ও বৃদ্ধি হয়, শরীর সবল, কর্মক্ষম থাকে, তাকে পুষ্টিকর খাদ্য বলে। খাদ্য ও পুষ্টি একে অপরের সাথে জড়িত। প্রতিটি খাদ্য অবশ্যই পুষ্টিকর ও নিরাপদ হতে হবে। নিয়মিত পুষ্টিকর খাদ্য গ্রহণ করলে শরীর ও মন ভালো থাকে, মনে প্রফুল্লতা আসে এবং পড়াশোনা ও কাজে মনোযোগ বাড়ে। মনে রাখতে হবে পুষ্টিকর খাদ্য গ্রহণ না করলে রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা কমে যায় এবং শরীরে বিভিন্ন ধরনের রোগ হয়।

ID: 2164

Context: পুষ্টিকর খাাবারের গুরুত্ব

Question: কৈশোরে পুষ্টিকর খাবারের কেন গুরুতপূর্ন ?

Answer:

বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা (WHO) সংজ্ঞা অনুযায়ী ১০-১৯ বছর বয়স সীমাকে কৈশোরকাল (adolescence) বলে। এ সময় ছেলে-মেয়ে উভয়েরই স্বাভাবিক শারীরিক ও মানসিক পরিবর্তন হয়। দ্রুত ওজন ও উচ্চতার বৃদ্ধি এবং বুদ্ধির বিকাশ ঘটে। তাই কিশোর-কিশোরীদের সঠিক বৃদ্ধির জন্য এসময় পরিমাণমতো পুষ্টিকর ও সুষম খাবার গ্রহণ করা প্রয়োজন। সঠিক পুষ্টি নিয়ে বেড়ে উঠলে কিশোর-কিশোরীদের মেধা ও বুদ্ধির বিকাশ হয়। লেখাপড়ায় মনোযোগ, ভালো ফলাফল এবং কাজ করার সক্ষমতা বৃদ্ধি পায়।

ID: 2165

Context: খাদ্য

Question: খাদ্য কি?

Answer:

মানবদেহকে সুস্থ-সবল রাখার জন্য খাদ্য অপরিহার্য। খাদ্য বলতে সেই সকল জৈব উপাদানকে বোঝায় যেগুলো মানবদেহ গঠনে ভূমিকা রাখে, ক্ষয়পূরণ করে, শক্তি বৃদ্ধিসহ রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা তৈরি করে। মানুষ খাদ্য থেকে পুষ্টি গ্রহণ করে।

ID: 2166

Context: বি.এম.আই. (Body Mass Index) পরিমাপ

Question: কিভাবে বি.এম.আই. (Body Mass Index) পরিমাপ করা যায়?

Answer:

ওজন ও উচ্চতা পরিমাপক যন্ত্র, সমতল ও সুবিধাজনক জায়গায় সেট করতে হবে। ওজন পরিমাপের সময় যথাসম্ভব স্বল্প কাপড় পরিধান করতে হবে এবং উচ্চতা পরিমাপের সময় জুতা/স্যান্ডেল খুলে কাঁধ সোজা রেখে সামনের দিকে তাকিয়ে উচ্চতা পরিমাপ করতে হবে।

ID: 2167

Context: কিশোর-কিশোরীদের দৈনিক নমুনা খাদ্যতালিকা

Question: একজন কিশোর-কিশোরীদের দৈনিক নমুনা খাদ্যতালিকা কেমন হওয়া উচিৎ?

Answer:

\* তাপ ও শক্তি উৎপাদনকারী খাদ্য (শর্করা জাতীয় খাবার- ভাত, রুটি, চিড়া, মুড়ি, আলু, মিষ্টি আলু)

সকালের খাবারঃ-

\* মাঝারি সাইজের ২/৩টি রুটি অথবা ২টি পরোটা অথবা ১ বাটি ভাত

\* বাড়িতে তৈরি নাস্তা জাতীয় খাবার (চিড়া/মুড়ি গুড়) ও পাকা কলা

\* মধ্য-সকালের নাস্তা

দুপুরের খাবারঃ-

\* ২/৩ বাটি ভাত

বিকালের নাস্তা

রাতের খাবারঃ-

\* ২/৩ বাটি ভাত

\* শরীরের ক্ষয়পূরণ ও বৃদ্ধিকারক খাদ্য (আমিষ জাতীয় খাবার- ডিম, মাছ, মাংস, দুধ, ডাল ও বিচি জাতীয় খাবার)

\* ১টি ডিম অথবা ১ বাটি ডাল

\* ১ বাটি মাঝারি ঘন ডাল ও ১ টুকরা (মাঝারি সাইজের) মাছ/মাংস/কলিজা

\* ১ গ্লাস দুধ অথবা দুধ দিয়ে তৈরি ঘন যেকোনো খাবার (ফিরনি/সেমাই/ পায়েস/ পিঠা/দই ইত্যাদি)

\* ১ বাটি ঘন ডাল (যদি সম্ভব হয় ১ টুকরা মাছ/ মাংস)

\* রোগ প্রতিরোধকারী খাদ্য (ভিটামিন ও খনিজ | উপাদান সমৃদ্ধ খাবার- রঙ্গিন শাক অথবা সবজি, দেশি মৌসুমী ফল)

\* ১ বাটি সবজি (২/৩ রকম সবজি মিশিয়ে) অথবা সবজি ভাজি (পটল ভাজি, পেঁপে ভাজি ইত্যাদি)

\* যেকোনো দেশি মৌসুমী ফল (আম, কাঁঠাল, পেঁপে, আনারস ইত্যাদি)। ঋতুভেদে যেসব ফল সহজেই আমরা পাই।

\* ১ বাটি শাক (লাল শাক, কচু শাক, পুঁই শাক) অথবা সবজি।

\* যেকোনো দেশী মৌসুমী ফল। ঋতুভেদে যেসব ফল সহজেই আমরা পাই।

ID: 2168

Context: কৈশোরকালীন অপুষ্টি প্রতিরোধ

Question: কিভাবে কৈশোরকালীন অপুষ্টি প্রতিরোধ করা যায়?

Answer:

\* সুষম খাবার, যেমন - শর্করাজাতীয় খাবার (ভাত, রুটি, মুড়ি, চিনি, গুড়, মধু, আলু, চিড়া ইত্যাদি), আমিষজাতীয় খাবার (ডিম, দুধ, মাছ, মাংস, ডাল, বাদাম, বিচি ইত্যাদি), আয়রনসমৃদ্ধ খাবার (মাংস, কলিজা এবং গাঢ় সবুজ শাক-সবজি), ভিটামিন এ সমৃদ্ধ খাবার (কলিজা, পাকা পেঁপে, আম, গাজর, মিষ্টি কুমড়া, ছোট মাছ, ডিম, সবুজ শাক-সবজি ও হলুদ রঙের ফলমূল) খাওয়া

\* প্রতিদিন ভিটামিন সি-যুক্ত খাবার খাওয়া

\* আয়োডিনসমৃদ্ধ খাবার (সামুদ্রিক মাছ এবং সমুদ্র তীরবর্তী এলাকার শাক-সবজি) এবং আয়োডিনযুক্ত লবণ খাওয়া

\* প্রতিদিন ১০-১২ গ্লাস পানি পান করা

\* চিকিৎসক বা স্বাস্থ্যকর্মীর পরামর্শ অনুযায়ী কিশোরীদের আয়রন-ফলিক অ্যাসিড (IFA) ট্যাবলেট খাওয়া (প্রতি সপ্তাহে ১টি করে খাবে)

\* প্রত্যেক কিশোর-কিশোরীকে চিকিৎসকের পরামর্শ অনুযায়ী ছয়মাস পর পর কৃমিনাশক বড়ি গ্রহণ করা

\* খাবার খাওয়ার আগে ও পরে সাবান এবং নিরাপদ পানি দিয়ে হাত ধোয়া

\* স্বাস্থ্যসম্মত টয়লেট ব্যবহার করা এবং জুতা বা স্যান্ডেল পরে টয়লেটে যাওয়া

\* মাসিকের সময় পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন থাকা। মনে রাখতে হবে যে, এ সময় সব ধরনের খাবার খাওয়া যায় এবং সব স্বাভাবিক কাজকর্ম করা যায়

\* দেরিতে বিয়ে ও দেরিতে গর্ভধারণ করা (১৮ বছরের পরে)

\* কিশোরীকে টিডি (টিটেনাস-ডিপথেরিয়া) টিকার ৫টি ডোজ সম্পূর্ণ করা

ID: 2169

Context: স্বাস্থ্য

Question: স্বাস্থ্য বলতে কি বুঝি?

Answer:

বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার মতে (১৯৪৮), স্বাস্থ্য শুধুমাত্র রোগ বা দুর্বলতার অনুপস্থিতিই নয় বরং এমন একটি অবস্থা যেখানে পরিপূর্ণ শারীরিক, মানসিক এবং সামাজিক সুস্থতা বিদ্যমান।

ID: 2217

Context: কৃমি থেকে সুরক্ষা

Question: কৃমি: আমি কীভাবে শিশুকে সুরক্ষিত রাখব?

Answer:

মাটি থেকে বা অসুরক্ষিত জলের মাধ্যমে আপনার শিশুর কৃমি হতে পারে, এবং এর ফলে সে অসুস্থ হয়ে পড়তে পারে৷

\* আপনার শিশু মেঝেতে শোওয়া, হামাগুড়ি দেওয়া বা খেলার আগে মেঝে সাবান জল দিয়ে ধুয়ে পরিষ্কার করে দিন৷ এটা তাকে সুরক্ষিত রাখতে সাহায্য করবে৷ যদি আপনি মেঝে পরিষ্কার করতে না পারেন তাহলে একটা বড় পরিষ্কার চাদর বা মাদুর পেতে দিন৷

\* আপনার শিশু বড় হওয়ার সাথে সাথে, সে হয়ত বাইরে গিয়ে খেলতে চাইবে, তবে কয়েকটা জায়গায় কৃমির সমস্যা থাকে৷ মাটি ও কাদা থেকে কৃমি সংক্রমণ হয় এবং এর ফলে পেটে যন্ত্রণা, কাশি ও জ্বর হতে পারে৷

\* আপনার শিশু যখন বাইরে হাঁটতে শুরু করবে তখন মোটা মোজা, চটি বা জুতো তাকে সুরক্ষিত রাখতে পারে৷ সাবান ও পরিষ্কার, সুরক্ষিত জল দিয়ে ওর হাত ধুয়ে দিন৷ নিয়মিত ওর নখ পরিষ্কার করাও জরুরি৷ সে যখন মুখে হাত দেয় তখন এটা মাটি থেকে কৃমির ডিম ওর শরীরে প্রবেশ করায় বাধা দেবে।

\* যদি আপনার শিশুর কৃমির সংক্রমণ থাকে তাহলে আপনি হয়ত জানতেও পারবেন না৷ আপনার শিশুর কোনোরকম কৃমির সংক্রমণ হলে কৃমিনাশক ওষুধ সেগুলোকে মেরে দেয়। যদি আপনার শিশুর কৃমি নাও থাকে তাহলেও এগুলি তার জন্য সম্পূর্ণ নিরাপদ৷ আপনার শিশুর বয়স 1 বছর হওয়ার পরে প্রতি 6 মাসে তাকে এই কৃমিনাশক ওষুধ দিন৷

ID: 2271

Context: শিশু: 11 মাস বয়স

Question: শিশু: 11 মাস বয়সে কী করতে শুরু করে ?

Answer:

তোমার বাচ্চা হাঁটতে শুরু করে

তোমার বাচ্চা হয়তো কথা বলছে, বা মুখ দিয়ে শব্দ করছে যা কথার মত শোনায়। ওর মস্তিষ্ক বাড়ছে, আর ওর কথা বলার ক্ষমতাও বাড়ছে। মন দিয়ে ওর কথা শোনো আর সাড়া দাও। এতে ও উৎসাহ পাবে।

ওর এখন প্রায় এক বছর বয়েস হল! ঠিকমত সব কিছু না বুঝলেও, এই বয়েসে পরিবার ও বন্ধুবান্ধবের সঙ্গে মিলেমিশে উৎসব ও অনুষ্ঠান পালন ওকে নিরাপত্তা ও একজোট হওয়ার অনুভূতি দেয়। বাড়ির কাছাকাছি সাদাসিধা অনুষ্ঠান ওর ভালো লাগবে। অনেক লোকজন থাকলে ও ঘাবড়ে যেতে পারে।

তুমি হয়তো দেখবে তোমার বাচ্চা এখনও জিনিসপত্র মুখে পুরে দিয়ে সেগুলো সম্বন্ধে জানছে। উঁচু জিনিসে হাত পাওয়ার জন্য ও চেয়ারের উপরেও চড়তে পারে! এখন খেয়াল রাখো, ওর দিকে নজর রাখো আর বিপজ্জনক জিনিসপত্র নাগালের বাইরে সরিয়ে ফেলো।

তোমার বাচ্চা তোমাকে খুশি করতে চায়, তাই কী করে ও তোমায় সাহায্য করবে তা যত তাড়াতাড়ি ইচ্ছে ওকে শেখাতে পারো। কাজকর্মকে মজাদার করে তুলতে সেগুলোকে খেলা বানিয়ে নাও। কাজটাকে ছোট ছোট ভাগে ভাগ করে ওর সঙ্গে সেটা করো।

তোমার বাচ্চা হয়তো এর মধ্যে হাঁটা শুরু করে দিয়েছে, কিংবা কিছুদিনের মধ্যেই হাঁটতে আরম্ভ করবে।

ওকে খুব মজা করে হাঁটতে শেখাতে পারো। ওর সামনে দাঁড়িয়ে বা হাঁটু গেড়ে বসে তোমার হাতদুটো বাড়িয়ে দাও। ওর হাত দুটো ধরে ওকে তোমার দিকে হাঁটাও। ও হয়তো প্রথম হাঁটার সময় দু পাশে হাত ছড়িয়ে রাখবে এবং কনুই থেকে হাত ভাঁজ করে রাখবে। টাল সামলানোর জন্য ও পা দুটোও বাইরের দিকে করে আর পেছনটা উঁচু করে রাখতে পারে।

ID: 2272

Context: শিশু: 7 মাস বয়স

Question: শিশু: 7 মাস বয়সে কী করতে শুরু করে ?

Answer:

তোমার বাচ্চার কৌতূহল বাড়ছে

তোমার বাচ্চা এবার নিজে নিজে খেতে চাইবে। হয়তো ওকে খাওয়ানোর সময় ও চামচটা আঁকড়ে ধরে, বা তোমার থালা থেকে খাবার নেয়? ওর থালায় নরম খাবারের ছোট ছোট দলা দিয়ে দেখো তো। ওগুলো তুলে তুলে খেতে ও খুব মজা পাবে। মনে রেখো মেয়েদের আর ছেলেদের সমান পরিমাণ খাবার লাগে।

তোমার বাচ্চার হয়তো ভালোরকম খিদে থাকতে পারে, কিন্তু ওর হয়ত বেশি দাঁত নেই। এমন খাবার দিয়ে শুরু করো যা ও মাড়ি দিয়ে চিবোতে পারবে বা সহজেই মুখের মধ্যে নাড়াচাড়া করতে পারবে।

এই বয়েসে বাচ্চাদের খুব কৌতূহল বাড়ে। ও হয়তো খেলনা ছুঁড়ে ফেলে বা ওর বোনের চুল ধরে টান দেয়! তোমার বাচ্চা দুষ্টুমি করছে না, শুধু পরীক্ষা করে দেখছে সবকিছু। ওর কিছুই খুব বেশিক্ষণ মনে থাকবে না, তাই এখন ওর কাছে শাসনের বিশেষ মানে নেই। তবে ওকে সহজেই ভোলানো যায়। তাই তুমি পছন্দ করো না এমন কোনো কাজ করা থামাতে হলে ওকে একটা খেলনা দেখাও কিংবা একটা গান গেয়ে শোনাও।

ওর দাঁতের মধ্যে ফাঁক থাকলে চিন্তা কোরো না। ওর তিন বছর বয়েসের মধ্যে, সবগুলো দুধের দাঁত গজিয়ে গেলে দাঁতের ফাঁকগুলো বন্ধ হয়ে যাবে মনে হয়।

এই রকম সময়ে, তোমার বাচ্চা হয়তো তোমার চলে যাওয়া নিয়ে ভয় পেতে পারে। ও তোমার সঙ্গে এতটাই জড়িয়ে আছে যে এক মিনিটের জন্য ওকে ছেড়ে গেলেও ও হয়তো কাঁদতে শুরু করতে পারে। এটা স্বাভাবিক, এবং অল্প সময়ের জন্য তোমাকে ছেড়ে থাকলে তোমার বাচ্চার অন্য লোকের সঙ্গে মেলামেশা করতে সাহায্য হবে। ও খুব তাড়াতাড়িই শিখে যাবে যে তুমি সব সময় ওর কাছে ফিরে আসবে।

এতদিনে তোমার বাচ্চার মনের ভাব আরো স্পষ্ট হয়ে বোঝা যাচ্ছে। ও হয়তো যাদের চেনে তাদের দিকে চুমু ছুঁড়ে দিতে পারে। ও অন্য লোকের মনের ভাবও খেয়াল করতে আর সেগুলো নকল করতে শুরু করছে। কাউকে কাঁদতে দেখলে, ও-ও হয়তো কান্না জুড়ে দিতে পারে।

ID: 2273

Context: শিশু: 6 মাস বয়স

Question: শিশু: 6 মাস বয়সে করণীয় ?

Answer:

তোমার বাচ্চাকে শক্ত খাবার খাওয়াও

তোমার বাচ্চা বুকের দুধের সঙ্গে এবার বাড়ির খাবার খাওয়ার জন্য তৈরি! প্রথমে ও একটুখানি খাবারই খেতে পারবে: এক চামচই যথেষ্ট। চটকানো ঘরোয়া খাবার খেতে ওর ভালো লাগবে। ওর দিকে মুখ করে বসে তোমার পরিষ্কার আঙুলে বা চামচে করে ওকে অল্প একটু নরম খাবার দাও। মুখের ভেতর কী করে জিভ দিয়ে খাবারটা নাড়াচাড়া করে গিলতে হয় তা বুঝতে ওর হয়তো একটু সময় লাগবে। ধৈর্য ধরো। ও শিখে যাবে।

প্রথমে ওকে দিনে একবার চটকানো খাবার দিয়ে শুরু করো। তারপরে দিনে দুবার ও তার পরে দিনে তিনবার। ও হয়তো চটকানো খাবারের আগে কিছুটা বুকের দুধ আবার পরেও কিছুটা বুকের দুধ চাইতে পারে।

এই মাসে হয়তো তোমার বাচ্চার প্রথম দাঁত উঠতে পারে। নিচের পাটির সামনের কোনো একটা দাঁতই সাধারণত প্রথমে ওঠে।

ও হয়তো একটা হাত অন্য হাতের তুলনায় বেশি ব্যবহার করতে শুরু করবে। তারপরে হয়তে হাত অদলবদল করতে পারে। কিন্তু ওর দু তিন বছর বয়েসের আগে তুমি ঠিক করে বুঝবে না যে ও ডান-হাতি না বাঁ-হাতি। ওকে ছোট একটা জিনিস ধরে এ-হাত ও-হাত করতে দাও। এতে ওর দক্ষতা গড়ে উঠতে সাহায্য হবে।

তোমার বাচ্চা হয়তো এখন আরো চঞ্চল হয়ে উঠছে, এবং ও এখন অন্য বাচ্চাদের সঙ্গে মিশতে পছন্দ করবে!

তোমার বাচ্চা কি কোনো বিশেষ একটা জিনিস বা খেলনা পছন্দ করে? তাহলে কিছুদিনের মধ্যেই ও ওটা ছাড়া কোথাও যেতে পারবে না। এটা স্বাভাবিক, এবং তোমার বাচ্চার বাড়তে থাকা স্বাধীনতার চিহ্ন, কারণ ও ভরসা পাওয়ার জন্য তোমার বদলে একটা খেলনা বা কাপড় কাজে লাগাতে পারে।

ID: 2274

Context: শিশুর কোষ্ঠকাঠিন্য লক্ষণ

Question: শিশুর কোষ্ঠকাঠিন্য লক্ষণ কী কী ?

Answer:

ওকে এইভাবে সাহায্য করা যায়

আপনার শিশুর প্রথম কয়েক সপ্তাহে, ওর মলত্যাগের রুটিন তৈরী হতে কিছুটা সময় লাগবে৷ একদিন হয়ত ওর পায়খানা পাতলা হবে, আবার পরের দিন শক্ত হবে৷ কোনটা স্বাভাবিক আপনি শীঘ্রই বুঝতে পারবেন৷

যতদিন আপনার শিশু শুধুই বুকের দুধ খাবে, ওর মল নরম থাকবে ও মলত্যাগ সহজ হবে৷ যখন ও শক্ত খাবার খেতে শুরু করে, তখন কোষ্ঠকাঠিন্য হতে পারে, হয়ত ওর পায়খানা শক্ত হয়ে উঠবে, মলত্যাগ করতে কষ্ট হবে ও সাধারণত যতবার পায়খানা হত ততবার হবে না৷

কোষ্ঠকাঠিন্যের লক্ষণগুলি সহজেই বোঝা যায়৷

যদি পায়খানা করতে গিয়ে আপনার শিশু কান্নাকাটি করে, সেটা একটা লক্ষণ হতে পারে৷ আপনি এটাও লক্ষ্য করতে পারেন যে তার মল শুকনো ও শক্ত৷ সে স্বাভাবিকের তুলনায় কম পায়খানা করতে পারে, কখনো কখনো সারা সপ্তাহে মাত্র 3 বার পায়খানা করতে পারে৷

মল ও গ্যাসে দুর্গন্ধ হলে সেগুলিও কোষ্ঠকাঠিন্যের লক্ষণ৷ আরেকটা লক্ষণ হল পেট শক্ত হয়ে, ফুলে যাওয়া৷

আপনি কী করতে পারেন? যদি আপনার শিশুর বয়স 6 মাসের কম হয় এবং যদি আপনার মনে হয় যে ওর কোষ্ঠকাঠিন্য হয়েছে তাহলে ওকে প্রচুর বুকের দুধ খাওয়ান৷ বুকের দুধই হল আদর্শ। ওকে জল বা অন্য কোনো পানীয় দেবেন না, শুধু বুকের দুধ দিন৷

যদি আপনার শিশু শক্ত খাবার খাওয়া শুরু করে থাকে, তাহলে ওকে বুকের দুধ ছাড়াও প্রচুর পরিমাণে ফল ও সব্জি খেতে দিন, আর পরিষ্কার, সুরক্ষিত জল খাওয়ান৷ এটা ওর মল নরম করতে সাহায্য করবে৷

কখনো কখনো খুব তরল পায়খানাও কোষ্ঠকাঠিন্যের লক্ষণ হয়৷ যে শক্ত মল পাচন তন্ত্রে বাধা সৃষ্টি করে তার চারিপাশ দিয়ে তরল পায়খানা নড়াচড়া করতে পারে৷ যদি আপনার মনে হয় আপনার শিশুর এইরকম কিছু হয়েছে, তাহলে ডাক্তার দেখান৷

ID: 2275

Context: শিশুর হামাগুড়ি দেবার বয়স

Question: আমার শিশু কখন হামাগুড়ি দেবে?

Answer:

বসতে শেখার পরে শিশুর বড় সাফল্য হল হামাগুড়ি দিতে শেখা৷ সাধারণত, তবে সবসময় না, এর পরেই সে হাঁটতে শিখে যায়৷

6 এবং 9 মাস বয়সে পৌঁছে হয়ত আপনার শিশু হামাগুড়ি দিতে শিখে যায়৷ তার মানে, 1 বছর বয়সে সে হয় ভালোভাবে হামাগুড়ি দিতে পারবে৷

তবে সব শিশু কিন্ত হামাগুড়ি দেয় না৷ হয়ত দেখবেন আপনার শিশু হামাগুড়ি না দিয়ে পিছন ঘষে চলে বেড়াচ্ছে৷ বা হয়ত সে পেট ঘষে ঘষে ঘুরে বেড়াচ্ছে৷

কয়েকজন শিশু একেবারেই হামাগুড়ি দেয় না৷ বরং তারা সরাসরি সোজা হয়ে দাঁড়াতে ও তারপরে হাঁটতে শিখে যায়৷ আপনার শিশু কীভাবে শিখছে তা জরুরি নয়, যা জরুরি তা হল আপনার শিশু যথেষ্ট ছটফটে কিনা৷

বিভিন্ন গতিতে শিশুদের বিকাশ হয়৷ যদি আপনার চিন্তা হয় যে আপনার শিশুর হামাগুড়ি দিতে বা চলাফেরা করতে দেরী করছে তাহলে স্বাস্থ্য কর্মীর সঙ্গে কথা বলুন৷

ID: 2276

Context: শিশু: 5 মাস বয়েস

Question: শিশু: 5 মাস বয়েস

Answer:

তোমার বাচ্চা উলটে যেতে পারে!

তোমার বাচ্চা এখনও তোমার মত করে মনের ভাব বোঝাতে পারে না। কিন্তু ওর রাগ হলে, বিরক্ত বা খুশি হলে ও তোমাকে জানিয়ে দেবে। কোলে উঠতে চেয়ে দু হাত উঁচু করে ও তোমার প্রতি ওর ভালোবাসা বোঝাবে। তুমি ঘর ছেড়ে চলে গেলে ও কাঁদতেও পারে।

এখন ওর জোর অনেক বেড়েছে। মেঝেতে বসিয়ে দিলে দেখবে ও হয়ত কিছুক্ষণ নিজে নিজেই বসে থাকতে পারছে। যদি পড়ে যায় তাই ওর চারদিকে বালিশ দিয়ে দাও আর তুমিও কাছাকাছি থাকো।

ও হয়তে হঠাৎ উলটে গিয়ে তোমায় চমকে দিতে পারে! যাতে গড়িয়ে পড়ে না যায় তাই ওকে খাট বা কোনো উঁচু জায়গায় একা ছেড়ে যেও না। মেঝেতে পরিষ্কার কাপড়ের উপরে শুইয়ে তুমি ওর ন্যাপি পালটাতে পারো।

তোমার বাচ্চার দৃষ্টিশক্তি এখনও বিকশিত হচ্ছে। ও এখন ছোট ছোট জিনিস বা নড়তে থাকা জিনিস দেখতে পায়। ওর প্রিয় খেলনাটাকে লুকিয়ে রাখো যাতে সেটার একটা কোণা শুধু দেখা যায়। ও ওটা খুঁজে বার করতে খুব মজা পাবে!

তোমার বাচ্চা হয়তো এখন তোমায় নকল করতে পারবে। জিভটা বার করো, গাল দুটো ফোলাও আর দেখো ও তোমায় নকল করে কিনা।

তোমার বাচ্চা এখন প্রায় তোমার মত করেই পৃথিবীটাকে দেখে ও শোনে। ওর ভাব প্রকাশের ক্ষমতা দ্রুত বিকশিত হচ্ছে। ওর আওয়াজগুলো ওর মনের ভাব বোঝায়। ও হয়তো খুশি, উৎসুক বা সমস্যা সমাধান করে পরিতৃপ্ত বোধ করতে পারে।

ও আধো আধো কথা বলতে শুরু করতে পারে, "বা", "মা", "গা"-র মত শব্দ বার বার বলে। এগুলো সবই যখন ও কথা বলবে তার জন্য তৈরি হওয়া।

ID: 2277

Context: শিশুর শক্ত খাবার খাওয়ার বয়স

Question: কখন শক্ত খাবার দিতে হবে?

Answer:

শক্ত খাবার খাওয়া একটা বড় পদক্ষেপ!

আপনি নিজেই বুঝতে পারেন আপনার শিশু শক্ত খাবার খাওয়ার জন্য তৈরী কিনা৷ যখন তার 6 মাস বয়স হয়ে যায় তখন৷ যে শিশু শক্ত খাবার খাওয়ার জন্য প্রস্তুত থাকে সে সাধারণত এই কাজগুলি করতে পারে:

সে মাথা উপরদিকে তুলতে পারে৷

হেলান দেওয়ার সুবিধা পেলে, সে ভালো করে বসতে পারে৷ প্রথমে হয়ত আপনার শিশুকে কোলে নিয়ে বসাতে হবে৷

সে চিবানোর মত মুখভঙ্গী করবে৷ আপনার শিশু তার মুখের ভিতরে খাবার ঢোকাতে পারবে ও গিলে খেতে পারবে৷

আপনি কী খাচ্ছেন সেই ব্যাপারে সে উৎসুক হবে৷ যখন শিশুরা আপনার খাবারের দিকে তাকায় ও সেদিকে হাত বাড়িয়ে দেয় তার মানে সে শক্ত খাবার খাওয়ার জন্য প্রস্তুত৷

তার শরীরের ওজন স্বাস্থ্যকর৷ বেশির ভাগ শিশুর জন্মের সময় যা ওজন থাকে তার দ্বিগুণ ওজন হয়ে গেলে তারা মন্ড করা শক্ত খাবার খাওয়ার জন্য তৈরী হয়ে যায়৷ এটা সাধারণত প্রায় 6 মাস বয়সে হয়৷

6 মাস বয়সের আগেই আপনার শিশুর এই লক্ষণগুলি হয়ত আপনার চোখে পড়ে৷ তবে তাকে চটকানো খাবার খেতে দেওয়ার আগে তার 6 মাস বয়স হওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করা নিরাপদ৷ ততদিনে তার হজমশক্তি আরো মজবুত হয়ে যায়৷ তার অর্থ এই যে তার পেটের গোলমাল বা খাবারে খারাপ প্রতিক্রিয়া হওয়ার সম্ভাবনা কম থাকে৷

ID: 2278

Context: শিশুর বসতে পারার বয়স

Question: কখন আমার শিশু বসে থাকতে পারবে?

Answer:

4 এবং 7 মাস বয়সে আপনার শিশু বসে থাকার মত যথেষ্ট শক্তপোক্ত হয়ে যায়৷

যদি ওকে আপনার কোলে বসিয়ে রাখেন বা মেঝেতে বসিয়ে দেন, তাহলে কয়েক মুহূর্ত আপনার কোনোরকম সাহায্য ছাড়া ও হয়ত বসে থাকতে পারবে৷

শিশুকে বসতে শেখানোর জন্য, ওর পা দুটো ছড়িয়ে রাখুন যাতে ওর শরীরের ওজনের ভারসাম্য থাকে৷ এটা ওর উল্টে পড়ার ভয় কমিয়ে দেয়। এইভাবে ওকে বসিয়ে দেওয়ার পরে, ওর সামনে ওর প্রিয় খেলনা রেখে দিন৷ ওর চারিপাশে কম্বল বা বালিশ ঠেস দিয়ে রাখুন যাতে পড়ে গেলে ওর ব্যথা না লাগে৷ ওর প্রতি নজর রাখার জন্য কাছাকাছি থাকুন৷

এছাড়া আপনার শিশুকে পেটে ভর দিয়ে খেলতেও উৎসাহিত করতে পারেন৷ একটা খেলনা দেখার জন্য আপনার শিশুকে যে মাথা ও বুক উপরদিকে তুলে রাখতে হবে তাতে ওর ঘাড়ের মাংসপেশী মজবুত হবে এবং বসে থাকার জন্য ওর মাথার ভার সামলানোর ক্ষমতারও বিকাশ হবে৷ ওর পা সোজা করতে ওকে সাহায্য করার জন্য আপনি ওকে নিজের ঊরুর উপর দাঁড় করিয়ে উপর নিচে করে ঝাঁকাতে পারেন৷ এইভাবে হয়ত ও খিলখিল করে হেসে উঠবে!

8 মাস বয়সে পৌঁছে ওর হেলান ছাড়াই ভালোভাবে বসতে শিখে যাওয়া উচিত।

ID: 2279

Context: শিশুর দাঁত উঠার বয়স

Question: আমার শিশুর দাঁত উঠছে!

Answer:

প্রায় 6 মাস বয়সে বেশির ভাগ শিশুর প্রথম দাঁত ওঠে৷ তবে শিশুদের 3 মাস এবং 1 বছর সময়ের মধ্যে যে কোনো সময় দাঁত গজাতে পারে৷ সাধারণত, সামনের দিকে, নিচের পাটিতে প্রথম দাঁত দেখা যায়৷

যদি আপনার শিশুর দাঁত গজায় তাহলে এই লক্ষণগুলি দেখতে পাবেন:

ওর মাড়ি লাল হয়ে ফুলে যায় ও ওর মুখ ও গাল লাল হয়ে ওঠে

ওর মুখ দিয়ে সমানে লালা ঝরে

যেদিকে ওর দাঁত উঠছে ও সেদিকের মাড়ি ও কান ঘষার চেষ্টা করে

যন্ত্রণায় রাতে ওর ঘুম ভেঙে যায়

যখন আপনার শিশুর 2 বছর বয়স হয় ততদিনে ওর পুরো 20 টা দুধের দাঁতের সারি গজিয়ে যাওয়া উচিত৷

আপনার শিশুর দাঁত ওঠার পর থেকেই ওর দাঁত মাজা শুরু করে দেওয়া শ্রেয়৷ নরম টুথব্রাশ ও যদি টুথপেস্ট থাকে, ব্যবহার করুন৷ আপনার শিশুর দাঁত ও মাড়ি দুইয়ের উপরিভাগ পরিষ্কার করে দেওয়ার চেষ্টা করুন৷

কয়েকজন শিশুর দাঁত ওঠার সময় খেতে কষ্ট হয়৷ বুকের দুধ খাওয়ার সময় চুষতে গিয়ে ফোলা মাড়িতে আরো রক্ত এসে পড়ে৷ এই সময় মাড়ি খুব স্পর্শকাতর থাকে৷ তাই ও হয়ত আপনার বুকের দুধ খেতে চাইবে না৷

স্পষ্টত, দাঁত ওঠার সময় শিশুরা বিরক্ত বোধ করে ও অস্থির হয়ে পড়ে৷ ওকে আদর করে শান্ত করার যথাসাধ্য চেষ্টা করুন৷

আপনার শিশুর দাঁত ওঠার সমস্যার নিরাময়ের জন্য মধু ব্যবহার করবেন না৷ বরং ওকে চিবানোর জন্য পরিষ্কার, নরম কিছু দিন৷ ঐসব জিনিস এত ছোট হওয়া উচিত নয় যে গিলে ফেলা যায় বা এত নরম হওয়া উচিত নয় যে টুকরো হয়ে যায়৷ এমন জিনিস ওর গলায় আটকে যেতে পারে৷

ID: 2280

Context: শিশুর বুলির বয়স

Question: আমার শিশুর প্রথম বুলি!

Answer:

জন্মের মুহূর্ত থেকেই আপনার শিশু কথা বলতে শিখছে৷

ওর কান্নাই ওর প্রথম কথার ভঙ্গী৷ খিদে পেলে, অস্বস্তিবোধ করলে, বা ক্লান্ত হলে ও কেঁদে জানায়৷

বড় হওয়ার সাথে সাথে আপনার শিশু আপনার ও ওর আশেপাশের লোকদের কথাবার্তা শুনে আপনাদের নকল করার চেষ্টা করে৷ ও আপনার সঙ্গে কথা বলতে চায়!

আপার শিশুর চোখের দিকে তাকিয়ে যতটা সম্ভব ওর সঙ্গে কথা বলুন৷ অন্যদের ও অন্য কিছুর ব্যাপারে কথা বলার সময় ঐদিকে আঙুলের ইশারা করে দেখান৷

3 এবং 4 মাসে, ওর কান্না কম হবে ও নানা রকম শব্দ করতে শুরু করে৷ ও নিজের নাম চিনতে শুরু করে৷ একটু দূর থেকে ওর নাম ধরে ডাকুন ও সাড়া দেয় কিনা দেখুন৷

5 এবং 6 মাসে আপনার দৃষ্টি আকর্ষণ করতে আপনার শিশু নানারকম শব্দ করে এবং খেলার সময় নিজের মনে বক বক করে৷ ও হয়ত বার বার ‘বা’ কিংবা ‘মা’ এর মত শব্দ করবে৷

7 মাস বয়স এবং 1 বছরের মধ্যে ও নতুন শব্দ বলতে চেষ্টা করে এবং আপনি যা বলেন তা নকল করার চেষ্টা করে৷ চেনা জিনিসপত্রের নামগুলি যেমন “বল”, এখন ও চিনতে পারে৷

প্রায় 1 বছর বয়স থেকে ও হয়ত একটা দুটো শব্দ ব্যবহার করতে শুরু করবে এবং ঐ শব্দগুলির মানে বুঝবে৷

15 মাস বয়স পর্যন্ত যদি আপনার শিশু কোনো কথা না বলে এবং আপনার দুশ্চিন্তা হয় তাহলে ডাক্তারের সঙ্গে কথা বলুন৷

ID: 2281

Context: শিশু ভালোভাবে বেড়ে ওঠা

Question: আমার শিশু ভালোভাবে বেড়ে উঠছে তো?

Answer:

যে শিশু ভালোভাবে বেড়ে উঠবে সে প্রাণবন্ত, কর্মশক্তিতে ভরপুর হবে এবং খেলতে চাইবে৷

ও কি সরাসরি আপনার দিকে দেখছে? হয়ত ও আপনাকে দেখে হাসবে! তাহলে আপনি বুঝতে পারবেন যে ও ভালোভাবে দেখতে পাচ্ছে৷

আপনি কী লক্ষ্য করেছেন, যখন ওকে কোলে তুলে নেন তখন ও আগের চেয়ে কত ভারী হয়ে উঠছে? তার মানে ও ভালো করে খাওয়াদাওয়া করছে৷

নতুন শব্দ শুনে ও কী মুখ ঘুরিয়ে সেই দিকে তাকাচ্ছে? তার মানে ও ভালোভাবে শুনতে পাচ্ছে৷

যদি আপনার শিশু ঘুমাচ্ছন্ন থাকে, কর্মশক্তির অভাব হয় ও খেলতে না চায়, তাহলে কোনো গোলমাল আছে কিনা জানার জন্য ওকে স্বাস্থ্য কর্মীর কাছে নিয়ে যাওয়া দরকার৷

যদি আপনার শিশু অসুস্থ আছে বা যদি ওর ব্যাপারে আপনার কোনো দুশ্চিন্তা থাকে তাহলে প্রতি মাসে একটা সুতো দিয়ে ওর উর্ধ্ববাহু অর্থাৎ হাতের উপরদিক মেপে দেখবেন৷ সুতোয় চিহ্ন দিয়ে রাখুন, যাতে পরের বার যখন মেপে দেখবেন তখন আপনি বুঝতে পারেন ও কতটা বেড়েছে৷ যদি ওর বাহুর মাপ বাড়ে তার মানে ও বাড়ছে৷ যদি ওর বাহুর মাপ একই থাকে বা কম হয়ে য়ায় তার মানে ওর আরো খাবার দরকার৷

স্বাস্থ্য কর্মীকে দিয়ে নিয়মিত চেক-আপ করালে আপনি নিশ্চিন্ত হতে পারবেন যে ওর ভালো বিকাশ হচ্ছে৷ কয়েক মাস পর পর ওর ওজন নেওয়ার চেষ্টা করুন। সেখানে গিয়ে, আপনার যদি কোনো প্রশ্ন থাকে, স্বাস্থ্য কর্মীকে জিজ্ঞাসা করে নিতে পারেন৷ 1 বারের ভিজিটে সব প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করে নেওয়ার চেষ্টা করুন৷ এটা আপনার সময় বাঁচাবে৷

ID: 2282

Context: শিশুর গড়াগড়ির বয়স

Question: ও কখন গড়াতে শিখবে?

Answer:

গড়ানো মানে হল আপনার শিশু চিৎ হয়ে শুয়ে থাকার অবস্থা থেকে উপুর হয়ে পেটে ভর দিয়ে শুতে পারে, বা উপুর হওয়া থেকে আবার নিজে চিৎ হয়ে যেতে পারে।

যখন ওর 6 বা 7 মাস বয়স হবে তখন হয়ত ও গড়াতে শিখবে, ততদিনে ওর ঘাড় ও বাহুর মাংসপেশী যথেষ্ট মজবুত হয়ে যায়৷

আপনার শিশুর প্রায় 3 মাস বয়সে আপনি তাকে পেটের উপর ভর দিয়ে শুইয়ে দিলে সে হয়ত হাতে ভর দিয়ে মাথা ও কাঁধ উপরদিকে তুলতে পারবে৷ এটা ওকে গড়ানোর জন্য তৈরী করছে৷

আপনার শিশুর সঙ্গে খেলা করে আপনি ওর উৎসাহ বাড়াতে পারেন৷ ওকে পেটের উপর ভর দিয়ে শুইয়ে দিন আর ওর একপাশে একটা খেলনা ধরে দোলাতে থাকুন৷ যদি ও খেলনার দিকে গড়িয়ে যেতে পারে তখন হেসে বলুন,"সাবাস!"

আপনার শিশু প্রথম কখন গড়াবে তা বলা মুস্কিল৷ নিরাপদ থাকার জন্য একা ওকে কখনো বিছানা বা এমন কোনো জায়গায় রেখে যাবেন না যেখান থেকে পড়ে গিয়ে ওর ব্যাথা লাগতে পারে৷

7 মাস বয়স হওয়ার পরেও যদি আপনার শিশু গড়াতে না পারে তাহলে ডাক্তারের সঙ্গে কথা বলতে পারেন৷ তবে বিশেষ দুশ্চিন্তার কারণ নেই: সব শিশুদের শেখার গতি আলাদা আলাদা হয়, কয়েকজন বেশি তাড়াতাড়ি শিখে নেয়৷

ID: 2283

Context: -1

Question: আমার শিশু এখন ধরে থাকতে পারে!

Answer:

জিনিস নিয়ে খেলা আপনার শিশুর জন্য মজার ব্যাপার, আর এটা তার মানসিক ও শারীরিক দক্ষতা গড়ে তুলতে তাকে সাহায্য করে৷

কীভাবে জিনিস হাতে ধরতে হয় সেটা শিখে নেওয়া আপনার শিশুর কাছে একটা পুরো নতুন জগতের দরজা খুলে দেয়। এছাড়াও এটা আপনার শিশুর নিজে কাজ করার, যেমন খাওয়া, দাঁত মাজা, পড়া, লেখা এবং নানা কাজকর্ম করার প্রথম পদক্ষেপ৷

জন্মের সময় থেকেই আপনার শিশুর আঁকড়ে ধরার একটা সহজাত ক্ষমতা থাকে৷ প্রথমে মজাদার জিনিস দেখেই সে খুশী হয়, তবে ক্রমশ সে ঐগুলি হাত দিয়ে আঁকড়ে ধরতে চাইবে৷ প্রায় 3 মাস বয়স থেকে সে এই কৌশল ব্যবহার করতে শুরু করবে৷ আপনার শিশুকে এই কৌশলটা শেখানোর জন্য রঙবেরঙের জিনিসপত্র দিলে ভাল হয়। ওর নাগালের মধ্যে জিনিস দোলাতে থাকু। দেখুন ও কীভাবে সেটা আঁকড়ে ধরার চেষ্টা করে!

আবিষ্কারের জন্য নানা আকার প্রকারের জিনিস ও খেলনা দিলে খুব ভালো হয়৷ নরম ও শক্তের প্রভেদ আপনার শিশুর অনুভূতিগুলোকে রোমাঞ্চিত করতে সাহায্য করবে৷ খেলার জন্য ওকে নরম জিনিসে তৈরী সুরক্ষিত খেলনা দিন৷

আপনার শিশুর যখন প্রায় 5 মাস বয়স হ‌য়, সে জিনিসপত্র মুখে দিয়ে সেগুলি পরীক্ষা করতে শুরু করে৷ এটা স্বাভাবিক, আর আপনার শিশুকে শিখতে সাহায্য করে।

যেসব জিনিস ও খেলনা শিশুর পক্ষে মুখে দেওয়া নিরাপদ তেমন জিনিস বেছে নিন৷ ঐগুলি পরিষ্কার করা সহজ হওয়া উচিত এবং ঐগুলিতে ধারালো কোণা, সুতো বা ছোট টুকরো থাকা উচিত না৷ প্রায়ই ঐগুলি পরিষ্কার করে নিন৷

ID: 2284

Context: গর্ভাবস্থা: 3 মাস

Question: গর্ভাবস্থা: 3 মাস সময়ে মায়ের শরীরে পরিবর্তন ?

Answer:

তোমার পেটে ছোট্ট ঢাকের বোল

তোমার বাচ্চা এখনও তোমার হাতের তালুতে আঁটার মত ছোট্টটি। তার মাথায় চুল গজাচ্ছে, আর সারা গায়ে গজাচ্ছে ফিনফিনে নরম লোম। আঙুলের ডগায় ছোট্ট ছোট্ট দাগ তৈরি হচ্ছে।

তোমার গর্ভের ভিতর তোমার বাচ্চা নিরাপদে জলে ভেসে থাকে। এই জল বা তরল তাকে গুঁতোগাঁতা থেকে বাঁচায় এবং গরম রাখে। বাচ্চাদের হেঁচকি উঠতে পারে। তোমার মনে হতে পারে যে পেটের মধ্যে তালে তালে ঢাক বাজছে, যা বেশ কয়েক মিনিট ধরে চলতে পারে।

তোমার বমি বমি ভাব এখন কম হতে পারে আর হঠাৎ ক্ষিদে পেতে পারে। ভালো করে খাওয়াদাওয়া করো। রোজ মনে করে নানা রকমের খাবার খাবে। প্রতিবার খাওয়ার সময় এক মুঠো খাবার বেশি খাও। খাবার যেন টাটকা আর ভালো হয়, বাসি পুরোনো যেন না হয়।

আস্তে আস্তে তোমার ক্লান্তি কমে গিয়ে শরীরে মনে বেশি জোর আসবে। গর্ভের ভিতরে এখন ফুল তৈরি হয়ে গেছে যেটা তোমার বাচ্চাকে ধরে আছে। বাচ্চা জন্মানোর ঠিক পরেই ওটা বেরিয়ে আসবে।

কোমরে আর বুকের কাছে জামাকাপড় একটু আঁটো লাগতে পারে। অল্প দিনের মধ্যেই তোমার গর্ভ দেখতে পাওয়া যাবে, তলপেটে একটা ছোট্ট ঢিপির মতন দেখাবে।

গর্ভবতী অবস্থায় তোমার রোগবীজাণু ঠেকানোর ক্ষমতা কমে যায়, তাই তোমার হয়তো বার বার সর্দিকাশি হতে পারে। নিয়ম করে পরিষ্কার শুদ্ধ জল আর সাবান দিয়ে হাত ধোও। জীবাণু তাড়ানোর জন্য এটাই সবথেকে ভালো উপায়।

ID: 2285

Context: টিবি-র লক্ষণগুলি বিষয়ে সতর্কতা

Question: টিবি-র লক্ষণগুলি বিষয়ে সতর্কতা কী ?

Answer:

আপনার পরিবারে যদি কারুর যক্ষ্মারোগ (টিবি) থাকে, তাহলে প্রত্যেকের পরীক্ষা করানো উচিত৷ টিবি রোগ সহজেই ছড়িয়ে পড়তে পারে তবে সঠিক চিকিৎসার দ্বারা এটা সারিয়ে তোলা যায়৷ চিকিৎসা আপনাকে এবং আপনার শিশুকে সুরক্ষিত রাখবে এবং কয়েকটা সরকারি হাসপাতালে বিনামূল্যে এটা দেওয়া হয়৷

আপনার নিজের শরীরে, এবং আপনার চারিপাশে প্রত্যেকের টিবি-র লক্ষণগুলি সম্বন্ধে সতর্ক থাকুন, টিবি এমন এক রোগ যা অত্যন্ত বিপজ্জনক হয়ে উঠতে পারে৷ হাঁচি কাশির মাধ্যমে এটা বাতাসে ছড়িয়ে পড়ে৷ অনেকক্ষণ পর্যন্ত এটা বাতাসে থেকে যেতে পারে৷

যদি আপনার 2 সপ্তাহের বেশি সময় ধরে কাশি থাকে বা অপ্রত্যাশিতভাবে ওজন কম হয়ে যায় তাহলে স্বাস্থ্য কর্মীর সঙ্গে দেখা করুন৷ আপনার টিবি আছে কিনা তারা পরীক্ষা করে দেখতে পারেন এবং আপনাকে সঠিক ওষুধ দিতে পারেন৷

যদি আপনি সব ওষুধ নিয়ে থাকেন তাহলে আপনি টিবি রোগ সম্পূর্ণ নির্মূল করে দিতে পারবেন৷ আপনাকে দেওয়া সব ওষুধ শেষ হওয়ার আগেই যদি সেগুলি নেওয়া বন্ধ করে দেন তাহলে আবার টিবি ফিরে আসতে পারে৷

গর্ভাবস্থায় আপনি আরো সহজে টিবি-তে আক্রান্ত হতে পারেন৷ ভালো করে খাওয়াদাওয়া করে একটু বেশি যত্ন নেওয়ার চেষ্টা করুন এবং যেখানে খুব বেশি ভিড় এবং যেখানে লোকেদের হাঁচি কাশি হচ্ছে এমন সব জায়গা থেকে দূরে থাকুন৷

যদি আপনার পরিবারে কারুর টিবি হয় তাহলে 2 সপ্তাহ ধরে ওষুধ নেওয়ার পরে তারা আর সংক্রামক থাকবেন না৷ হাঁচি কাশির সময় তাদের মুখ ও নাক ঢেকে রাখতে বলুন এবং নিয়মিত হাত ধুতে বলুন৷

মনে রাখুন, টিবি রোগের দ্রুত চিকিৎসা করা হলে এই রোগ সারিয়ে তোলা যায়৷

ID: 2286

Context: কম বয়সে মেনোপজ

Question: কম বয়সে মেনোপজ হয় কি নারীদের ?

Answer:

মেনোপজ এমন একটি সমস্যা যা পৃথিবীর অর্ধেক মানুয়ের জীবনে সরাসরি প্রভাব ফেলে থাকে, আর এর পরোক্ষ প্রভাব পড়ে সবার জীবনে।

অনেক মহিলাই তাদের বয়স ৪০ বা ৫০এর কোঠায় পৌঁছানোর পরই এ নিয়ে ভাবতে শুরু করেন। কিন্তু তার আগেও মেনোপজ ঘটতে পারে।

যুক্তরাজ্যে প্রতি ১০০ জন নারীর অন্তত একজনের ৪০ বছরের আগেই মেনোপজ হয়ে থাকে। তবে এর প্রকৃত সংখ্যা অনেক বেশি হতে পারে।

মেয়েদের মাসিক ঋতুস্রাব বন্ধ হযে যাওয়াকেই বলে মেনোপজ, যা সাধারণত ৫০ বছর বয়সের দিকে ঘটে থাকে। মাসিক পুরোপুরি বন্ধ হবার আগের সময়টাকে বলে পেরি-মেনোপজ, যখন তাদের মাসিক অনিয়মিত হয়ে যায়, কখনো খুব বেশি স্রাব হয়, এমন কিছু লক্ষণ দেখা দেয় যা আগে ঘটেনি।

একনাগাড়ে ১২ মাস মাসিক না হলে একজন নারী পোস্ট-মেনোপজ স্তরে পৌঁছেছেন বলে ধরা হয়। এটা ৪০ বছরের আগে ঘটলে বলা হয় প্রাইমারি ওভেরিয়ান ইনসাফিশিয়েন্সি।

অনেকের ক্ষেত্রে কেমোথেরাপি, অস্ত্রোপচার বা অন্য কোন চিকিৎসার জন্যও কম বয়সে মেনোপজ হতে পারে।

যুক্তরাজ্যে প্রতি ১০০ জন নারীর অন্তত একজনের ক্ষেত্রে ৪০ বছরের আগেই মেনোপজ হয়ে থাকে। তবে প্রকৃত সংখ্যা এর চেয়ে অনেক বেশি হতে পারে।

স্বাভাবিক সময়ের আগে মেনোপজ বিষয়ে সচেতনতা বৃদ্ধি দরকার।

ID: 2287

Context: লকডাউনে ওজন বৃদ্ধি

Question: করোনা ভাইরাস: লকডাউনে ঘরে বসে থেকে ওজন বেড়ে যাচ্ছে, কী করবেন?

Answer:

এক জরিপে বলা হচ্ছে, লকডাউনে জীবন কাটাচ্ছেন এমন ৪৮ শতাংশ লোকই বলছেন, ঘরে বসে থেকে থেকে তাদের ওজন বেড়ে গেছে।

বিশেষত: সামাজিক মাধ্যমে অনেকেই অভিযোগ করছেন, তাদের পেট মোটা হয়ে যাচ্ছে।

পশ্চিমা দেশগুলোয় কিছু জরিপেও বিষয়টি নিয়ে অনুসন্ধান করে দেখা হচ্ছে যে লকডাউনের মধ্যে মানুষের ওজন আসলে কতটা বেড়েছে।

সাম্প্রতিক মাসগুলোতে অনেক জরিপেই দেখা যাচ্ছে যে মানুষের পরিবর্তিত খাদ্যাভ্যাস, খাদ্যের প্রাপ্যতা এবং জীবনধারার পরিবর্তন – এগুলো মানুষের ওজনে প্রভাব ফেলছে।

লন্ডনের কিংস কলেজ এবং ইপসোস-মোরির জরিপে অংশ নেয়া ২,২৫৪ জন লোকের ৪৮ শতাংশই বলছেন, লকডাউনের সময় তাদের ওজন বেড়ে গেছে।

একই পরিমাণ লোক বলেছেন, তারা এ সময় দুশ্চিন্তা ও বিষণ্ণতায় ভুগেছেন। আর ২৯ শতাংশ বলেছেন, লকডাউনের সময়টায় তাদের মদ্যপানের পরিমাণ বেড়ে গেছে।

অনেকে এ প্রশ্ন করতেই পারেন যে এ ক্ষেত্রে ওজনের চাইতে মানসিক স্বাস্থ্যটাই অপেক্ষাকৃত বড় সমস্যা কিনা।

স্বাস্থ্যকর খাদ্যাভ্যাস

পুষ্টিবিদ প্রিয়া টিউ বলছেন, মানুষ যখন দুশ্চিন্তা এবং চাপের মুখে পড়ে তখন এটা মোকাবিলা করার জন্য অনেক ক্ষেত্রে তার খাওয়ার পরিমাণ বেড়ে যায়।

তিনি বলছেন, লকডাউনে কারো ওজন যদি সামান্য বেড়েও যায় তা নিয়ে দুশ্চিন্তা বা অপরাধবোধে ভোগা উচিৎ নয়। তা হলে লকডাউনের আরো নানা দুশ্চিন্তার সাথে এটাও যোগ হয়ে বরং মানসিক চাপ আরো বাড়িয়ে দেবে।

এ নিয়ে বিশেষজ্ঞরা বলছেন, কিছু উপায় আছে যার ফলে আপনি লকডাউনের মধ্যে ওজন বৃদ্ধি নিয়ে খুব বেশি দুশ্চিন্তা না করে বরং শারীরিক ও মানসিক স্বাস্থ্য এ দুটোই আপনি ভালো রাখতে পারবেন।

প্রিয়া টিউ বলছেন, যেটা করা উচিৎ তা হলো খাদ্য তালিকা থেকে কী বাদ দিতে হবে সে চিন্তা না করে বরং কী যোগ করা দরকার তা নিয়ে ভাবা।

‍“আপনি এভাবে ভাবতে পারেন - ‘আমি কি প্রতিদিন যথেষ্ট সব্জি ও ফল খাচ্ছি? আমি কি কার্বোহাইড্রেট খাচ্ছি নাকি হোলগ্রেইন খাচ্ছি ?’ প্রতিদিন অতিরিক্ত খানিকটা ফল খান। মাঝে মাঝে একটুকরো কেক খেলে ক্ষতি নেই।‍“

প্রিয়া টিউ বলছেন, একসংগে ১০টি অভ্যাস পরিবর্তন করার বদলে একটি একটি করে শুরু করুন। আপনি যদি ভাবেন ‘আমি চকলেট কেক খাবো না’, তাহলে আরো বেশি খেতে ইচ্ছে করবে। কিন্তু তা না খেলে আপনি এর পরিবর্তে এমন একটা কিছু খাবেন যা আপনি আগে খাননি।

নিজের শরীর সম্পর্কে ধারণার ওপর বিরূপ প্রভাব

অনিশ্চিত সময়ে মানুষের দুশ্চিন্তা বেড়ে যেতে পারে। অনেক সময় এর প্রভাব পড়ে খাওয়ার অভ্যাসের ওপর।

মনোবিজ্ঞানী কিম্বার্লি উইলসন বলছেন, খাদ্যের সাথে মানুষের একটা আবেগের সম্পর্ক আছে। বহু মানুষই দুশ্চিন্তার সময় অজান্তেই তাদের মনোবল বাড়াতে খাদ্যকে ব্যবহার করে।

লকডাউনের সময় মানুষ যদি তার স্বাভাবিক খাবার খেতে না পারে, শরীরচর্চা করতে জিমে যেতে না পারে - তখন তার একটা মানসিক সংকট হয়।

মিজ উইলসন বলছেন, কেউ যদি বলে যে সে লকডাউনের মধ্যে কোন একটা বিশেষ খাবার ছাড়া আর কিছুই খেতে পারছে না, তাহলে তাকে বলতে হবে যে ‘ঠিক আছে, এতে কোন সমস্যা নেই। পরিস্থিতি স্বাভাবিক না হওয়া পর্যন্ত সে এভাবেই চলতে পারে।'

ID: 2288

Context: করোনাভাইরাস টিপস

Question: করোনাভাইরাস টিপস: যেসব ভুয়া স্বাস্থ্য পরামর্শ এড়িয়ে চলবেন ?

Answer:

বিশ্বের নানা দেশে করোনাভাইরাস দ্রুতবেগে ছড়িয়ে পড়ছে এবং এখন পর্যন্ত এর কোন প্রতিষেধক বের হয়নি।

তবে দুর্ভাগ্যবশত: করোনাভাইরাস ঠেকাতে নানা ধরণের স্বাস্থ্য পরামর্শ দেখা যাচ্ছে - যেগুলো প্রায়ই হয় অপ্রয়োজনীয় নয়তো বিপজ্জনক।

কিন্তু অনলাইনে ছড়িয়ে পড়া এসব পরামর্শ সম্পর্কে বিজ্ঞানীরা কী বলছেন?

রসুন:

ফেসবুকে এমন অসংখ্য পোস্ট দেখা গেছে যেখানে লেখা: যদি রসুন খাওয়া যায় তাহলে সংক্রমণ প্রতিরোধ করা সম্ভব।

বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা বলছে "যদিও রসুন একটা স্বাস্থ্যকর খাবার এবং এটাতে এন্টিমাইক্রোবিয়াল আছে" কিন্তু এমন কোন তথ্য প্রমাণ নেই যে রসুন নতুন করোনাভাইরাস থেকে মানুষকে রক্ষা করতে পারে।

অনেক ক্ষেত্রেই এধরনের প্রতিকারক ব্যবস্থা মানুষের জন্য ক্ষতিকারক নয়। কিন্তু এর মাধ্যমেও ক্ষতি হতে পারে।

সাউথ চায়না মর্নিং পোস্ট সংবাদপত্রে খবর বের হয়েছে যে করোনাভাইরাস থেকে রক্ষা পেতে একজন নারী দেড় কেজি কাঁচা রসুন খেয়েছে।

সম্পর্কিত খবর:

বাংলাদেশে করোনাভাইরাস শনাক্ত, জনসমাগম এড়িয়ে চলার পরামর্শ

করোনাভাইরাস গাইড: আপনার প্রশ্নের উত্তর

এতে করে তার গলায় ভয়াবহ প্রদাহ শুরু হয়। পরে ঐ নারীকে হাসপাতালে চিকিৎসা নিতে হয়।

আমরা জানি ফল, সবজি, এবং পানি খেলে স্বাস্থ্য ভাল থাকে। কিন্তু নির্দিষ্ট কোন খাদ্য দিয়ে করোনাভাইরাস সংক্রমণ ঠেকানো সম্ভব হবে, এর পক্ষে কোন প্রমাণ এখনও পাওয়া যায়নি।

অলৌকিক সমাধান

জরডান সাথের হলেন একজন ইউটিউবার, বিভিন্ন প্ল্যাটফর্মে তার রয়েছে হাজার হাজার অনুসারী।

তিনি দাবি করছেন যে "একটা অলৌকিক খনিজ পদার্থ" যাকে এমএমএস নামে ডাকা হয় সেটা দিয়ে এই করোনাভাইরাস একেবারে দূর করা সম্ভব।

এটাতে রয়েছে ক্লোরিন ডাই-অক্সাইড যেটা একটা ব্লিচিং এজেন্ট।

মি. সাথের এবং অন্যরা এই পদার্থকে করোনাভাইরাস ছড়িয়ে পড়ার আগেই প্রচার করে আসছে।

কিন্তু জানুয়ারি মাসে তিনি টুইট করে বলেন "ক্লোরিন ডাই-অক্সাইড ক্যান্সারের কোষকেও ধ্বংস করতে পারে এবং এটা করোনাভাইরাসকে ধ্বংস করতে পারে।"

গত বছরে মার্কিন ফুড এন্ড ড্রাগ অ্যাডমিনিস্ট্রিশন সতর্ক করে বলে যে এমএমএস পান করা স্বাস্থ্যের জন্য হানিকর।

অন্যান্য দেশের স্বাস্থ্য কর্তৃপক্ষও এই বিষয়ে সতর্কতা জারি করেছে।

এফডিএ বলছে, তারা এমন কোন গবেষণা সম্পর্কে জানে না যে এই পদার্থ নিরাপদ অথবা কোন অসুস্থতার জন্য পথ্য হতে পারে।

এফডিএ সতর্ক করে বলেছে এটা পান করার ফলে, মাথাব্যথা, বমি, ডায়রিয়া, এবং পানিশূন্যতার লক্ষণ দেখা দিতে পারে।

ঘরে তৈরি জীবাণুনাশক

করোনাভাইরাস ঠেকানোর একটা কার্যকর উপায় হচ্ছে বার বার করে হাত ধোয়া।

হাত ধোয়ার জেল, যেটা দিয়ে তাৎক্ষণিক জীবাণু ধ্বংস করা যায়, সেটা ফুরিয়ে যাওয়ার শঙ্কা তৈরি হয়েছে।

ইটালি এখন করোনাভাইরাস আক্রান্ত দেশগুলোর মধ্যে একটি।

সে দেশে যখন এই জেল ফুরিয়ে যাওয়ার খবর বের হল তখন এই জেল কীভাবে ঘরে বানানো যায় সেটার রেসিপি দেয়া শুরু হল সোশাল মিডিয়াতে।

কিন্তু সেসব রেসিপি ছিল মূলত সেই সব জীবাণুনাশকের - যা ঘরের মেঝে বা টেবিলের উপরিভাগে ব্যবহার করতে হয়।

কিন্তু বিজ্ঞানীরা জানিয়ে দেন এটা ত্বকের জন্য মোটেই উপযুক্ত নয়।

অ্যালকোহল যুক্ত হ্যান্ড জেলগুলোতে ৬০%-৭০% অ্যালকোহল থাকে তার সাথে থাকে এমোলিয়েন্ট নামে এক ধরণের পদার্থ যেটা ত্বককে নরম রাখে।

লন্ডন স্কুল অব হাইজিন এন্ড ট্রপিক্যাল মেডিসিন বিভাগের অধ্যাপক স্যালি ব্লুমফিল্ড বলেছেন, তিনি বিশ্বাস করেন না ঘরে বসে হাতের জন্য উপযুক্ত জীবাণুনাশক তৈরি করা সম্ভব।

রূপার জল

কলোইডিয়াল সিলভার মূলত এমন জল যেখানে রুপার ক্ষুদ্র কণিকা মেশানো থাকে।

মার্কিন টেলি-ইভানজেলিস্ট ধর্মপ্রচারক জিম বেকার এই জল ব্যবহারের পরামর্শ দিয়েছেন।

তার অনুষ্ঠানে এক অতিথি দাবি করেন যে এই জল কয়েক ধরণের করোনাভাইরাস মেরে ফেলতে সক্ষম।

অবশ্য তিনি স্বীকার করেন যে কোভিড-১৯ এর ওপর এটা পরীক্ষা করে দেখা হয়নি।

কলোইডিয়াল সিলভারের সমর্থকরা দাবি করেন যে এটা অ্যান্টিসেপটিক, এবং নানা ধরনের চিকিৎসায় ব্যবহার করা চলে।

কিন্তু মার্কিন স্বাস্থ্য কর্তৃপক্ষ পরিষ্কার ভাষায় বলেছে, এই ধরনের রূপা ব্যবহার করে স্বাস্থ্যের কোন উপকার হয় না। বরং এর ব্যবহারে কিডনির ক্ষতি হতে পারে ও লোকে জ্ঞান হারাতে পারে।

তারা বলে, লোহা এবং জিংক যেমন মানব দেহের জন্য উপকারী, রূপা তেমনটা নয়।

১৫ মিনিট অন্তর জলপান

ফেসবুকের একটি অ্যাকাউন্ট থেকে এক পোস্টে একজন 'জাপানি ডাক্তার'কে উদ্ধৃত করে বলা হয়েছে, করোনাভাইরাসের জীবাণু মুখের মধ্যে ঢুকে পড়লেও প্রতি ১৫ মিনিট পর পর পানি খেলে তা দেহ থেকে বের হয়ে যায়।

এই পোস্টের একটি আরবি ভার্সন ২৫০,০০০ বার শেয়ার হয়েছে।

কিন্তু লন্ডন স্কুল অব হাইজিন এন্ড ট্রপিক্যাল মেডিসিন বিভাগের অধ্যাপক স্যালি ব্লুমফিল্ড বলেছেন, এই দাবির পক্ষে সত্যিই কোন প্রমাণ নেই।

তাপমাত্রা ও আইসক্রিম পরিহার

গরমে এই ভাইরাস মরে যায় বলে সোশাল মিডিয়াতে অনেক ধরনের পরামর্শ দেয়া হচ্ছে।

গরম পানি পান করা, গরম জলে গোসল করা, এমনকি হেয়ারড্রায়ার ব্যবহারেরও সুপারিশ করা হচ্ছে।

ইউনিসেফের উদ্ধৃতি দিয়ে এমনি একটি পোস্ট নানা দেশে সোশাল মিডিয়ায় শেয়ার করা হচ্ছে।

এতে বলা হয়েছে, গরম জলপান করলে এবং রৌদ্রের নীচে দাঁড়ালে করোনাভাইরাসের জীবাণু মরে যাবে।

পাশাপাশি আইসক্রিম খেতেও বারণ করা হয়েছে।

কিন্তু ইউনিসেফ বলছে, এটা স্রেফ ভুয়া খবর। ফ্লু ভাইরাস মানব দেহের বাইরে বেঁচে থাকতে পারে না।

আর দেহের বাইরে এই জীবাণুকে মেরে ফেলতে হলে ন্যূনতম ৬০ ডিগ্রি সেলসিয়াস তাপমাত্রা লাগবে, যেটা গোসলের পানি থেকে অনেক বেশি গরম।

ID: 2289

Context: অ্যান্টিবায়োটিক রেসিস্ট্যান্স

Question: অ্যান্টিবায়োটিক রেসিস্ট্যান্স কী?

Answer:

যদি কারও শরীরে ব্যাকটেরিয়ার সংক্রমণজনিত রোগ হয় এবং সেই রোগ নিরাময়ে কেউ যদি চিকিৎসকের পরামর্শমত সঠিক পরিমাণে এবং পর্যাপ্ত সময় ধরে অ্যান্টিবায়োটিক গ্রহণ না করেন তাহলে ব্যাকটেরিয়াগুলো পুরোপুরি ধ্বংস না হয়ে উল্টো আরও শক্তিশালী হয়ে উঠতে পারে।

তখন এই ব্যাকটেরিয়ার বিরুদ্ধে ওই অ্যান্টিবায়োটিক পরে আর কাজ করে না।

অ্যান্টিবায়োটিক প্রয়োগের পরেও ব্যাকটেরিয়ার এই টিকে থাকার ক্ষমতা অর্জনকে অ্যান্টিবায়োটিক রেজিস্ট্যান্স বলা হয়।

বাংলাদেশের বিভিন্ন হাসপাতালে সাধারণ রোগ নিয়ে চিকিৎসা নেয়া অনেক মানুষের মধ্যে এই অ্যান্টিবায়োটিক রেসিস্ট্যান্স দেখা দিয়েছে। এর ফলে রোগীর আগে যে অ্যান্টিবায়োটিকে রোগ সারতো, এখন আর সেটি কাজ করছে না। না হলে অত্যন্ত উচ্চ মাত্রার অ্যান্টিবায়োটিক দিতে হচ্ছে।

এভাবে মানুষের শরীরের রোগপ্রতিরোধ ক্ষমতা ক্রমে হ্রাস পাচ্ছে

ID: 2290

Context: অস্টিওপোরেসিস

Question: অস্টিওপোরেসিস: হাড় ক্ষয় রোগ কী এবং এটি কেন 'নীরব ঘাতক'?

Answer:

বাংলাদেশ অর্থোপেডিক সোসাইটির তথ্য অনুযায়ী বাংলাদেশে মোট জনসংখ্যার তিন শতাংশই অস্টিওপরোসিস বা হাড় ক্ষয় রোগে আক্রান্ত এবং এই রোগে নারীরাই বেশি আক্রান্ত হচ্ছেন।

চিকিৎসকরা বলছেন এই রোগে আক্রান্তদের অনেকেই তাদের রোগ সম্পর্কে জানেন না এবং আক্রান্তদের সময়মতো সঠিক চিকিৎসা না হলে এমনকি ছয় মাসেই মৃত্যু ঘটতে পারে।

সোসাইটির গবেষণায় পাওয়া তথ্য অনুযায়ী যদিও তাদের অনেকের জানাই নেই যে তারা হাড় ক্ষয় রোগে আক্রান্ত হয়েছেন।

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয়ের ফিজিক্যাল মেডিসিন ও রিহ্যাবিলিটেশন বিভাগের অধ্যাপক একেএম সালেক বলছেন ৫০ বছর বয়সী যারা এ রোগে আক্রান্ত হচ্ছেন তাদের প্রতি দশজনের নয়জনই নারী। তবে ৭০ বছর বয়সীদের মধ্যে পুরুষের সংখ্যা কিছুটা বেড়ে সাধারণত এ অনুপাত হয় ৬:৪ বা ৭:৩।

অনেকদিন ধরে হাড় ক্ষয় রোগে আক্রান্ত রোমেনা আখতার বলছেন দীর্ঘদিন পিঠ ব্যথায় ভোগার পর পরীক্ষায় নিরীক্ষায় ধরা পড়ে যে তিনি হাড় ক্ষয় রোগে আক্রান্ত।

"অনেক দিন ধরেই পিঠে ব্যথা। ব্যথা উঠলে কাজ কর্ম করতে পারতাম না। ব্যথার ঔষধ খেতাম। কিছুক্ষণ ভালো, আবার খারাপ। পরে ডাক্তার টেস্ট করে বললো হাড় ক্ষয়। ঔষধ খাচ্ছি। আর ডাক্তারের পরামর্শ মতো রোদে যাই, একটু পরিশ্রম করার চেষ্টা করি," বিবিসি বাংলাকে বলছিলেন তিনি।

চিকিৎসকরা বলছেন তাদের ধারণা আগামী পাঁচ বছরে নন-কমিউনিকেবল যেসব রোগে মানুষ বেশি আক্রান্ত হয় তার মধ্যে শীর্ষ পাঁচে এই হাড় ক্ষয় রোগ উঠে আসবে।

"হার্ট, স্ট্রোক, ডায়াবেটিস ও ফুসফুসের সমস্যার পর হাড় ক্ষয় রোগে আক্রান্ত রোগীর সংখ্যা বেশি হবে বলে আমরা ধারণা করছি," বলছিলেন মিস্টার সালেক।

ID: 2291

Context: কানে কম শোনা

Question: আগের চেয়ে কানে কিছুটা কম শুনছেন কি?

Answer:

শব্দ দূষণে শরীরে যে অঙ্গটি সবচেয়ে প্রথম আক্রান্ত হয় সেটি হল কান এবং শ্রবণশক্তি, বলছিলেন জাতীয় নাক কান গলা ইন্সটিটিউটের পরিচালক অধ্যাপক মুহাম্মদ আবু হানিফ।

তিনি বলছেন, "কানের ভেতরে রিসেপ্টর প্রথমে শব্দ তরঙ্গকে ধারণ করে, তারপর ককলিয়ার নার্ভের মাধ্যমে মস্তিষ্কে পাঠায়। দীর্ঘদিন অতিরিক্ত শব্দ এই রিসেপ্টরকে ক্ষতিগ্রস্ত করে। ক্রমাগত যারা অনেক শব্দের মধ্যে থাকেন তারা ধীরে ধীরে শ্রবণশক্তি হারাতে থাকেন। অনেকে টেরও পান না যে তারা ধীরে ধীরে কানে কম শুনছেন।"

ইউএনইপির প্রতিবেদনে বাংলাদেশের দুটি শহরের কথা উল্লেখ করা হয়েছে। ঢাকায় বাণিজ্যিক এলাকায় গড়ে শব্দের মাত্রা ১১৯ এবং রাজশাহীতে ১০৩ ডেসিবল। যা একজন মানুষের কানের সহ্য ক্ষমতার অনেক বেশি।

অধ্যাপক হানিফ বলছেন, একজন মানুষ সাধারণত ৪০ ডেসিবল শব্দে কথা বলে। যাকে বলা হয় বাড়ির ভেতরের শব্দ। সেটিই কানের জন্য সুস্থ মাত্রার শব্দ। মানুষের কান ৭০ ডেসিবল পর্যন্ত শব্দ সহ্য করতে পারে।

ID: 2292

Context: প্লাস্টিক এবং অন্যান্য রাসায়নিক পদার্থ

Question: পুরুষের প্রজনন স্বাস্থ্যের ওপর প্লাস্টিক এবং অন্যান্য রাসায়নিক পদার্থ এর প্রভাব ?

Answer:

মানুষের ঘরের ভেতরে ব্যবহৃত হয় এমন কিছু রাসায়নিক পদার্থ পুরুষের প্রজনন স্বাস্থ্যের ওপর কী প্রভাব ফেলছে – তা নিয়ে গবেষণা করছেন যুক্তরাজ্যের নটিংহ্যাম বিশ্ববিদ্যালয়।

এই প্রভাব বোঝার জন্য তিনি কাজে লাগাচ্ছেন গৃহপালিত কুকুরকে। কারণ, গৃহপালিত প্রাণী হিসেবে সেই কুকুর একই বাড়িতে থাকছে এবং একই দূষণকারী রাসায়নিক পদার্থের সংস্পর্শে আসছে।

রেবেকা গবেষণা করছেন প্লাস্টিক, আগুনরোধী রাসায়নিক, এবং ঘরের অন্যান্য নিত্যব্যবহার্য সামগ্রী নিয়ে।

এসব রাসায়নিক পদার্থের কিছু কিছু নিষিদ্ধ, কিন্তু পরিবেশে এবং পুরোনো জিনিসপত্রের মধ্যে তার অবশেষ রয়ে গেছে।

তার গবেষণায় দেখা গেছে, এসব রাসায়নিক পদার্থ আমাদের হর্মোন সিস্টেমকে বিঘ্নিত করতে পারে এবং মানুষ ও কুকুর উভয়ের ক্ষেত্রেই উর্বরতা কমিয়ে দিতে পারে।

রেবেকা ব্ল্যানচার্ড বলছেন, “আমরা মানুষ এবং কুকুর উভয়েরই শুক্রাণুর নড়াচড়ার ক্ষমতা কমে যাওয়ার তথ্য পেয়েছি । তা ছাড়া তার ডিএনএ ভেঙে যাওয়ার পরিমাণও বেড়ে যেতে দেখেছি।“

ডিএনএ ভেঙে যাওয়া বলতে তিনি বোঝাচ্ছেন, যেসব জিনগত সামগ্রী দিয়ে শুক্রাণু তৈরি - তা ক্ষতিগ্রস্ত হওয়া বা ভেঙে যাওয়া।

এর ফলে গর্ভধারণের পরও নানা সমস্যা দেখা দিতে পারে।

রেবেকা ব্ল্যানচার্ড বলছেন, ডিএনএ ভেঙে যাওয়ার পরিমাণ যদি বেড়ে যায় তাহলে গর্ভধারণের প্রথম কয়েক মাসের মধ্যে ‘মিসক্যারেজ’ বা ভ্রুণ নষ্ট হয়ে যাওয়ার ঘটনাও বেড়ে যায়।

তার এই তথ্যের সাথে অন্যান্য গবেষণায় প্রাপ্ত তথ্যের মিল আছে। ওই গবেষণাগুলোতে দেখা গেছে যে প্লাস্টিক, সাধারণ নানা ওষুধ, খাদ্য এবং বাতাসে উপস্থিত রাসায়নিক পদার্থ উর্বরতার ক্ষতি ঘটাতে পারে।

এগুলো শুধু পুরুষ নয়, নারী ও শিশুদের দেহেও বিরূপ প্রভাব ফেলছে।

কার্বন এবং কখনোই নষ্ট হয় না এমন কিছু রাসায়নিক পদার্থের অস্তিত্ব এমনকি গর্ভস্থ শিশুর দেহেও পাওয়া গেছে।

ID: 2293

Context: মেনোপজ হলে নারীর শরীরে পরিবর্তন

Question: মেনোপজ হলে নারীর শরীরে কী কী ঘটে ?

Answer:

বাংলাদেশ মেনোপজ সোসাইটির তথ্যমতে এদেশে নারীদের মনোপজের গড় বয়স ৫১ বছর।

মেনোপজের বয়স প্রতিটি নারীর ক্ষেত্রে ভিন্ন। মেনোপজের প্রক্রিয়াটি কয়েক বছর ধরে ধীরে ধীরে ঘটে।

সাধারণত ৪৫ থেকে ৫৫ বছর বয়সের মধ্যে নারীদের মেনোপজ হয়ে থাকে। অনেক সময় এই বয়সের মধ্যে থেমে থেমে কয়েক মাস পরপর ঋতুস্রাব হতে পারে।

অনেক সময় কোন অস্ত্রোপচারের কারণে যদি কোনও নারীর দুটো ওভারি অথবা জরায়ু ফেলে দিতে হয় তাহলেও হঠাৎ মেনোপজ হয়ে যায়।

তবে একটানা ১২ মাস যখন ঋতুস্রাব বন্ধ থাকে, তখন সেটিকে চিকিৎসকেরা মেনোপজ বলে থাকেন।

বাংলাদেশ মেনোপজ সোসাইটির সাংগঠনিক সম্পাদক গুলশান আরা বলছেন, মেনোপজের ফলে নারীর শরীরে যে পরিবর্তনগুলো হয় তার পেছনে মূল কারণ ইস্ট্রোজেন নামের একটি হরমোন। যা নারীর শরীরের জন্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ।

তিনি বলছেন, “ইস্ট্রোজেন নারীদের নানাভাবে প্রটেকশন দেয়। যেমন নারীর মেনোপজের আগে পুরুষের চেয়ে হার্ট ডিজিজ কম হয় এবং ইস্ট্রোজেনের জন্যেই। কিন্তু যখনই তার মেনোপজ হয় তখন কিন্তু নারী ও পুরুষ হার্ট ডিজিজের সমান সমান রিস্কে থাকে। ইস্ট্রোজেন হরমোন নারীর প্রজনন গ্রন্থিকে তো প্রোটেকশন দেয়ই, ইস্ট্রোজেন নারীর মানসিক স্বাস্থ্যেও প্রভাব ফেলে। তাছাড়া ইস্ট্রোজেন নারীর হাড়ের জন্য ভাল। ইস্ট্রোজেন হরমোন নারীর শরীরে আরও অনেক কাজ করে।”

গুলশান আরা বলছেন, তার কাছে মেনোপজ নিয়ে কথা বলতে আসেন এমন নারীর সংখ্যা খুবই বিরল।

মেনোপজের ফলে ইস্ট্রোজেন হরোমন কমে যাওয়ায় নারীর শরীরে আর কি ঘটে সে সম্পর্কে আরো বিস্তারিত ধারনা দিলেন তিনি।

“মেনোপজের কারণে ইস্ট্রোজেন হরমোন কমে গেলে সবচেয়ে প্রথমে যেটা ঘটে সেটা হল হটফ্লাস। দিনের মধ্যে কয়েকবার হঠাৎ করে খুব গরম লাগে। মুখ লাল হয়ে যায়, ঘেমে যায়। এছাড়া অনেক কিছু ভুলে যাওয়া, খুব ছোটখাটো বিষয়ে আবেগপ্রবণ হয়ে কেঁদে ফেলা।

অনেকে প্রস্রাব ধরে রাখতে পারে না, একটু হাঁচি কাশি দিলে প্রস্রাব পড়ে যায়। যোনিপথ শুকিয়ে যায়, জ্বালা-পোড়া হয়। আর ইস্ট্রোজেন না থাকার আর একটা দীর্ঘমেয়াদি এফেক্ট হল অস্টিওপোরোসিস।”

ID: 2294

Context: অস্টিওপোরোসিস

Question: অস্টিওপোরোসিস কী ?

Answer:

এটি মেনোপজ পরবর্তী সবচেয়ে জটিল সমস্যাগুলোর একটি। এটি হাড়ের ক্ষয়জনিত একটি রোগ।

মেনোপজ পরবর্তী সময়ে নারীরা অস্টিওপোরোসিসের বেশি ঝুঁকিতে থাকেন। পুরুষের চেয়ে নারীর হাড়ের পুরুত্ব কম।

ইস্ট্রোজেন তাকে এ থেকে নিরাপত্তা দেয়। কিন্তু শরীরে মেনোপজের পর ইস্ট্রোজেন হরমোনের নিরাপত্তা কমে যায়।

এর কোন উপসর্গ থাকে না কিন্তু খুব অল্পতেই হাড় ভেঙে যেতে পারে।

নারীর শরীরে পর্যাপ্ত ক্যালসিয়াম এবং কায়িক পরিশ্রমের অভ্যাস না থাকলে মেনোপজ পরবর্তী সময়ে অস্টিওপোরোসিস জটিল আকার ধারণ করতে পারে।

এছাড়া ঘুম না হওয়া, উদ্বেগ, মনমরা ভাব এবং যৌন মিলনে আগ্রহ কমে যাওয়া মেনোপজ পরবর্তী কয়েকটি অভিজ্ঞতা।

সকল নারীর অভিজ্ঞতা অবশ্য একরকম নয়।

ID: 2295

Context: মেনোপজ নিয়ে সচেতনতা

Question: বাংলাদেশে নারীরা মেনোপজ নিয়ে কেন নীরব থাকেন?

Answer:

মাসিক শুরু হলে যেমন নারীর শরীরে আমূল পরিবর্তন ঘটে, সেটি বন্ধ হয়ে গেলেও বদলে যায় অনেক কিছু।

চিকিৎসকেরা বলেন মেনোপজের জন্য আগেভাগে একজন নারীর প্রস্তুতি দরকার।

কিন্তু বাংলাদেশে নারীদের মেনোপজের প্রভাব নিয়ে কথা বলতে যেমন দেখা যায় না, এর জন্য কোন প্রস্তুতিও তারা নেন না এবং কোন সমস্যা হলে নীরবেই তা সহ্য করেন।

বাংলাদেশে মেনোপজ বিষয়ে অনেক নারীর জ্ঞান বেশ সীমিত বলে মনে হয়।

মেনোপজ মানে মাসিক বন্ধ হয়ে যাওয়া এর বাইরে তেমন কোন তথ্য তাদের জানা নেই।

আর চিকিৎসকের কাছে যাওয়ার ক্ষেত্রে নারীরা সাধারণত স্বামী অথবা পরিবারের অন্য কোন সদস্যের উপর নির্ভরশীল।

অন্য কোন শারীরিক সমস্যার ক্ষেত্রে যেমন, মেনোপজের ক্ষেত্রে বিষয়টি চিকিৎসকের কাছে যাওয়ার মতো গুরুত্বপূর্ণ মনে করা হয় না। যদি না তা বড় কোন শারীরিক সমস্যা সৃষ্টি করে।

প্রজনন স্বাস্থ্য বিষয়ে বাংলাদেশের গ্রামাঞ্চলে গবেষণা করেছেন ব্র্যাক বিশ্ববিদ্যালয়ের জেমস পি গ্র্যান্ট স্কুল অফ পাবলিক হেলথের অধ্যাপক আফসানা কাওসার।

তিনি বলছেন, পশ্চিমা বিশ্বে মেনোপজ নারীদের জন্য অনেক বড় ইস্যু।

“তাদের কাছে যৌনতা একটা গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। অনেকে চেহারায় মেনোপজের ছাপ পড়লে, অর্থাৎ মেনোপজের কারণে সৌন্দর্য কমে গেলে তারা ছবি পর্যন্ত তুলতে চান না। সেখানে হরমোন রিপ্লেসমেন্ট থেরাপি হয়। অনেক কিছু করেন নারীরা। তারা এটি নিয়ে কথা বলেন।”

তার ভাষায়, বাংলাদেশে নারীর জীবনের পরবর্তী ধাপ যেমন সে শাশুড়ি, নানী ও দাদী হয়ে উঠবে।

সন্তান জন্মদান, যৌনতা, সৌন্দর্য, শরীরের এই দিকগুলো তার জন্য গৌণ হয়ে উঠবে, সেটি সামাজিকভাবে ঠিক করে করে দেয়া থাকে।

এর উপর নির্ভর করে এই অঞ্চলে মেনোপজের প্রতি মনোভাব গড়ে উঠেছে বলে তিনি মনে করেন।

“এই অঞ্চলের কথা বলি, দক্ষিণ এশিয়া অঞ্চল, এখানে নারীর এই শারীরিক পরিবর্তনটা খুব প্রাকৃতিক পরিবর্তন হিসেবে গ্রহণ করা হয়। যুগ যুগ ধরে এটা খুব ন্যাচারালভাবে চলে এসেছে”।

“এখানে নারীরা বাড়িতে থাকেন, সংসার সন্তান এসব দেখভাল করে থাকেন। একটা সময় নাতি নাতনির দায়িত্ব তার উপরে আসে। নারী কোন সময়ে থেমে নেই। তার জীবন চলমান জীবন। এমন চলমান জীবনে সে তার এই পরিবর্তনটা অনেক সময় বুঝতেই পারে না।”

ID: 2296

Context: যৌনতা ও মেনোপজ

Question: যৌনতা ও মেনোপজ এর সম্পর্ক কী ?

Answer:

কিন্তু সমস্যাটি যদি হয় যৌনতা বিষয়ক তাহলে সে নিয়ে এখানে কথা বলা রীতিমতো অস্বাভাবিক ব্যাপার।

যৌনতায় নারীর আগ্রহ থাকলে সেটি সমাজের পছন্দ নয়। যৌনতা নিয়ে নারী এদেশে কথা বলে খুব কম।

মেনোপজের পর প্রায়শই দাম্পত্য জীবনে যৌনতায় সমস্যা হবে বলে ধারণা করা হয়।

যোনিপথ শুকিয়ে যাওয়াকে সেজন্য অনেকে দায়ী করেন।

তবে চিকিৎসকেরা বলেন এটি ভ্রান্ত ধারনা। নারীরা অনেকে যৌনতায় আগ্রহ হারিয়ে ফেলেন বলে বলে মনে করা হয়।

অনেক নারী মনে করেন স্বামী হয়তো তাকে আর আগের মতো ভালবাসবেন না, তার নারীত্ব হারিয়ে যাবে, এসব চিন্তার কারণে মেনোপজ হওয়ার পর নারীরা অনেকেই আশা হারিয়ে ফেলেন, অবসাদগ্রস্ত হয়ে পড়েন।

“নারীত্বের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ একটা ব্যাপার হল সন্তান ধারণের ক্ষমতা। এর সাথেই মাসিকের সম্পর্ক। মাসিকের সাথে আর একটা যে ব্যাপার খুব গুরুত্বপূর্ণ সেটি হল যৌনতা। অনেক নারীর মনের মধ্যে একটা ভয় থাকে যে সে বোধহয় সেক্সুয়ালি আর আগের মতো পারফর্ম করতে পারবে না।”

এছাড়া একজন নারী অনেক দিন ধরে একটি শারীরিক অভিজ্ঞতার সাথে বসবাস করেন। কিন্তু মেনোপজের মাধ্যমে তিনি নতুন একটা ধাপে প্রবেশ করেন। তার শরীরের অনেক বড় একটি পরিবর্তন ঘটে, সেই সাথে তার জীবনেও অনেক বড় একটি রূপান্তর ঘটে। অনেকের এসব আমূল পরিবর্তনের সাথে মানিয়ে নিতে সমস্যা হয়।

ডা. মেখলা সরকার বলছেন, “দেখা যায় কোন সমস্যা না থাকলেও ইনসিকিউরিটি থেকে সমস্যাটা আসলেই দেখা দেয় এবং এদেশে অনেক নারী যৌনতায় আগ্রহ হারিয়ে ফেলেন।”

ID: 2297

Context: মেনোপজ এর পর করণীয়

Question: মেনোপজ এর পর যা করলে মানিয়ে নিতে সুবিধা হবে ?

Answer:

৩০ বছর বয়স থেকে কিছু বিষয় মেনে চললেই ইস্ট্রোজেন কমে গেলে যে সমস্যাগুলো হয় তার প্রভাব অতটা মারাত্মক হয় না।

“প্রতিটি নারীর মেনোপজ সম্পর্ক সচেতন থাকা প্রয়োজন। এটা সুসম খাবার গ্রহণ, নিয়মিত ব্যায়াম, কায়িক পরিশ্রম ও জীবনে অ্যাক্টিভ থাকার উপর নির্ভর করে। একদম শুরু থেকে যদি আমরা লাইফস্টাইলটা এরকমভাবে তৈরি করি, খাবার যদি সুসম হয়, সচেতনতা থাকে তখন অনেক ভালোভাবে অ্যাডাপ্ট করা যায়, জটিলতাগুলো কম হয়।”

জটিলতাগুলো কমানোর আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ ধাপ হল বিষয়টি নিয়ে কথা বলা।

বয়ঃসন্ধিকালে একটা সময় হলে মেয়েদের ঋতুস্রাব শুরু হওয়াটাই যেমন স্বাভাবিক, ঠিক তেমনি একটি বয়সের পর পুরোপুরি মাসিক ঋতুস্রাব বন্ধ হয়ে যাওয়াও নারীর শরীরের জন্য প্রাকৃতিক নিয়ম।

ID: 2298

Context: ফ্যাটি লিভার ডিজিজ

Question: ফ্যাটি লিভার ডিজিজ কি ?

Answer:

নামই সম্ভবত বলে দেয় এই অসুখটি হলে আসলে কি ঘটে। একজন ব্যক্তির যকৃতে দরকারের চাইতে বেশি চর্বি জমে গেলে সেটিকে ফ্যাটি লিভার ডিজিজ বলা হয়।

যুক্তরাজ্যের স্বাস্থ্য সেবা সংস্থা এনএইচএস বলছে, যকৃতে কিছুটা চর্বির উপস্থিতি থাকা স্বাভাবিক। কিন্তু একজন ব্যক্তির যকৃতের যে ওজন, তার ১০ শতাংশের বেশি যদি চর্বি হয় তখন সেটিকে ফ্যাটি লিভার হিসেবে বিবেচনা করা হয়।

সংস্থাটি বলছে যাদের শরীরের ওজন স্বাভাবিকের চাইতে বেশি তাদের মধ্যে এর প্রবণতা বেশি, বিশেষ করে যাদের শরীরের মাঝখানের অংশে, পেটে অনেক চর্বি রয়েছে তাদের ক্ষেত্রে। এই ধরনের ব্যক্তিদের শরীরকে আপেল আকৃতির শরীর হিসেবে বর্ণনা করেছে এনএইচএস।

এছাড়া যাদের টাইপ-২ ডায়াবেটিস, উচ্চ রক্তচাপ, রক্তে উচ্চ মাত্রার কোলেস্টেরল, থাইরয়েডের সমস্যা, পলিসিস্টিক ওভারি রয়েছে তাদের ঝুঁকি বেশি।

কিন্তু এসব অসুখ নেই এমন ব্যক্তির ক্ষেত্রেও ফ্যাটি লিভার ধরা পড়ছে। এমনকি শিশুদের মধ্যেও এটি পাওয়া যাচ্ছে বলে জানাচ্ছে এনএইচএস।

এক সময় বলা হতো এটি মদ্যপায়ীদের অসুখ। অতিরিক্ত অ্যালকোহল পানের কারণে লিভারে যেসব অসুখ ধরা পড়ে তার সাথে এটির মিল থাকলেও অ্যালকোহলের সাথে একদমই কোন সম্পর্ক নেই এমন ব্যক্তিদের মধ্যেও এর প্রবণতা গত কয়েক দশক ধরে বাড়ছে।

তাই এর আলাদা নাম দেয়া হয়েছে নন-অ্যালকোহলিক ফ্যাটি লিভার ডিজিজ।

ID: 2299

Context: ফ্যাটি লিভার ডিজিজ

Question: কোণ লিভার রোগের শুরুতে লক্ষণ নেই ?

Answer:

ঢাকার শেখ রাসেল গ্যাস্ট্রোলিভার ইন্সটিটিউট ও হাসপাতালের পরিচালক, পরিপাকতন্ত্র ও লিভার রোগ বিশেষজ্ঞ অধ্যাপক ফারুক আহমেদ বলছেন, দীর্ঘদিন কারও ফ্যাটি লিভার থাকলে লিভার ধীরে ধীরে ক্ষতিগ্রস্ত হতে থাকে। এর ফলে যকৃতে ফাইব্রোসিস, ক্যান্সার, লিভার সিরোসিস হয়ে থাকে।

তিনি বলছেন, "প্রাথমিক পর্যায়ে এর কোন লক্ষণ নেই। একদম শুরুতে কোন সমস্যা হয় না। তাই রোগীরা বুঝতে পারে না। অন্য কোন সমস্যার কারণে চিকিৎসকের কাছ গেলেই বেশিরভাগ সময় এটি ধরা পড়ে। এর জন্য আল্ট্রাসনোগ্রাম ও রক্ত পরীক্ষা করার প্রয়োজন হয়। তবে এর পরের ধাপগুলোতে লক্ষণ শুরু হয়"

সেগুলো সম্পর্কে ধারণা দিয়ে তিনি বলছেন, "পেটের উপরের ডান দিকে, বুকের খাঁচার নিচে ডান দিকে ভারি লাগবে, একটা ব্যথা হবে। ক্লান্ত ও দুর্বল লাগবে সব সময়। ওজন কমতে থাকবে যার কোন ব্যাখ্যা নেই। যদি খুব খারাপ পর্যায়ে চলে যায় তাহলে চোখের সাদা অংশ ও ত্বক হলুদাভ হয়ে যাবে, জন্ডিস হবে, ত্বকে চুলকানি দেখা দিতে পারে। পেট, গোড়ালি, পা ফুলে যাবে, রক্ত বমি, কালো পায়খানা হবে। এগুলো খুব অ্যাডভানস স্টেজে হয়।"

ID: 2300

Context: ফ্যাটি লিভার ডিজিজ এর প্রবণতা

Question: বাংলাদেশে ফ্যাটি লিভার ডিজিজ এর প্রবণতা কতটুকু ?

Answer:

অধ্যাপক আহমেদ বলছেন, "পশ্চিমা বিশ্বে এর প্রবণতা অনেক বেশি হলেও আমরা ইদানীং দেখছি আমাদের কাছে ফ্যাটি লিভার নিয়ে আগের চেয়ে অনেক বেশি রোগী আসছেন। এমনকি গ্রামের মানুষ তাদেরও এটি হচ্ছে। আমরা ভাবি যে শহরের মানুষ মোটা হয়ে থাকে আর গ্রামের মানুষ কায়িক পরিশ্রম করে বেশি তাই তাদের ওজন কম। কিন্তু আমাদের নিজেদের গবেষণা আছে। এমনকি গ্রামেও অনেকের ফ্যাটি লিভার পেয়েছি আমরা।"

অধ্যাপক আহমেদ জানিয়েছেন, বাংলাদেশে কুড়ি শতাংশ জনগোষ্ঠীর ফ্যাটি লিভার রয়েছে।

ঢাকা জেলার নবাবগঞ্জ ও দোহার উপজেলায় শেখ রাসেল গ্যাস্ট্রোলিভার ইন্সটিটিউট ও হাসপাতালের করা একটি গবেষণার কথা উল্লেখ করে তিনি বলছেন, সেখানে তেইশ শতাংশ নারী এবং কুড়ি শতাংশ পুরুষদের মধ্যে ফ্যাটি লিভার পাওয়া গেছে। তিনি বলছেন, শহরে এর প্রবণতা তিরিশ শতাংশের মতো।

অধ্যাপক আহমেদ বলছেন, এই মানুষগুলোই ভবিষ্যতে লিভার সিরোসিসের মতো অসুখ নিয়ে আমাদের কাছে আসবে।

ID: 2301

Context: ফ্যাটি লিভার ডিজিজ নিয়ে গবেষণা

Question: ফ্যাটি লিভার ডিজিজ নিয়ে কী গবেষণা আছে ?

Answer:

যুক্তরাষ্ট্রের জন হপকিনস মেডিসিন বলছে এটি এমন এক রোগ যা নীরবে লিভার বা যকৃতের স্বাস্থ্য ক্ষতিগ্রস্ত করে। আর লিভারের স্বাস্থ্যের উপর নির্ভর করে শরীরের গুরুত্বপূর্ণ অন্য সকল অঙ্গের সুস্থতা।

জন হপকিনস মেডিসিন বলছে ফ্যাটি লিভার সারিয়ে তোলার কোন ঔষধ নেই। কিন্তু লিভারের নিজেকে সারিয়ে তোলার দারুণ ক্ষমতা রয়েছে।

সেজন্য অবশ্য দরকার জীবনাচরণ পরিবর্তন করা, লিভারে চর্বি জমার কারণগুলো নির্ণয় করে তা নিয়ন্ত্রণের মাধ্যমে এর খারাপ পর্যায় পর্যন্ত পৌঁছানো প্রতিরোধ করা যায়।

সাবধান হওয়ার জন্য ফারুক আহমেদ বলছেন, "যাদের এর ঝুঁকি বেশি মানে যাদের ওজন বেশি, ডায়াবেটিস, উচ্চ রক্তচাপ, রক্তে উচ্চ মাত্রার কোলেস্টেরল তাদের নিয়মিত এর জন্য আল্ট্রোসনোগ্রাম করা উচিৎ। তাদের এটা করতেই হবে।"

এছাড়া তিনি বলছেন, জীবনাচরণ পরিবর্তন করার জন্য পরিমিত, সুষম খাবার সময়মত খাওয়া। পর্যাপ্ত ফাইবার বা আঁশযুক্ত খাবার খাওয়া। কায়িক পরিশ্রম করে বাড়তি চর্বি শরীর থেকে ঝড়িয়ে ফেলা খুব জরুরি।

ভাজাপোড়া খাবার, সকল প্রকার ফাস্টফুড বর্জন করা। ফাস্টফুডে অতিরিক্ত ক্যালোরি থাকে কিন্তু শরীরের জন্য দরকারি অন্য পুষ্টিগুণ অনেক কম থাকে। তাই ফাস্টফুড শরীরের ওজন বাড়ায়।

পর্যাপ্ত পানি খাওয়া, নিয়ম করে ঘুমানোর অভ্যাস। এভাবে জীবনাচরণ পরিবর্তন করা এবং ফ্যাটি লিভারের সাথে সম্পর্কিত অন্যান্য শারীরিক সমস্যার চিকিৎসা বা নিয়ন্ত্রণ করার কথা বলছেন তিনি।

"কেউ যদি পরিমিত খাবারের চেয়ে বেশি খায়, আপনার দরকার বারোশ ক্যালোরি কিন্তু খেলেন দুই হাজার। আবার শুধু শর্করা জাতিয় খাবারই বেশি খেলেন বা অতিরিক্ত মাংস খেলেন কিন্তু কোন শারীরিক পরিশ্রম করলেন না, তাহলে কিন্তু সমস্যা।", বলছিলেন অধ্যাপক আহমেদ।

ID: 2302

Context: সুষম খাদ্য

Question: সুষম খাদ্য কী ?

Answer:

মোটা হবার জন্য নির্দিষ্ট দুয়েকটি গ্রুপের খাদ্য মানে কার্বোহাইড্রেট বা চর্বি জাতীয় খাবার বেশি খান অনেকে। তাতে শরীরের ক্ষতি হয়।

বরং সব খাদ্য উপাদান রয়েছে এমন খাবার খেতে হবে। এজন্য পুষ্টিবিদের পরামর্শ নিন।

কার্বোহাইড্রেট বা শর্করা, প্রোটিন, ভিটামিন, চর্বি, দুধ ও দুধজাতীয় খাবার এবং খনিজ উপাদান-সমৃদ্ধ ফলমূল রাখুন খাদ্য তালিকায়।

সাথে প্রচুর পানি পান করতে হবে।

সাধারণ নিয়ম হচ্ছে একজন মানুষের উচ্চতার অর্ধেক লিটারে পরিমাপ করে পানি পান করতে হবে।

ID: 2303

Context: সময়মত খাবার খাওয়ার গুরুত্ব

Question: সময়মত খাবার খাওয়ার গুরুত্ব কী ?

Answer:

খাবারের সময় ঠিক রাখুন।

অর্থাৎ সকালের নাস্তা সময়ের অভাবে খেতে পারলেন না, দুপুরে খেতে ইচ্ছে করলো না, কিংবা রাতে একেকদিনে একেক সময়ে খাবার খাচ্ছেন, এসব সুস্থ শরীরের জন্য একেবারেই অনুচিত।

ফলে ওজন বাড়াতে চাইলে বা কমাতে চাইলে এই নিয়ম সবার জন্যই এক।

তা হচ্ছে সময়মত খেতে হবে।

বড় কোন অসুবিধা না থাকলে প্রতিদিন একই সময়ে খাবার খাওয়ার পরামর্শ দেন পুষ্টিবিদেরা।

ID: 2305

Context: অ্যালোপেশিয়া

Question: অ্যালোপেশিয়া কী?

Answer:

যুক্তরাজ্যের জাতীয় স্বাস্থ্যসেবা এনএইচএস বলছে, সাধারণভাবে মাথার চুল পড়ে যাওয়াকে চিকিৎসা শাস্ত্রের ভাষায় অ্যালোপেশিয়া বলে।

সত্তর বছর বয়সী নারীদের অন্তত ৪০ শতাংশ এ রোগে ভোগেন যাতে দেখা যায় তাদের মাথার সামনের অংশের চুল পাতলা হয়ে গেছে।

ID: 2306

Context: স্বাস্থ্য: লবণ বা চিনি

Question: স্বাস্থ্য: লবণ বা চিনি যখন মৃত্যুর কারণ হয়ে উঠতে পারে ?

Answer:

খাবারের টেবিলে অনেকেরই পাতে অতিরিক্ত লবণ নেয়া বা চায়ের বাড়তি চিনি নেয়ার অভ্যাস রয়েছে। কিন্তু স্বাস্থ্য বিশেষজ্ঞরা বলছেন, স্বল্প মাত্রার এরকম কাঁচা লবণ বা চিনি আপনার স্বাস্থ্যের জন্য মারাত্মক ঝুঁকি তৈরি করছে।

মানবদেহের জন্য লবণ বা চিনির প্রয়োজন রয়েছে, কিন্তু তার মাত্রা রয়েছে।

মানুষ প্রতিদিন যে নানা ধরনের খাবার গ্রহণ করে থাকে, তার ভেতরেও লবণ বা চিনির উপস্থিতি থাকে। একজন মানুষের প্রতিদিন যতটা লবণ বা চিনি খাওয়া উচিত, খাবার থেকেই অনেক সময় তার চেয়ে বেশি শরীরে প্রবেশ করে।

ফলে যখন কোন মানুষ খাবার টেবিলে বা চায়ের সঙ্গে বা অন্য কোন ভাবে বাড়তি লবণ বা চিনি গ্রহণ করে, সেটা তার জন্য ঝুঁকির মাত্রা আরও বাড়িয়ে দেয়।

ID: 2307

Context: স্বাস্থ্য: লবণ বা চিনি

Question: দিনে এক চামচের বেশি লবণ নয় ?

Answer:

মানুষের শরীরে যত সোডিয়াম ঢোকে, তার প্রধান উৎস লবণ।

যুক্তরাষ্ট্রের খাদ্য ও ওষুধ প্রশাসন (এফডিএ) বলছেন, মানুষের দেহ ঠিকভাবে কাজ করার জন্য খুব কম পরিমাণ লবণ দরকার হয়। কিন্তু মানুষ প্রতিদিন সেই মাত্রার চেয়ে অনেক বেশি লবণ গ্রহণ করছে।

সংস্থাটি বলছে, একজন মানুষের বমিলিয়ে ২,৩০০ মিলিগ্রাম বা এক চা চামচের বেশি লবণ খাওয়া উচিত নয়।

পুষ্টিবিদ ফারজানা আহমেদ বিবিসি বাংলাকে বলছেন, মানুষের শরীরে সোডিয়াম ক্লোরাইডের বয়স অনুযায়ী চাহিদা আছে। কিন্তু কারও যদি লিভার, কিডনি বা বড় জটিলতা থাকে, তখন সেটার বেশি বা কম হলে সমস্যা তৈরি করতে পারে।

''আমরা সরাসরি লবণ খেতে একেবারেই মানা করে দেই। কিন্তু নানা খাবারের মধ্য দিয়ে একজনের শরীরে যতটুকু লবণ যাবে, তা যেন আধা চা চামচ থেকে এক চা চামচের বেশি না হয়,'' তিনি বলছেন।

যুক্তরাষ্ট্রের সেন্টার ফর ডিজিজ কন্ট্রোল বা সিডিসির তথ্য অনুযায়ী, অতিরিক্ত লবণ রক্তচাপ, হৃদরোগ এবং স্ট্রোকের সম্ভাবনা অনেক বাড়িয়ে দিতে পারে।

বিশেষ করে প্রক্রিয়াজাত খাবার অথবা রেস্তোরাঁয় খাবারে যে লবণ থাকে, সেটা নিয়ন্ত্রণের কোন উপায় থাকে না।

ID: 2308

Context: স্বাস্থ্য: লবণ বা চিনি

Question: যেসব খাবারে লবণ বেশি থাকে ?

Answer:

সিডিসির তথ্য অনুযায়ী, আমেরিকানরা যত লবণ গ্রহণ করে থাকে, তার ৪০ শতাংশের বেশি আসে নীচের খাবারগুলো থেকে:

মাংসের স্যান্ডউইচ

পিৎজা

ট্যাকোস

সুপ

চিপস, ক্র্যাকার্স, পপকর্ন

ফ্রেঞ্চ ফ্রাই বা চিকেন ফ্রাই

পাস্তা

বার্গার

ডিম ভাজা বা ডিমের নানা ভাজি আইটেম

কিন্তু এসব খাবারেও বিভিন্ন স্থানে লবণের মাত্রার কমবেশি হতে পারে। তবে লবণ ছাড়াও বেকিং সোডা, মনো-সোডিয়াম গ্লুটামেট, সোডিয়াম নাইট্রেটের মাধ্যমেও মানুষের দেহে সোডিয়াম প্রবেশ করে। সব মিলিয়ে সোডিয়ামের মাত্রা বেড়ে গেলেও স্বাস্থ্যের ঝুঁকি তৈরি হয়।

তাই এফডিএ খাবার কেনা বা খাওয়ার পূর্বে সেটার গায়ে থাকা লেবেল দেখে নেওয়ার জন্য পরামর্শ দিয়েছে।

তবে সবসময়ে যে লবণের মাত্রা দেখেই সোডিয়ামের উপস্থিতি বোঝা যায়, তা নয়। আচার বা সয়া সসের ভেতর সোডিয়ামের উপস্থিতি সহজে বোঝা যায়। কিন্তু সেরিয়াল এবং প্যাস্ট্রির ভেতরেও সোডিয়াম থাকে, যদিও সেটা হয়তো টের পাওয়া যায় না।

ID: 2309

Context: শরীর থেকে লবণের মাত্রা কমিয়ে আনা

Question: যে ১০ উপায়ে শরীর থেকে লবণের মাত্রা কমিয়ে আনা যায়

Answer:

যুক্তরাষ্ট্রের খাদ্য ও ওষুধ প্রশাসন বলছে, খাবারের ভেতরে থাকা লবণ সম্পর্কে সচেতন হওয়া এবং খাবার তৈরির নতুন উপায় বের করার মাধ্যমে শরীরের সোডিয়ামের মাত্রা ঠিক রাখা যেতে পারে। এজন্য তারা কিছু পরামর্শ দিয়েছে। এসব পরামর্শ অনুসরণ করে আস্তে আস্তে সোডিয়াম গ্রহণের হার কমিয়ে আনা হলে, তার সঙ্গে শরীরও সমন্বয় করে নেবে। ফলে স্বাদের তারতম্য হবে না।

এফডিএ যেসব পরামর্শ দিয়েছে:

১. খাবারের লেবেলে থাকা পুষ্টিমান পড়া

প্যাকেটজাত খাবার বা প্রক্রিয়াজাত খাবারের লেবেলে উপাদানের যে বর্ণনা থাকে, সেখান থেকে দিনে কতটুকু সোডিয়াম শরীরে প্রবেশ করছে, তা যাচাই করা যেতে পারে।

২. নিজের খাবার নিজে তৈরি করা

ইনস্ট্যান্ট নুডলস, তৈরি পাস্তা, নানা ধরনের সসের ব্যবহার কমিয়ে এনে নিজের খাবার তৈরি করা যেতে পারে।

৩. সোডিয়ামমুক্ত ফ্লেভার যোগ করা

রান্না করার সময় বা খাওয়ার সময় লবণ ব্যবহার করা যতটা সম্ভব কমিয়ে দিতে হবে। বিশেষ করে খাবার টেবিলে কাঁচা লবণ খাওয়া পরিহার করতে হবে। লবণের বদলে নানা ধরনের ভেষজ ব্যবহার করে স্বাদের পরিবর্তন আনা যেতে পারে।

৪. তাজা খাদ্যদ্রব্য

প্যাকেটজাত বা প্রক্রিয়াজাত খাবার না কিনে তাজা খাবার খাওয়ার প্রবণতা বাড়াতে হবে। তবে সেক্ষেত্রেও প্যাকেটে দেখে নেয়া ভালো যে, কোন লবণ পানি ব্যবহার করা হয়েছে কিনা।

৫. সস বা সিজনিং পরিহার

শাকসবজি বা সালাদ খাওয়ার সময় লবণ, সস ইত্যাদি ব্যবহার না করলে সোডিয়ামের মাত্রাও কমে আসবে।

৬. লবণাক্ত খাবার ধুয়ে খাওয়া

কৌটার বা প্রক্রিয়াজাত খাবার (যেমন সিমের বিচি, টুনা, সবজি) খাওয়ার পূর্বে ধুয়ে নেয়া যেতে পারে। তাহলে এসব খাবার থেকে সোডিয়ামের মাত্রা অনেক কমে আসবে।

৭. হালকা খাবারে লবণ পরিহার

সকাল বা বিকালের হালকা খাবারে লবণ বা সস জাতীয় পণ্য এড়িয়ে চলা ভালো। তার বদলে ফল বা গাজরের মতো খাদ্য খাওয়া যেতে পারে, যাতে সোডিয়াম থাকে না।

৮. বিকল্প ব্যবহার করুন

অনেক সময় সালাদের মতো পণ্যে সস বা ড্রেসিং ব্যবহার করার মাধ্যমে আসলে সোডিয়াম বা লবণ যোগ করা হয়। এফডিএ পরামর্শ দিচ্ছে, সস, বা বোতলের ড্রেসিং ব্যবহার না করে ভিনেগার, তেল সালাদে ব্যবহার করা যেতে পারে।

৯. খাবারের প্লেট হালকা করুন

কম খাবার মানেই কম সোডিয়াম। তাই ঘরে বা বাইরে খাওয়ার সময় ছোট টুকরো নেয়া, অল্প খাওয়ার অভ্যাস তৈরি করা ভালো।

১০. জিজ্ঞেস করুন কম লবণের খাবার দিতে পারবে কিনা

রেস্তোরাঁ বা বাইরে কোথাও খাবার সময় জিজ্ঞেস করা যেতে পারে যে, তারা কম লবণের খাবার তৈরি করতে পারবে কিনা। এছাড়া সস বা সালাদের ড্রেসিং টেবিলে দেয়ার জন্য বলতে পারেন, তাহলে আপনি সেটা কম মাত্রায় ব্যবহার করতে পারবেন।

ID: 2310

Context: স্বাস্থ্য: লবণ বা চিনি

Question: আরেক নীরব ঘাতক চিনি ?

Answer:

চিনি, শর্করা বা সুগার, যে নামেই ডাকা হোক না কেন, গত কয়েক দশক ধরে এটি বিজ্ঞানী ও চিকিৎসকদের মাথাব্যথার কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে।

তারা বলছেন, এটি জনস্বাস্থ্যের অন্যতম প্রধান শত্রুতে পরিণত হয়েছে। বিভিন্ন দেশের সরকার এর ওপর বাড়তি কর বসাচ্ছে। স্কুল আর হাসপাতালগুলো খাদ্যতালিকা থেকে একে বাদ দিয়ে দিচ্ছে। বিশেষজ্ঞরা বলছেন: আমাদের খাবার থেকে চিনি সম্পূর্ণ বাদ দিয়ে দিতে।

বিজ্ঞানীরা বলছেন, উচ্চমাত্রার ফ্রুকটোজসমৃদ্ধ কর্ন সিরাপ বা বাড়তি চিনিওয়ালা পানীয়, জুস ড্রিংক, মধু, বা সাদা চিনি এগুলো হৃদযন্ত্রের সমস্যা তৈরি করতে পারে, কারণ তা ধমনির ভেতর ট্রাইগ্লিসারাইড জাতীয় চর্বি জমাতে ভূমিকা রাখে।

বিভিন্ন জরিপে এই বাড়তি যোগ করা চিনি সমৃদ্ধ খাবার বা পানীয়ের সাথে হৃদরোগ ও ডায়াবেটিসে আক্রান্ত হবার সম্পর্ক দেখা গেছে। এটি ক্যান্সারের ঝুঁকিও অনেকাংশে বাড়িয়ে দেয়।

চিনি বা অতিরিক্ত মিষ্টি জাতীয় খাবার স্থূলতা বৃদ্ধিতেও ভূমিকা রাখে। যেসব খাবার - যেমন বিভিন্ন ফলের রস বা মিশ্রণ এবং সিরাপ খাওয়ার ক্ষেত্রেও সতর্ক হওয়ার পরামর্শ দিচ্ছেন চিকিৎসকরা।

কিছু গবেষণায় বলা হয়, চিনি বা মিষ্টি খাওয়ার আকর্ষণ কোকেনের আকর্ষণের মতোই - যাকে বলা চলে একটা নেশা।

একাধিক গবেষণার ফল পর্যালোচনা করে দেখা গেছে, কোন এক দিনের খাবারে যদি ১৫০ গ্রামের বেশি ফ্রুকটোজ থাকে, তাহলে তা উচ্চ রক্তচাপ বা কোলেস্টেরলের মতো সমস্যার ঝুঁকি বাড়িয়ে দেয়।

অনেক খাবারের মধ্যে চিনি যুক্ত থাকে, যাকে বলা হয় মুক্ত চিনি। যেমন মধু, সিরাপ, ফলের জুস ইত্যাদি। পেস্ট্রি, কেক, বিস্কুট, কোমল পানীয়ের মধ্যে যে চিনি যুক্ত থাকে, সেটিও এর অন্তর্ভুক্ত। এতে কেউ সরাসরি চিনি বা মিষ্টি না খেলেও এসব খাবার থেকে শরীরের চিনি প্রবেশ করে।

আবার চা বা কফি, শরবতের সঙ্গে সরাসরি চিনি মিশিয়েও খাওয়া হয়। একে বলা হয় বাড়তি চিনি। উভয় ক্ষেত্রে শরীরের সরাসরি চিনি প্রবেশ করে।

যুক্তরাষ্ট্রের খাদ্য ও ওষুধ প্রশাসন বলছে, একজন ব্যক্তি প্রতিদিন যে পরিমাণ খাবার গ্রহণ করে, তার ১০ শতাংশের কম অতিরিক্ত চিনি বা বাড়তি চিনি খাওয়া উচিত।

চকলেটের বাইরে চা এবং কফি এজন্য অনেকাংশে দায়ী।

বিশ্বের অনেক দেশ চিনির ওপর বাড়তি কর বসিয়ে মিষ্টি খাওয়া কমানোর চেষ্টা করছে।

পুষ্টিবিদ ফারজানা আহমেদ বলছেন, সরাসরি কেউ চিনি না খেলেও তার শরীরের কোন সমস্যা হবে না। কারণ নানা খাবার থেকে শরীর চিনি বা গ্লুকোজ পেয়ে থাকে। তাই তার সরাসরি চিনি না খেলেও চলে। তাই আমরা সবাইকে পরামর্শ দেই, চিনি না খেয়ে পারলে ভালো। তারপরেও খেতে ইচ্ছা করলে এক চামচের বেশি নয়। আর শিশুর জন্মের দুই বছর চিনি ও লবণ দুইটাই মানা করি।

অনেকের চিনি বা মিষ্টিজাতীয় খাবারের প্রতি আসক্তি থাকে। বেশি সময় মিষ্টিজাতীয় খাবার না খেলে তাদের অস্থির লাগতে থাকে।

''এটা কাটাতে সচেতনভাবে আস্তে আস্তে চিনি বা মিষ্টি জাতীয় খাবার খাওয়া কমিয়ে আনতে হবে। আর আমরা টক দই খেতেও পরামর্শ দেই। কারণ টক দই খেলে মিষ্টির প্রতি জিহ্বায় একপ্রকার স্পর্শকাতরতা তৈরি হয়, তখন মিষ্টি খাওয়ার আগ্রহ কমে যায়,'' বলছেন পুষ্টিবিদ ফারজানা আহমেদ।

ID: 2311

Context: কোলন ক্যান্সারের ঝুঁকি

Question: তরুণদের মধ্যে কি কোলন ক্যান্সারের ঝুঁকি বাড়ছে?

Answer:

হলিউডের 'ব্ল্যাক প্যান্থার' সিনেমায় প্রধান ভূমিকায় অভিনয় করা চ্যাডউইক বোসম্যান ৪৩ বছর বয়সে কোলন বা মলাশয়ের ক্যান্সারে মারা যাওয়ার পর এই বিশেষ ধরণের ক্যান্সার সম্পর্কে সোশ্যাল মিডিয়ায় আলোচনা করতে দেখা গেছে ব্যবহারকারীদের।

তুলনামূলক কম বয়সে মানুষের মধ্যে কোলন ক্যান্সারের হার কেন বাড়ছে, ঠিক কী কী কারণে কোলন বা কোলোরেকটাল ক্যান্সার হয়ে থাকে - এই ধরণের বিষয়গুলো নিয়ে সোশ্যাল মিডিয়ায় খোঁজখবর নিচ্ছেন এবং আলোচনা করছেন অনেকে।

আমেরিকান ক্যান্সার সোসাইটির ২০১৭ সালের এক গবেষণায় দেখা যায় যে যুক্তরাষ্ট্রে প্রাপ্তবয়স্ক তরুণদের মধ্যে কোলন ক্যান্সারে আক্রান্ত হওয়ার গড় বয়স কমছে।

আমেরিকান ক্যান্সার সোসাইটির তত্বাবধান বিভাগের প্রধান এবং গবেষণা নিবন্ধটির একজন লেখক রেবেকা সিগেল সিএনএন'কে দেয়া এক সাক্ষাৎকারে বলেন, "বিজ্ঞানীরা জানতেন যে তরুণদের মধ্যে কোলোরেকটাল ক্যান্সার শনাক্ত হওয়ার হার বাড়ছে। কিন্তু এত দ্রুতগতিতে এটি হচ্ছে, সেটা জানতে পেরে আমরা বিস্মিত হয়েছি।"

মিজ. সিগেল বলেন, "এই রিপোর্টটি গুরুত্বপূর্ণ, কারণ এটি যে শুধু বর্তমানের ক্যান্সার পরিস্থিতির চিত্র তুলে ধরে তাই নয়, ভবিষ্যৎ সম্পর্কেও আমাদের ধারণা দেয়।"

তিনি মন্তব্য করেন প্রাপ্তবয়স্ক তরুণদের মধ্যে কোলন ক্যান্সার শনাক্ত হওয়ার হার বাড়তে থাকলে তাদের সন্তান জন্মদানের ক্ষমতা ও যৌন ক্ষমতা অক্ষুণ্ণ রাখা নিশ্চিত করার ক্ষেত্রে ডাক্তাররা নতুন ধরণের চ্যালেঞ্জের মুখে পড়বেন।

পাশাপাশি তরুণরা আক্রান্ত হলে দীর্ঘ মেয়াদে তাদের চিকিৎসা চালিয়ে যেতে হয়, যেই ক্ষেত্রে দীর্ঘসময় ধরে চিকিৎসার পার্শ্ব প্রতিক্রিয়াগুলোর বিষয়েও নতুন চ্যালেঞ্জের মুখে পড়তে হবে চিকিৎসকদের।

ID: 2312

Context: কোলন ক্যান্সারের কারণ

Question: কোলন ক্যান্সারের কারণ কী ?

Answer:

যুক্তরাজ্যের স্বাস্থ্য সেবা ব্যবস্থা এনএইচএস'এর তথ্য অনুযায়ী কোলন ক্যান্সারের নির্দিষ্ট কোন কারণ জানা যায় না, তবে কিছু কিছু বিষয় এই ক্যান্সারের ঝুঁকি বাড়াতে পারে। সেগুলো হল:

বয়স - কোলন ক্যান্সারে ভুগতে থাকা প্রতি ১০ জনের ৯ জনের বয়সই ৬০ বা তার চেয়ে বেশি।

খাদ্যাভ্যাস - অতিরিক্ত মাংস খাওয়া এবং খাদ্য তালিকায় ফাইবার সমৃদ্ধ খাবারের স্বল্পতা থাকলে ঝুঁকি বাড়ে।

ওজন - অতিরিক্ত ওজন যাদের রয়েছে, তাদের মধ্যে এই ক্যান্সার হওয়ার সম্ভাবনা বেশি থাকে।

ব্যায়াম - যথেষ্ট শারীরিক পরিশ্রম না করা হলে কোলন ক্যান্সারের ঝুঁকি বৃদ্ধি পায়।

মদ্যপান ও ধূমপান - মদ্যপান ও ধূমপান কোলন ক্যান্সারের ঝুঁকি বাড়াতে পারে।

পারিবারিক ইতিহাস - পরিবারের কোনো সদস্যের (বাবা, মা বা ভাই, বোন) যদি ৫০ এর কম বয়সে কোলন ক্যান্সার হয়, তাহলে ঐ ব্যক্তিরও ক্যান্সারের সম্ভাবনা বাড়ে।

এছাড়া মলত্যাগের জন্য হাই কমোড ব্যবহার করা কোলন ক্যান্সারের ঝুঁকি বাড়াতে পারে বলে উঠে আসে ২০১২ সালে যুক্তরাষ্ট্রের জাতীয় স্বাস্থ্য ইনস্টিটিউটের জার্নালে প্রকাশিত হওয়া এক গবেষণায়। গবেষণাটি ২০০৭ থেকে ২০০৯ পর্যন্ত তেহরানের ১০০ জন কোলন ক্যান্সারে আক্রান্ত রোগীর তথ্য নিয়ে তৈরি করা হয়েছিল।

ID: 2313

Context: কোলন ক্যান্সারের উপসর্গ

Question: কোলন ক্যান্সারের উপসর্গ কী ?

Answer:

এনএইচএস'এর ওয়েবসাইটের তথ্য অনুযায়ী কোলন ক্যান্সারের প্রধান উপসর্গ তিনটি। সেগুলো হল:

মলের সাথে নিয়মিত রক্ত নির্গত হওয়া - মলের সাথে রক্ত নির্গত হয় সাধারণত পাকস্থলীর কার্যক্রমে পরিবর্তন হলে।

পাকস্থলীর কার্যক্রমে দীর্ঘমেয়াদি পরিবর্তন - এরকম সময়ে রোগী সাধারণ সময়ের চেয়ে বেশি মলত্যাগ করে এবং মল অপেক্ষাকৃত তরল হয়ে থাকে।

তলপেটে ক্রমাগত ব্যাথা, পেট ফোলা বা অস্বস্তি বোধ করা - এই উপসর্গের সাথে সাধারণত খাদ্যাভ্যাসে পরিবর্তন, খাওয়ার রুচি হারানো বা ওজন হারানোর সংশ্লিষ্টতা থাকে।

এছাড়া ডায়রিয়া বা কোষ্ঠকাঠিন্য, মলত্যাগ করার পরও বারবার মলত্যাগের ইচ্ছা হওয়া বা রক্তে আয়রনের স্বল্পতার মত উপসর্গও দেখা যায় কোলন ক্যান্সারে।

ID: 2314

Context: বাংলাদেশে কোলন ক্যান্সারের চিত্র

Question: বাংলাদেশে কোলন ক্যান্সারের চিত্র কী?

Answer:

বাংলাদেশে কী পরিমাণ মানুষের মধ্যে কোলন ক্যান্সার শনাক্ত হয়েছে, সেসম্পর্কে নির্দিষ্ট কোনো পরিসংখ্যান না থাকলেও বাংলাদেশের জাতীয় ক্যান্সার রিসার্চ ইনস্টিটিউটের ২০১৪ সালের রিপোর্ট অনুযায়ী বাংলাদেশে মোট ক্যান্সার আক্রান্ত রোগীদের মধ্যে ১৯.২ ভাগ পরিপাকতন্ত্রের ক্যান্সারে আক্রান্ত হয়ে থাকে।

জাতীয় ক্যান্সার গবেষণা ইনস্টিটিউটের এপিডেমিওলজি বিভাগের প্রধান হাবিবুল্লাহ তালুকদার বলেন, "বাংলাদেশে ক্যান্সার পরিস্থিতির বিস্তারিত বিশ্লেষণ বা কোন ধরণের ক্যান্সারে মানুষ বেশি ভুগে, এই বিষয়ে সাম্প্রতিক তথ্য না থাকলেও কমবয়সীদের মধ্যে আজকাল কোলন ক্যান্সারে আক্রান্ত হওয়ার হার কিছুটা বেশি বলে লক্ষ্য করা যাচ্ছে বলে আমরা ধারণা করছি।।"

আর মলত্যাগে হাই কমোডের ব্যবহার কোলন ক্যান্সারের ঝুঁকি বাড়ায় কিনা, এই প্রশ্নের উত্তরে মি. তালুকদার বলেন, "এই বিষয়ে এখনো সেভাবে কোনো গবেষণা না থাকলেও মলত্যাগের পদ্ধতির সাথে কোলন ক্যান্সারের ঝুঁকি বাড়ার সম্পর্ক থাকার সম্ভাবনা রয়েছে।"

মি. তালুকদার বলেন, "আমাদের ধারণা, হাই কমোডে বসে মলত্যাগ করলে মলাশয় পুরোপুরি পরিষ্কার হয় না। প্রয়োজনীয় চাপ না পড়ায় মলদ্বারে কিছুটা মল থেকে যায়। আর মলে অসংখ্য জীবাণু থাকে, আর সেই জীবাণু সেখানে থেকে যাওয়ায় কোলন ক্যান্সারের ঝুঁকি বাড়ার সম্ভাবনা তৈরি হতে পারে।"

ID: 2315

Context: হেপাটাইটিস

Question: হেপাটাইটিস কি ?

Answer:

হেপাটাইটিস যকৃতের প্রদাহজনক অবস্থাকে বোঝায়। এটি সাধারণত একটি ভাইরাল সংক্রমণের কারণে ঘটে থাকে তবে হেপাটাইটিসের অন্যান্য সম্ভাব্য কারণও রয়েছে। এর মধ্যে রয়েছে অটোইমিউন হেপাটাইটিস এবং হেপাটাইটিস যা ওষুধ, ড্রাগ, টক্সিন এবং অ্যালকোহলের গৌণ ফলাফল হিসাবে ঘটে। অটোইমিউন হেপাটাইটিস এমন একটি রোগ যা আপনার শরীর যখন আপনার লিভারের টিস্যুর বিরুদ্ধে অ্যান্টিবডি তৈরি করে তখন ঘটে।

হেপাটাইটিস হিসাবে শ্রেণিবদ্ধ লিভারের ভাইরাল সংক্রমণের মধ্যে হেপাটাইটিস এ, বি, সি, ডি এবং ই অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। প্রতিটি ধরণের ভাইরাল সংক্রমণে হেপাটাইটিসের জন্য আলাদা ভাইরাস দায়ী। এই ওয়েবসাইটটির ফোকাসের জন্য, আমরা কেবলমাত্র হেপাটাইটিস অবস্থার উপর দৃষ্টি নিবদ্ধ করব যা যৌনতার মাধ্যমে সংক্রমণ হতে পারে।

ID: 2316

Context: হেপাটাইটিস বি

Question: হেপাটাইটিস বি কি ?

Answer:

হেপাটাইটিস বি সংক্রামক শরীরের তরল যেমন রক্ত, যোনি নিঃসরণ বা বীর্যর সংস্পর্শের মাধ্যমে সংক্রামিত হয়, যাতে হেপাটাইটিস বি ভাইরাস (এইচবিভি) থাকে। ইনজেকশনের ওষুধের ব্যবহার, সংক্রামিত অংশীদারের সাথে সেক্স করা বা সংক্রামিত ব্যক্তির সাথে রেজার ভাগ করে নেওয়া আপনার হেপাটাইটিস বি হওয়ার ঝুঁকি বাড়ায়।

ID: 2317

Context: হেপাটাইটিস সি

Question: হেপাটাইটিস সি কি ?

Answer:

হেপাটাইটিস সি হেপাটাইটিস সি ভাইরাস (এইচসিভি) থেকে আসে। হেপাটাইটিস সি সংক্রামিত শরীরের তরলগুলির সাথে সরাসরি যোগাযোগের মাধ্যমে সাধারণত ইনজেকশন ড্রাগের ব্যবহার এবং যৌন যোগাযোগের মাধ্যমে সঞ্চারিত হয়। এইচসিভি হ'ল আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের সবচেয়ে সাধারণ রক্তবাহিত ভাইরাল সংক্রমণের মধ্যে একটি।

ID: 2318

Context: রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়ানোর জন্য করণীয়

Question: শরীরের রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়ানোর জন্য কী কী করতে পারি?

Answer:

আমাদের শরীর যখন যে-কোনো ধরনের রোগ-জীবাণু কিংবা ভাইরাস-ব্যাকটেরিয়া দ্বারা আক্রান্ত হয়, তখন সেগুলো থেকে শরীরকে রক্ষা করে আমাদের শরীরের রোগপ্রতিরোধ ক্ষমতা। সুতরাং, যার রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা যতটা ভালো, তার রোগ-বালাইয়ে আক্রান্ত হবার ঝুঁকি ততই কম। রোগপ্রতিরোধ ক্ষমতার কিছু অংশ আমরা জন্মের সময়ই অর্জন করি আর বাকিটা আমাদের জীবনযাপন পদ্ধতির ওপর নির্ভর করে। তাই শরীরের রোগপ্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়াতে হলে নিচের নিয়মগুলো মেনে চলা খুব জরুরি। এগুলো হলো:

ধূমপান এবং যে-কোনো ধরনের নেশাদ্রব্য থেকে দূরে থাকুন। আপনি যদি ধূমপায়ী হোন তবে যে-কোনো রোগে আপনার আক্রান্ত হবার সম্ভাবনা অধূমপায়ীদের থেকে অনেক বেশি।

স্বাস্থ্যকর খাবার খেতে হবে। তেল, চর্বি ও বেশি মশলাযুক্ত খাবারের বদলে শাকসবজি, ফলমূল ও আঁশযুক্ত খাবার বেশি খেতে হবে। চিনিযুক্ত খাবার কম খাওয়াই ভালো। চা-কফি অতিরিক্ত না খাওয়াই ভালো।

প্রতিদিন শারীরিক পরিশ্রম করতে হবে। নিয়মিত আধাঘণ্টা জোরে জোরে হাঁটা শরীরের জন্য খুব ভালো ব্যায়াম।

নিজের ওজন নিয়ন্ত্রণে রাখতে হবে।

মানসিক চাপ কমাতে হবে। কাজের পাশাপাশি পরিবার ও বন্ধুদেরকে সময় দেওয়া কিংবা কোনো ধরনের সখের কাজ মানসিক চাপ নিয়ন্ত্রণে সহায়ক।

রক্তচাপ নিয়ন্ত্রণে রাখা জরুরি। উচ্চ রক্তচাপ শরীরের রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা কমিয়ে ফেলে।

পর্যাপ্ত পরিমাণে ঘুমাতে হবে। ঘুমের পরিমাণ বয়সের সাথে সাথে কম বেশি হতে পারে। তবে সুস্থ থাকতে হলে প্রতিদিন কমপক্ষে ৬ থেকে ৮ ঘণ্টা ঘুমানো খুব জরুরি।

নিজেকে পরিছন্ন রাখতে হবে। বারবার সাবান পানি দিয়ে হাত ধোয়া কিংবা স্যানিটাইজার দিয়ে হাত স্যানিটাইজ করার অভ্যাস সুস্থ থাকার জন্য একটা জরুরি অভ্যাস। চোখ-মুখে হাত দেওয়া, নাক খোঁটা—এই জাতীয় অভ্যাসগুলো ছেড়ে দিতে হবে। যেখানে সেখানে থুতু ফেলার মতো বাজে অভ্যাস বাদ দিতে হবে।

এসব নিয়ম মেনে চললে আমাদের শরীর রোগের বিরুদ্ধে আরো ভালো প্রতিরোধ তৈরি করতে পারবে। আর আমরাও একটা সুস্থ জীবনযাপন করতে পারব।

ID: 2319

Context: অভ্যাস তৈরি ও পরিবর্তন

Question: অভ্যাস কীভাবে তৈরি ও পরিবর্তন হয় ?

Answer:

কোনো অভ্যাস তৈরি করতে বা ছাড়তে সেটির হ্যাবিট লুপ বা অভ্যাসের চক্র গড়তে বা ভাঙতে হবে। এই অভ্যাসের চক্রটি ভাঙতে হলে নিচের ধাপগুলো মেনে চলতে হবে:

১. রুটিনটি চিহ্নিত করুন:

যে অভ্যাসটি বদলাতে চান এবং তার রুটিনটি চিহ্নিত করুন। ধরুন, আপনি দেরিতে ঘুম ভাঙার অভ্যাস ছাড়তে চান। সেটি করতে হলে দেরিতে ঘুমাতে যাওয়া কিংবা অ্যালার্ম বন্ধ করে আবার ঘুমিয়ে যাওয়ার রুটিনটি পরিবর্তন করতে হবে।

২. অন্য পুরস্কার বের করুন:

হ্যাবিট লুপের পুরস্কার অংশটির জন্য খারাপ অভ্যাসগুলো স্থায়ী হয়। খারাপ অভ্যাসটি কেন আপনি বারবার করছেন তা খুঁজে বের করুন। ধরুন, আপনি ফোনে আসক্তির অভ্যাসটি পরিবর্তন করতে চান। এখন, বিনোদন, প্রিয়জনের বার্তা কিংবা সময় কাটানো–এগুলো সব শুধু সোশ্যাল মিডিয়া থেকেই পেলে ফোনে আসক্তি বাড়বেই, তাই না? তাই ফোনের বদলে ১০ মিনিট বই পড়ুন, চা/কফি তৈরি করে সময় কাটান। বিনোদনের উৎস হিসেবে ফোনের পরিবর্তে অন্য কিছু যখন হবে তখন ফোনে আসক্তি এমনিতেই কমে যাবে।

৩. সংকেত চিহ্নিত করুন:

কোন সংকেতগুলো আপনার অভ্যাসটি শুরুর ইঙ্গিত দেয় তার উদাহরণ প্রথমেই দেওয়া হয়েছিল। যেই অভ্যাসটি বদলাতে চান, খেয়াল করুন আপনি কোথায়, কখন, কাদের উপস্থিতিতে, কেমন মনের অবস্থায় বা কোন কাজের পরে সেটি করছেন। কয়েকদিন ধরে চিহ্নিত করার চেষ্টা করুন আপনার জন্য প্রযোজ্য সংকেতটি কী। অভ্যাস ছাড়ার গুরুত্বপূর্ণ ধাপ এটি।

৪. পর্যবেক্ষণগুলো প্রয়োগ করুন:

ধরুন, অ্যালার্ম বাজলে সেটি বন্ধ করে অতিরিক্ত ঘুমানোর অভ্যাস আপনার। এটি করছিলেন কারণ সকালের কাজগুলো করতে আগ্রহী না আপনি। কিন্তু অভ্যাসটি পর্যবেক্ষণ করে বুঝবেন যে, দেরিতে উঠে হুলস্থুল করে কর্মক্ষেত্র বা শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে যেতেও দেরি হচ্ছে। পর্যবেক্ষণের সাথে সাথে আসে প্রয়োগের ব্যাপারটা। যখন আপনি আপনার বাজে অভ্যাসের কারণ এবং এর ফলে ক্ষতি সম্পর্কে জানেন তখন আপনার জন্য কী করে সেই অভ্যাসটি বদলানো যায় সেটি বের করা এবং সেটি প্রয়োগ করা সোজা। যেমন দেরিতে ঘুম থেকে ওঠার অভ্যাসটি বদলাতে রাতে নাস্তা তৈরি, পোশাক নির্বাচন, প্রয়োজনীয় জিনিস গুছিয়ে রাখা, তারাতারি ঘুমাতে যাওয়া–এই জাতীয় কাজগুলো করতে হবে। এর ফলাফল স্বরূপ আপনি সকাল সকাল ঘুম থেকে উঠতে পারবেন এবং সকালের কাজগুলো ভালোমতো করতে পারবেন।

মনে রাখবেন একই পন্থা সবার প্রযোজ্য নাও হতে পারে এবং যে-কোনো অভ্যাস স্থায়ী হতে এক মাসেরও বেশি সময় প্রয়োজন হয়। তাই ধৈর্যশীল হতে হবে এবং নতুন রুটিনটি আপনার জন্য ঠিক কি না তা আপনাকেই বিচার করতে হবে।

ID: 2320

Context: ওজন কমাতে খাবার

Question: ওজন কমাতে দৈনিক কী পরিমাণ শর্করা/কার্বোহাইড্রেট গ্রহণ করা উচিত?

Answer:

খাদ্যতালিকায় কম কার্বোহাইড্রেট বা শর্করা রাখাটা ওজন কমানোর জন্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ। গবেষণা ঠিক এমনটাই বলে। লো-কার্ব ফুড বা কম শর্করা জাতীয় খাবার আমাদের ক্ষুধাকে উপশম করে এবং খাওয়ার সময় খাবার গ্রহণের পরিমাণ না কমিয়ে কেবলমাত্র লো-কার্ব ফুড গ্রহণ করেও ওজন কমানো যায়।

ID: 2321

Context: কম কার্বোহাইড্রেট ডায়েট

Question: কেন আপনি কম কার্বোহাইড্রেট খাবেন?

Answer:

দ্য ডায়েটারি গাইডলাইন অব আমেরিকা-এর মতে আমাদের দৈনিক গ্রহণ করা মোট ক্যালোরির প্রায় ৪৫-৬৫% আসে কার্বোহাইড্রেট থেকে। তাই খাদ্যতালিকায় কার্বোহাইড্রেটের পরিমাণ কমানো মানেই গৃহীত ক্যালোরির পরিমাণ কমানো। লো ফ্যাট বা কম চর্বিযুক্ত ডায়েটের তুলনায় লো কার্বোহাইড্রেট ডায়েট ওজন কমাতে অধিক কার্যকরী। এজন্য হাই কার্ব ফুড যেমন: সাদা চিনি, সাদা ময়দা, চাল, সাদা পাউরুটি ইত্যাদির পরিবর্তে বিভিন্ন শাকসবজি, ফলমূল ও আমিষ জাতীয় খাবার খাদ্যতালিকায় যুক্ত করতে হবে।

ID: 2322

Context: কম কার্বোহাইড্রেট ডায়েট

Question: কতটুকু কার্বোহাড্রেট খেতে পারেন?

Answer:

দিনে কতটুকু শর্করা খাবেন তা নির্ভর করে আপনার বয়স, ওজন, লিঙ্গ, কাজের পরিমাণ ইত্যাদির ওপর। তবে স্বাভাবিক মাত্রা ধরা হয় দিনে ৩০০ গ্রাম। তবে ওজন কমানোর লক্ষ্যে আপনি সেটা কমিয়ে ৫০ -১৫০ গ্রাম পর্যন্ত আনতে পারেন ।

ID: 2323

Context: কম কার্বোহাইড্রেট ডায়েট

Question: ওজন কমাতে কারা কতটুকু পরিমাণ কার্বোহাইড্রেট গ্রহণ করবেন?

Answer:

যাদের শরীর স্লিম, যারা কর্মচঞ্চল এবং কেবলমাত্র ফিট থাকতে চান তারা প্রতিদিন ১০০-১৫০ গ্রাম কার্বোহাড্রেট গ্রহণ করেও ওজন নিয়ন্ত্রণে রাখতে পারেন। তবে খেয়াল করে প্রতিদিন ঠিকমতো সকল প্রকার সবজি, ফলমূল এবং স্বাস্থ্যকর কার্বস যেমন মিষ্টি আলু, গোটা শস্যদানা এবং ওটস গ্রহণ করতে হবে।

যাদের ওজন একটু বেশি তারা ৫০-১০০ গ্রাম কার্বোহাইড্রেট গ্রহণ করে ওজন কমিয়ে আনতে পারেন। সেক্ষেত্রে তাদেরকেও কার্ব জাতীয় খাবারের পরিবর্তে শাকসবজি, ফলমূল, শস্যদানা গ্রহণ করতে হবে।

যাদের ওজন একদম বেশি , দ্রুত ওজন কমাতে চান এবং শরীরে মেটাবলিক সমস্যা আছে তারা দৈনিক ২০-৫০ গ্রাম কার্ব বা শর্করা গ্রহণ করতে পারেন। পাশাপাশি শাকসবজি , বেরি জাতীয় ফল যেমন জাম, ক্রিম, বাদাম এবং শিমের বিচি জাতীয় খাবার গ্রহণ করতে পারেন।

লো-কার্ব ফুড ডায়েট কেবলমাত্র ওজনই কমায় না এটি আমাদের সার্বিক স্বাস্থ্যের জন্যও উপকারী। সঠিক শারীরিক গঠনে কার্বোহাড্রেটেরও প্রয়োজনীয়তা আছে। হাই কার্ব ফুড বা উচ্চ শর্করা জাতীয় খাবার এড়িয়ে গিয়ে তাই অল্প শর্করাযুক্ত খাবার বেছে নেওয়াটাই বুদ্ধিমানের কাজ।

যা এড়িয়ে যাবেন:

সাদা চিনি

সাদা আটা-ময়দা

প্রসেসড বা প্যাকেটজাত খাবার

নুডুলস, পাস্তা

যা গ্রহণ করবেন:

কম ফ্যাটযুক্ত মাছ-মাংস

ডিম

শাকসবজি

বাদাম

ফলমূল

ফাইবার বা আঁশযুক্ত খাবার

গোটা শস্যদানা

স্বাস্থ্যকর ফ্যাটস

সঠিক খাবার বাছাই করার মাধ্যমে ওজন সহজেই কমিয়ে আনা সম্ভব। লো কার্ব ডায়েট শুরু করার আগে ভালো করে যাচাই করে নিতে হবে যা খাচ্ছেন সেটা কতটুকু স্বাস্থ্যকর এবং আপনার দৈনিক কতটুকু দরকার আর আপনি কতটুক খাচ্ছেন।

ID: 2324

Context: মুখ ও পাশের অতিরিক্ত চর্বি কমানোর উপায়

Question: মুখ ও পাশের অতিরিক্ত চর্বি কমানোর ৮ উপায় কী ?

Answer:

অনেকেই তাদের মুখ এবং তার চারপাশের গাল, গলা ও ঘাড়ের অংশের জমানো চর্বি কমিয়ে আনতে চান নিজের মুখশ্রী আরেকটু আকর্ষণীয় করে তোলার জন্য।

বাজারে এমন অনেক ডিজিটাল ডিভাইস এবং স্ট্র্যাপ পাওয়া যায় যেগুলোর নির্মাতার প্রতিষ্ঠান দাবি করে যে সেগুলো মুখমণ্ডলের আশেপাশে জমা অতিরিক্ত চর্বি কমাতে সক্ষম। কিন্তু বাস্তবতা হলো শরীরের যে-কোনো অংশের জমা চর্বি কমানোর জন্য দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনা করে খাদ্যাভাস এবং লাইফস্টাইলের বা জীবনযাত্রায় পরিবর্তন প্রয়োজন।

তবে আশার বিষয় হলো, মুখমণ্ডলের জমা চর্বি কমানোর বেশ কিছু কার্যকরী কৌশল রয়েছে। এমন ৮টি কৌশল সম্পর্কে চলুন জেনে আসি।

১. ফেসিয়াল এক্সারসাইজ বা মুখমণ্ডলের ব্যায়াম: মুখের ব্যায়াম মুখে অবস্থিত মাসলসমূহকে দৃঢ় করে এবং ত্বকের রিংকেলস (কুঁচকে যাওয়া) দূর করতে পারে।

তাছাড়া কিছু গবেষণায় এটাও প্রকাশ পেয়েছে যে বিভিন্ন ফেসিয়াল এক্সারসাইজ মুখের মাসলকে টোন করতে পারে । যা মুখমণ্ডলকে দেখতে আরও স্লিম করে তোলে। এছাড়া এমন ব্যায়ামগুলো মুখের ত্বককে করে তোলে প্রাণবন্ত এবং তরুণের মতো উজ্বলতা এনে দিতে পারে।

২. কার্ডিও বা হৃৎপিণ্ড সংশ্লিষ্ট ব্যায়াম: বেশিরভাগ ক্ষেত্রে মোটা হয়ে যাওয়ার সময় শরীরের বিভিন্ন অংশের পাশাপাশি মুখেও অতিরিক্ত চর্বি জমা হয় । তাই ওজন কমাতে পারলে মুখে জমা চর্বিও এমনিতেই কমে যায়।

কার্ডিও এক্সারসাইজ মূলত সেই সকল ব্যায়াম যা হৃৎপিণ্ডের গতি বাড়ায় এবং ওজন কমানোর জন্য খুবই কার্যকরী। প্রতিদিন ২০- ৪০ মিনিটের মতো কার্ডিও-ই যথেষ্ট।

হাঁটা, দৌড়ানো, বাই সাইকেলিং, সাঁতার, ড্যান্সিং স্কেটিং, সবই কার্ডিও ব্যায়াম।

৩. যথেষ্ট পানি পান: পরিমাণমতো পানি পান করা সর্বোপরি স্বাস্থ্যের জন্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ, এমনকি শরীর ও মুখের অতিরিক্ত চর্বি কমিয়ে আনার ক্ষেত্রে।

পানি শরীরের মেটাবলিজম বাড়ায় এবং শরীরে ক্যালোরি গ্রহণের পরিমাণ কমায়। এছাড়া পানি পানে ক্ষুধা কমে যা ওজন কমাতে সাহায্য করে।

৪. মদ বা নেশাদ্রব্য গ্রহণ বন্ধ করা: অতিরিক্ত মদ পান শরীর ও মুখে মেদ বা চর্বি জমার কারণ হতে পারে। মদ শরীরে ডিহাইড্রেশন অর্থাৎ পানিশূন্যতা সৃষ্টি করে যা শরীরকে পানি ধারণ করে রাখতে প্রভাবিত করে। যার ফলে ওজন বাড়তে পারে।

এছাড়া মদ আমাদের ক্ষুধার অনুভূতিতে ব্যাঘাত ঘটায় যা অধিক খাবার গ্রহণের কারণ হতে পারে।

৫. রিফাইনড কার্বোহাইড্রেট গ্রহণ কমানো: রিফাইনড কার্বস ( সাদা চিনি, সাদা ময়দা , সাদা চাউল ,সাদা রুটি প্রভৃতি) জাতীয় খাবার আমাদের ব্লাড সুগার বাড়িয়ে দিতে পারে। আর হাই ব্লাড সুগার শরীরে অধিক চর্বি জমার অন্যতম একটি কারণ।

৬. পর্যাপ্ত ঘুম: প্রতিদিন পর্যাপ্ত ঘুমের অভাবে শরীরের মেটাবলিজম কমে যায়। যা মুখ ও শরীরের অন্যন্য অংশে চর্বি জমার কারণ হতে পারে। এছাড়া ঠিকমতো ঘুম না হলে শরীরে স্ট্রেস হরমোন কর্টিসল বেড়ে যায় যেটি কি না ওজন বাড়ানোর একটি কারণ। তাই পর্যাপ্ত ঘুম শরীরের চর্বি কমাতে খুবই প্রয়োজন।

৭. সোডিয়াম বা লবণ গ্রহণের পরিমাণ কমিয়ে আনা: খাবারে লবণের পরিমাণ কমিয়ে আনলে সেটি শরীরের ওজন কমাতে সাহায্য করে। লবণ মূলত শরীরে অধিক পানি ধারণ ক্ষমতা সৃষ্টি করে । যা মুখমণ্ডলেও ফোলা ফোলা ভাব সৃষ্টি করতে পারে।

৮. অধিক আঁশযুক্ত খাবার গ্রহণ: আঁশ বা ফাইবার যুক্ত খাবার আমাদের ক্ষুধা প্রশমিত করে । যা ওজন কমাতে ভূমিকা রাখতে পারে। বিভিন্ন প্রকার শাক সবজি, ফল, গোটা শষ্যদানা প্রভৃতি খাবারে প্রচুর ফাইবার রয়েছে। আমাদের দৈনিক ২৫-৩৮ গ্রাম আঁশযুক্ত খাবার খাওয়া প্রয়োজন।

তবে কেবলমাত্র মুখমণ্ডলের চারপাশে জমা চর্বি কমানোর পরিবর্তে পুরো শরীরের চর্বি কমানোর লক্ষ্যে কাজ করা উচিত। কারণ সম্পূর্ণ শরীরে চর্বি কমে গেলে মুখেরও কমবে।

সঠিক খাদ্যাভাস, কর্মচঞ্চলতা, পরিমিত ঘুম ও স্ট্রেস/মানসিক চাপমুক্ত জীবন হতে পারে মুখসহ সম্পূর্ণ দেহে জমা অতিরিক্ত চর্বি থেকে মুক্তির একটি স্থায়ী সমাধান।

ID: 2325

Context: ওজন কমার লক্ষণ

Question: ওজন কমার ৬টি লক্ষণ কী কী ?

Answer:

দেহের বাড়তি ওজন কমাতে দীর্ঘসময় লেগে থাকা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। হাল না ছেড়ে খেয়াল করুন আপনার শরীরের দিকে।

কিছু শারীরিক লক্ষণ আছে যার মাধ্যমে আপনি বুঝবেন যে ওজন কমানোর পথে আপনি সঠিকভাবেই এগিয়ে যাচ্ছেন–

১. মানসিক সুস্থতা বৃদ্ধি: ওজন কমলে মানসিক সুস্থতার উন্নতি ঘটে। ২০১৩ সালের এক সমীক্ষায় দেখা গেছে, যেসব ব্যক্তি ১ বছর ধরে ওজন কমানোর চেষ্টা করছেন,

ওজন কমার পর তাদের ডিপ্রেশন, উদ্বিগ্নতা কমে যায়। অপরদিকে প্রাণশক্তি, আত্মসংযম বেড়ে যায়। তবে ট্রমা (মানসিক আঘাত), অসুস্থতা কিংবা ডিভোর্স,

চাকরি চলে যাওয়ার মতো পরিস্থিতির কারণে ওজন কমে গেলে সেক্ষেত্রে এই মানসিক ব্যাপারগুলো কাজ নাও করতে পারে।

২. আঁটোসাঁটো পোশাক গায়ে লাগা: যেই কামিজ বা জিন্স গায়ে জড়াতে একপ্রকার যুদ্ধ করা লাগত তা এখন সহজেই পরতে পারছেন, যার অর্থ ওজন একটু হলেও কমেছে।

ওজন কমানোর যাত্রায় এই বিষয়টি বেশ মানসিক প্রশান্তি দেয়। ২০১৭ সালে করা এক সমীক্ষায় দেখা গেছে, ৭৭% নারী ও ৩৬% পুরুষ দাবি করেছেন

যে পোশাক গায়ে ফিট হওয়া তাদেরকে ওজন কমানোর ক্ষেত্রে অনুপ্রেরণা দিয়েছে।

৩. শরীরের মাপে পরিবর্তন: শরীরের বিভিন্ন অংশের, বিশেষত কোমরের মাপ কমার অর্থ আপনার ওজন কমেছে। এটি সুস্বাস্থ্যেরও একটি পরিমাপ।

গবেষকরা ৪৩০ জন ব্যক্তির ২ বছরের ওজনের পরিবর্তন লক্ষ করে দেখেছেন, কোমরের মাপ কমার সঙ্গে সঙ্গে ব্লাড প্রেশার, ব্লাড সুগার, কোলেস্টেরলের মাত্রাও কমে আসে।

৪. শরীরের দীর্ঘস্থায়ী ব্যথা কমা: ওজন কমলে দেহের যে অংশগুলো বেশি ভার বহন করে (বিশেষত পায়ের নিম্নাংশ, মেরুদণ্ডের শেষ অংশ) সেগুলোর ব্যথা কমে।

২০১৭ সালের এক গবেষণা অনুযায়ী, যেসব ব্যক্তিরা অন্তত ১০% ওজন কমিয়েছে তাদের দেহের ভার বহনকারী অংশের দীর্ঘস্থায়ী শারীরিক ব্যথা কমেছে।

আরেক গবেষণা বলছে, ২০% ওজন কমালে আর্থ্রাইটিস ও হাঁটুর ব্যথায় ভোগা ব্যক্তিদের ব্যথা কমে।

৫. রক্তচাপ নিয়ন্ত্রণে থাকা: রক্তচাপ নিয়ন্ত্রণে রাখার একটি ভালো উপায় হলো স্বাস্থ্যকর ডায়েটে ওজন কমানো। আগের চেয়ে আপনার রক্তচাপ যদি কমে আসে তবে তা ওজন কমার ক্ষেত্রে ভালো ইঙ্গিত দিচ্ছে।

৬. কম নাক ডাকা: বেশি ওজনের সঙ্গে নাক ডাকার সম্পর্ক রয়েছে। আপনার যদি এই সমস্যা থেকে থাকে এবং আগের চেয়ে বর্তমানে তার মাত্রা কমে তাহলে ধরে নিতে পারেন ওজন কমেছে।

ওজন কমানোর স্বল্পমেয়াদি কোনো পরিকল্পনা না করে দীর্ঘমেয়াদি ও স্বাস্থ্যকর পরিকল্পনা করুন। এতে ওজন কমার পাশাপাশি আপনি সুস্বাস্থ্যের অধিকারী হতে পারবেন।

ID: 2326

Context: পানি বিশুদ্ধ করন

Question: সঠিকভাবে পানি বিশুদ্ধ করবেন কীভাবে?

Answer:

এই গরমে দ্রুত ছড়িয়ে পড়ছে ডায়রিয়াসহ অন্যান্য পানিবাহিত নানান মারাত্মক রোগ। তাই এগুলো প্রতিরোধ করতে সঠিক নিয়মে পানি বিশুদ্ধ করে খাওয়াটা জরুরি।

পানি বিশুদ্ধিকরণের কিছু পদ্ধতি যা আপনি ব্যবহার করতে পারেন:

১. পানি ফুটানো: ফুটানো হলো পানি বিশুদ্ধিকরণের সবচেয়ে নিরাপদ উপায়। এই পদ্ধতিতে একটি পাত্রে পরিষ্কার পানিকে ১০০ ডিগ্রি সেলসিয়াস তাপমাত্রায় ফুটাতে হবে এবং ফুটন্ত অবস্থায় ২-৩ মিনিট রেখে দিতে হবে। ফুটানো হয়ে গেলে পানি ঠান্ডা করে পরিষ্কার পাত্রে ঢেকে রেখে দিতে হবে। যারা বেশি উঁচু জায়গায় থাকেন, তাদের উচিত নিচু জায়গায় বসবাসকারীদের চাইতে বেশি সময় ধরে পানি ফোটানো। কারণ উচ্চতায় কম তাপমাত্রাতেই পানি ফুটতে আরম্ভ করে।

২. ফিল্টার বা ছাকন: ছাকন প্রক্রিয়া পানি বিশুদ্ধিকরণের একটা কার্যকরী উপায় এবং যথাযথ উপকরণ ব্যবহার করতে পারলে পানিকে সব ধরনের দূষিত পদার্থ থেকেই মুক্ত করা যায়। রাসায়নিক এবং ভৌতিক উভয় প্রক্রিয়াতেই পানি ফিল্টার করা যায়। ফিল্টার করলে পানির সকল খনিজ লবণ দূরীভূত হয় না, তাই এটি পানি বিশুদ্ধিকরণের অন্যান্য পদ্ধতির চাইতে বেশি স্বাস্থ্যকর। ছাকন প্রক্রিয়ায় খরচও কম এবং এছাড়া এটি করার সময় পানির অপচয়ও হয় না তেমন। বাজারে বিভিন্ন আকৃতির এবং ধরনের ফিল্টার কিনতে পাওয়া যায়।

৩. ডিস্টিলেশন বা পাতন: এই পদ্ধতিতে তাপ প্রয়োগ করে পানিকে বাষ্পে পরিণত করা হয়, এবং বাষ্প হিসাবেই বিশুদ্ধ পানি সংগৃহীত হয়। পরে ঠান্ডা করলে পানি পাওয়া যায়। তবে এটি খুব ধীর প্রক্রিয়া এবং ব্যয়বহুল। যে সমস্ত ক্ষেত্রে একেবারে অপরিশোধিত পানি ছাড়া আর কোনো উৎস থাকে না তাদের জন্য এই পদ্ধতি উপযোগী। পাতনের জন্য আলাদা যন্ত্রপাতি পাওয়া যায়। ঘরে করতে চাইলে একটা বড়ো পাত্রে পানি দিয়ে তার ভিতরে ছোটো একটা পাত্র দিতে হবে, এবং ঢাকনিটা উলটো করে বড়ো পাত্রটায় বসিয়ে দিতে হবে। বাষ্পীভূত পানি ঢাকনিতে লেগে তরল হয়ে ছোটো পাত্রে জমা হবে।

৪. ক্লোরিনেশন: ক্লোরিন একটি শক্তিশালী রাসায়নিক পদার্থ এবং দীর্ঘদিন ধরেই ঘরের পানি বিশুদ্ধ করতে এটি ব্যবহার হয়ে আসছে। ক্লোরিন দিয়ে সহজেই জীবাণু, পরজীবী এবং অন্যান্য অণুজীবকে মারা যায়। ক্লোরিন ট্যাবলেট বা তরল ক্লোরিন দিয়ে পানি বিশুদ্ধ করা যায়। এটি সস্তা এবং কার্যকর। তবে এক্ষেত্রে কিছুটা সতর্ক থাকা জরুরি। যাদের থাইরয়েডের সমস্যা আছে তাদেরকে ক্লোরিন ব্যবহারের ব্যাপারে চিকিৎসকের পরামর্শ নেওয়া উচিত। ক্লোরিন ট্যাবলেট ব্যবহার করলে সেটি উষ্ণ পানিতে দিতে হয়, কারণ ক্লোরিন ট্যাবলেট পানিতে দ্রবীভূত হয় ২১ ডিগ্রি সেলসিয়াসে।

পানি বিশুদ্ধ করে পান করতে পারলেই আমরা আমাদের দৈনন্দিন জীবনের অনেকগুলো রোগের হাত থেকে নিস্তার পেতে পারব। তাই নিজের সুবিধামতো যেকোনো একটি পদ্ধতিতে পানি বিশুদ্ধ করে নিয়ে পান করাটা জরুরি।

ID: 2327

Context: ওজন না কমা

Question: ওজন কমছে না কেন?

Answer:

আপনি যদি ওজন কমাতে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হয়ে থাকেন এবং খুব কঠোরভাবে লো-কার্ব ডায়েট অনুসরণ করতে থাকেন তবুও দেখা যাবে কয়েক মাস পর আর আগের নিয়মে আপনার ওজন কমছে না। এর কারণ আমাদের ওজন কখনও সমানুপাতিকহারে কমে না। বেশিরভাগ ক্ষেত্রে লো-কার্ব ডায়েট অনুসরণ করার পর প্রথম ৪-৬ সপ্তাহ ওজন খুব দ্রুত কমতে থাকে। কিন্তু তারপরই ওজন কমার হার কমতে থাকে। প্রায় ৬ সপ্তাহ পরে ওজন কমা প্রায় স্থির হয়ে যায়।

এর অন্যতম কারণ হতে পারে–

১.এডাপ্টেশন বা অভিযোজন: দীর্ঘকাল কম শর্করাযুক্ত খাবার খাওয়ার ফলে আমাদের শরীর এতে অভ্যস্ত হয়ে যায়। তখন অল্প শর্করা খেলেও ওজন আর আগের মতো কমে না বরং একটি স্থিতাবস্থা লক্ষ করা যায়।

২.হতাশ হয়ে অসচেতনভাবে খাওয়া: দেহের স্বাভাবিক প্রক্রিয়ায়ই ওজন কমার হার স্থির হয়ে যায় কিন্তু অনেকে সেটা না জানার কারণে হতাশ হয়ে যায় এবং ডায়েট চার্ট অনুসরণ করার আগ্রহ হারিয়ে ফেলে। তাছাড়া ওজন না কমার দুশ্চিন্তাও ওজন বাড়াতে ভূমিকা রাখে।

৩.চর্বি কমছে কিন্তু পেশি বাড়ছে: অনেক সময় শরীরচর্চার কারণে আমাদের শরীরে চর্বি ক্ষয় হয় ঠিকই কিন্তু ওজন কমে না। কারণ চর্বি যেমন কমে তেমনি মাংসপেশি তৈরি হতে থাকে।

মাংসপেশি রক্তে চিনির মাত্রা নিয়ন্ত্রণের পাশাপাশি আমাদের চলনশক্তি জোগায়। তাই মাংসপেশি তৈরি হয়ে ওজন না কমলে ভয় পাবার কিছু নেই। তাই হতাশ না হয়ে ওজন কমানো ধরে রাখতে চাইলে নিম্নোক্ত কাজগুলো করা যেতে পারে–

১.উপভোগ্য ব্যায়াম নির্বাচন করা: ওজন কমাতে আমরা যেসব কঠিন, একঘেয়ে, বিরক্তিকর ব্যায়ামগুলো নির্বাচন করি তার জন্য মোটিভেশন ধরে রাখা অনেক সময়ই প্রায় অসম্ভব হয়ে পড়ে। তাই এমন কোনো শরীরচর্চা নির্বাচন করা যেতে পারে যেটা ওজন কমানোর চেয়ে আনন্দলাভের জন্যই বেশি করতে ইচ্ছে হয়। যেমন বাচ্চাদের সাথে মাঠে দৌঁড়ঝাপ বা খেলাধুলা করা। মোটরচালিত বাইক ব্যবহার না করে সাইকেল চালানোর অভ্যাস করা যেতে পারে। গোসলের সময় পানিতে সাঁতার কেটে গোসল করা হতে পারে ওজন কমানোর একটি উপভোগ্য ব্যায়াম।

২. স্বাস্থ্যকর খাবার খাওয়া: ওজন কমানো মানে খাওয়া-দাওয়া ছেড়ে দেওয়া না। প্রক্রিয়াজাত খাবার যথাসম্ভব পরিহার করতে হবে। তবে আঁশ জাতীয় খাবার যেমন ফলমূল শাকসবজি ইত্যাদি পুষ্টিকর খাবার খাওয়া বরং ওজন কমাতে সহায়তা করে।

৩.পর্যাপ্ত ঘুম: কম ঘুম শরীরের জন্য ক্ষতিকর। এটি ওজন বাড়িয়ে দেয়। তাই ওজন কমাতে চাইলে অবশ্যই স্বাস্থ্যকর ঘুমের অভ্যাস গড়ে তুলতে হবে।

৪.মোটা দানার শস্য খাওয়া: খুব সহজেই খাবার টেবিলে কিছু পরিবর্তন এনে ওজন কমানো যায়। যেমন সাদা চালের পরিবর্তে লাল চাল খাওয়া। রুটি বানানোর সময় মনে করে লাল আটা দিয়ে রুটি বানানো ইত্যাদি। ওজন কমানো কোনো স্বল্পমেয়াদি কার্যক্রম না। রাতারাতি পরিবর্তন আসবে না। কিন্তু কিছু দীর্ঘমেয়াদি স্বাস্থ্যকর অভ্যাস গড়ে তুলতে পারলে নিশ্চিতভাবেই ওজন কমিয়ে স্বাভাবিক জীবনযাপন করা সম্ভব।

ID: 2328

Context: গরমে সুস্থ থাকতে করণীয়

Question: এই গরমে সুস্থ থাকতে কী কী করণীয় ?

Answer:

বৈশাখ মাস চলছে। ইতোমধ্যেই প্রচণ্ড তাপপ্রবাহ বয়ে যাচ্ছে দেশের বিভিন্ন জেলার ওপর দিয়ে। কদিন পর হয়তো তাপমাত্রা বাড়বে আরও বেশি। তাই সুস্থ থাকতে এখন থেকেই প্রস্তুতি নেওয়া আবশ্যক।

স্বাস্থ্যকর ও হালকা খাবার গ্রহণ করুন: গরমে সুস্থ থাকতে চাইলে ভারী খাবার এড়িয়ে চলুন। খাদ্যতালিকায় যোগ করুন হালকা ও স্বাস্থ্যকর খাবার। একেবারে অনেক খাবার না খেয়ে কিছু সময় পরপর অল্প করে খাওয়ার অভ্যাস করুন। ভারী খাবারে বেশি পরিমাণ কার্বোহাইড্রেট ও ফ্যাট থাকে যা দেহের তাপমাত্রা বাড়িয়ে দেয়। এসবের পরিবর্তে খেতে পারেন সতেজ ফল ও সবজি যাতে রয়েছে প্রচুর পরিমাণ পানি। কমলা, তরমুজ, টমেটো ইত্যাদি এক্ষেত্রে বেশ উপকারী।

চোখের সুরক্ষা বজায় রাখুন: কাজের প্রয়োজনে ঘরের বাইরে বের হলে অতিরিক্ত সূর্যের আলো যেন চোখের ক্ষতি করতে না পারে সেদিকে খেয়াল রাখুন। চশমা ব্যবহার করলে অতিবেগুনি রশ্মি থেকে প্রতিরক্ষামূলক চশমা ব্যবহার করুন। এমন সানগ্লাস পরুন যা অন্তত ৯৯% অতিবেগুনি রশ্মি থেকে চোখকে সুরক্ষিত রাখবে।

মদ্যপান ও ক্যাফেইন এড়িয়ে চলুন: মদ, ঠান্ডা পানীয় ও কফি দ্রুত শরীরকে ডিহাইড্রেট বা পানিশূন্য করে দেয়। পছন্দের হলেও তাই গরমে যতটা পারা যায় কফি বা ঠান্ডা পানীয় থেকে দূরে থাকুন। বরং প্রচুর পরিমাণ পানি পান করুন। গরমে দেহের আর্দ্রতা বজায় রাখতে দিনে অন্তত ২ থেকে ৩ লিটার পানি পান করা উচিত।

রাস্তার পাশের খাবার এড়িয়ে চলুন: গরম এলেই রাস্তার পাশের বিভিন্ন খাবার বিশেষ করে শরবত, জুস খাওয়ার পরিমাণ বেড়ে যায়। এগুলো খাদ্যজনিত নানা রোগ যেমন–ডায়রিয়া, ফুড পয়জনিং, বমি, জন্ডিস ইত্যাদির কারণ হয়। তাই এসব এড়িয়ে চলুন।

নিয়মিত গোসল করুন: বাইরে থেকে ঘেমে এসে যত দ্রুত সম্ভব গোসল করে ফেলুন। কারণ দেহে ঘাম জমে ফাংগাল ইনফেকশন দেখা দিতে পারে। অনেকসময়, ঘাম বসে গেলে জ্বর, সর্দি, কাশির মতো সমস্যাও দেখা দেয়।

আরামদায়ক পোশাক পরুন: গরমে সুস্থ থাকতে চাইলে আঁটোসাঁটো পোশাক এড়িয়ে চলুন। সুতির নরম পোশাক গরমের জন্য আদর্শ। এসময় সিনথেটিক কাপড়ের পোশাক এড়িয়ে চলাই ভালো। হালকা রঙের পোশাক পরলে গরমে আরাম পাওয়া যায়।

বেশিক্ষণ এসিতে একদমই নয়: গরম লাগলেই এসি অন করে বসে থাকতে ভালোবাসেন? দীর্ঘসময়ের জন্য এ কাজটি না করাই ভালো। কারণ, এসির বাতাস দ্রুত ত্বক ও চুল রুক্ষ করে দেয় যা বেশ ক্ষতিকর। এসিতে দীর্ঘক্ষণ থাকতে হলে অন্তত খেয়াল রাখুন ঘরের তাপমাত্রা যেন বাইরের তাপমাত্রার চেয়ে খব বেশি কম না হয়। তা না হলে এসি থেকে বের হবার পর গরম লাগার পরিমাণ আরো বেড়ে যাবে। এসবের পাশাপাশি ত্বক ও দেহের যত্ন নিন। বাইরে বের হলে স্কার্ফ, ছাতা বা টুপি সঙ্গে রাখুন, ব্যাগে রাখুন পানি। রোদে পোড়া থেকে বাঁচতে ব্যবহার করতে পারেন

ভালোমানের সানস্ক্রিন লোশন। রূপচর্চায় রাখতে পারেন মুলতানি মাটি, টমেটোর রস, অ্যালোভেরার মতো উপাদান। এভাবেই ছোটো ছোটো পদক্ষেপ নিয়ে গরমে সুস্থ থাকুন, ভালো থাকুন।

ID: 2329

Context: ত্বকের জন্য খাবার

Question: এই ১২টি খাবার ত্বকের জন্য যথেষ্ট ?

Answer:

তরুণ, উজ্জ্বল, মোহময় ত্বকের জন্য টিভিতে দেখানো ওই ঝলমলে বিজ্ঞাপন নিয়ে আর বিরক্ত হওয়া লাগবে না আপনার। বাজারে হাজারও রূপচর্চার ক্রিম এবং এটা সেটার ভিড়ে ক্লান্ত হয়ে গেলেও, এই ১২টি খাবার খেলেই আপনি পেতে পারেন সেই কাঙ্ক্ষিত রূপ।

১। তেলযুক্ত মাছ (ওমেগা-৩ ফ্যাটি অ্যাসিড, উচ্চ মানের প্রোটিন, ভিটামিন ই, এবং জিঙ্ক)

ওমেগা-৩ ত্বকে প্রদাহ কমায়, অর্থাৎ ত্বকে লালভাব এবং ব্রণ কমে যায়, ত্বককে ময়েশ্চারাইজ করে এবং সূর্যের ক্ষতিকারক UV রশ্মির প্রতি কম সংবেদনশীল করে তুলতে পারে।

প্রোটিন ত্বকের কোষগুলোকে শক্তি দেয়।

জিঙ্ক বা দস্তাকে বলা হয় ত্বকে প্রদাহ নিয়ন্ত্রণ ও নতুন কোষ উৎপাদনের জন্য একটি অত্যাবশ্যকীয় খনিজ পদার্থ।

২। মিষ্টি আলু (বিটা ক্যারোটিন) প্রাকৃতিক সানব্লক হিসেবে কাজ করে।

৩। ক্যাপসিকাম বা বেল পেপার (বিটা ক্যারোটিন এবং ভিটামিন সি) গুরুত্বপূর্ণ অ্যান্টিঅক্সিডেন্ট।

কোলাজেন তৈরি করতে প্রয়োজনীয়, যা ত্বককে শক্তিশালী রাখে।

৪। ব্রকলি (ভিটামিন, খনিজ, সালফোরাফেন এবং ক্যারোটিনয়েড) ত্বকে রিঙ্কল বা ভাঁজ পড়তে দেয় না।

ত্বকের ক্যান্সার প্রতিরোধ করতে এবং ত্বককে রোদে পোড়া থেকে রক্ষা করে।

৫। টমেটো (ভিটামিন সি এবং ক্যারোটিনয়েড) ত্বককে সূর্যের অতিবেগুনি রশ্মি থেকে রক্ষা করে।

চামড়া কুঁচকে যাওয়া বা বলিরেখা প্রতিরোধে সাহায্য করে।

৬। সয়া (আইসোফ্ল্যাভোন) বলিরেখা রোধ করে।

ত্বকের স্থিতিস্থাপকতা ধরে রাখে, ত্বকের শুষ্কতা রোধ করে, সেই সাথে ত্বককে অতিবেগুনি রশ্মি থেকে রক্ষা করে।

৭। ডার্ক চকলেট (অ্যান্টিঅক্সিডেন্ট) ত্বককে রোদে পোড়া থেকে রক্ষা করে। বলিরেখা রোধ, ত্বকের পুরুত্ব স্বাভাবিক রাখে, ত্বকের শুষ্কতা রোধ করে, ত্বকে রক্ত ​​প্রবাহ বাড়ায় এবং সর্বোপরি ত্বকের গঠন উন্নত করতে পারে।

৮। সবুজ চা (ক্যাটেচিন–শক্তিশালী অ্যান্টিঅক্সিডেন্ট) ত্বককে সূর্যের অতিবেগুনি রশ্মি থেকে রক্ষা করে।

ত্বকের লালভাব কমায়, ময়েশচারাইজ করে, পুরুত্ব এবং স্থিতিস্থাপকতা উন্নত করে।

৯। লাল আঙ্গুর (রেসভেরাট্রল) ত্বকের ক্ষতি করে এমন রাসায়নিক পদার্থকে দুর্বল করে আপনার ত্বকের বয়স বাড়ার প্রক্রিয়াকে ধীর করে দিতে পারে। তবে এটি থাকে আঙ্গুরের চামড়ায়, তাই চামড়া না ফেলে আঙ্গুর খান।

১০। সূর্যমুখীর বীজ (ভিটামিন ই) গুরুত্বপূর্ণ অ্যান্টিঅক্সিডেন্ট।

১১। আখরোট (অত্যাবশ্যকীয় চর্বি, জিঙ্ক, ভিটামিন ই, সেলেনিয়াম এবং প্রোটিন) ক্ষত নিরাময়, ব্যাকটেরিয়া দমন এবং প্রদাহের বিরুদ্ধে লড়াই করে।

১২। আভোকাডো (চর্বি, ভিটামিন ই এবং সি) ত্বককে সূর্যের অতিবেগুনি রশ্মি থেকে রক্ষা করতে পারে।

এখন আপনি জানেন কোন কোন খাবার, এবং কোন কোন খাদ্য উপাদান আপনার ত্বককে সজীব এবং তারুণ্যদীপ্ত রাখে। তাই হাতের কাছে এই পুষ্টি উপাদানগুলো সম্পন্ন যা খাবার আছে, সেগুলোর দিকে নজর দিন। আপনার রূপচর্চার রুটিনে অন্তর্ভুক্ত করুন স্বাস্থ্যকর খাদ্যাভ্যাস।

ID: 2330

Context: ত্বকের জন্য খাবার

Question: তৈলাক্ত ত্বক ভালো রাখার ১০টি ঘরোয়া উপায় ?

Answer:

ত্বকে থাকা সেবাসিয়াস গ্রন্থি থেকে অতিরিক্ত সিবাম উৎপাদনের জন্য ত্বক তৈলাক্ত হয় । সিবাম হলো চর্বি দিয়ে তৈরি একটি তৈলাক্ত পদার্থ যার কাজ ত্বককে রক্ষা এবং ময়েশ্চারাইজ করা এবং আপনার চুলকে চকচকে এবং স্বাস্থ্যকর রাখা। তবে অত্যাধিক সিবাম ত্বকের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ছিদ্রে আটকে জমে যেতে পারে এবং এতে ব্রণ হতে পারে। জেনেটিক কারণ, হরমোনের পরিবর্তন, এমনকি স্ট্রেস বা মানসিক চাপে সিবামের উৎপাদন বাড়াতে পারে।

তৈলাক্ত ত্বকের যত্ন করা জটিল। বিভিন্ন ওষুধ বা ব্যয়বহুল ক্রিম, প্যাক এবং নানান কঠিন পদ্ধতিগুলো ব্যবহার না করে, আপনি বাড়িতে বসে এই ১০টি প্রাকৃতিক পথ্য ব্যবহার করতে পারেন।

১। মুখ ধোয়া: দিনে ন্যূনতম দুইবার তৈলাক্ত মুখ ধোয়া উচিত। বেশি ক্ষারীয় সাবান এড়িয়ে চলুন। এরচেয়ে মৃদু সাবান যেমন গ্লিসারিন সমৃদ্ধ সাবান ব্যবহার করুন।

২। মধু: মধু জীবাণু প্রতিরোধ করে এবং ত্বকের আর্দ্রতা ধরে রাখতে সাহায্য করে। ব্রণ এবং তৈলাক্ত ত্বকে সরাসরি মুখের ওপর মধু মাখুন। প্রায় ১০ মিনিট অপেক্ষা করে, মধু শুকিয়ে গেলে উষ্ণ পানি দিয়ে ভালোভাবে মুখ ধুয়ে ফেলুন।

৩। ডিমের সাদা অংশ এবং লেবু: লেবু এবং অন্যান্য সাইট্রাস ফল তেল শোষণ করতে সাহায্য করে। এছাড়াও, লেবুর অ্যান্টিব্যাক্টেরিয়াল ক্ষমতাও আছে। ডিম লেবুর প্যাক বানাতে ১টি ডিমের সাদা অংশে ১চা চামচ লেবু রস মেশান। এবারে, এটি আপনার মুখে লাগিয়ে নিন এবং শুকিয়ে না হওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করুন। শুকিয়ে গেলে হালকা গরম পানিতে মুখ ধুয়ে নিন। তবে যাদের ডিমে এলার্জি আছে, তাদের জন্য এই প্রক্রিয়াটি এড়িয়ে চলাই ভালো।

৪। কাজুবাদাম:কাজুবাদামের গুড়ো ত্বকের মৃত কোষ পরিষ্কার বা এক্সফলিয়েট করে। এটি অতিরিক্ত তেল শুষে নিতেও সাহায্য করে। বাদামের স্ক্রাব তৈরি করতে ৩চা চামচ গুড়ো করা কাঁচা বাদামে ২ টেবিল চামচ কাঁচা মধু মিশিয়ে নিন। স্ক্রাবটি আপনার মুখে আস্তে আস্তে হাত ঘুরিয়ে ঘুরিয় বৃত্তাকারভাবে প্রয়োগ করুন। এটি শুকিয়ে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে উষ্ণ পানিতে ধুয়ে ফেলুন। তবে বাদামে এলার্জি থাকলে এটি ব্যবহার করা যাবে না।

৫। ঘৃতকুমারী বাঁ অ্যালোভেরা: অ্যালো ভেরা ত্বকের শুষ্কতা প্রতিরোধ করে। রাতে ঘুমানোর আগে আপনার মুখে পাতলাভাবে ঘৃতকুমারী প্রয়োগ করুন এবং সকাল পর্যন্ত রেখে দিন। তবে আপনার ত্বক অতিরিক্ত সংবেদনশীল হলে অ্যালোভেরা ব্যবহার করবেন না। আপনি যদি আগে অ্যালোভেরা ব্যবহার না করে থাকেন, তবে আপনার হাতে অল্প পরিমাণ মেখে নিন। ২৪ থেকে ৪৮ ঘণ্টার মধ্যে সেখানে যদি কোনো প্রতিক্রিয়া দেখা না যায়, তবে আপনি নিশ্চিন্তে অ্যালোভেরা] ব্যবহার করতে পারেন।

৬। টমেটো: ত্বকে অতিরিক্ত তেল এবং ত্বকের ছিদ্রগুলোতে ময়লা জমে বন্ধ হয়ে গেলে সেগুলো পরিষ্কার করতে টমেটো সাহায্য করে। টমেটো দিয়ে একটি এক্সফলিয়েটিং মাস্ক তৈরি করতে ১টি টমেটোর রসের সঙ্গে ১ চা চামচ চিনি মিশান। এরপর গালের ওপর বৃত্তাকারভাবে ম্যাসেজ করুন এবং ৫ মিনিটের জন্য রেখে দিন। মাস্কটি শুকিয়ে গেলে উষ্ণ পানিতে খুব ভালোভাবে মুখ ধুয়ে নিন।

৭। ব্লটিং পেপার: ব্লটিং পেপার হলো পাতলা কাগজের মতো যা আপনার ত্বক থেকে অতিরিক্ত তেল শুষে নেয়। আপনার ত্বকের তৈলাক্তভাব যখনই আপনাকে অস্বস্তি দেবে, তখনই অথবা সারাদিন প্রয়োজনমতো ব্যবহার করুন ব্লটিং পেপার।

৮। কসমেটিক ক্লে বা কাদামাটি: কসমেটিক ক্লে ত্বকের তেল শোষণ করতে ব্যবহৃত হয়। ফরাসি সবুজ কাদামাটি তৈলাক্ত ত্বক এবং ব্রণের জন্য বেশ উপকারী। কসমেটিক ক্লে দিয়ে মাস্ক তৈরি করতে চাইলে–প্রায় এক চা চামচ মাটিতে ফিল্টারের পানি বা গোলাপজল মিশাতে থাকুন যতক্ষণ না এটি মাখা মাখা বা পুডিংয়ের মতো হয়। আপনার মুখে এই মিশ্রণটি লাগান এবং শুকিয়ে যাওয়া পর্যন্ত রেখে দিন। এরপর হালকা গরম পানি দিয়ে কাদামাটি ধুয়ে ফেলুন।

৯। ওটস: ওটমিল ত্বকের অতিরিক্ত তেল শোষণ এবং এক্সফোলিয়েট করতে সাহায্য করে। আপনার মুখে ওটমিল ব্যবহার করতে, ১/২ কাপ গুড়ো করা ওটস গরম পানিতে মিশিয়ে একটি পেস্ট তৈরি করুন। মিশ্রনটিতে নেড়ে নেড়ে ১ টেবিল চামচ মধু দিন। প্রায় তিন মিনিট ধরে এই ওটমিলের মিশ্রণটি আপনার মুখে ম্যাসাজ করুন। এরপর গরম পানি দিয়ে ধুয়ে ফেলুন এবং মুখ শুকিয়ে নিন। মাঝে মাঝে আপনি এটি ১০-১৫ মিনিটও রেখে দিতে পারেন।

১০। জোজোবা তেল:জোজোবা তেল দিয়ে তৈরি মাস্ক সপ্তাহে দুই থেকে তিনবার প্রয়োগ করলে ত্বকের হালকা ব্রণগুলো কমে আসে। তবে এটি খুব বেশি ব্যবহার করলে তৈলাক্ত ত্বকে হিতে বিপরীত হতে পারে।

ID: 2331

Context: গরমে সুস্থ থাকতে করনীয়

Question: এই গরমে সুস্থ থাকতে কী কী পরিবর্তন ?

Answer:

বৈশাখ মাস চলছে। ইতোমধ্যেই প্রচণ্ড তাপপ্রবাহ বয়ে যাচ্ছে দেশের বিভিন্ন জেলার ওপর দিয়ে। কদিন পর হয়তো তাপমাত্রা বাড়বে আরও বেশি। তাই সুস্থ থাকতে এখন থেকেই প্রস্তুতি নেওয়া আবশ্যক।

স্বাস্থ্যকর ও হালকা খাবার গ্রহণ করুন: গরমে সুস্থ থাকতে চাইলে ভারী খাবার এড়িয়ে চলুন। খাদ্যতালিকায় যোগ করুন হালকা ও স্বাস্থ্যকর খাবার। একেবারে অনেক খাবার না খেয়ে কিছু সময় পরপর অল্প করে খাওয়ার অভ্যাস করুন। ভারী খাবারে বেশি পরিমাণ কার্বোহাইড্রেট ও ফ্যাট থাকে যা দেহের তাপমাত্রা বাড়িয়ে দেয়। এসবের পরিবর্তে খেতে পারেন সতেজ ফল ও সবজি যাতে রয়েছে প্রচুর পরিমাণ পানি। কমলা, তরমুজ, টমেটো ইত্যাদি এক্ষেত্রে বেশ উপকারী।

চোখের সুরক্ষা বজায় রাখুন: কাজের প্রয়োজনে ঘরের বাইরে বের হলে অতিরিক্ত সূর্যের আলো যেন চোখের ক্ষতি করতে না পারে সেদিকে খেয়াল রাখুন। চশমা ব্যবহার করলে অতিবেগুনি রশ্মি থেকে প্রতিরক্ষামূলক চশমা ব্যবহার করুন। এমন সানগ্লাস পরুন যা অন্তত ৯৯% অতিবেগুনি রশ্মি থেকে চোখকে সুরক্ষিত রাখবে।

মদ্যপান ও ক্যাফেইন এড়িয়ে চলুন: মদ, ঠান্ডা পানীয় ও কফি দ্রুত শরীরকে ডিহাইড্রেট বা পানিশূন্য করে দেয়। পছন্দের হলেও তাই গরমে যতটা পারা যায় কফি বা ঠান্ডা পানীয় থেকে দূরে থাকুন। বরং প্রচুর পরিমাণ পানি পান করুন। গরমে দেহের আর্দ্রতা বজায় রাখতে দিনে অন্তত ২ থেকে ৩ লিটার পানি পান করা উচিত।

রাস্তার পাশের খাবার এড়িয়ে চলুন: গরম এলেই রাস্তার পাশের বিভিন্ন খাবার বিশেষ করে শরবত, জুস খাওয়ার পরিমাণ বেড়ে যায়। এগুলো খাদ্যজনিত নানা রোগ যেমন–ডায়রিয়া, ফুড পয়জনিং, বমি, জন্ডিস ইত্যাদির কারণ হয়। তাই এসব এড়িয়ে চলুন।

নিয়মিত গোসল করুন: বাইরে থেকে ঘেমে এসে যত দ্রুত সম্ভব গোসল করে ফেলুন। কারণ দেহে ঘাম জমে ফাংগাল ইনফেকশন দেখা দিতে পারে। অনেকসময়, ঘাম বসে গেলে জ্বর, সর্দি, কাশির মতো সমস্যাও দেখা দেয়।

আরামদায়ক পোশাক পরুন: গরমে সুস্থ থাকতে চাইলে আঁটোসাঁটো পোশাক এড়িয়ে চলুন। সুতির নরম পোশাক গরমের জন্য আদর্শ। এসময় সিনথেটিক কাপড়ের পোশাক এড়িয়ে চলাই ভালো। হালকা রঙের পোশাক পরলে গরমে আরাম পাওয়া যায়।

বেশিক্ষণ এসিতে একদমই নয়: গরম লাগলেই এসি অন করে বসে থাকতে ভালোবাসেন? দীর্ঘসময়ের জন্য এ কাজটি না করাই ভালো। কারণ, এসির বাতাস দ্রুত ত্বক ও চুল রুক্ষ করে দেয় যা বেশ ক্ষতিকর। এসিতে দীর্ঘক্ষণ থাকতে হলে অন্তত খেয়াল রাখুন ঘরের তাপমাত্রা যেন বাইরের তাপমাত্রার চেয়ে খব বেশি কম না হয়। তা না হলে এসি থেকে বের হবার পর গরম লাগার পরিমাণ আরো বেড়ে যাবে। এসবের পাশাপাশি ত্বক ও দেহের যত্ন নিন। বাইরে বের হলে স্কার্ফ, ছাতা বা টুপি সঙ্গে রাখুন, ব্যাগে রাখুন পানি। রোদে পোড়া থেকে বাঁচতে ব্যবহার করতে পারেন ভালোমানের সানস্ক্রিন লোশন। রূপচর্চায় রাখতে পারেন মুলতানি মাটি, টমেটোর রস, অ্যালোভেরার মতো উপাদান।

এভাবেই ছোটো ছোটো পদক্ষেপ নিয়ে গরমে সুস্থ থাকুন, ভালো থাকুন।

ID: 2332

Context: -1

Question:

Answer:

ঘাড়ে হুটহাট টান লেগে ব্যথা হওয়া–এটা আমাদের সাথে হরহামেশাই ঘটে। দৈনন্দিন চলাফেরা এবং নানা কাজে ভুল অঙ্গভঙ্গি এবং পেশির ওপর ভুলভাবে চাপ পড়ার কারণে আমরা অনেকেই ঘাড়ব্যথার শিকার হই। শুধুমাত্র সঠিকভাবে দাঁড়ানো, বসা বা শোয়ার ভঙ্গি পরিবর্তন করেই বেশিরভাগ সময় ঘাড়ব্যথা থেকে মুক্ত থাকা সম্ভব। পাশাপাশি যদি ঘাড়ব্যথা হয়েই যায় তাহলে ঘাড়ের পেশিগুলোকে দুই একদিন বিশ্রাম দিলেই সাধারণত ব্যথা চলে যায়।

তবে এজাতীয় ঘরোয়া চিকিৎসায় আপনার ঘাড়ের ব্যথার উন্নতি না হলে এবং ব্যথা দীর্ঘমেয়াদি হলে অতিসত্বর ডাক্তার দেখানো উচিত।

যদি আপনার ঘাড়ে সামান্য ব্যথা থাকে বা শক্ত হয়ে থাকে, তা উপশম করতে এই সহজ পদক্ষেপগুলো নিতে পারেন:

প্রথম কয়েকদিন বরফ লাগান। এরপরে, একটি হিটিং প্যাড বা গরম তোয়ালে দিয়ে ছেঁক নিয়ে কিংবা গরম পানিতে গোসল করে ঘাড়ে তাপ প্রয়োগ করতে পারেন।

ডাক্তারের পরামর্শমতো আইবুপ্রোফেন বা প্যারাসিটামলের মতো ব্যথা উপশমকারী ওষুধ গ্রহণ করতে পারেন।

আপনার ঘাড়ের ব্যথা বাড়িয়ে দেয় এমন কাজ যেমন, খেলাধুলা, ব্যায়াম, ভারোত্তলন–এসব থেকে কয়েক দিন দূরে থাকুন। এই কাজগুলোতে পুনরায় ফেরার সময় ধীরে ধীরে শুরু করুন।

প্রতিদিন ঘাড়ের ব্যায়াম করুন। ধীরে ধীরে আপনার মাথা ডানে-বায়ে এবং ওপরে-নিচে ঘোরান।

ওঠা, বসা, শোয়া, চলাফেরা এবং প্রাত্যাহিক কার্যকলাপে শরীরকে সঠিক ভঙ্গিতে রাখার অভ্যাস করুন। কুঁজো হয়ে হাঁটা, অনেকক্ষণ ফোন বা কম্পিউটারের দিকে ঘাড় নিচু করে তাকিয়ে থাকা কিংবা আঁকাবাঁকা হয়ে শোয়ার অভ্যাস ত্যাগ করতে হবে।

ঘাড় এবং কাঁধের মাঝে মোবাইল ফোন রেখে কাজ করা এড়িয়ে চলুন।

একইভাবে বেশিক্ষণ দাঁড়াবেন না বা বসবেন না। ঘনঘন আপনার অবস্থান এবং অঙ্গভঙ্গি পরিবর্তন করুন।

ঘাড়ের মৃদু মাসাজ নিতে পারেন।

ঘুমের জন্য বিশেষ ধরনের বালিশ ব্যবহার করুন যা ঘাড়কে সঠিক অবস্থানে রাখে।

ডাক্তারের পরামর্শ ছাড়া ঘাড়ের বন্ধনী বা কলার ব্যবহার করবেন না। কারণ এটি যদি আপনি সঠিকভাবে ব্যবহার না করেন তবে তা আপনার ঘাড়ের ব্যথাকে আরও তীব্র করে তুলতে পারে।

বেশিরভাগ সময়, ঘাড়ের ব্যথা কয়েক দিনে কমে যেতে পারে এবং গুরুতর হয় না। কিন্তু কিছু ক্ষেত্রে, ঘাড়ের ব্যথা গুরুতর আঘাত বা অসুস্থতার লক্ষণ হতে পারে। যদি আপনার ঘাড়ে ব্যথা থাকে যা এক সপ্তাহেরও বেশি সময় ধরে চলতে থাকে, গুরুতর হয় বা অন্যান্য উপসর্গের সাথে ঘাড়ের ব্যথাও থাকে, তাহলে অবিলম্বে চিকিৎসকের পরামর্শ নিন।

ID: 2333

Context: ফিজিওথেরাপি

Question: ফিজিওথেরাপি কী?

Answer:

“ফিজিওথেরাপি” শব্দটির সাথে আজকাল আমরা সবাই কম বেশি পরিচিত। ফিজিওথেরাপি শব্দটিতে রয়েছে দুটি অংশ, ফিজিও বা ফিজিকাল এবং থেরাপি। কেমোথেরাপিতে যেমন হয় ওষুধ দিয়ে রোগের উপশম করা হয়, সেরকমই ফিজিও থেরাপিতে নানান শারীরিক ব্যায়ামের মাধ্যমে রোগ নিরাময় করা হয়।

ফিজিওথেরাপির মূল লক্ষ্য হলো দৈনন্দিন জীবনে আমাদের চলাফেরা যেন ব্যথামুক্ত হয়।

ফিজিওথেরাপির মাধ্যমে আমরা যেসব সমস্যা থেকে নিরাময় পেতে পারি সেগুলো হলো–

১. বিভিন্ন ধরনের মাথা, ঘাড়, কাঁধ, পিঠ, কোমর ও হাঁটুর ব্যথা,

২. বাত-ব্যথা,

৩. আঘাতজনিত ব্যথা,

৪. প্যারালাইসিস,

৫. সড়ক দুর্ঘটনার আঘাত,

৬. শারীরিক প্রতিবন্ধতা,

৭. বিকলাঙ্গতা,

৮. পক্ষাঘাত,

৯. স্পোর্টস ইনজুরির।

এ ছাড়াও বড়ো কোনো অস্ত্রোপচারের পর রোগীর স্বাভাবিক জীবনে ফিরে আসার অন্যতম প্রধান চিকিৎসাই হলো ফিজিওথেরাপি।

একজন ফিজিথেরাপিস্ট প্রাথমিকভাবে আপনার শারীরিক অবস্থাকে মূল্যায়ন এবং রোগ নির্ণয় করে আপনার উপযোগী ব্যায়ামের পরামর্শ দিবেন যা আপনাকে সক্রিয় এবং সুস্থ করে তুলবে।

তবে খেয়াল রাখতে হবে, ফিজিওথেরাপি চিকিৎসা ও পরামর্শের জন্য অবশ্যই একজন বিশেষজ্ঞ ফিজিওথেরাপিস্টের কাছে যেতে হবে। অনেক সময় হাসপাতালে বা ক্লিনিকে ভর্তি থেকেও ফিজিওথেরাপি চিকিৎসা নিতে হয়। সেক্ষেত্রে রোগী দ্রুত আরোগ্য লাভ করে।

বাংলাদেশে প্রতিদিন গড়ে প্রায় পাঁচ লাখ মানুষ ফিজিওথেরাপি চিকিৎসার নিয়ে থাকেন। কিন্তু এর মধ্যে শতকরা প্রায় ৯০ ভাগ সঠিক ফিজিওথেরাপি চিকিৎসা পান না এবং অপচিকিৎসার শিকার হন। আমাদের দেশে এই চিকিৎসাসেবাতে বিভিন্ন মহলের অপপ্রচার ও অনভিজ্ঞ লাইসেন্সহীন অসাধু লোকের জন্য সাধারণ মানুষ সঠিক চিকিৎসা সেবা থেকে বঞ্চিত হচ্ছে।

তাই, শারীরিক ব্যথাহীন আনন্দময় জীবনের জন্য কিংবা বিভিন্ন মেকানিক্যাল অসুস্থতা থেকে নিরমায় পেতে বিশেষজ্ঞ ফিজিওথেরাপিস্টের কাছে যাওয়া আমাদের সকলের জন্যই ভালো।

ID: 2334

Context: ঘাড় ব্যথা কেন

Question: ঘাড় ব্যথা কেন হয়?

Answer:

আমরা মাঝে মাঝেই ঘাড়ে ব্যথা অনুভব করি। কিছু কিছু ক্ষেত্রে এসব ঘাড়ের ব্যথা খুব গুরুতর কিছু নয় এবং তা কয়েক দিনের মধ্যে সেরেও যায়। কিন্তু অনেক সময় ঘাড়ের ব্যথা গুরুতর আঘাত বা অসুস্থতার লক্ষণও হতে পারে।

যেসব কারণে ঘাড় ব্যাথা হয়:

১. ঘাড়ের পেশিতে টান এবং চাপ লাগলে: দৈনন্দিন কার্যকলাপে ভুল অভ্যাসের কারণে ঘাড় ব্যথা হতে পারে, যেমন–ভুল ভঙ্গিতে বসা বা শোয়া বা কাজ করা, অবস্থান পরিবর্তন না করে খুব বেশি সময় ধরে ডেস্কে কাজ করা, ঘুমের সময় বেকায়দায় ঘাড় রাখা এবং ব্যায়ামের সময় ঘাড়ে ঝাঁকুনি লাগা।

২. আঘাত: পড়ে যাওয়া, গাড়ি দুর্ঘটনা এবং খেলাধুলার বিভিন্ন আঘাতে ঘাড় অধিকতর ঝুঁকিতে থাকে। অন্যদিকে ঘাড়ের হাড় (সারভাইকাল কশেরুকা) ভেঙে গেলে মেরুদণ্ডও ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে। হঠাৎ মাথার ঝাঁকুনি থেকে ঘাড়ের আঘাতকে সাধারণত হুইপ্ল্যাশ বা কশাঘাত বলা হয়।

৩. হার্ট অ্যাটাক: হঠাৎ হার্ট অ্যাটাক হলে কিংবা রক্তচাপ অনেক বেশি বেড়ে গেলে ঘাড় ব্যথা হতে পারে, যার সাথে অন্যান্য উপসর্গগুলোও দেখা দেয় যেমন–হাঁপানি, ঘাম, বমি বমি ভাব বা বমি হওয়া, বাহু বা চোয়াল ব্যথা। এ অবস্থায় অনতিবিলম্বে হাসপাতালে যেতে হবে।

৪. মেনিনজাইটিস: মস্তিষ্ক এবং মেরুদণ্ডকে ঘিরে থাকে এক ধরনের পাতলা টিস্যু। এই পাতলা টিস্যুতে জীবানুর সংক্রমণ বা প্রদাহকে মেনিনজাইটিস বলে। মেনিনজাইটিসের লক্ষণগুলো হলো মাথাব্যথা, বমি বমি ভাব বা বমি, আলোর প্রতি সংবেদনশীলতা, জ্বর। মেনিনজাইটিস জীবনঘাতি হয়ে উঠতে পারে। তাই কারো যদি মেনিনজাইটিসের লক্ষণ থাকে তবে অবিলম্বে চিকিৎসা কেন্দ্রে যেতে হবে।

৫. ঘাড় এবং এর পার্শ্ববর্তী এলাকার অসুস্থতা, যাতে ঘাড়ের পেশি বা হাড়ে বেশি চাপ পড়ে: কিছু রোগ আছে যেগুলোতে ঘাড় এবং এর আশেপাশের পেশিগুলো দুর্বল হয়ে যায়, ফলে ঘাড়ের হাড়ের ওপর মাথার ওজন বেশি পড়ে। যেমন:

রিউমাটয়েড আর্থ্রাইটিস বা বাত: এই রোগে ব্যথা, হাড়ের জয়েন্ট ফুলে যাওয়া এবং হাড়ের অস্বাভাবিকতা হয়। ঘাড় বা এর আশেপাশে এগুলো হলে, ঘাড়ে ব্যথা হতে পারে।

অস্টিওপোরোসিস: এতে হাড় দুর্বল হয় এবং তাতে ছোটো ছোটো ফাটল হতে পারে। অস্টিওপোরোসিস প্রায়শই হাতে বা হাঁটুতে ঘটে, তবে এটি ঘাড়েও হতে পারে যার ফলে সৃষ্টি হয় ব্যথা।

স্পন্ডিলাইটিস: আপনার বয়স বাড়ার সাথে সাথে সার্ভিকাল ডিস্ক ক্ষয়ে যেতে পারে। এটি স্পন্ডিলাইটিস বা ঘাড়ের অস্টিওআর্থারাইটিস নামে পরিচিত। এটি কশেরুকাগুলোর মাঝে জায়গা কমিয়ে দেয় এবং জয়েন্টগুলোতে চাপ দেয়।

স্লিপড ডিস্ক: যেকোনো ট্রমা বা আঘাত থেকে যখন কশেরুকার একটি ডিস্ক বেরিয়ে আসে, তাতে মেরুদণ্ডের ওপর চাপ পড়তে পারে। একে হার্নিয়েটেড সার্ভিকাল ডিস্ক বলা হয়, যা ফেটে যাওয়া বা স্লিপড ডিস্ক নামেও পরিচিত।

স্পাইনাল স্টেনোসিস: স্পাইনাল স্টেনোসিস ঘটে যখন মেরুদণ্ড সরু হয়ে আসে এবং তাতে চাপ পড়ে। এটি আর্থ্রাইটিস বা অন্যান্য অসুস্থতার কারণে দীর্ঘমেয়াদি প্রদাহ থেকে হতে পারে।

জীবাণুর সংক্রমণ,

ঘাড়ের চামড়ার ওপরে বা ভেতরে ফোড়া,

টিউমার,

মেরুদণ্ডের ক্যান্সার।

তাই ঘাড়ে ব্যথা, বিশেষ করে দীর্ঘস্থায়ী ব্যথার ক্ষেত্রে ঘরে বসে না থেকে ডাক্তারের পরামর্শ নিন। হতে পারে, আপনার ঘাড়ে ব্যথা শরীরের অন্য কোনো জটিল সমস্যার জানান দিচ্ছে।

ID: 2335

Context: ঘাড় ব্যথার লক্ষণগুলো

Question: ঘাড় ব্যথার লক্ষণগুলো কী?

Answer:

আমাদের ঘাড় খুবই গুরুত্বপূর্ণ একটি অঙ্গ। ঘাড়ের হাড়, পেশি এবং লিগামেন্টসমূহ আমাদের মাথার ভার বহন করে এবং তার চলন নিয়ন্ত্রণ করে। এই অংশগুলোতে যেকোনো অস্বাভাবিকতা, প্রদাহ বা আঘাত হয়ে উঠতে পারে ঘাড় ব্যথার কারণ।

ঘাড়ের ব্যথার লক্ষণগুলোর তীব্রতা এবং স্থায়িত্বকাল এক এক রকম। প্রায়শই, ঘাড়ের ব্যথা সহনশীল পর্যায়ের হয় এবং মাত্র কয়েক দিন বা সপ্তাহ স্থায়ী হয়। আবার এটি দীর্ঘস্থায়ীও হতে পারে। তবে ঘাড়ের ব্যথা হালকা বা তীব্র যাইহোক না কেন–তা কিন্তু আমাদের দৈনন্দিন জীবনে প্রভাব ফেলে।

ঘাড় ব্যথার নানানরকম লক্ষণ রয়েছে:

অনেকের ঘাড় ব্যথায় তাদের ঘাড় শক্ত বা আটকে যাওয়ার অনুভুতি হয়। এই অবস্থায় ঘাড়ের নড়াচড়াও সীমিত হয়।

অনেকের ক্ষেত্রে ব্যথাটি তীক্ষ্ণ বা “ছুরিকাঘাতের” ব্যথার মতো অনুভূত হয় ঘাড়ের যেকোনো একটি নির্দিষ্ট অংশে।

ঘাড়কে ওপরে নিচে, ডানে বায়ে ঘাড় নাড়াতে গেলে বা বাঁকালে ঘাড়ের ব্যথা তীব্রভাবে অনুভব হয়।

ঘাড়ের ব্যথা ছড়িয়ে যাওয়া অথবা অসাড়তা: ঘাড়ের ব্যথা আপনার মাথা, কাঁধ এবং বাহুতে ছড়িয়ে যেতে পারে। যদি আপনার ঘাড়ে ব্যথা কোনো স্নায়ুর জটিলতার জন্য হয় তাহলে আপনি বাহু বা হাতে অসাড়তা, শিহরণ বা দুর্বলতা অনুভব করতে পারেন। এক্ষেত্রে ঘাড়ে একটি জ্বলন্ত বা তীক্ষ্ণ ব্যথার মতো শুরু হয় যা হাত পর্যন্ত ছড়িয়ে যায়। আপনি যদি এই উপসর্গটি অনুভব করেন তবে একজন ডাক্তারের সাথে দ্রুত পরামর্শ করুন।

ঘাড়ে ব্যথা শুরু হলে তা সার্ভিকোজেনিক মাথাব্যথা নামক মাথাব্যথাও তৈরি করতে পারে। মাথা ব্যথার সাথে ঘাড়ে ব্যথা মাইগ্রেনের মাথাব্যথার লক্ষণ হতে পারে।

অনেক সময় ডাক্তারের কাছে মেরুদণ্ড পরীক্ষা করার কারণেও ঘাড়ের ব্যথা বাড়তে পারে।

যদি আপনার ঘাড়ে ব্যথা থাকে যা এক সপ্তাহেরও বেশি সময় ধরে চলতে থাকে এবং গুরুতর হয় বা অন্যান্য উপসর্গের সাথে থাকে, তাহলে অবিলম্বে চিকিৎসার পরামর্শ নিন।

ID: 2336

Context: ব্যাক পেইন বা পিঠ ব্যথা কেন

Question: ব্যাক পেইন বা পিঠ ব্যথা কেন হয়?

Answer:

ব্যাক পেইন শব্দটি আমরা আজকাল বেশ শুনতে পাই। এই ব্যাক পেইন বা পিঠ ব্যথা সাধারণত নিচের পিঠের পেশি, লিগামেন্ট, মেরুদণ্ড, কশেরুকার সমস্যা থেকে তৈরি হয়। পিঠ ব্যথার কারণগুলোর ভেতর সবচেয়ে বেশি থাকে পিঠের পেশিতে চাপ পড়া এবং পিঠের কাঠামোগত সমস্যা। চলুন জেনে নেওয়া যাক পিঠ ব্যথা বা ব্যাকপেইনের কারণগুলো কী কী।

১. পিঠের পেশিতে চাপ বা স্ট্রেইন: পিঠের পেশিতে অতিরিক্ত চাপ, ভারী বস্তু ভুলভাবে উত্তোলন এবং ভুল ভঙ্গিতে শরীরের আকস্মিক নড়াচড়াতে প্রায়ই পিঠে ব্যথা করে। অতিরিক্ত কাজ করার ফলেও পেশিতে চাপ পড়তে পারে।

২. কাঠামোগত সমস্যা: কশেরুকা হলো মেরুদণ্ডকে ঘিরে থাকা চাকতি আকারের হাড়। এই হাড়গুলো একে অপরের সাথে সংযুক্ত। প্রতিটি কশেরুকার মধ্যবর্তী স্থানগুলোতে ডিস্ক নামক টিস্যু থাকে এবং কশেরুকাগুলোকে চারপাশ থেকে ঘিরে রাখে। এই ডিস্কে আঘাত পিঠে ব্যথার সাধারণ কারণ।

কখনো কখনো এই ডিস্কগুলো ফুলে যেতে পারে, বেরিয়ে পড়তে পারে (হার্নিয়েট হওয়া), অথবা ফেটে যেতে পারে। এসব ক্ষেত্রে মেরুদণ্ডের স্নায়ুতে চাপ পড়ে। এগুলোর মাঝে সবচেয়ে বেশি ব্যথা হয় হার্নিয়েটেড ডিস্ক বা ডিস্কগুলো কশেরুকা থেকে বেরিয়ে গেলে। বেরিয়ে পড়া ডিস্ক স্নায়ুতে চাপ দিলে পিঠ বা কোমর থেকে পা পর্যন্ত ব্যথা, শিরশিরে অনুভুতি এবং অল্প থেকে প্রচণ্ড পরিমাণ ব্যথা হতে পারে।

৩. বাত বা আর্থ্রাইটিস: স্পাইনাল অস্টিওআর্থারাইটিস পিঠে ব্যথার একটি সম্ভাব্য কারণ। এই রোগে আপনার পিঠের নিচের জয়েন্টগুলোর কারটিলেজের অবনতি ঘটে যার কারণে মেরুদণ্ড চেপে আসতে পারে বা সংকীর্ণ হতে পারে, যা ব্যথার কারণ।

৪. অস্টিওপোরোসিস: হাড়ের ঘনত্ব হ্রাস এবং হাড় পাতলা হয়ে যাওয়াকে অস্টিওপোরোসিস বলা হয়। এতে আপনার কশেরুকার ছোটো ছোটো ফাটল হতে পারে যেগুলো গুরুতর ব্যথার কারণ।

৫. পিঠে ব্যথার অন্যান্য কারণ:ওপরে দেওয়া কারণগুলোর বাইরেও আরো কিছু কারণেও আপনার ব্যাকপেইন বা পিঠে ব্যথা হতে পারে।

– ডিজেনারেটিভ স্পন্ডিলোলিস্থেসিস: একটি কশেরুকা তার স্থান থেকে সরে গিয়ে কাছাকাছি একটি কশেরুকার দিকে চলে যাওয়া।

– কাউডা ইকুইনা সিন্ড্রোম: মেরুদণ্ডের নিচের অংশে স্নায়ুর কার্যকারিতা হ্রাস পাওয়া।

– মেরুদণ্ডের ছত্রাক বা ব্যাকটেরিয়া সংক্রমণ।

– মেরুদণ্ডে ক্যান্সার বা টিউমার।

– কিডনি সংক্রমণ বা কিডনি পাথর।

ব্যাকপেইন যন্ত্রণাদায়ক এবং এটি কাজের ক্ষমতা হ্রাস করে দেয়। তাই আপনি যদি অনেকদিন ধরে, ঘনঘন পিঠের ব্যথা অনুভব করেন তবে একজন ডাক্তারের সাথে দেখা করতে ভুলবেন না।

ID: 2337

Context: পিঠে ব্যাথা প্রতিরোধে ৯টি দৈনিক অভ্যাস

Question: পিঠে ব্যাথা প্রতিরোধে ৯টি দৈনিক অভ্যাস কী ?

Answer:

পিঠ ব্যথা প্রতিরোধে সবচেয়ে জরুরী হলো আপনার পিঠের উপর চাপ কমানো। তাই দৈনন্দিন চলাফেরা এবং কাজকর্মের সময় আপনার দেহভঙ্গীর দিকে খেয়াল রাখুন। কিছু কাজ আছে যেগুলিকে আপনার দৈনন্দিন জীবনে অভ্যাসে পরিণত করতে পারলে পিঠে ব্যাথা বা ব্যাকপেইন থেকে সহজেই দূরে থাকা সম্ভব। চলুন এমন নয়টি অভ্যাস সম্পর্কে জেনে নিই।

১. কম ওজন বহন করুন: ভারী ব্রিফকেস, ল্যাপটপ ব্যাগ, স্যুটকেস কিংবা বাজারের ব্যাগ- এগুলি আপনার ঘাড় এবং মেরুদণ্ডে অপ্রয়োজনীয় চাপ প্রয়োগ করতে পারে। তাই শুধুমাত্র প্রয়োজনীয় জিনিসই বহন করুন। এমন ব্যাগ ব্যবহার করুন যা পিঠে, ঘাড়ে, কাঁধে সমানভাবে ভর বিতরণ করে, যেমন ব্যাকপ্যাক, যা দুই কাঁধে নেয়ার মত। ভারী কিছু বহন করতে চাইলে, প্রয়োজনে চাকাওয়ালা ব্যাগ ব্যবহার করুন।

২. ব্যায়াম করুন: আপনার পেট এবং পিঠের চারপাশের পেশীগুলি আপনাকে সোজা থাকতে সাহায্য করে এবং পুরো শরীরের ভার বহন করতে সহায়তা করে। তাই এগুলিকে শক্তিশালী করে আপনার পিঠে ব্যথা বা ক্ষতি হওয়ার সম্ভাবনা কমাতে পারেন। সপ্তাহে অন্তত কয়েকবার পেট ও পিঠের ব্যায়াম করুন।

৩. সোজা হোন: সঠিক দেহভঙ্গী আপনার মেরুদন্ডকে সুস্থ রাখে এবং সঠিকভাবে কাজ করতে সহায়তা করে। দেহভঙ্গি সঠিক না হলে তা আপনার মেরুদন্ডে অপ্রয়োজনীয় চাপ প্রয়োগ করে। যারা দীর্ঘক্ষণ অফিসে কিংবা কম্পিউটারের সামনে কাজ করেন তাদের ব্যাকপেইন হবার সম্ভাবনা অন্যদের চেয়ে অনেক বেশি থাকে। তাই চেয়ারে বসার সময় হয়ে বসতে হবে। দাড়ানোর সময়ও সোজা হয়ে দাড়াতে হবে। ফোন ব্যবহারের সময় চেষ্টা করতে হবে যেন তা মাথা সোজা রেখে ব্যবহার করা হয়। কম্পিউটারের মনিটর প্রয়োজনে উচু করে নিতে হবে যেন মাথা ও শিরদাড়া সোজা রেখে কাজ করা যায়। ।

৪. টেবিলের উপর ঝুঁকে পড়বেন না: অফিসের চেয়ারে বসার সময় কিংবা দাঁড়ানোর সময় ঝুঁকে যাবেন না। বিশেষ করে যদি আপনি প্রতিদিন কয়েক ঘন্টার বেশি বসে থাকেন বা ‘ডেস্ক জব’ করেন তাহলে ঠিকভাবে বসা এবং আপনার পিঠকে পেছন থেকে সঠিকভাবে চাপ দিয়ে রাখাটা গুরুত্বপূর্ণ, ।

বসার চেয়ারটা ভাল হওয়া খুব জরুরী। এমন চেয়ার বেছে নিন যা আপনার পিঠের নীচের দিককে সঠিক ভাবে চাপ দিয়ে রাখতে পারবে। খেয়াল রাখতে হবে যেন আপনি বসলে আপনার হাঁটু আপনার নিতম্বের থেকে একটু উঁচুতে থাকে।

৫. প্রায়ই নড়ে চড়ে বসুন, উঠুন: দীর্ঘ সময় ধরে এক জায়গায় দাঁড়িয়ে থাকা, বসা বা শুয়ে থাকা আপনার পিঠের জন্য স্বাস্থ্যকর নয়। আপনি যখনই পারেন বসা থেকে উঠে, হাঁটাহাঁটি করে এবং কিছু সাধারণ হাল্কা স্ট্রেচ করে পেশী এবং হাড় এবং মেরদন্ডকে চাপ থেকে মুক্তি দিন। এটি আপনার পিঠে রক্ত ​​সঞ্চালন বাড়িয়ে দেয় এবং সুস্থ রাখে।

৬. জুতা বদলান: হাই-হিলের জুতা আপনার পিঠের ক্ষতির কারণ হতে পারে, বিশেষ করে তা যদি নিয়মিত পরেন। তাই অল্প উচ্চতার সমান তলিওয়ালা জুতা বা স্যান্ডেল ব্যবহার করুন।

৭. আপনার ক্যালসিয়াম এবং ভিটামিন ডি গ্রহণের পরিমাণ বাড়ান: পর্যাপ্ত পরিমাণে ক্যালসিয়াম এবং ভিটামিন ডি গ্রহণ করে আপনার মেরুদন্ডের হাড় মজবুত রাখুন। ক্যালসিয়াম অস্টিওপরোসিস প্রতিরোধ করতে সাহায্য করতে পারে, যা বিশেষ করে নারীদের পিঠে ব্যথার একটি বড় কারণ। দুধ, দই, শাকে আপনি পাবেন ক্যালসিয়াম এবং ভিটামিন ডি পাবেন চর্বিযুক্ত মাছ, ডিমের কুসুম, গরুর যকৃত বা কলিজা কিংবা পনিরে। এছাড়াও বিভিন্ন ধরণের ক্যালসিয়াম বড়ি পাওয়া যায় যা কার্যকত। তবে ভিটামিনের বড়ি খাওয়ার আগে অবশ্যই ডাক্তারের পরামর্শ নিয়ে নিতে হবে।

৮. সিগারেটটা বাদ দিন: ধূমপান গুরুতর স্বাস্থ্য ঝুঁকি তৈরি করতে পারে এবং এটি ব্যাকপেইনও বাড়িয়ে তুলতে পারে। নিকোটিন মেরুদন্ডের ডিস্কগুলিতে রক্ত ​​প্রবাহকে সীমিত করে দেয়, যার ফলে তারা শুকিয়ে যায় বা ফেটে যেতে পারে। ধূমপান রক্তে অক্সিজেনের পরিমাণও হ্রাস করে এবং এর ফলে পেশীতে কম পুষ্টি পৌঁছায়। এই দুর্বল, অসুস্থ পিঠ দুর্ঘটনাজনিত স্ট্রেন এবং পিঠে ব্যথা সৃষ্টিকারী টানগুলির জন্য বেশি ঝুঁকিপূর্ণ।

৯. হাঁটুর নিচে বালিশ দিয়ে ঘুমান: উপুড় হয়ে বা চিৎ হয়ে ঘুমালে আপনার মেরুদণ্ডে চাপ পড়ে। ঘুমের সময় আপনার পা সামান্য উঁচু করে রাখলে পিঠের এই চাপ থেকে মুক্তি পাওয়া যায়। তাই হাঁটুর নিচে বালিশ দিয়ে আপনি আপনার পিঠের উপর চাপ অর্ধেক কমে ফেলতে পারেন।

ID: 2338

Context: ডায়রিয়া থেকে বাঁচতে খাদ্য ও পানীয় বিষয়ক সতর্কতা

Question: ডায়রিয়া থেকে বাঁচতে খাদ্য ও পানীয় বিষয়ক সতর্কতা কী ?

Answer:

এই গরমে ডায়রিয়ার প্রকোপ প্রচণ্ডভাবে বাড়ছে। আর ডায়রিয়া মূলত পানিবাহিত রোগ। তাই খাবার–সেটা কাঁচাই হোক আর রান্নাই হোক, অসতর্ক থাকলে আপনি

পানি বাহিত যেকোনো রোগেই আক্রান্ত হতে পারেন। এই কারণে খাদ্য নিরাপত্তার একদম মৌলিক ব্যাপারগুলো সম্পর্কে জানা থাকাটা খুবই জরুরি। আর এই গরম

মৌসুমে নিজের এবং পরিবারের সুরক্ষার জন্য এগুলো মাথায় রেখেই রান্না ও খাওয়া-দাওয়া করতে হবে।

রান্না বান্নার ক্ষেত্রে সতর্কতা:

কাঁচা যেকোনো কিছু খাওয়ার আগে অবশ্যই ভালো করে হাত ধুয়ে নিতে হবে। হাত যতই পরিষ্কার দেখাক না কেন, সাবান দিয়ে হাত কচলে পরিষ্কার পানি দিয়ে ধুয়ে নেওয়া আবশ্যক।

যেকোনো আমিষ (গোরু, মুরগি বা মাছ) ভালোমতো সিদ্ধ করা। যেমন, গোরুর মাংস রান্না করতে হলে পাত্রের ভিতরের তাপমাত্রা কমপক্ষে ৭১০ সেলসিয়াসবা ১৬০০ ফারেনহাইট হতে হবে। মুরগির মাংসের ক্ষেত্রে এটা ১৬৫০ ফারেনহাইট, মাছ ১৪৫০ ফারেনহাইট। রান্না করতে হবে ২০-৩০ মিনিট ধরে।

যেকোনো কাঁচা মাংস হাত দিয়ে ধরার পর অন্য কিছু ধরার আগে অবশ্যই হাত সাবান দিয়ে ধুয়ে ফেলতে হবে, পাশাপাশি যেখানে রেখে মাংস কাটা হয়সেই স্থান এবং রান্নাঘরের বাসন-কোসনও ধুয়ে ফেলতে হবে ভালোভাবে।

খাবার পরিবেশনের আগেও হাত ধুয়ে নিতে হবে।

রান্না খাবারের সাথে কাঁচা খাবার মেশানো যাবে না।

রান্নার সব বাসন-কোসন, তৈজসপত্র এবং রান্নার জায়গা (কাটিং বোর্ড, বেসিন, কাটাকাটির জায়গা, চুলার আশপাশ ইত্যাদি) প্রতিবার ব্যবহারের আগেধুয়ে জীবাণুমুক্ত করে নিলে ভালো হবে। পরিষ্কার করার জন্য পানি এবং ডিটারজেন্ট ব্যবহার করতে হবে, তারপর গরম পানি ঢেলে দিয়ে ধুয়ে নিতে হবে।আর খাবার কোথাও পড়ে গেলে জীবাণুমুক্তকরণ তরল দিয়ে মুছে নিতে হবে জায়গাটা।

কোনো রোগে আক্রান্ত হলে লক্ষণ থাকাকালীন এবং সুস্থ হওয়ার ৪৮ ঘণ্টা পর্যন্ত রান্না করা যাবে না।

পানি পানের ক্ষেত্রে সতর্কতা:

যেখান থেকে পানি আনা হচ্ছে সেটা নিয়মিত পরীক্ষা করে দেখা উচিত যে তাতে কোনো জীবাণু জন্মাচ্ছে কি না।

সাঁতার কাটার সময়, সুইমিং পুল বা ঝরনা, নদী, দিঘি, সমুদ্র এসব জায়গা থেকে পানি গিলে ফেলা যাবে না।

দিঘি, নদী, ঝরনা, বা অগভীর ডোবা থেকে অপরিশোধিত পানি খাওয়া যাবে না।

কোথাও বেড়াতে গেলে না জেনেই কোনো কল থেকে পানি বা বরফ ব্যবহার করা যাবে না। পানিকে বিশুদ্ধ করে তারপর পান করতে হবে।

রাস্তার পাশের পানিপুরি, ভেল্পুরি, চটপটি, ফুচকা জাতীয় খাবারের সাথে যেই টক দেওয়া হয়–সেই টকের পানিতে ই-কোলাই ব্যাকটেরিয়া থাকতে পারে,যা ডায়রিয়ার অন্যতম প্রধান কারণ। এ কারণে রাস্তার পাশের যেকোনো খাবার খাওয়ার সময়ই সতর্ক থাকা ভালো। প্রয়োজনে এসব খাবার বর্জন করতে হবে।

রোগ প্রতিকারের চাইতে প্রতিরোধ অনেক গুণ উত্তম। আর ডায়রিয়াসহ পানিবাহিত রোগগুলো শুধুমাত্র সামান্য সতর্কতা দিয়েই প্রতিরোধ করা সম্ভব।

নিজে এসব সতর্ক হওয়ার পাশাপাশি, বাড়ির ছোটো বাচ্চাদেরকেও শিখিয়ে দিলে তারাও সহজেই সুস্থ থাকতে পারে।

ID: 2339

Context: পিঠের ব্যাথা বা ব্যাকপেইন নিয়ে

Question: কখন পিঠের ব্যাথা বা ব্যাকপেইন নিয়ে চিন্তিত হবেন?

Answer:

পিঠে ব্যথার অনেক ধরণের উপসর্গ থাকতে পারে, যার মধ্যে রয়েছে পিঠের নিচের অংশে একটা ভোতা, বেদনাদায়ক অনুভুতি, ছুরিকাঘাতের মত ব্যাথা যা পায়ের দিকেও ছড়িয়ে পড়ে, সোজা হয়ে দাঁড়ানোর সময় ব্যাথা এবং দাঁড়াতে অক্ষমতা, চলাচলে ব্যাঘাত ঘটা।

ব্যাকপেইন যদি অতিরিক্ত কাজের চাপ বা ভুল ভঙ্গীতে শোয়া বা বসার কারণে হয় তবে তা সাধারণত দুই তিন দিনের ভেতরই সেরেও যায়। তবে, ৩ মাসের বেশি সময় ধরে থাকা পিঠের ব্যথা আমাদের জন্য উদ্বেগজনক। ব্যাথার শুরু হওয়ার ৩ সপ্তাহের মধ্যে পিঠ ব্যাথার অবস্থা এবং তীব্রতায় যদি কোনো পরিবর্তন না আসলে দ্রুত ডাক্তারের পরামর্শ নেয়া উচিত।

এ ছাড়াও ব্যাকপেইনের সাথে সাথে নিচে দেয়া এই লক্ষণগুলি আছে কি না সেটাও খেয়াল রাখতে হবে। ব্যাকপেইনের সাথে এই উপসর্গগুলি সাধারণত অন্য কোন জটিল রোগের কারণও হতে পারে।

মল-মুত্র ত্যাগে নিয়ন্ত্রণ হারানো

যেকোনো একটি বা উভয় পায়ে অসাড়তা, দুর্বলতা অথবা শিরশিরে অনুভুতি,

তীব্র, দীর্ঘস্থায়ী ব্যথা যা রাতে আরও খারাপ হয়

ব্যাখ্যাতীত ওজন হ্রাস

জ্বর

পেটে দপদপে ব্যাথা

আঘাত বা ট্রমার পরের পিঠ ব্যথা

দীর্ঘস্থায়ী ব্যাকপেইন কিংবা ব্যাকপেইনের সাথে যদি এই উপসর্গগুলি থাকে তবে দ্রুতই ডাক্তারের শরণাপন্ন হতে হবে।

ID: 2340

Context: পিঠ ব্যাথার ঘরোয়া থেরাপি

Question: পিঠ ব্যাথার ঘরোয়া থেরাপি কী ?

Answer:

পিঠের ব্যথা চিকিত্সায় রয়েছে অনেক ঘরোয়া প্রতিকার, যার মাঝে অনেকগুলোকে ঐতিহ্যবাহীও বলা যেতে পারে।

১. তাপ এবং বরফ থেরাপি: পিঠের ব্যথার অস্বস্তি কমাতে আইস প্যাক ব্যবহার করতে পারেন। এছাড়াও স্বল্পমেয়াদীভাবে প্রদাহ কমিয়ে আনতে সাহায্য করতে পারে আইস প্যাক। তবে মনে রাখবেন, আপনার ত্বকে সরাসরি বরফ প্রয়োগ করবেন না। এতে ত্বকের ক্ষতি হয়। তাই একটি পাতলা তোয়ালে বা গজ দিয়ে মুড়িয়ে বরফ ব্যবহার করুন। প্রদাহ কমে গেলে উষ্ণ তোয়ালে দিয়েও ব্যথা উপশম করতে পারেন। তবে তাপ এবং ঠান্ডার মধ্যে কোনটি আপনার সাথে মানানসই সেটি বিবেচনা করুন।

২. ব্যায়াম: পিঠের পেশীগুলিকে শক্তিশালী করার ব্যায়াম পিঠ ব্যাথা থেকে মুক্তি পাওয়ার সবচেয়ে উত্তম উপায়। এর পাশাপাশি দৈনন্দিন চলাফেরা এবং কাজকর্মের অঙ্গভঙ্গিতে পরিবর্তন আনুন। ভারি জিনিস সঠিক নিয়মে উঠান। প্রয়োজনে ফিজিওথেরাপিস্ট এর সাহায্য নিন। একজন ফিজিওথেরাপিস্ট আপনাকে পিঠের জন্য উপযোগী এবং বাড়িতে বসেই করতে পারার মতো ব্যায়াম শিখিয়ে দিতে পারেন। তাছাড়া আপনার অঙ্গভঙ্গি ঠিক করতেও সাহায্য করতে পারবেন তিনি।

৩. ভেষজ তেল: গবেষণায় দেখা গেছে ক্যাপসাইসিন দিয়ে তৈরি ভেষজ তেল বা মলম ব্যথা কমাতে সাহায্য করতে পারে। ক্যাপসাইসিন হল মরিচের একটি উপাদান যা তাদের উষ্ণতা দেয়। এটি আক্রান্ত এলাকার স্নায়ুগুলির সংবেদনশীলতা কমিয়ে আনে এবং ব্যথা কমিয়ে দিতে পারে।

পিঠের ব্যথা কমাতে এই ঘরোয়া সমাধানগুলি অত্যন্ত কার্যকর হতে পারে। সেগুলি কীভাবে ব্যবহার করবেন সে সম্পর্কে বিস্তারিত জেনে বুঝে এরপরই প্রয়োগ করুন। তবে ব্যাকপেইন বেশি হলে বা দীর্ঘস্থায়ী হলে অবশ্যই ডাক্তারের পরামর্শ নিন।

ID: 2341

Context: ডায়রিয়ায় স্যালাইন খাওয়ানোর সঠিক নিয়ম

Question: ডায়রিয়ায় স্যালাইন ও অন্যান্য তরল খাওয়ানোর সঠিক নিয়ম ?

Answer:

ডায়রিয়া বা অন্য যেকোনো কারণে পানিশূন্যতা প্রতিরোধে কার্যকর সমাধান হলো খাবার স্যালাইন খাওয়া। ডায়রিয়ার কারণে শরীর থেকে

যে অতিরিক্ত পানি বের হয়ে যায়, সেই ক্ষতি পুষিয়ে দেওয়াই স্যালাইনের কাজ।

কিন্তু স্যালাইন ভুল নিয়মে খেলে উপকার হবে না, বরং এতে ক্ষতির সম্ভাবনাই বেশি। তাই চলুন জেনে নেই ডায়রিয়ায় স্যালাইন ও অন্যান্য তরল

প্রশ্ন: কীভাবে সঠিক নিয়মে স্যালাইন খেতে হবে?

উত্তর: শরীরে পানি প্রতিস্থাপনের কাজটা তাড়াহুড়া করে করা যাবে না। ধীরে ধীরে করতে হবে। তাই স্যালাইন একটু একটু করে চুমুক দিয়ে খেতে হবে।

বয়স ২ বছরের কম হলে–বাচ্চাকে প্রতিবার পাতলা পায়খানার পরে একটা বড়ো কাপের (২৫০ মিলি) অর্ধেক বা সোয়া পরিমাণ খাওয়াতে হবে। চামচে হিসাব করলে ১০ থেকে ২০ চা চামচ।

২ থেকে ১০ বছর বয়সি বাচ্চা–প্রতিবার পাতলা পায়খানার পরে বড়ো কাপের (২৫০ মিলি) পুরোটা অথবা কমপক্ষে অর্ধেক খাওয়াতে হবে।

১০ বছরের বেশি বয়স–প্রতিবার পাতলা পায়খানার পরে কমপক্ষে বড়ো কাপের (২৫০ মিলি) পুরোটা বা ২ কাপ অর্থাৎ স্যালাইনের প্যাকেটের পুরোটা খেতে হবে।

প্রশ্ন: স্যালাইন খাওয়ানোর পরে বাচ্চা বমি করলে?

উত্তর: ১০ মিনিট অপেক্ষা করুন, তারপর আবার স্যালাইন দিন। সাধারণত বমি এমনিতেই থেমে যাবে। একটু একটু করে খাওয়ান। তাড়াহুড়ো করবেন না।

বমি হলেও শরীর ঠিকই একটু না একটু পানি এবং লবণ শোষণ করে নেবে।

প্রশ্ন: ডায়রিয়া হলে কী শুধু কি স্যালাইনই খাওয়াবো?

উত্তর: না। সাথে তরল জাতীয় অন্যান্য খাবারও খাওয়াতে হবে। যেমন স্যুপ, বা জ্যুস, ডাবের পানি, ভাতের মাড়। স্যালাইন খাওয়ানোর সময় বুকের দুধ খাওয়ানো বন্ধ রাখবেন না। বাচ্চা যদি ৬ মাসের বেশি বয়সি হয়, তাহলে অর্ধ তরল বা শক্ত খাবারও দেওয়া উচিত।

প্রশ্ন: যদি পানিশূন্যতার কারণে রোগী অচেতন হয়ে পড়ে?

উত্তর: তাহলে যত দ্রুত সম্ভব হাসপাতালে নিতে হবে। তবে যদি কোনো কারণে ঐ মুহূর্তে হাসপাতালে নেওয়া সম্ভব না হয়, বা অ্যাম্বুলেন্স আসার আগ পর্যন্ত ৫ মিনিট পরপর তার ঠোঁটে একটু একটু করে

স্যালাইন দিতে থাকতে হবে, যতক্ষণ না প্রস্রাবের পরিমাণ ঠিক হয়।

প্রশ্ন: কতদিন পর্যন্ত স্যালাইন দিয়ে যেতে হবে?

উত্তর: ডায়রিয়া যতদিন পুরোপুরি না সারে। তার আগপর্যন্ত স্যালাইন ও অন্যান্য তরল খাবার চালিয়েই অনেক বেশি পরিমাণে যেতে হবে। তবে সাধারণত ২/৩ দিনের বেশি ডায়রিয়া থাকে না।

প্রশ্ন: ডায়রিয়ায় জিংক সাপ্লিমেন্ট খাওয়ানো কি ভালো?

উত্তর: ডায়রিয়ার ব্যাপ্তি কমিয়ে আনার জন্য জিংক চমৎকার কাজ করে। তাই এখন স্যালাইনের পাশাপাশি জিংকও ডায়রিয়ার জরুরি পথ্য। তবে কোন বয়সি রোগী কতটা জিংক গ্রহণ করবেন সেটার জন্য ডাক্তারের পরামর্শ নিতে হবে। স্যালাইন জীবন রক্ষাকারী হিসাবে যেমন কাজ করে, তেমনি এটি সঠিক নিয়মে না খাওয়ালে জটিলতা আরও বাড়তে পারে। তাই এই ব্যাপারে সতর্ক থাকা উচিত সবার।

ID: 2342

Context: সঠিক নিয়মে স্যালাইন খাওয়া

Question: কীভাবে সঠিক নিয়মে স্যালাইন খেতে হবে?

Answer:

শরীরে পানি প্রতিস্থাপনের কাজটা তাড়াহুড়া করে করা যাবে না। ধীরে ধীরে করতে হবে। তাই স্যালাইন একটু একটু করে চুমুক দিয়ে খেতে হবে।

\* বয়স ২ বছরের কম হলে–বাচ্চাকে প্রতিবার পাতলা পায়খানার পরে একটা বড়ো কাপের (২৫০ মিলি) অর্ধেক বা সোয়া পরিমাণ খাওয়াতে হবে। চামচে হিসাব করলে ১০ থেকে ২০ চা চামচ।

\* ২ থেকে ১০ বছর বয়সি বাচ্চা–প্রতিবার পাতলা পায়খানার পরে বড়ো কাপের (২৫০ মিলি) পুরোটা অথবা কমপক্ষে অর্ধেক খাওয়াতে হবে।

\* ১০ বছরের বেশি বয়স–প্রতিবার পাতলা পায়খানার পরে কমপক্ষে বড়ো কাপের (২৫০ মিলি) পুরোটা বা ২ কাপ অর্থাৎ স্যালাইনের প্যাকেটের পুরোটা খেতে হবে।

ID: 2343

Context: সঠিক নিয়মে স্যালাইন খাওয়া

Question: স্যালাইন খাওয়ানোর পরে বাচ্চা বমি করলে?

Answer:

১০ মিনিট অপেক্ষা করুন, তারপর আবার স্যালাইন দিন। সাধারণত বমি এমনিতেই থেমে যাবে। একটু একটু করে খাওয়ান। তাড়াহুড়ো করবেন না।

বমি হলেও শরীর ঠিকই একটু না একটু পানি এবং লবণ শোষণ করে নেবে।

ID: 2344

Context: ডায়রিয়া স্যালাইন

Question: ডায়রিয়া হলে কী শুধু কি স্যালাইন খাওয়াবো?

Answer:

না। সাথে তরল জাতীয় অন্যান্য খাবারও খাওয়াতে হবে। যেমন স্যুপ, বা জ্যুস, ডাবের পানি, ভাতের মাড়।

স্যালাইন খাওয়ানোর সময় বুকের দুধ খাওয়ানো বন্ধ রাখবেন না। বাচ্চা যদি ৬ মাসের বেশি বয়সি হয়, তাহলে অর্ধ তরল বা শক্ত খাবারও দেওয়া উচিত।

ID: 2345

Context: পানিশূন্যতার কারণে রোগী অচেতন হওয়া

Question: যদি পানিশূন্যতার কারণে রোগী অচেতন হয়ে পড়ে?

Answer:

তাহলে যত দ্রুত সম্ভব হাসপাতালে নিতে হবে।

তবে যদি কোনো কারণে ঐ মুহূর্তে হাসপাতালে নেওয়া সম্ভব না হয়, বা অ্যাম্বুলেন্স আসার আগ পর্যন্ত ৫ মিনিট পরপর তার ঠোঁটে একটু একটু করে

স্যালাইন দিতে থাকতে হবে, যতক্ষণ না প্রস্রাবের পরিমাণ ঠিক হয়।

ID: 2346

Context: সঠিক নিয়মে স্যালাইন খাওয়া

Question: কতদিন পর্যন্ত স্যালাইন দিয়ে যেতে হবে?

Answer:

ডায়রিয়া যতদিন পুরোপুরি না সারে। তার আগপর্যন্ত স্যালাইন ও অন্যান্য তরল খাবার চালিয়েই অনেক বেশি পরিমাণে যেতে হবে।

তবে সাধারণত ২/৩ দিনের বেশি ডায়রিয়া থাকে না।

ID: 2347

Context: ডায়রিয়ায় জিংক সাপ্লিমেন্ট খাওয়ানো

Question: ডায়রিয়ায় জিংক সাপ্লিমেন্ট খাওয়ানো কি ভালো?

Answer:

ডায়রিয়ার ব্যাপ্তি কমিয়ে আনার জন্য জিংক চমৎকার কাজ করে। তাই এখন স্যালাইনের পাশাপাশি জিংকও ডায়রিয়ার জরুরি পথ্য।

তবে কোন বয়সি রোগী কতটা জিংক গ্রহণ করবেন সেটার জন্য ডাক্তারের পরামর্শ নিতে হবে।

স্যালাইন জীবন রক্ষাকারী হিসাবে যেমন কাজ করে, তেমনি এটি সঠিক নিয়মে না খাওয়ালে জটিলতা আরও বাড়তে পারে। তাই এই ব্যাপারে সতর্ক থাকা উচিত সবার।

ID: 2348

Context: মেরুদণ্ড এর সমস্যা

Question: আপনার মেরুদণ্ড কি বাঁকা?

Answer:

কী? প্রশ্নটি দেখে ভড়কে গেলেন? ভড়কে যাওয়াটাই স্বাভাবিক। কিন্তু বাস্তবতা হচ্ছে, আমাদের অনেকেরই মেরুদণ্ড বিভিন্ন কারণে বাঁকা হয়ে যায় এবং এটি বিভিন্ন ধরনের ছোটো বড়ো শারীরিক সমস্যা তৈরি করে।

আমাদের মেরুদণ্ড হলো হাড়ের কলাম, যা কশেরুকা নিয়ে গঠিত। এটি আপনার খুলির নিচ থেকে আপনার কোমর পর্যন্ত বিস্তৃত। এটি আপনার ওপরের শরীরের ভার বহন করে। আমাদের দৈনন্দিন কার্যক্রম ও চলাফেরায় অপরিহার্য অংশ এই মেরুদণ্ড।

আপনার মেরুদণ্ডের হাড়গুলো সঠিকভাবে সারিবদ্ধ থাকলে একটি আর্চ বা ধনুকের মতো বাঁকানো থাকবে। যদি মেরুদণ্ড স্বাভাবিক থাকে তবে আপনার মাথা থেকে শুরু করে, কাঁধ, পিঠ, থেকে আপনার পশ্চাদ্দেশ, হাঁটু এবং পা একটি অপেক্ষাকৃত সরল রেখা বজায় রাখবে।

আপনার মেরুদণ্ড যদি সঠিকভাবে সারিবদ্ধ না থেকে তার স্বাভাবিক ধনুক আকৃতি হারিয়ে ফেলে বা যদি কোনো মিস-অ্যালাইনমেন্ট হয়, তাহলে আপনার চলাফেরা ও গতির পরিধিকে ব্যাহত করতে পারে, ব্যথার সৃষ্টি করতে পারে এবং আরো গুরুতর সমস্যা তৈরি করতে পারে।

আপনার মেরুদণ্ডের মিস-অ্যালাইনমেন্ট বা কশেরুকার সাজানো অবস্থান নষ্ট হলে, যে লক্ষণগুলোর দেখা দেবে মধ্যে রয়েছে:

দীর্ঘস্থায়ী মাথাব্যথা

কোমর ব্যথা

ঘাড় ব্যথা

হাঁটুর ব্যথা

পশ্চাদ্দেশের ব্যথা

ঘনঘন অসুস্থতা

অত্যধিক ক্লান্তি

হাত বা পায়ে অসাড়তা বা ঝাঁকুনি

হাঁটায় অস্বাভাবিকতা, যার কারণে অনেক সময় একটি জুতা খুলেও যেতে পারে

ব্যায়াম এবং জীবনযাত্রায় পরিবর্তন, যেমন চলাফেরায়, কাজকর্মে সঠিক অঙ্গভঙ্গি আমাদের মেরুদণ্ডকে সুস্থ রাখতে পারে।

তবে এগুলো পালন করা সত্ত্বেও আপনি যদি বারবার পিঠে ব্যথা, হাঁটার সমস্যা অনুভব করেন তবে ডাক্তারের পরামর্শ নিন। এর পাশাপাশি যদি মূত্রাশয়ের সমস্যা অনুভব করেন, যেমন মল বা মুত্র ত্যাগে নিয়ন্ত্রণ হারানো, অথবা পায়ে অনুভূতি হারিয়ে ফেলেন তবে অবিলম্বে একজন ডাক্তারের সাথে যোগাযোগ করুন।

ID: 2349

Context: বাত নিয়ে যে দশটি তথ্য

Question: বাত নিয়ে যে দশটি তথ্য আপনার জানা থাকা জরুরি ?

Answer:

বাত বা রিউমাটয়েড আর্থ্রাইটিস (RA) হলো একটি অটোইমিউন ব্যাধি। মানে এতে আপনার রোগ প্রতিরোধ সিস্টেম বা ইমিউন সিস্টেম আপনার জয়েন্টগুলোকে আক্রমণ করে। এর ফলে জয়েন্টে বা গিরায় গিরায় ব্যথা, লালভাব, ফুলে যাওয়া এবং প্রদাহ হয়।

আমাদের অনেকেরই এই বাতের ব্যথা রয়েছে। তবে রোগটি সাধারণ হলেও পর্যাপ্ত জ্ঞান নেই আমাদের মধ্যে। চলুন জেনে আসা যাক বাত নিয়ে ১০টি বিষয়–

১। প্রাথমিক পর্যায়ে বাত একটি অদৃশ্য রোগ। তাই রোগীর নিজেরই বাতের সমস্যার শারীরিক লক্ষণগুলো সম্পর্কে ধারণা থাকা প্রয়োজন।

২। এক এক বয়সি রোগীদের মধ্যে বাতের প্রভাব ভিন্ন হয়।

৩। বাতের ব্যথা উপশমে ব্যায়াম একটি কার্যকরী ওষুধ।

৪। বাতের ব্যথা নিয়ন্ত্রণে বিশ্রাম খুব গুরুত্বপূর্ণ।

৫। বাতের জন্য মানসিক চাপ কমানো জরুরি।

৬। ওজন নিয়ন্ত্রণে রাখলে বাত নিয়ন্ত্রণ করা অনেকাংশে সম্ভব।

৭। বাত ব্যথার সাথে অবসাদ (ডিপ্রেশন) বা মানসিক ক্লান্তি আসাটা খুবই সাধারণ।

৮। বাতের রোগীদের হার্ট অ্যাটাকের সম্ভাবনা অন্যদের থেকে বেশি।

৯। বাতের রোগীদের ধীরে ধীরে ফিব্রোমায়ালজিয়া কিংবা লুপাসের মতো রোগও হতে পারে।

১০। বাত থেকে পুরোপুরি সুস্থ হওয়া সম্ভব, যদি প্রারম্ভিক পর্যায়ে তা শনাক্ত এবং চিকিৎসা শুরু করা যায়।

বাতের ব্যথা কমে বাড়ে, এবং আমাদের দৈনন্দিন জীবনের একটা বড়ো অংশ কেড়ে নেয়। তবে লক্ষণগুলো নিয়ন্ত্রএন করতে চাইলে ডাক্তারের পরামর্শ মতো চলাটা খুব জরুরি।

আপনার জয়েন্টগুলোতে ব্যথা এবং শক্ত হয়ে যাওয়া, দৃশ্যমান লালভাব বা বিবর্ণতা, আপনার নিয়মিত কাজের পরে অতিরিক্ত ক্লান্তি বা অবসাদ, আর সর্বোপরি আপনার বাতের ব্যথা যদি আপনার দৈনন্দিন কাজে ব্যাঘাত ঘটায় তবে ডাক্তারের সাথে আলাপ করুন।

জীবনধারা পরিবর্তন এবং ওষুধ নেওয়ার পরও যদি আপনার লক্ষণগুলোতে উন্নতি না হয় তবে অবশ্যই ডাক্তারের পরামর্শ জরুরি।

ID: 2350

Context: বাতের ব্যথা

Question: বাতের ব্যথায় কী খাবেন?

Answer:

বাতের ব্যথা আমাদের দেশে সচরাচর দেখা যায়। বাত পুরোপুরি নির্মূল করা না গেলেও চিকিৎসকের পরামর্শ মতো চললে বেশ ভালোভাবে নিয়ন্ত্রণ করা যায়। এর মাঝে একটি গুরুত্বপূর্ণ দিক হলো আপনার খাদ্যাভ্যাস বা ডায়েট।

খাদ্যাভাসের প্রতি যত্নশীল হওয়া আপনার বাতকে নিয়ন্ত্রণে রাখতে মুখ্য ভূমিকা পালন করবে। আপনার উপসর্গগুলো কমাতে ডাক্তার কিছু বিশেষ খাদ্যাভ্যাস সুপারিশ করতে পারে যা মেনে চললে আপনার ব্যথা অনেকাংশে কমতে পারে। এই খাদ্যাভ্যাসে সাধারণত থাকে:

১। ওমেগা-3 ফ্যাটি অ্যাসিড সম্পন্ন খাবার: ওমেগা-3 ফ্যাটি অ্যাসিড সম্পন্ন খাবারগুলোর মধ্যে রয়েছে মাছের তেল, সামুদ্রিক মাছ, চিয়া বীজ, শণ বীজ, আখরোট।

২। অ্যান্টিঅক্সিডেন্ট সমৃদ্ধ খাবার:ভিটামিন এ, সি, এবং ই, এবং সেলেনিয়াম, প্রদাহ কমাতেও সাহায্য করতে পারে। অ্যান্টিঅক্সিডেন্ট সমৃদ্ধ খাবারের মধ্যে রয়েছে: কালো চকলেট, পালং শাক, মটরশুটি ইত্যাদি।

৩। প্রচুর ফাইবার বা আঁশজাতীয় খাবার: প্রচুর আঁশ বা ফাইবার খাওয়াও গুরুত্বপূর্ণ। শস্য জাতীয় খাবার, তাজা শাকসবজি এবং তাজা ফল আঁশের খুব ভালো উৎস।

৪। ফ্ল্যাভোনয়েডযুক্ত খাবার: সয়া, গ্রিন টি , ব্রকলি, আঙ্গুরের মতো ফ্ল্যাভোনয়েডযুক্ত খাবারগুলো শরীরের প্রদাহ প্রতিরোধে সাহায্য করতে পারে।

সুস্থ থাকার জন্য কী খাচ্ছেন আর কী খাচ্ছেন না–সেটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। যে খাবারে আপনার ব্যথা শুরু হয়ে যায়, সেগুলো এড়িয়ে চলতে হবে। পাশাপাশি প্রক্রিয়াজাত কার্বোহাইড্রেট এবং স্যাচুরেটেড বা ট্রান্স ফ্যাট, যা বাইরের ভাজাপোড়া খাবারে, ফাস্টফুড এবং জুস, চিপ্স, বিস্কুটের মতো প্রক্রিয়াজাত খাবারে থাকে–এমন খাবার পরিহার করতে হবে।

ID: 2351

Context: বাতের ব্যথার ঘরোয়া সমাধান

Question: বাতের ব্যথার ঘরোয়া সমাধান কী ?

Answer:

বাতের ব্যথা নিয়েই যাদের নিত্য বসবাস, তাদের জন্য লেখাটি খুব কাজের হতে পারে। যারা দীর্ঘদিন বাতের ব্যথায় ভুগছেন–তারা অনেকেই বাতের ব্যথার উপশমের নানা উপায় খোঁজেন। এসব উপশমের উপায়গুলো অনেক সময় অপচিকিৎসা বা ভুল চিকিৎসাও হয়ে থাকে।

বাতের ব্যথা উপশমে মূলত কাজে আসে বাতের ওষুধ এবং আমাদের জীবনযাত্রার কিছু বাজে অভ্যাস পরিবর্তন। এই রোগের সরাসরি কোনো চিকিৎসা নেই। তাই শুধুমাত্র ব্যথার ওষুধের ওপর নির্ভরশীল না হয়ে বরং মনোযোগ দিতে হবে আমাদের লাইফস্টাইলে। বাতের ব্যথা নিয়ন্ত্রণে রাখার কিছু ঘরোয়া সমাধান নিয়ে এবার আলোচনা করা যাক।

১। ব্যায়াম: হালকা ব্যায়াম আপনার শরীরের জয়েন্টগুলোর উন্নতি করতে পারে। এছাড়াও ব্যায়ামের মাধ্যমে পেশি শক্তিশালী হয়। ফলে শরীরের ওজন পেশিগুলো বহন করে আপনার গিরার ওপর থেকে কিছু চাপ কমাতে পারে।

২। পর্যাপ্ত বিশ্রাম: বাতের ব্যথা শুরু হলে আপনার স্বাভাবিকের তুলনায় বেশি বিশ্রামের প্রয়োজন হতে পারে। পর্যাপ্ত ঘুম আপনার ব্যথার পাশাপাশি ক্লান্তি কমাতে সাহায্য করবে।

৩। ঠান্ডা কিংবা গরম ছ্যাঁক দেওয়া: আইস প্যাক দিয়ে ঠান্ডা চাপ দিলে প্রদাহ এবং ব্যথা কমতে সাহায্য করতে পারে। ব্যথার কারণে পেশিতে যদি খিঁচুনি হয় তবে ঠান্ডা চাপ দেওয়া কার্যকর। অন্যদিকে হালকা গরম পানিতে গোসল বা ব্যথাস্থানে গরম ছ্যাঁক দিলে ব্যথার সাময়িক উপশম পাওয়া যায়। গরম ছেঁক দেওয়া–হাত পায়ের গিরাগুলো শক্ত হয়ে যাওয়া কমাতেও সাহায্য করতে পারে।

৪। সহায়ক যন্ত্রপাতি ব্যবহার: স্প্লিন্ট এবং ব্রেসের মতো কিছু ডিভাইস আপনার জয়েন্টগুলোকে বিশ্রামে রাখতে পারে। ফলে এগুলোর সাহায্যে বাতের ব্যথাও কমতে পারে। তবে এগুলো একটানা পরে থাকলে “ফ্রোজেন জয়েন্ট” হতে পারে, তাই এগুলো ব্যবহারের মাঝে বিরতি নেওয়া গুরুত্বপূর্ণ।

ব্যথা অবস্থায় হাঁটাচলা বা কাজ করার জন্য প্রয়োজনে হাতের লাঠি বা ক্র্যাচ ব্যবহার করতে পারেন। এতে ব্যথার স্থানে চাপ কম পড়বে।

আমাদের জীবনযাত্রার কিছু অভ্যাস পালটালেই বাতের ব্যথা অনেকাংশে নিয়ন্ত্রণে রাখা সম্ভব। এছাড়াও প্রয়োজনে বাতের ব্যথার জন্য ডাক্তারের পরামর্শ নিন।

ID: 2352

Context: `সুস্থভাবে দীর্ঘদিন বেঁচে থাকা

Question: `সুস্থভাবে দীর্ঘদিন বেঁচে থাকতে কি কাজ করতে লাগে ?

Answer:

সুস্থভাবে দীর্ঘদিন বেঁচে থাকতে আমরা সবাই চাই। সুস্থভাবে বেঁচে থাকতে প্রয়োজন সুস্থ জীবনধারা। কিছু কিছু কাজ আছে যেগুলোকে নিয়মিত অভ্যাসে পরিণত করে ফেলতে পারলে সুস্থভাবে বেঁচে থাকার সম্ভাবনা অনেক বেড়ে যায়। জেনে নিন সেই কাজগুলো কী কী–

শরীরচর্চা: গবেষণা বলছে, দৈনিক মাত্র ১৫ মিনিট ব্যায়াম তিন বছর পর্যন্ত আয়ু বাড়াতে পারে। এর বেশি সময় ব্যায়াম আরো সুফল দেবে আপনাকে। চেষ্টা করবেন সপ্তাহে অন্তত ১৫০ মিনিট ব্যায়াম করার। তবে শরীরচর্চার সময় খেয়াল রাখতে হবে যেন তা ঘাম ঝরানোর মতো হয়।

ধূমপান করবেন না: ধূমপানের অভ্যাস জীবন থেকে ১০ বছর পর্যন্ত কেড়ে নিতে পারে, বাড়াতে পারে অকালমৃত্যুর ঝুঁকি। ৩৫ বছর বয়সে ধূমপান ছাড়লে ৮.৫ বছর বেশি বাঁচার সম্ভাবনা থাকে, এমনকি ৬০ বছর বয়সেও কেউ ধূমপান ছাড়লে আয়ুতে ৩.৭ বছর যোগ হতে পারে। তাই ধূমপানের অভ্যাস ছাড়ার সবচেয়ে ভাল সময় এই মুহূর্তেই।

নিজের সুখকে প্রাধান্য দিন: হাসিখুশি ও প্রসন্ন থাকা দীর্ঘায়ু লাভের রহস্য হতে পারে। ৩৫টি জরিপের ফলাফল পর্যালোচনা করে দেখা যায় সুখী ব্যক্তিদের জীবন ১৮% দীর্ঘায়িত হয়। তাই নিজের যত্ন নিন এবং হাসিখুশি থাকুন।

মানসিক চাপ এড়ানোর চেষ্টা করুন: দীর্ঘসময় মানসিক চাপ ও উদ্‌বেগ আয়ু কমিয়ে আনতে পারে। নারীদের ক্ষেত্রে মানসিক চাপ হৃদরোগ, স্ট্রোক, ফুসফুস ক্যান্সারের ঝুঁকি দ্বিগুণ করে এবং পুরুষদের ক্ষেত্রে অকালমৃত্যুর ঝুঁকি ৩ গুণ বাড়ায়।

জীবনের প্রতি ইতিবাচক মনোভাব রাখুন এবং প্রাণ খুলে হাসার চেষ্টা করুন। ইতিবাচক মনোভাব মানসিক চাপের কুফলগুলো কমাতে ভূমিকা রাখতে পারে।

আপনজনদের কাছে রাখুন: আপন মানুষদের সাথে সম্পর্ক ভালো রাখুন। সুস্থ সামাজিক জীবন মানসিক চাপ কমিয়ে ও রোগপ্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়িয়ে দীর্ঘায়ু পেতে সাহায্য করে। আপনজনদের সাহায্য করা এবং সঙ্গ দেওয়া নিজের মানসিক স্বাস্থ্যের জন্য ভালো।

কর্তব্যবোধ: একটি গবেষণায় ১৫০০ বালক-বালিকাদের বার্ধক্য পর্যন্ত পর্যবেক্ষণ করে দেখা যায় যে, নিয়মানুবর্তী ও কর্মঠ ব্যাক্তিরা ১১% বেশি আয়ুস্কাল লাভ করে। শৃঙ্খলাবোধ সম্পন্ন ব্যক্তিদের উচ্চ রক্তচাপ, মানসিক ব্যাধি ও ডায়াবেটিসের ঝুঁকি কম থাকে বলে জানা যায়।

ঘুম: নিয়মিত ৬ থেকে ৮ ঘণ্টা ঘুম দীর্ঘ জীবন লাভ করতে সহায়ক হতে পারে। অপরদিকে ৫-৭ ঘণ্টার কম অথবা ৮-৯ ঘণ্টার বেশি ঘুম স্বাস্থ্যের জন্য ক্ষতিকর।

আমরা নশ্বর এটাই সত্য। তবে এই পৃথিবীতে অনেকদিন প্রিয়জনদের সাথে সুস্থ সুন্দরভাবে বেঁচে থাকতে কে না চায়। এই সাতটি অভ্যাস মেনে চলে আসুন সুস্থ সুন্দর ভাবে বাঁচি।

ID: 2353

Context: গর্ভাবস্থায় ৫টি বিপদচিহ্ন

Question: গর্ভাবস্থায় কোন ৫টি বিপদচিহ্ন দেখা মাত্রই নিকটবর্তী স্বাস্থ্যকেন্দ্রে যোগাযোগ করুন?

Answer:

\* রক্তস্রাব

\* মাথাব্যথা ও চোখে ঝাপসা দেখা

\* খিঁচুনি

\* ভীষণ জ্বর

\* বিলম্বিত প্রসব বা প্রসবের সময় বাচ্চার মাথা ছাড়া অন্য কোন অঙ্গ প্রথমে বের হওয়া

ID: 2354

Context: দুর্যোগকালীন সময়ে গর্ভবতী মায়েদের করণীয়

Question: দুর্যোগকালীন সময়ে গর্ভবতী মায়েদের বিষয়ে করণীয়?

Answer:

\* যদি গর্ভবতী মা নিজেকে শারীরিকভাবে সুস্থ মনে করেন তবে এই সময়ে স্বাস্থ্যসেবা কেন্দ্রে না গিয়ে প্রয়োজনে ফোনের মাধ্যমে স্বাস্থ্যসেবা নিন স্বাস্থ্য কেন্দ্র

\*গর্ভাবস্থায় খুব জরুরী হলেই শুধুমাত্র স্বাস্থ্যসেবা কেন্দ্রে যান সেক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় সাবধানতা অবলম্বন করুন। যেমন- \* পরিবহনকে নিরাপদ করা, সব সময় মাস্ক ব্যবহার করা, যথাযথ নিয়ম মেনে হাত ধোয়া

\* গর্ভবতী মা-কে নিরাপদ রাখতে প্রসবের আগে, প্রসবের সময় এবং প্রসব পরবর্তী সময়ে করোনাভাইরাস প্রতিরোধের সকল নিয়ম-কানুন মেনে চলুন

\* স্বামীরা সংসারের কাজগুলো করার বিষয়ে সচেতন হোন এবং গর্ভবতী মাকে আরো বেশি বিশ্রামের সুযোগ করে দিন

\* নিরাপদ প্রসবের জন্য স্বাস্থ্যসেবা কেন্দ্রের সাথে অথবা স্বাস্থ্যকর্মীর সঙ্গে আগে থেকেই যোগাযোগ করুন এবং কিছু সঞ্চয়, রক্তদাতা, যানবাহন ঠিক করে রাখুন

ID: 2355

Context: দুর্যোগকালীন সময়ে করনীয়

Question: দুর্যোগকালীন সময়ে কোথায় যোগাযোগ করব?

Answer:

পরিবার কল্যাণ সহকারীর (FWA) সাথে

• স্যাটেলাইট ক্লিনিকে কমিউনিটি ক্লিনিকে

- ইউনিয়ন স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ কেন্দ্রে (UH & FWC)

উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে

• মা ও শিশু কল্যাণ কেন্দ্রে (MCWC)

- জেলা সদর ও মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে

ID: 2356

Context: দুর্যোগকালীন সময়ে পরিবার পরিকল্পনা

Question: দুর্যোগকালীন সময়ে পরিবার পরিকল্পনা কী ?

Answer:

• দুর্যোগকালীন সময়ে স্বামী-স্ত্রী মিলে আলোচনা করে পরিবার পরিকল্পনার কোন পদ্ধতিটি গ্রহণ করবেন সে বিষয়ে সিদ্ধান্ত নিন এবং নিজেদেরকে ঝুঁকিমুক্ত রাখুন

•যেকোনো পদ্ধতির সঠিক ব্যবহারবিধি, সুবিধা/অসুবিধা বিষয়ক তথ্য পেতে নিকটবর্তী স্বাস্থ্যকেন্দ্রে যোগাযোগ করুন

•পরিবার পরিকল্পনা পদ্ধতি গ্রহণের ক্ষেত্রে স্বামী হিসেবে আপনার স্ত্রীকে সহায়তা করুন

•পদ্ধতি গ্রহণকালীন সময়ে কোনো সমস্যা দেখা দিলে নিকটবর্তী স্বাস্থ্যসেবা কেন্দ্র অথবা স্বাস্থ্যকর্মীর সঙ্গে যোগাযোগ করুন।

ID: 2357

Context: পরিবার পরিকল্পনা পদ্ধতি সম্পর্কিত তথ্য, পরামর্শ এবং সেবা

Question: পরিবার পরিকল্পনা পদ্ধতি সম্পর্কিত তথ্য, পরামর্শ এবং সেবা যেসকল স্থানে পাওয়া যায় ?

Answer:

পরিবার কল্যাণ সহকারী বা স্বাস্থ্য সহকারী

- কমিউনিটি ক্লিনিক

- ইউনিয়ন স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ কেন্দ্র

- উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স

- মা ও শিশু কল্যাণ কেন্দ্ৰ

- জেলা সদর হাসপাতাল

- মডেল পরিবার পরিকল্পনা ক্লিনিক

- এনজিও/ বেসরকারী ক্লিনিক

ID: 2358

Context: জেণ্ডারভিত্তিক সহিংসতা থেকে নিজেকে সুরক্ষার উপায়

Question: দুর্যোগকালীন সময়ে জেণ্ডারভিত্তিক সহিংসতা থেকে নিজেকে সুরক্ষার উপায়?

Answer:

\* ত্রাণ বা অন্য কোনো জরুরী সেবা নেয়ার সময় আপনাকে যদি কেউ কোনো কুপ্রস্তাব দেয় বা গায়ে অযাচিতভাবে স্পর্শ করে তবে সে যে-ই হোক না কেনো দৃঢ়ভাবে 'না' বলুন

\* বাবা-মাকে বা অভিভাবককে না জানিয়ে কারো কাছ থেকে কোনো উপহার গ্রহণ করা থেকে বিরত থাকুন

\* নির্জন এবং অন্ধকার জায়গাগুলো থেকে নিরাপদ দূরত্বে থাকুন, প্রয়োজনে টর্চ ব্যবহার করুন এবং বাঁশি বাজান

\* শরীরের বিভিন্ন স্পর্শকাতর অংশগুলো সম্পর্কে সচেতন থাকুন

\* ঘরে বা বাহিরে যেকোনো জায়গায় নির্যাতনের শিকার হওয়ার সম্ভাবনা দেখা দিলে জোরে কথা বলুন, প্রয়োজনে চিৎকার দিন

\* পারিবারিক নির্যাতনের ক্ষেত্রে বিশ্বস্ত কারো সহায়তা নিন

\* আপনার অনুমতি না নিয়ে কাউকে ছবি তুলতে দিবেন না

\* ফোনে কেউ বাজে উক্তি করলে বা এস এম এস পাঠালে তাকে এড়িয়ে চলুন

ID: 2359

Context: কৈশোরকালীন সময়ে করণীয়

Question: কৈশোরকালীন সময়ে করণীয় কী ?

Answer:

বাবা-মা অথবা পরিবারের বড় সদস্যদের সাথে

খোলামেলা আলোচনা করা। স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা সেবাদানকারীর সাথে সরাসরি যোগাযোগ করা।

ID: 2360

Context: অপুষ্টি র সমস্যা

Question: অপুষ্টিতে ভুগলে কি সমস্যা হয়?

Answer:

অপুষ্টিতে ভুগলে যে কোনো সংক্রমণের সম্ভাবনা বেড়ে যায়। মাসিকের সময় অপরিষ্কার কাপড়

ব্যবহার করলে বা পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন না থাকলে প্রজননতন্ত্রের সংক্রমণ হতে পারে।

ID: 2361

Context: পুষ্টি নিয়ে করনীয়

Question:

পরিবারে যা মেনে চলতে হবে পুষ্টি নিয়ে?

Answer:

■ শাকসবজি ও ফলমূল কাটার আগে নিরাপদ ও পরিষ্কার পানি দিয়ে ধুয়ে নিতে হবে

■ খাবারের পুষ্টিগুণ বজায় রাখতে অল্পতাপে, ঢাকনা দিয়ে রান্না করতে হবে এবং রান্নার শেষ দিকে আয়োডিনযুক্ত লবণ যোগ করতে হবে

■ দিনে অন্ততপক্ষে ২ লিটার (৮ গ্লাস) নিরাপদ পানি পান করতে হবে

■ সপ্তাহে ২টি আয়রন ফলিক এসিড ট্যাবলেট

■ ৬ মাস অন্তর কৃমিনাশক ট্যাবলেট খেতে হবে

: ভাতের সাথে লেবু ও কাঁচা মরিচ খাওয়ার অভ্যাস গড়ে তুলতে হবে

■ স্বাস্থ্যসম্মত পায়খানা ব্যবহার করতে হবে এবং জুতা বা স্যান্ডেল পরে পায়খানায় যেতে হবে

# খাবার তৈরি ও গ্রহণের আগে এবং শৌচকর্মের পরে পরিষ্কার পানি ও সাবান দিয়ে হাত ধুতে হবে ।

ID: 2362

Context: পুষ্টি

Question: পুষ্টি কি?

Answer:

বয়ঃসন্ধিকালে শরীর দ্রুত বাড়ে। সেজন্য অতিরিক্ত শক্তি ও পুষ্টির প্রয়োজন হয়। তাই এসময়ে শরীর গঠন, ও ক্ষয়পূরণের পাশাপাশি মানসিক বিকাশ এবং রোগ প্রতিরোধের জন্য সুষম ও পুষ্টিকর খাবার খেতে হবে। বিশেষ করে আমিষ, ভিটামিন, খনিজ ও লবণসমৃদ্ধ খাবার খেতে হবে।

কৈশোরে ছেলে-মেয়েরা পড়াশুনার পাশাপাশি খেলাধুলাও করে থাকে। তাই শরীরে প্রয়োজনীয় শক্তি যোগানের জন্যে বয়স ও দৈনন্দিন কাজের পরিমাণ অনুযায়ী ক্যালরি কম বা বেশি গ্রহণ করতে হবে। অর্থাৎ যার বয়স কম বা কাজ কম করে সে কম ক্যালরি ও যার বয়স বেশি এবং বেশি কাজ করে সে বেশি ক্যালরি গ্রহণ করবে।

ID: 2363

Context: সুষম ও পুষ্টিকর খাবার

Question: সুষম ও পুষ্টিকর খাবার কি ?

Answer:

শর্করা জাতীয় খাবার :

ভাত, আটা বা ময়দার রুটি, পাউরুটি, আলু, মিষ্টিআলু, মুড়ি, চিড়া, খৈ, চিনি, মধু প্রভৃতি ।

চর্বি জাতীয় খাবার :

তেল, মাখন, ঘি, মাছ-মাংসের চর্বি প্রভৃতি ।

আমিষ জাতীয় খাবার :

ডিম, মাছ, মাংস, কলিজা, ছোটমাছ, দুধ, সয়াবিন ও অন্যান্য ডাল, বাদাম, সিমের বিচি প্রভৃতি।

ভিটামিন ও খনিজসমৃদ্ধ খাবার :

(শাক, সবজি ও ফল জাতীয় খাবার) কচুশাক, পুঁইশাক, কলমিশাক, পালংশাক, পাকা আম, পাকা তাল, পাকা পেঁপে, পাকা কাঁঠাল, আনারস, পেয়ারা, আমলকি, আমড়া, কলা, লেবু, গাজর, মিষ্টিকুমড়া, শিম, ছোটমাছ, দুধ, ডিম, কলিজা প্রভৃতি ।

ID: 2364

Context: মাদকে করণীয়

Question: মাদকে করণীয় কী?

Answer:

মাদক থেকে দূরে থাকি জীবনটাকে সুস্থ রাখি

শখ করেও কখনো মাদক সেবন নয়

সন্তানের কথা শুনবো ওদের নিরাপদে রাখবো

ID: 2365

Context: কৈশোরের স্বাস্থ্যতথ্য, সমস্যার সমাধান ও পরামর্শ

Question: কৈশোরের স্বাস্থ্যতথ্য, সমস্যার সমাধান ও পরামর্শ পেতে কোথায় যাব?

Answer:

\*ইউনিয়ন স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ কেন্দ্র

•উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স

• মা ও শিশু কল্যাণ কেন্দ্ৰ

• জেলা হাসপাতাল

• স্কুল হেলথ ক্লিনিক

• নির্দিষ্ট এনজিও ক্লিনিক

ID: 2366

Context: -1

Question: অধিকার

Answer:

নির্যাতনের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াই একসাথে

কিশোর-কিশোরীদের নির্যাতনের বিরুদ্ধে কথা বলি, তাদের নিরাপদ রাখি ।

ID: 2367

Context: কিশোর বান্ধব স্বাস্থ্যসেবা

Question: কিশোর বান্ধব স্বাস্থ্যসেবা কী কী ?

Answer:

কৈশোরকালীন স্বাস্থ্য বিষয়ক তথ্য, সমস্যার সমাধান ও পরামর্শ পেতে

\* ইউনিয়ন স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ কেন্দ্ৰ

উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স \* মা ও শিশু কল্যাণ কেন্দ্ৰ

\* জেলা হাসপাতাল স্কুল হেলথ ক্লিনিক নির্দিষ্ট এনজিও ক্লিনিক

ID: 2368

Context: কৈশোরকালীন মনোসামাজিক পরিবর্তন

Question: কৈশোরকালীন মনোসামাজিক পরিবর্তন কি?

Answer:

কৈশোরকালীন সময়ে কিশোর-কিশোরীদের মাঝে বিভিন্ন ধরণের পরিবর্তন লক্ষ্য করা যায়। পরিবার, বন্ধু এবং সমবয়সীদের সাথে যোগাযোগের ক্ষেত্রেও নানা ধরণের ভিন্নতা প্রকাশ পায়। কারণ, প্রত্যেক কিশোর- কিশোরীর মনোসামাজিক বিকাশ ভিন্ন, এক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ উপাদান হিসেবে জিনগত বৈশিষ্ট্য, মস্তিষ্কের বিকাশ, অভিজ্ঞতা ছাড়াও চারপাশের পরিবেশ (পরিবার, বন্ধু, সমাজ, কৃষ্টি) ইত্যাদিও বিশেষভাবে প্রভাব বিস্তার করে। মনোসামাজিক পরিবর্তনের মাধ্যমে কিশোর-কিশোরীদের মাঝে আত্ম-নির্ভরশীলতা এবং পরিণত বয়সের বৈশিষ্ট্যগুলো ধীরে ধীরে প্রকাশ পায়।

ID: 2369

Context: মনোসামাজিক পরিবর্তনসমূহ

Question: মনোসামাজিক পরিবর্তনসমূহ কি ধরনের?

Answer:

ব্যক্তিগত পরিচয় অনুসন্ধান করা

অধিক স্বাধীনচেতা মনোভাব

অধিক দায়িত্ব অন্বেষণ করা

ঝুঁকি-গ্রহণমূলক আচরণ

সম্পর্কজনিত বিষয়

ID: 2370

Context: পুষ্টি

Question: পুষ্টি কি?

Answer:

পুষ্টি হলো একটি প্রক্রিয়া। এ প্রক্রিয়াতে খাদ্যবস্তু খাওয়ার পরে পরিপাক হয় এবং জটিল খাদ্য উপাদানগুলো ভেঙ্গে সরল উপাদানে পরিণত হয়। মানবদেহ এসব সরল উপাদান শোষণ করে নেয়। এসব খাদ্য উপাদান মানবদেহের শক্তি ও যথাযথ বৃদ্ধি নিশ্চিত করে, মেধা ও বুদ্ধি বাড়ায়, রোগ প্রতিরোধ করে, রোগ-ব্যাধি থেকে তাড়াতাড়ি সুস্থ হতে সাহায্য করে এবং সর্বোপরি কর্মক্ষম করে।

ID: 2371

Context: পুষ্টিকর খাদ্য

Question: পুষ্টিকর খাদ্য কাকে বলে?

Answer:

যেসব খাদ্য খেলে শরীরে তাপ ও শক্তি উৎপাদিত হয়, দেহের গঠন ও বৃদ্ধি হয়, শরীর সবল, কর্মক্ষম থাকে, তাকে পুষ্টিকর খাদ্য বলে। খাদ্য ও পুষ্টি একে অপরের সাথে জড়িত। প্রতিটি খাদ্য অবশ্যই পুষ্টিকর ও নিরাপদ হতে হবে। নিয়মিত পুষ্টিকর খাদ্য গ্রহণ করলে শরীর ও মন ভালো থাকে, মনে প্রফুল্লতা আসে এবং পড়াশোনা ও কাজে মনোযোগ বাড়ে। মনে রাখতে হবে পুষ্টিকর খাদ্য গ্রহণ না করলে রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা কমে যায় এবং শরীরে বিভিন্ন ধরনের রোগ হয়।

ID: 2372

Context: কৈশোরে পুষ্টিকর খাবার

Question: কৈশোরে পুষ্টিকর খাবারের কেন গুরুতপূর্ন ?

Answer:

বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা (WHO) সংজ্ঞা অনুযায়ী ১০-১৯ বছর বয়স সীমাকে কৈশোরকাল (adolescence) বলে। এ সময় ছেলে-মেয়ে উভয়েরই স্বাভাবিক শারীরিক ও মানসিক পরিবর্তন হয়। দ্রুত ওজন ও উচ্চতার বৃদ্ধি এবং বুদ্ধির বিকাশ ঘটে। তাই কিশোর-কিশোরীদের সঠিক বৃদ্ধির জন্য এসময় পরিমাণমতো পুষ্টিকর ও সুষম খাবার গ্রহণ করা প্রয়োজন। সঠিক পুষ্টি নিয়ে বেড়ে উঠলে কিশোর-কিশোরীদের মেধা ও বুদ্ধির বিকাশ হয়। লেখাপড়ায় মনোযোগ, ভালো ফলাফল এবং কাজ করার সক্ষমতা বৃদ্ধি পায়।

ID: 2373

Context: খাদ্য

Question: খাদ্য কি?

Answer:

মানবদেহকে সুস্থ-সবল রাখার জন্য খাদ্য অপরিহার্য। খাদ্য বলতে সেই সকল জৈব উপাদানকে বোঝায় যেগুলো মানবদেহ গঠনে ভূমিকা রাখে, ক্ষয়পূরণ করে, শক্তি বৃদ্ধিসহ রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা তৈরি করে। মানুষ খাদ্য থেকে পুষ্টি গ্রহণ করে।

ID: 2374

Context: কৈশোরকালীন অপুষ্টি প্রতিরোধ

Question: কিভাবে কৈশোরকালীন অপুষ্টি প্রতিরোধ করা যায়?

Answer:

সুষম খাবার, যেমন - শর্করাজাতীয় খাবার (ভাত, রুটি, মুড়ি, চিনি, গুড়, মধু, আলু, চিড়া ইত্যাদি), আমিষজাতীয় খাবার (ডিম, দুধ, মাছ, মাংস, ডাল, বাদাম, বিচি ইত্যাদি), আয়রনসমৃদ্ধ খাবার (মাংস, কলিজা এবং গাঢ় সবুজ শাক-সবজি), ভিটামিন এ সমৃদ্ধ খাবার (কলিজা, পাকা পেঁপে, আম, গাজর, মিষ্টি কুমড়া, ছোট মাছ, ডিম, সবুজ শাক-সবজি ও হলুদ রঙের ফলমূল) খাওয়া

প্রতিদিন ভিটামিন সি-যুক্ত খাবার খাওয়া

আয়োডিনসমৃদ্ধ খাবার (সামুদ্রিক মাছ এবং সমুদ্র তীরবর্তী এলাকার শাক-সবজি) এবং আয়োডিনযুক্ত লবণ খাওয়া

প্রতিদিন ১০-১২ গ্লাস পানি পান করা

চিকিৎসক বা স্বাস্থ্যকর্মীর পরামর্শ অনুযায়ী কিশোরীদের আয়রন-ফলিক অ্যাসিড (IFA) ট্যাবলেট খাওয়া (প্রতি সপ্তাহে ১টি করে খাবে)

প্রত্যেক কিশোর-কিশোরীকে চিকিৎসকের পরামর্শ অনুযায়ী ছয়মাস পর পর কৃমিনাশক বড়ি গ্রহণ করা

খাবার খাওয়ার আগে ও পরে সাবান এবং নিরাপদ পানি দিয়ে হাত ধোয়া

স্বাস্থ্যসম্মত টয়লেট ব্যবহার করা এবং জুতা বা স্যান্ডেল পরে টয়লেটে যাওয়া

মাসিকের সময় পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন থাকা। মনে রাখতে হবে যে, এ সময় সব ধরনের খাবার খাওয়া যায় এবং সব স্বাভাবিক কাজকর্ম করা যায়

দেরিতে বিয়ে ও দেরিতে গর্ভধারণ করা (১৮ বছরের পরে)

কিশোরীকে টিডি (টিটেনাস-ডিপথেরিয়া) টিকার ৫টি ডোজ সম্পূর্ণ করা

ID: 2375

Context: স্বাস্থ্য

Question: স্বাস্থ্য বলতে কি বুঝি?

Answer:

বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার মতে (১৯৪৮), স্বাস্থ্য শুধুমাত্র রোগ বা দুর্বলতার অনুপস্থিতিই নয় বরং এমন একটি অবস্থা যেখানে পরিপূর্ণ শারীরিক, মানসিক এবং সামাজিক সুস্থতা বিদ্যমান।

ID: 2376

Context: নারীর মুখা গহ্বরে পরিবর্তন

Question: যে কারণে নারীর মুখা গহ্বরে পরিবর্তন আসে ?

Answer:

বয়সের সঙ্গে নারীদের জীবদ্দশায় শরীরের স্বাভাবিক হরমোনের তারতম্যের কারণে মুখগহ্বরে বেশ কিছু স্বল্প মেয়াদি পরিবর্তন আসে। সঠিক পরিচর্যার অভাবে এখান থেকে বড় ধরনের জটিলতার আশঙ্কাও রয়ে যায়। যেমন-

\*\* বয়ঃসন্ধিকাল

ইস্ট্রোজেন ও প্রোজেস্টেরনের আধিক্যের কারণে মাড়িতে স্বাভাবিকের তুলনায় রক্ত প্রবাহ বেশি থাকে, ফলে সামান্য কিছুতেই মাড়ি দিয়ে রক্ত পড়ার প্রবণতা থাকে, মাড়ি ফুলে যেতে পারে, মুখে দুর্গন্ধ হতে পারে, ডেন্টাল ক্যারিজের প্রবণতাও বাড়তে পারে।

\*\* মেনস্ট্রুয়েশন পিরিয়ড

পিরিয়ডের সময়ে রক্তে প্রোজেস্টেরন হরমোনের মাত্রা বেড়ে যাওয়ার ফলে মাড়ি উজ্জ্বল দেখায় ও ফুলে যায়, মাড়িতে ব্যথাসহ ছোট এপথাস আলসারসহ কিছু ঘা বা ক্ষত হতে পারে, লালা গ্রন্থি ফুলে যেতে পারে। মাসিকের ২ থেকে ৩ দিন আগে উপসর্গগুলো শুরু হলেও কয়েকদিনে ভালো হয়ে ওঠে।

\*\* জন্মনিয়ন্ত্রক ওষুধ সেবন

প্রোজেস্টেরন সম্পর্কীয় ওষুধে মাড়িতে নানা ধরনের প্রদাহ দেখা দিতে পারে, বিশেষ করে ওষুধ নেওয়ার প্রথম কয়েক মাস। ইস্ট্রোজেন সম্পর্কীয় ওষুধ শরীরে প্রাকৃতিক ইস্ট্রোজেন কমিয়ে কৃত্রিম ইস্ট্রোজেন বাড়িয়ে দেয়, ফলে মুখের একমাত্র নড়াচড়াক্ষম জয়েন্ট, টেম্পেরোম্যান্ডিবুলার জয়েন্টে নানা সমস্যার কারণে মুখ খুলতে, খাবার চর্বণে এমনকি মুখ নাড়াচাড়া করতে কষ্ট হতে পারে।

\*\* গর্ভকাল

গর্ভাবস্থায় হরমোনের ব্যাপক তারতম্য ঘটে, স্পর্শকাতর এ সময়ে প্রোজেস্টেরনের মাত্রা বেড়ে যাওয়াতে মুখের মধ্যকার জীবাণু সক্রিয় হয়ে ওঠে। গর্ভাবস্থার ২ থেকে ৮ মাসের মধ্যে দাঁতে গর্ত, দাঁত শিন শিন করা, মাড়ি ফুলে রক্ত পড়া খুব সাধারণ। মুখ পরিষ্কারে অনিহা বা বমি বমি ভাবের জন্য মুখগহ্বর রোগের অভয়ারণ্য হয়ে ওঠে। অন্যদিকে মুখের রোগ থেকে অপরণীত গর্ভপাত ও গর্ভের শিশুর মানসিক ও শারীরিক জটিলতা হতে পারে। প্রথম ও শেষ তিন মাস চিকিৎসা গ্রহণেও সর্বোচ্চ সতর্কতা অবলম্বন জরুরি।

\*\* মেনোপজকাল

নারীদের মেনোপজে মুখে বিভিন্ন ধরনের জটিলতা খুব সাধারণ। এর সঙ্গে যোগবাঁধে অন্যরোগ। মুখের স্বাদ কমে যাওয়া, মুখে জ্বালা পোড়া করা, অল্পতে ঝাঁল অনুভূতি, ঠান্ডা বা গরম খাবারে অতিসংবেদনশীলতা, মুখ শুষ্ক হয়ে যাওয়া থেকে শুরু করে নানা পরিবর্তন হতে পারে। এসময়ে ক্যারিজ বা দাঁতক্ষয়, মাড়ি রোগ, চোয়ালের হাড় ক্ষয় থেকে নানা রোগের প্রাদুর্ভাব ঘটতে পারে।

\*\* করণীয়

\* প্রত্যেকদিন নিয়ম মেনে সকালে নাশতার পর ও রাতে ঘুমানোর আগে নরম টুথ ব্রাশ ও ফ্লোরাইড যুক্ত টুথপেস্ট দিয়ে দাঁতের পাঁচটি পৃষ্ঠ পরিষ্কার, বিশেষ প্রয়োজনে জীবাণু ধ্বংসকারক মাউথ ওয়াশ ব্যবহার।

\* দুই দাঁতের মধ্যবর্তী স্থানে ডেন্টাল ফ্লস দিয়ে পরিষ্কার।

\* সমস্যা বা উপসর্গ না হলেও ছয়মাস পর পর অনুমোদিত ডেন্টাল চিকিৎসকের পরামর্শ নেওয়া, যাতে রোগের প্রদুর্ভাব শুরুতেই ধরা পড়ে।

\* স্বাস্থ্যবান্ধব খাবার গ্রহণ।

\* গর্ভাবস্থায় চিকিৎসকের তত্ত্বাবধানে মুখ পরিষ্কার।

\* মেনোপোজে গাইনি চিকিৎসকের পরামর্শে হরমোন থেরাপি

ID: 2377

Context: মেনোপজের পর তলপেটে মেদ জমা

Question: মেনোপজের পর তলপেটে মেদ হতে পারে কী ?

Answer:

নারীদের মেনোপজের পর হরমোনের পরিবর্তন যা ঘটে এ জন্য মধ্য দেশে জমতে পারে মেদ। উষ্ণ ঝলক, রাতে ঘাম, মেজাজের চড়াই-উতরাই বেশ নজরে পড়ে, কিন্তু বাথরুম স্কেলে দেহ ওজন মাপা হয় না, ওজনও বাড়ে।

শরীরে ওজন বিতরণ বদলে যায়, তলপেটে জমতে থাকে মেদ।

মেনোপজের আগে আগে, সে সময় ও পরে স্ত্রী হরমোন ইস্ট্রোজেন কমতে থাকে, বিপাক হয় শ্লথ, তখন ওজন হ্রাস করা হয়ে পড়ে কঠিন, জমে মেদ তলপেটে। এতে ডায়াবেটিস, হৃদরোগ, কিছু ক্যান্সারও আগাম মৃত্যুর ঝুঁকি বাড়ে।

কী করা যায়

\* ব্যায়াম করতে হবে নিয়মিত।

\* এরোবিক ব্যায়াম যেমন- দ্রুত হাঁটা, সাইকেল চালানো, সাঁতার কাটা, ভার উত্তোলন, প্রতি সপ্তাহে অন্তত মোট ১৫০ মিনিট মাঝারি ও কঠোর ব্যায়াম।

\* যতদূর সম্ভব বসার চেয়ে দাঁড়িয়ে থাকুন। কারণ যত বেশি শরীর থাকে সচল, তত বেশি ক্যালোরি পোড়ে। বেশিরভাগ সময় ঋজু থাকুন, হাঁটুন কথা বলুন কোনো গাড়ি দূরে পার্ক করে হেঁটে যান অফিসে।

\* কম্পিউটার নিয়ে যারা কাজ করেন তারা স্ট্যান্ডিং ডেসক ব্যবহার করুন।

\* খাবারের পরিমাণ কমান, সঠিক সময়ে খান। সকালে ভরপেট প্রাতঃরাশ, মাঝারি মধ্য আহার ও রাতে হালকা খাবার। মূল খাবার মধ্যাহ্নে ভালো। রাতে হালকা।

\* খাবার বাছতে হবে বিজ্ঞজনোচিতভাবে, স্বাস্থ্যকর চর্বি খান।

\* উদ্ভিজ্জ চর্বি যেমন জলপাই ও বাদাম। এভোক্যাডো।

\* মনোযোগী হয় যেন খাওয়া।

\* অমনোযোগে আহার হয় বেশি।

\* ব্যায়ামে নতুন বৈচিত্র্য যেন থাকে। যেমন ইয়োগা, ওয়েট ট্রেনিং।

\* চাই সুনিদ্রা

\* ব্যায়ামের জন্য খুঁজে নিন সঙ্গী। ডাক্তারের পরামর্শ নিন।

ID: 2378

Context: হরমোনের তারতম্যে নারীদের মুখের জটিলতা

Question: হরমোনের তারতম্যে নারীদের মুখের জটিলতা কি কি ?

Answer:

মেয়েদের জীবদ্দশায় বিশেষ পাঁচটি সময়ে শরীরের স্বাভাবিক হরমোন বা গ্রন্থিরসের তারতম্যের জন্য মুখগহ্বরে নানা উপসর্গ দেখা দিতে পারে।

এ সময়গুলোতে মুখের যত্নে অধিকতর সচেতন থাকার বিষয়ে শক্তভাবে পরামর্শ দিচ্ছেন বিশেষজ্ঞরা। তা না হলে স্বাভাবিক ও ক্ষণস্থায়ী এমন পরিবর্তন নানা অপূরণীয় ক্ষতির কারণ হয়ে দাঁড়াতে পারে।

পর্যায়-১ : বয়ঃসন্ধিকাল

ইস্ট্রোজেন ও প্রোজেস্টেরনে অধিকতর কারণে মাড়িতে রক্ত প্রবাহ বেশি থাকে, ফলে সামান্য কিছুতেই মাড়ি দিয়ে রক্ত পড়তে পারে, মাড়ি ফুলে যেতে পারে, মুখে দুর্গন্ধ হতে পারে, ডেন্টাল ক্যারিজের প্রবণতাও বাড়তে পারে।

পর্যায়-২ : মেনস্ট্রয়েশন সময়কাল

মাসের বিশেষ দিনগুলোতে রক্তে প্রোজেস্টেরন হরমোনের আধিক্যের জন্য মাড়ি উজ্জ্বল দেখায় ও ফুলে যায়, মাড়িতে এপথাস আলসারসহ কিছু ঘা বা ক্ষত হতে পারে, লালাগ্রন্থি ফুলে যেতে পারে। বেশিরভাগ ক্ষেত্রে মাসিকের ২ থেকে ৩ দিন আগে এমন উপসর্গগুলো শুরু হলেও এগুলো ক্ষণস্থায়ী হয়।

পর্যায়-৩ : জন্মনিয়ন্ত্রক ওষুধ সেবনকাল

প্রোজেস্টেরন সম্পর্কীয় ওষুধে মাড়িতে নানা ধরনের প্রদাহ দেখা দিতে পারে, বিশেষ করে ওষুধ গ্রহণের প্রথম কয়েক মাস। ইস্ট্রোজেন সম্পর্কীয় ওষুধ শরীরে প্রাকৃতিক ইস্ট্রোজেন কমিয়ে কৃত্রিম ইস্ট্রোজেন বাড়িয়ে দেয়, ফলে মুখের একমাত্র নড়াচড়াক্ষম জয়েন্ট, টেম্পেরোম্যান্ডিবুলার জয়েন্টে নানা সমস্যার কারণে মুখ খুলতে, খাবার চর্বণে এমনকি মুখ নাড়াচাড়া করতে কষ্ট হতে পারে।

পর্যায়-৪ : গর্ভকাল

গর্ভাবস্থায় হরমোনের ব্যাপক তারতম্য ঘটে। বিশেষ করে প্রোজেস্টেরনের মাত্রা বেড়ে যাওয়াতে মুখের মধ্যকার জীবাণু সক্রিয় হয়ে ওঠে, গর্ভাবস্থার ২ থেকে ৮ মাসের মধ্যে দাঁতে গর্ত, দাঁত শিন শিন করা, মাড়ি ফুলে গিয়ে রক্ত পড়া বা প্রেগনেন্সি ইপিউলিস খুব সাধারণ। মুখ পরিষ্কারে অনিহা বা বমি বমি ভাবের জন্য মুখগহ্বর রোগের অভয়ারণ্য হয়ে ওঠে। এ সময়টিতে অধিক সচেতন থাকতে হবে।

পর্যায়-৫ : মেনোপজকাল

বয়স্কদের মেনোপজে মুখে বিভিন্ন ধরনের জটিলতা খুব সাধারণ। এর সঙ্গে যোগ হয় অন্যান্য রোগ নিয়ন্ত্রণে কোনো সেবনকৃত ওষুধের পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া। সাধারণ মুখের স্বাদ কমে যাওয়া, মুখে জ্বালাপোড়া করা, একটুতেই ঝাল অনুভূতি, ঠাণ্ডা বা গরম খাবারে অতিসংবেদনশীলতা, মুখ শুষ্ক হয়ে যাওয়া থেকে শুরু করে নানা পরিবর্তন স্পষ্ট হয়। এ সময়ে ক্যারিজ বা দাঁত ক্ষয়, মাড়ি রোগ, চোয়ালের হাড় ক্ষয় থেকে নানা রোগের প্রাদুর্ভাব ঘটতে পারে।

করণীয়

\* প্রত্যেকদিন নিয়ম মেনে সকালে নাস্তার পর ও রাতে ঘুমানোর আগে নরম টুথ ব্রাশ ও ফ্লোরাইডযুক্ত উন্নতমানের টুথপেস্ট দিয়ে নিয়ম মেনে ২ মিনিট মুখ পরিষ্কার, বিশেষ প্রয়োজনে চিকিৎসকের পরামর্শে জীবাণু ধ্বংসকারক মাউথ ওয়াশ ব্যবহার।

\* দুই দাঁতের মধ্যবর্তী স্থানে সঠিক পদ্ধতিতে ডেন্টাল ফ্লস বা ইন্টার ডেন্টাল ব্রাশ দিয়ে পরিষ্কার রাখা, টুথ পিক বা কোনো ধাতব কাঠিকে শক্তভাবে নিরুৎসাহিত করা হয়।

\* ছয় মাস পরপর অনুমোদিত ডেন্টাল চিকিৎসকের পরিমর্শ নেয়া, বিগত কয়েকমাস কোভিডকালে যৌক্তিক কারণে ডেন্টাল রোগীদের ঘরে বসে টেলিমেডিসিনের মাধ্যমে কষ্ট লাঘবে প্রচেষ্টার কথা বলা হলেও বর্তমান নিউ নরমাল সময়ে অনেক ডেন্টাল ক্লিনিক সাধ্যমতো করোনা রোধের বিষয়টি নিয়ন্ত্রণে উপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করে রোগী দেখা শুরু করেছে। এখন পর্যন্ত জরুরি প্রয়োজন ছাড়া ডেন্টাল ক্লিনিকে না যাওয়াই ভালো আর প্রয়োজন পড়লে অবশ্যই বিশ্বস্ত ডেন্টাল চিকিৎসকের সঙ্গে টেলিফোনের মাধ্যমে সময় ও তারিখ চূড়ান্তের পাশাপাশি কীভাবে নিজেকে বিপদমুক্ত রেখে ক্লিনিকে আসবেন সেটার ধারণা নিয়ে আসতে হবে। কোভিডের সামান্য কোনো উপসর্গ, সম্ভাবনা বা ইতিহাস থাকলে সেটা স্পষ্ট করতে হবে। কারণ প্রতিটি রোগীর জন্য ক্লিনিকে বিশেষ ব্যবস্থা নিতে হয়।

\* স্বাস্থ্যবান্ধব খাবার গ্রহণ ও মিষ্টিজাতীয় খাবার কম খাওয়া।

\* গর্ভাবস্থায় চিকিৎসকের তত্ত্বাবধানে মুখ পরিষ্কার রাখার বিষয়টি নিশ্চিত করা।

\* বিশেষ প্রয়োজনে মেনপোজে গাইনি চিকিৎসকের পরামর্শে হরমোন থেরাপি।

\* শরীরের অন্যান্য রোগকে নিয়ন্ত্রণ ও দুশ্চিন্তামুক্ত থাকার চেষ্টা।

\* প্রতিদিন সময় করে হাঁটা বা ব্যায়ামের অভ্যাস করা।

ID: 2379

Context: নিম ফেস প্যাকের সুবিধা এবং ব্যবহার

Question: নিম ফেস প্যাকের সুবিধা এবং ব্যবহার ?

Answer:

নিম ফেস প্যাক ত্বক সম্পর্কিত সমস্যা কমাতে উপকারী। আপনি জানেন যে নিম পাতা প্রাচীন কাল থেকেই ওষুধ হিসাবে ব্যবহৃত হয়ে আসছে। নিমের রয়েছে অনেক পুষ্টিগুণ, খনিজ, অ্যান্টি-ব্যাকটেরিয়াল বৈশিষ্ট্য, অ্যান্টি-ফাঙ্গাল বৈশিষ্ট্য, অ্যান্টি-ভাইরাল বৈশিষ্ট্য। এগুলি শরীরের রোগ প্রতিরোধে সহায়ক হিসাবে বিবেচিত হয়। অনেকেই ভাবছেন যে কীভাবে নিম ফেস প্যাকটি ব্যবহার করবেন এবং কীভাবে এটি ত্বকের জন্য উপকারী হতে পারে

ID: 2380

Context: নিম ফেস প্যাক

Question: নিম ফেস প্যাক কী?

Answer:

নিম পাতায় অনেক ঔষধি গুণ রয়েছে যা অনেক আয়ুর্বেদিক চিকিৎসায় ব্যবহৃত হয়। নিম ফেস প্যাকটি ত্বকের সমস্যাগুলি দূর করতে প্রাচীন কাল থেকেই ব্যবহৃত হয়ে আসছে। আপনারা জানেন যে, নিম গাছ, পাতা, ফুল, মূল সবই ত্বক সম্পর্কিত সমস্যার ঘরোয়া চিকিৎসায় ব্যবহৃত হয়। বিজ্ঞানীর মতে নিম পাতাগুলিতে সর্বাধিক মানের গুণ রয়েছে। এর পাতা পিষে এবং এটি অন্যান্য গুল্মের সাথে মিশিয়ে ত্বকে ফেস প্যাক হিসাবে ব্যবহার করলে ত্বকের সাথে সম্পর্কিত সমস্যাটি শেষ হয়

ID: 2381

Context: নিম ফেস প্যাক র ব্যবহার

Question: নিম ফেস প্যাক র ব্যবহার ?

Answer:

নিম ফেস প্যাকটি নিম্নলিখিত উপায়ে ব্যবহার করা যেতে পারে।

নিম এবং বেসনের মিশ্রণ তৈরি করে ফেস প্যাক তৈরি করতে পারেন। এই প্যাকটি ত্বকের সৌন্দর্য বৃদ্ধিতে সহায়তা করে। এই প্যাকটির ব্যবহার ত্বককে সুন্দর করে এবং আপনাকে তরুণ করে তোলে।

নিম ফেস প্যাকগুলি ত্বক থেকে কালো দাগ দূর করতে ব্যবহৃত হয়।

নিম ফেস প্যাকটি টোনার হিসাবে ব্যবহার করা যেতে পারে। এটি ময়লা এবং তৈলাক্তভাব ত্বক থেকে দূর করে।

নিম দিয়ে অ্যালোভেরা ব্যবহার করে ফেসপ্যাক তৈরি করতে পারেন। এই ফেস প্যাকটিতে ভাল পরিমাণে অ্যান্টিব্যাক্টেরিয়াল গুণ রয়েছে যা ত্বককে সংক্রমণ থেকে রক্ষা করে।

ID: 2382

Context: নিম ফেস প্যাকের সুবিধা

Question: নিম ফেস প্যাকের সুবিধা?

Answer:

নিম ফেস প্যাকের নিম্নলিখিত সুবিধা রয়েছে। আসুন আমরা আরও ব্যাখ্যা করি।

ত্বকের সংক্রমণের হাত থেকে রক্ষা পেতে নিম ফেস প্যাক – একজিমা বা সোরিয়াসিস ইত্যাদির মতো সংক্রমণের আক্রমণে ত্বকের সংক্রমণ শুরু হয়। এই সমস্যাগুলি হ্রাস করতে নিম ফেস প্যাকটি খুব কার্যকর। আপনি নিম ফেস প্যাকের সাথে রসুন এবং নারকেল তেল মিশ্রণ করতে পারেন কারণ এটি এন্টি ব্যাকটেরিয়াল বৈশিষ্ট্য যা সংক্রমণ রোধ করে। এই পেস্টটি তৈরির জন্য কয়েকটি নিম পাতা সিদ্ধ করে একটি পেস্ট তৈরি করুন, এখন এক চামচ নারকেল তেল এবং রসুন গরম করে পেস্টে মিশিয়ে ত্বকে লাগান, কিছুক্ষণ পরে জল দিয়ে ধুয়ে ফেলুন। এই প্রক্রিয়াটি সপ্তাহে দু’বার করা যেতে পারে। (আরও পড়ুন – রসুনের কী কী সুবিধা রয়েছে)

দাগ দূর করার জন্য নিম ফেস প্যাক – ত্বকের কালো দাগ দূর করার জন্য নিম ফেস প্যাকটি খুব উপকারী। নিমে অনেক ধরণের ঔষুধি রয়েছে যা ত্বকে সংক্রমণ ছড়িয়ে দিতে এবং সুরক্ষা দেয়। আপনি যদি ত্বকের দাগ দূর করতে চান তবে নিম ফেস প্যাক ব্যবহার করতে পারেন।

মুখের পিম্পলস দূর করতে – ব্রণর সমস্যার কারণে ত্বকের সৌন্দর্য কমে যায়। ব্রণ থেকে মুক্তি পেতে নিম ফেস প্যাকের সাথে শসা ব্যবহার করা উচিত। নিমের মধ্যে অ্যান্টি-ব্যাকটেরিয়া রয়েছে যা ব্রণ নিরাময় করে এবং শসা ত্বকের শীতলতা সরবরাহ করে। এটি ব্যবহার করার জন্য কিছু নিম পাতার পেস্ট তৈরি করার পাশাপাশি শসার পেস্ট তৈরি করুন, এবার দুটোই ভাল করে মিশিয়ে মুখে লাগান, কিছুক্ষণ ম্যাসাজ করুন এবং পরিষ্কার জল দিয়ে ধুয়ে ফেলুন। প্রতিদিন এই পদ্ধতিটি করে ব্রণর সমস্যা দূর হয়। (আরও পড়ুন – ব্রণর জন্য ঘরোয়া প্রতিকার)

চকচকে ত্বকের জন্য নিম ফেস প্যাক – ত্বককে সুন্দর, নরম ও চকচকে করতে নিম ফেস প্যাকের ব্যবহার উপকারী। নিমের পাতার সাথে মুলতানি মিট্টির ব্যবহার ত্বককে নরম করে। এই পেস্টে কয়েকটি তুলসী, নিম পাতা, মধু এবং মুলতানি মাটি যুক্ত করে পেস্টটি তৈরি করে আপনার মুখে লাগান। (আরও পড়ুন – মুলতানি মাটির উপকারিতা)

ID: 2383

Context: নিম ফেস প্যাকের অসুবিধা

Question: নিম ফেস প্যাকের অসুবিধা কী ?

Answer:

ত্বকের সমস্যা দূর করতে নিম ফেস প্যাক ব্যবহার উপকারী। এটি কারণ প্রাকৃতিকভাবে নিমের অনেক ঔlষধি গুণ রয়েছে। তবে কিছু পরিস্থিতিতে ক্ষতিও হতে পারে।

আপনার ত্বক যদি সংবেদনশীল হয় তবে নিম ফেস প্যাকটি খানিকটা ব্যবহার করুন, যদি ত্বকে জ্বালা শুরু হয় তবে আপনি ত্বকে লাগাবেন না।

নিম পাতায় বিভিন্ন ধরণের ঔষধি গুণ রয়েছে তবে অতিরিক্ত পরিমাণে ত্বকের ব্যবহারে সমস্যা দেখা দিতে পারে।

নিম ফেস প্যাক লাগিয়ে ত্বকে যদি কোনও গুরুতর সমস্যা হয় তবে আপনি ডাক্তারের সাথে যোগাযোগ করতে পারেন।

যদি আপনি প্রথমবারের জন্য নিম ফেস প্যাকটি ব্যবহার করেন তবে এটি আপনার হাত বা পায়ের ত্বকে করুন।

অন্যান্য গুল্ম মিশ্রিত করে ত্বকে নিম ফেস প্যাক ব্যবহার করা উচিত।(আরও পড়ুন – শীতে ত্বকের যত্ন কীভাবে করবেন)

ID: 2384

Context: মলে রক্ত

Question: মলে রক্ত ​​কি?

Answer:

এটি মলের মধ্যে রক্তের উত্তরণ। মলের রক্ত ​​৩ ধরনের হতে পারে।

পায়খানায় মল চলে যাওয়ার পরে, চাপ দেওয়ার সময় বা মোছার সময় রক্ত ​​দেখা যেতে পারে। এটি ফ্রেশ ব্লাড নামে পরিচিত। রেক্টো-অ্যানাল অঞ্চলে রক্তপাত হলে তাজা রক্ত ​​সাধারণত দেখা যায়।

রক্তকে লাল বর্ণ হিসেবে দেখা নাও হতে পারে কিন্তু প্রকৃতপক্ষে মলের রং গাঢ় ও কালো হয়ে যেতে পারে। এটি মেলানা নামে পরিচিত। মেলেনা দেখা যায় যখন উপরের গ্যাস্ট্রোইনটেস্টাইনাল ট্র্যাক্টে রক্তপাত হয়। খাদ্যনালী (খাদ্য পাইপ), পাকস্থলী বা ডুওডেনাম।

মলের মধ্যে রক্ত ​​খালি চোখে দৃশ্যমান নাও হতে পারে তবে মাইক্রোস্কোপিক পরীক্ষায় দেখা যেতে পারে। এটি অকল্ট ব্লাড নামে পরিচিত। পুরো অন্ত্রের কোথাও ছোট ছোট রক্তপাত হলে দেখা যায়।

তাজা রক্ত ​​এবং মেলানা রোগীর দেখা যায় কিন্তু অকল্ট ব্লাড শুধুমাত্র ল্যাব দ্বারা মলের নমুনা পরীক্ষার পর দেখা যায়। এইগুলির যে কোনও একটির উপস্থিতি অবশ্যই কোনও ধরণের গ্যাস্ট্রোইনটেস্টাইনাল প্যাথলজির ইঙ্গিত দেয়। এটি উপেক্ষা না করা এবং অবশ্যই একজন ডাক্তারের সাথে পরামর্শ করা এবং আরও তদন্ত করা গুরুত্বপূর্ণ।

ID: 2385

Context: মলে রক্তের কারণ

Question: মলে রক্তের কারণ কি?

Answer:

মলের রক্ত ​​ইঙ্গিত করে যে গ্যাস্ট্রোইনটেস্টাইনাল ট্র্যাক্টের কিছু স্তরে রক্তক্ষরণ (রক্তপাত) রয়েছে। এর একাধিক কারণ রয়েছে যা শুধুমাত্র তদন্তের সাথে একটি পুঙ্খানুপুঙ্খ ক্লিনিকাল পরীক্ষার মাধ্যমে নিশ্চিত করা যেতে পারে। সম্ভাব্য কারণগুলো নিম্নরূপ-

1) পায়ূ ক্ষত:

ফিসারস- এটি মলদ্বারের আস্তরণে ছিঁড়ে যাওয়া

ফিস্টুলাস- এটি একটি অস্বাভাবিক ট্র্যাক্টের গঠন যা মলদ্বার বা মলদ্বারের সাথে যোগাযোগ করে

আলসারেশন- মলদ্বারের মিউকোসায় আলসার|

2) রেকটাল ক্ষত:

পাইলস- হেমোরয়েড নামেও পরিচিত, মলদ্বার এবং মলদ্বারের দেয়ালে শিরাগুলির প্রসারণ এবং রক্তপাত

পলিপস- মলদ্বারে ছোট অস্বাভাবিক বৃদ্ধি যা আঘাতের কারণে রক্তপাত হতে পারে

প্রক্টাইটিস (মলদ্বারের প্রদাহ)

ক্যান্সার

3) কোলনিক ক্ষত:

আমাশয়

ডাইভার্টিকুলা

প্রদাহজনক অন্ত্রের রোগ (ক্রোহন রোগ, আলসারেটিভ কোলাইটিস)

4) অন্যান্য:

রক্তপাতের ব্যাধি\

ID: 2386

Context: মলের মধ্যে রক্তের লক্ষণগুলি

Question: মলের মধ্যে রক্তের লক্ষণগুলি কী কী?

Answer:

মলের মধ্যে রক্তের উপস্থিতি একটি স্বাভাবিক আবিষ্কার নয় এবং অবিলম্বে একজন ডাক্তারকে জানাতে হবে। রোগী কমোডের দেয়ালে রক্ত বা পানির লাল রং দেখতে পারে। রোগীর অন্তর্বাসে রক্তের দাগ দেখা যেতে পারে। খুব গাঢ় এবং কালো রঙের মলগুলিও উল্লেখযোগ্য এবং এটি মেলানা নামে পরিচিত।

অন্যান্য সম্পর্কিত লক্ষণগুলি নিম্নরূপ-

মলদ্বার বা মলদ্বারে ব্যথা

মলত্যাগের সময় ব্যথা

(এ সম্পর্কে আরও জানুন- রেকটাল প্রোল্যাপস কী?)

পেটের বাধা

কোষ্ঠকাঠিন্য

রক্ত বমি করা (হেমেটেমেসিস)

মাথা ঘোরা

(বিস্তারিত জানুন- মাথা ঘোরা কি? মাথা ঘোরার ঘরোয়া প্রতিকার)

দুর্বলতা

হাইপোটেনশন (নিম্ন রক্তচাপ)

ধড়ফড়

অজ্ঞান হওয়া।

ব্যাখ্যাতীত ওজন হ্রাস

ID: 2387

Context: মলের রক্তের ঝুঁকির কারণগুলি

Question: মলের রক্তের ঝুঁকির কারণগুলি কী কী?

Answer:

যাদের পেটে রক্তপাত বা হেমোরয়েডের ইতিহাস রয়েছে

অজ্ঞাত বা নির্ণয় করা প্রদাহজনক অন্ত্রের রোগ

পেপটিক আলসারের ইতিহাস

উপরের গ্যাস্ট্রোইনটেস্টাইনাল ক্যান্সারের ঝুঁকি

(বিস্তারিত জানুন- পেটের ক্যান্সারের চিকিৎসা কি?)

নির্দিষ্ট ওষুধ গ্রহণ

মদ

ID: 2388

Context: মলের মধ্যে রক্ত নির্ণয়

Question: মলের মধ্যে রক্ত নির্ণয় কিভাবে?

Answer:

মলের রক্তের চিকিৎসা অন্তর্নিহিত কারণ অনুসারে পরিবর্তিত হয়। নিম্নলিখিত পরীক্ষাগুলির মাধ্যমে কারণগুলি নির্ণয় করা যেতে পারে:

প্রক্টোস্কোপি

প্রতি-মলদ্বার পরীক্ষা

কোলোনোস্কোপি, সিগমায়েডোস্কোপি, আপার জিআই এন্ডোস্কোপি

(বিস্তারিত জানুন- কোলনোস্কোপি কি?)

ক্যাপসুল এন্ডোস্কোপি

এন্টারোস্কোপি

বেরিয়াম অধ্যয়ন

মল পরীক্ষা

এমআরআই এবং সিটি স্ক্যান

ID: 2389

Context: মলের রক্তের চিকিৎসা

Question: মলের রক্তের চিকিৎসা কি?

Answer:

একবার কারণ সনাক্ত করা হলে নিম্নলিখিত চিকিৎসা পরিচালনা করা যেতে পারে:

ডায়েট এবং লাইফস্টাইল পরিবর্তনের সাথে মিলিত ওষুধ বা সার্জারি বা এন্ডোস্কোপিক ইনজেকশনের মাধ্যমে পাইলস কমানো।

(বিস্তারিত জানুন- পাইলস সার্জারি কি? কারণ, পরীক্ষা, চিকিৎসা, ঝুঁকি, খরচ)

পলিপ অপসারণ বা ক্যান্সারের বৃদ্ধি যা প্যাথলজিকাল পরীক্ষার জন্য পাঠানো হয়।

মেডিক্যাল থেরাপির মাধ্যমে পেপটিক বা ডুওডেনাল আলসারের চিকিৎসা।

পরজীবী সংক্রমণের জন্য অ্যান্টিহেলমিন্থিক ওষুধ।

প্রদাহ বিরোধী ওষুধ দিয়ে প্রদাহজনক অবস্থার চিকিৎসা।

রক্তাল্পতা লোহা সম্পূরক দ্বারা চিকিৎসা করা হয়; গুরুতর রক্তক্ষরণের ক্ষেত্রে, রক্ত সঞ্চালনের প্রয়োজন হতে পারে।

কোলন বা রেকটাল ক্যান্সারের ক্ষেত্রে সার্জারি, কেমোথেরাপি বা রেডিওথেরাপির প্রয়োজন হতে পারে

উপরে উল্লিখিত হিসাবে, মলের মধ্যে রক্তের একটি সাধারণ কারণ হল পাইলসের সমস্যা। রোগী মলদ্বারের চারপাশে চুলকানি, ফোলাভাব এবং ব্যথা, মলে রক্ত, তলপেটে পূর্ণতা অনুভব করা এবং বসে থাকলে ব্যথার মতো সমস্যায় ভোগেন। পাইলসের কারণে মারাত্মক রক্তক্ষরণ হতে পারে এবং গ্যাংগ্রেনাস হতে পারে, তাই পাইলস সার্জারির মাধ্যমে অপারেশন করতে হবে। ভারতের বিভিন্ন শহরে অনেক সূক্ষ্ম জেনারেল সার্জন আছে, এবং অত্যন্ত স্বনামধন্য হাসপাতাল যেখানে পাইলস সার্জারি উচ্চ সাফল্যের হারে করা হয়।

ID: 2390

Context: মল রক্ত প্রতিরোধ

Question: মল রক্ত প্রতিরোধ কি করে করবেন?

Answer:

মলের রক্ত ​​শুধুমাত্র কার্সিনোমা, পাইলস, ফিসার এবং ফিস্টুলাসের ঝুঁকি হ্রাস করে প্রতিরোধ করা যেতে পারে। এটি দ্বারা করা যেতে পারে-

বর্ধিত জল এবং ফাইবার গ্রহণ। জল মলকে আর্দ্র করে এবং ফাইবার মলের মধ্যে জল ধরে রাখতে সাহায্য করে যাতে তারা নরম এবং সহজে চলে যায়।

এটি মলত্যাগের সময় স্ট্রেনিং কমায়, এইভাবে পাইলস, ফিস্টুলা এবং ফিসার হওয়ার সম্ভাবনা অনেক কমে যায়।

(বিস্তারিত জানুন- পাইলস রোগীদের ডায়েট প্ল্যান)

ফাইবার কোলন পরিষ্কার করতে সাহায্য করে এবং কোষ্ঠকাঠিন্য প্রতিরোধ করে এইভাবে কার্সিনোমাস হওয়ার ঝুঁকি কমায়। ফাইবার সমৃদ্ধ খাবারের উদাহরণ হল সিরিয়াল, ব্রান, লেগুম, বীট এবং ফল। পিসিলিয়াম হাস্ক এবং লাকতুলস-এর মতো ফাইবার সাপ্লিমেন্টও ব্যবহার করা যেতে পারে।

ID: 2391

Context: চিয়া বীজের সুবিধা

Question: চিয়া বীজের সুবিধা কী কী ?

Answer:

চিয়া বীজে অনেক পুষ্টিকর উপাদান উপস্থিত । এটি স্বাস্থ্যের জন্য খুব উপকারী। এটি কে সুপার ফুড ও বলা হয় । এটি আকারে খুব ছোট। তবে গুণাবলী সহ সম্পূর্ণ। এতে প্রচুর পরিমাণে ফাইবার, প্রোটিন, ওমেগা -3 ফ্যাটি অ্যাসিড এবং বিভিন্ন মাইক্রোনিউট্রিয়েন্ট রয়েছে

ID: 2392

Context: চিয়া বীজ

Question: চিয়া বীজ কী?

Answer:

চিয়া বীজ সালভিয়া হিস্পানিকা বা চিয়া উদ্ভিদের অন্তর্ভুক্ত, যা পুদিনা পরিবারের একটি প্রজাতি। এই বীজটি, মধ্য আমেরিকার অনেক অংশে পাওয়া যায়। একে এক ধরণের ভেষজও বলা হয়। যা সাম্প্রতিক বছরগুলিতে খুব জনপ্রিয় হয়ে উঠেছে। চিয়া স্বাভাবিকভাবেই শস্যের শ্রেণিতে পড়ে। চিয়াতে রয়েছে অনেক পুষ্টিকর উপাদান। উদাহরণস্বরূপ, এক গ্লাস দুধের চেয়ে বেশি ক্যালসিয়াম, বাদামের চেয়ে বেশি ওমেগা -3 এবং অনেক অ্যান্টিঅক্সিডেন্ট উপস্থিত । যা ব্যক্তিকে প্রচুর পরিমাণে শক্তি সরবরাহ করে। চিয়া বীজ ওজন হ্রাস করার জন্য উপকারী কারণ এটির মধ্যে চর্বি শোষণ করার ক্ষমতা বেশি। যা ব্যক্তির শরীরে পানির অভাব পূরণে সহায়তা করে।

ID: 2393

Context: চিয়া বীজের পুষ্টিকর উপাদানগুলি

Question: চিয়া বীজের পুষ্টিকর উপাদানগুলি কী কী?

Answer:

চিয়া বীজের একটি পুষ্টিকর উপাদান রয়েছে। এতে রয়েছে শর্করা, ফাইবার, ম্যাঙ্গানিজ, ফসফরাস, ক্যালসিয়াম, দস্তা, তামা, পটাশিয়াম এবং চিয়া বীজ, প্রয়োজনীয় ফ্যাটি অ্যাসিড, আলফা-লিনোলেনিক এবং লিনোলিক অ্যাসিড, পাশাপাশি ভিটামিন এ , বি, ই, ডি এবং সালফার, আয়রন, আয়োডিন, ম্যাগনেসিয়াম, নিয়াসিন এবং থায়ামিন সহ খনিজ এবং অ্যান্টিঅক্সিডেন্টগুলির একটি প্রধান উৎস। যা স্বাস্থ্যের জন্য উপকারী।

ID: 2394

Context: চিয়া বীজের সুবিধা

Question: চিয়া বীজের সুবিধা কী কী?

Answer:

চিয়া বীজের অনেকগুলি স্বাস্থ্য উপকারিতা রয়েছে।

ওজন হ্রাস – যদি কোনও ব্যক্তি ওজন হ্রাস করার চেষ্টা করে। তবে তার জন্য চিয়া বীজ খুব উপকারী। এতে প্রচুর পরিমাণে ফাইবার রয়েছে। যা ফ্যাট কমাতে সহায়তা করে। শরীরের ওজন কমতে শুরু করে।

হাড় শক্তিশালীকরণ – হাড়কে শক্তিশালী করার জন্য ক্যালসিয়ামের প্রয়োজন। চিয়া বীজে প্রচুর পরিমাণে ক্যালসিয়াম এবং ম্যাগনেসিয়াম থাকে। যা হাড়কে মজবুত করতে সহায়তা করে। হাড়কে শক্তিশালী করার কারণে হাড়ের সমস্যা হয়না।

শক্তি বাড়ানোর জন্য – চিয়াতে প্রাকৃতিকভাবে অনেক খনিজ এবং ভিটামিন থাকে। যা শরীরে শক্তি জোগায়। শরীরে আরও বেশি কাজ করার ক্ষমতা থাকা শুরু করে। (আরও পড়ুন – বিপাক কী?)

ডায়াবেটিসে – চিয়াতে এমন অনেক পুষ্টি রয়েছে। যা ডায়াবেটিস রোগীদের জন্য গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। এটি রক্তে শর্করার মাত্রা হ্রাস করতে সহায়তা করে। যা ইনসুলিন তৈরিতে সহায়তা করে। শর্করা নিয়ন্ত্রণে থাকে।

ID: 2395

Context: চিয়া বীজের অসুবিধা

Question: চিয়া বীজের অসুবিধা কী?

Answer:

চিয়া বীজের অনেকগুলি স্বাস্থ্য উপকারিতা রয়েছে। তবে এর অনেক অসুবিধা থাকলেও অসুবিধাও রয়েছে এবং সেটার সম্পর্কে জানা খুব গুরুত্বপূর্ণ।

কিছু বিজ্ঞানী, চিয়া বীজ সম্পর্কে বলেছেন যে তাঁর দ্বারা পরিচালিত পরীক্ষায় দেখা গেছে যে এর বীজগুলি প্রোটেস্ট ক্যান্সার এবং স্তন ক্যান্সারকে বাড়িয়ে তুলতে পারে। সুতরাং এটি সীমিত পরিমাণে ব্যবহার করা উচিত।

চিয়া বীজ বেশি খাওয়ার ফলে পেটের সমস্যা হতে পারে। কারণ চিয়া বীজের মধ্যে প্রচুর পরিমাণে ফাইবার থাকে। তাই অল্প পরিমাণে চিয়া সেবন করুন।যদি চিয়া বীজ গ্রহণ করে এক ধরণের স্বাস্থ্য সমস্যা সৃষ্টি হচ্ছে তাহলে সঙ্গে সঙ্গে এটি সেবন করা বন্ধ করুন।

ID: 2396

Context: অ্যালোভেরার লাভ ও ক্ষতি

Question: অ্যালোভেরার লাভ ও ক্ষতি কী কী ?

Answer:

অ্যালোভেরা এক ধরণের আয়ুর্বেদিক ঔষুধ। এটি অনেক রোগ নিরাময়ে করতে সক্ষম । অ্যালোভেরা এর গুণাবলীর জন্য খুব জনপ্রিয়। অ্যালোভেরা ভারতের সাথে বহু দেশে এলোভেরা হিসাবে ব্যবহৃত হয়। অ্যালোভেরা একটি রসালো উদ্ভিদ। এর পাতা কেটে দেওয়া এটিকে জেল বের করা হয়। এটি অনেক মারাত্মক রোগ নিরাময়ের জন্য ব্যবহৃত হয়। তা ছাড়া এটি কুষ্ঠরোগও নিরাময় করতে সক্ষম

ID: 2397

Context: অ্যালোভেরার পুষ্টিকর উপাদান

Question: অ্যালোভেরার পুষ্টিকর উপাদান এবং খনিজ কী?

Answer:

অ্যালোভেরায় ভিটামিন এ (বিটা-ক্যারোটিন), সি, ই, ফলিক অ্যাসিড এবং কোলিন সহ অল্প পরিমাণে ভিটামিন এবং খনিজ থাকে, এবং অ্যান্টিঅক্সিডেন্ট থাকে যা মুক্ত র‌্যাডিক্যাল এর বিরুদ্ধে লড়াইয়ে সহায়তা করে। এটি শরীরের জন্য উপকারী।

ID: 2398

Context: অ্যালোভেরার লাভ

Question: অ্যালোভেরার লাভ কী?

Answer:

অ্যালোভেরার নিম্নলিখিত সুবিধা থাকতে পারে।

পিম্পলস দূর করতে – ত্বকে অতিরিক্ত তেল থাকার কারণে ব্রণর সমস্যা দেখা দেয়। ব্রণর সমস্যা কাটিয়ে উঠতে অ্যালোভেরা জেল দিনে দুবার ব্যবহার করা উচিত। এটি করে, পিম্পল ধীরে ধীরে অদৃশ্য হতে শুরু করে। (আরও পড়ুন – ব্রণর সমস্যার কারণ কী)

ত্বকের জন্য – অ্যালোভেরা জেল ত্বক সম্পর্কিত বিভিন্ন সমস্যার জন্য খুব উপকারী। অ্যালোভেরা জেল ত্বক কে হাইড্রেটেড এবং পুষ্টি সরবরাহ করে। এটি ত্বকের পোড়া, ক্ষত, দাগ দূর করতে সহায়তা করে। এগুলি ছাড়াও এটি ত্বকের সংক্রমণও নিরাময় করে।

কোষ্ঠকাঠিন্যের জন্য – কোষ্ঠকাঠিন্য এমন একটি সমস্যা যা নিয়ে সবাই চিন্তিত। এই সমস্যাগুলি কাটিয়ে ওঠার জন্য অ্যালোভেরার রস পান করা উচিত, এটি ব্যক্তিকে মল পাস করা এবং কোষ্ঠকাঠিন্যের সমস্যা থেকে মুক্তি দেয়। আপনার কোষ্ঠকাঠিন্যের সমস্যা থাকলে অ্যালোভেরার রস পান করুন এবং কোষ্ঠকাঠিন্য থেকে মুক্তি পান।

ওজন হ্রাসে – আপনার বর্ধিত ওজন কমাতে অ্যালোভেরার রস প্রতিদিন খাওয়া উচিত। অ্যালোভেরার জুসে এমন কিছু খনিজ ও অ্যান্টিঅক্সিডেন্ট রয়েছে যা ফ্যাট কমায়। এলোভেরা ওজন নিয়ন্ত্রণে রাখে।

উচ্চ কোলেস্টেরল কমাতে – শরীরে কোলেস্টেরল থাকা প্রয়োজন। তবে বেশি পরিমাণে কোলেস্টেরল থাকার কারণে অনেক ধরণের সমস্যা দেখা দেয়। খারাপ কোলেস্টেরল হার্টের ক্ষতি করে। অ্যালোভেরা বেশি পরিমাণে ব্যবহার করলে কোলেস্টেরলের মাত্রা বাড়ে।

ID: 2399

Context: অ্যালোভেরার অসুবিধাগুলি

Question: অ্যালোভেরার অসুবিধাগুলি কী কী?

Answer:

অ্যালোভেরার অনেক সুবিধা রয়েছে। তবে এই সুবিধার পাশাপাশি কিছু অসুবিধাও রয়েছে।

অ্যালোভেরা লাগানোর পরামর্শ দেওয়া হয়। যদি কোনও ব্যক্তি অ্যালোভেরার রস পান করতে চান তবে প্রথমে চিকিৎসকের সাথে পরামর্শ করুন কারণ এর রসগুলিও ক্ষতিকারক হতে পারে।

গর্ভবতী মহিলাদের এবং স্তন্যদানকারী মহিলাদের অ্যালোভেরার রস ব্যবহার এড়ানো উচিত। কারণ এটি তাদের স্বাস্থ্যের জন্য ক্ষতিকারক হতে পারে।

অ্যালোভেরা বেশি পরিমাণে খাওয়া উচিত নয়, এটি রক্তের বৃদ্ধি করে । তবে পাশাপাশি এটি কিডনির ক্ষতি করে।

অ্যালোভেরার রস বেশি পরিমাণে খাবেন না, কেবলমাত্র এটি ডোজ হিসাবে গ্রহণ করুন, অন্যথায় ডায়রিয়া হতে পারে। (আরও পড়ুন – ডায়রিয়ার কারণ কী)

অ্যালোভেরা ব্যবহারের কারণে যদি কোনও স্বাস্থ্য অনিয়ম হয় তবে তাৎক্ষণিকভাবে এর ব্যবহার সীমাবদ্ধ করুন এবং আপনার নিকটস্থ সাথে যোগাযোগ করুন।

ID: 2400

Context: থাইরয়েড

Question: থাইরয়েড কি?

Answer:

থাইরয়েড হল একটি প্রজাপতির আকৃতির গ্রন্থি যা ঘাড়ের শ্বাসনালীর (বায়ুপ্রবাহ) সামনে থাকে। থাইরয়েডের কাজ হল হরমোন সিক্রেট করা যা শরীরের কাজকে পরিবর্তন করে এবং নিয়ন্ত্রণ করে। থাইরক্সিন (T4) এবং Triiodothyronine (T3) হল থাইরয়েড হরমোন। এই হরমোনগুলি থাইরয়েড গ্রন্থি দ্বারা সরাসরি রক্তে সিক্রেটেড হয় এবং শরীরের বিভিন্ন অঙ্গে ভ্রমণ করে।

ID: 2401

Context: থাইরয়েড ব্যাধি

Question: থাইরয়েড ব্যাধি কি?

Answer:

থাইরয়েড হরমোনের মাত্রায় অস্বাভাবিক কাজকর্ম বা কোনো ধরনের অস্থিরতা থাইরয়েড ব্যাধি নির্দেশ করে। সূচক হিসাবে ব্যবহৃত প্রধান হরমোনগুলি হল:

থাইরয়েড স্টিমুলেটিং হরমোন (টিএসএইচ): এটি মস্তিষ্কের পিটুইটারি গ্রন্থি (মাস্টার গ্ল্যান্ড) দ্বারা সিক্রেটেড হরমোন। থাইরয়েড হরমোন T3 এবং T4 এর উৎপাদন TSH দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়। T3 এবং T4 ঘুরে TSH এর ক্ষরণ কমায়।

থাইরক্সিন (টি 4): এটি থাইরয়েড দ্বারা সিক্রেট হরমোনগুলির মধ্যে একটি যা বেসাল বিপাকীয় হার এবং প্রোটিন সংশ্লেষণ নিয়ন্ত্রণ করে।

ট্রাইওডোথাইরোনিন (টি 3): এটি টি 4 এর মতো একই কাজ করে কিন্তু এটি আরও শক্তিশালী এবং কম পরিমাণে সিক্রেটেড হয়।

ID: 2402

Context: থাইরয়েড রোগের প্রকার

Question: থাইরয়েড রোগের প্রকার কী?

Answer:

থাইরয়েড ব্যাধিগুলি মূলত গলগণ্ড হিসাবে পরিচিত বিস্তৃত শব্দটির আওতায় থাকে। থাইরয়েড গ্রন্থির বর্ধনকে বলা হয় গলগণ্ড। এটি নিম্নরূপ শ্রেণীবদ্ধ করা হয়েছে:

সরল (অ-বিষাক্ত) গলগণ্ড: এটি থাইরয়েড গ্রন্থির একটি সৌম্য বর্ধন যা গ্রন্থির কার্যক্রমে কোন পরিবর্তন করে না, অর্থাৎ; এটি একটি ইউথাইরয়েড অবস্থায় আছে (সাধারণত কাজ করে)। সাধারণ গলগণ্ডের প্রকারভেদ:

ডিফিউজ হাইপারপ্লাস্টিক (সবচেয়ে সাধারণ)

কলয়েড গলগণ্ড

মাল্টিনোডুলার গলগণ্ড

বিষাক্ত গলগণ্ড: এটি T3 এবং T4 এর বর্ধিত সিক্রেটেড সাথে যুক্ত। বড় হতে পারে বা নাও থাকতে পারে। রোগী হাইপারথাইরয়েড অবস্থায় আছে (স্বাভাবিক কাজকর্মের উপরে)। ব্যক্তি হাইপারথাইরয়েডিজমের লক্ষণ দেখায়।

কবর রোগ। (বিস্তারিত জানুন- কবরের রোগ কী?)

প্লামারের রোগ।

বিষাক্ত নির্জন নোডুল।

নিওপ্লাস্টিক গলগণ্ড: এটি ক্যান্সার বৃদ্ধির কারণে ঘটে যা সৌম্য বা ম্যালিগন্যান্ট হতে পারে। (বিস্তারিত জানুন- গয়টার কি?)

সৌম্য।

ম্যালিগন্যান্ট- কার্সিনোমা থাইরয়েড। (এ বিষয়ে আরও জানুন: থাইরয়েড ক্যান্সারের কারণ)

থাইরয়েডাইটিস: একটি অটোইমিউন প্রক্রিয়ার কারণে থাইরয়েড প্রদাহ যা থাইরয়েড গ্রন্থির হাইপার বা হাইপো কাজ করে। (আরও পড়ুন: হাইপোথাইরয়েডিজম কি?)

হাশিমোটোর থাইরয়েডাইটিস

ডি কোয়ারভেইনের থাইরয়েডাইটিস

রিডেলের থাইরয়েডাইটিস

ID: 2403

Context: থাইরয়েড রোগের কারণ

Question: থাইরয়েড রোগের কারণ কী?

Answer:

থাইরয়েড রোগ নিম্নলিখিত কারণে হতে পারে:

আয়োডিনের অভাব (সবচেয়ে সাধারণ)

গুইট্রোজেন ব্যবহার: এগুলি রাসায়নিক যা থাইরয়েড হরমোনের সংশ্লেষণকে বাধা দেয়

অটোইমিউন: শরীর অ্যান্টিবডি তৈরি করে যা থাইরয়েডকে অত্যধিক উদ্দীপিত বা বাধা দেয় যা যথাক্রমে হাইপারথাইরয়েডিজম বা হাইপোথাইরয়েডিজম সৃষ্টি করে।

বিকিরণ এক্সপোজার

দীর্ঘস্থায়ী সহজ গলগণ্ড: ক্যান্সারে রূপান্তরিত হতে পারে

জেনেটিক সংবেদনশীলতা

বিরল কারণ: ব্যাকটেরিয়া সংক্রমণের কারণে বা অন্যান্য রোগের গৌণ |

ID: 2404

Context: থাইরয়েড রোগের লক্ষণ

Question: থাইরয়েড রোগের লক্ষণ কি?

Answer:

থাইরয়েড রোগের নিম্নলিখিত লক্ষণ থাকতে পারে:

ঘাড়ের সামনে ফুলে যাওয়া। ব্যথাহীন

স্পন্দন (আপনার নিজের হৃদস্পন্দন শুনতে পাওয়া)

কার্ডিয়াক তালের অনিয়ম

ট্যাকিকার্ডিয়া (উচ্চ হার্ট রেট)

এক্সোফথালমোস (চোখের পলকের প্রোট্রুশন)

দুশ্চিন্তা

অনিদ্রা

বিষণ্ণতা ।

পরিবর্তিত মাসিক চক্র।

বন্ধ্যাত্ব (আরও পড়ুন: বন্ধ্যাত্বের ঝুঁকির কারণ)

বেসাল বিপাকীয় হার বৃদ্ধি বা হ্রাস ওজন হ্রাস বা ওজন বৃদ্ধি।

তাপমাত্রার পরিবর্তনে অসহিষ্ণুতা।

সংকোচনের কারণে- ডিসপোনিয়া (শ্বাসকষ্ট), ডিসফ্যাগিয়া (গিলতে অসুবিধা), কণ্ঠস্বরের তীব্রতা, অজ্ঞান আক্রমণ।

ID: 2405

Context: থাইরয়েড ডিজঅর্ডারের ক্ষেত্রে তদন্ত

Question: থাইরয়েড ডিজঅর্ডারের ক্ষেত্রে কী কী তদন্ত করা হয়?

Answer:

যে কোন থাইরয়েড ব্যাধি নির্ণয়ের জন্য মৌলিক তদন্ত থাইরয়েড প্রোফাইল নামে পরিচিত শব্দটির অধীনে আসে। নিম্নলিখিত পরীক্ষাগুলি থাইরয়েড প্রোফাইলে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে:

থাইরয়েড ফাংশন পরীক্ষা: সিরাম টি 3, টি 4, টিএসএইচ

থাইরয়েডের আল্ট্রাসনোগ্রাফি (ইউএসজি)

থাইরয়েড সিটি স্ক্যান বা এমআরআই

সিরাম এলএটিএস: দীর্ঘস্থায়ী থাইরয়েড স্টিমুলেটর (এলএটিএস) অ্যান্টিবডিগুলি কবর রোগের ক্ষেত্রে দেখা যায়

সিরাম ক্যালসিটোনিন: থাইরয়েডের কার্সিনোমাতে বাড়তে পারে

FNAC: ফাইন নিডেল অ্যাসপিরেশন সাইটোলজি কোষের মাইক্রোস্কোপিক মর্ফোলজি দেখার জন্য করা হয় যা ক্যান্সারের পাশাপাশি ক্যান্সারের ধরন সনাক্ত করতে সাহায্য করে।

ঘাড়ের এক্স-রে: বর্ধিত বিস্তার এবং বর্ধিত থাইরয়েডের প্রভাব পার্শ্ববর্তী কাঠামোর উপর। ক্যালসিফিকেশনের উপস্থিতি (সিএ থাইরয়েডে দেখা যায়)

বুকের এক্স-রে: ক্যান্সারের বিস্তার বা বুকের গহ্বরে বর্ধিত থাইরয়েডের প্রসারের জন্য পরীক্ষা করা হয় ।

পরোক্ষ ল্যারিঞ্জোস্কোপি: ভোকাল কর্ডের নড়াচড়া কল্পনা করা (স্নায়ু সংকোচনের ক্ষেত্রে আন্দোলন কম হওয়া)।

ID: 2406

Context: থাইরয়েড রোগের চিকিৎসা

Question: থাইরয়েড রোগের চিকিৎসা কী?

Answer:

থাইরয়েড রোগের চিকিৎসা নির্ভর করে রোগী যে ধরনের রোগে ভুগছে তার উপর। থাইরয়েড রোগের চিকিৎসার প্রধান লাইন হল চিকিৎসা, অস্ত্রোপচার হরমোন এবং বিকিরণ।

সহজ (অ-বিষাক্ত) গলগণ্ড:

চিকিৎসা: আয়োডিন পরিপূরক

সার্জিক্যাল: সাবটোটাল থাইরয়েডেক্টমি, যেখানে থাইরয়েডের লোব এবং ইসথমাস উভয়ই সরানো হয় তবে শ্বাসনালী এবং খাদ্যনালীর সংযোগস্থলের কিছু অংশ সংরক্ষিত থাকে।

বিষাক্ত গলগণ্ড:

চিকিৎসা: অ্যান্টিথাইরয়েড ওষুধ যা থাইরয়েড হরমোনের উৎপাদন কমায়।

বিকিরণ: তেজস্ক্রিয় আয়োডিন ট্যাবলেট, ইউথাইরয়েড অবস্থা অর্জনের জন্য থাইরয়েড টিস্যু ধ্বংস করতে সাহায্য করে।

অস্ত্রোপচার: মেডিকেল লাইন এবং বিকিরণ থেরাপি ব্যর্থ হলে এটি সাধারণত শেষ বিকল্প। হয় টোটাল থাইরয়েডেকটমি বা সাবটোটাল থাইরয়েডেক্টমি করা হয়।

থাইরয়েডের নিওপ্লাজম:

সার্জিক্যাল: সেন্ট্রাল নোড কম্পার্টমেন্ট নেক ডিসেকশন সহ মোট থাইরয়েডেক্টমি। (ঘাড়ের লিম্ফ নোডগুলি সরানো হয়েছে)

হরমোন: উচ্চ মাত্রায় থাইরক্সিন টিএসএইচ সিক্রেট দমন করে আকারে বৃদ্ধি রোধ করে।

বিকিরণ: তেজস্ক্রিয় আয়োডিন। সেকেন্ডারিদের জন্য বিকিরণ থেরাপি।

কেমোথেরাপি।

থাইরয়েডাইটিস:

হরমোন: এল-থাইরক্সিন পরিপূরক হাইপোথাইরয়েডিজমের চিকিৎসার জন্য।

চিকিৎসা: প্রদাহের চিকিৎসা এবং অটোইমিউন অ্যান্টিবডি কমাতে স্টেরয়েড থেরাপি।

সার্জিক্যাল: সাবটোটাল বা হেমি থাইরয়েডেক্টমি করা হয় যদি থাইরয়েড ব্যাপকভাবে বৃদ্ধি পায় বা পার্শ্ববর্তী কাঠামোর সংকোচনের কারণ হয় এবং রোগীর অস্বস্তি সৃষ্টি করে।

ID: 2407

Context: থাইরয়েড রোগে খাবার

Question: থাইরয়েড রোগে কোন খাবার খাওয়া উচিত এবং এড়ানো উচিত?

Answer:

যখন কোন থাইরয়েড ব্যাধি আসে তখন কোন খাদ্যের সীমাবদ্ধতা নেই। সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ দিক হল পর্যাপ্ত ব্যায়ামের পাশাপাশি পুষ্টিকর খাবারের সাথে সুষম খাদ্য গ্রহণ করা। এটি চিকিৎসকের দেওয়া চিকিৎসার পরিপূরক এবং চিকিৎসার প্রতিস্থাপন হিসেবে ব্যবহার করা যাবে না। এটি থাইরয়েড ডিসঅর্ডারের কারণে যে আরও সমস্যা দেখা দিতে পারে তা প্রতিরোধ করতে সাহায্য করে। যেসব খাবার থাইরয়েড রোগে আক্রান্ত হতে পারে সেগুলোকেই এড়িয়ে চলতে পারেন। গয়েট্রোজেনযুক্ত খাবার। গাইট্রোজেনযুক্ত খাবারগুলি হল:

সয়া খাবার- টফু, সয়া দুধ, সয়াবিন ইত্যাদি

কাসাভা

মিল্টস

ক্রুসিফেরাস সবজি- বাঁধাকপি, ব্রকলি, ফুলকপি ইত্যাদি

এই খাবারগুলি শুধুমাত্র বিপুল পরিমাণে ক্ষতিকারক এবং অন্যথায় খাওয়া নিরাপদ।

ID: 2408

Context: থাইরয়েড বৃদ্ধির সাথে সম্পর্কিত সমস্যাগুলি

Question: থাইরয়েড বৃদ্ধির সাথে সম্পর্কিত সমস্যাগুলি কী কী?

Answer:

থাইরয়েড রোগের সাথে সম্পর্কিত সমস্যাগুলি উপসর্গগুলিতে উপরে ব্যাখ্যা করা হয়েছে। বিশেষ করে থাইরয়েড বৃদ্ধির কারণে যে সমস্যাগুলি দেখা দেয় তা হল:

ডিসপোনিয়া (শ্বাসকষ্ট) বাতাসের পাইপের সংকোচনের কারণে

খাদ্যনালীর সংকোচনের কারণে ডিসফ্যাগিয়া (গিলতে অসুবিধা)

ল্যারিঞ্জিয়াল নার্ভের সংকোচনের কারণে কণ্ঠস্বরের তীব্রতা (ভোকাল কর্ড সরবরাহকারী স্নায়ু)

সাধারণ ক্যারোটিড ধমনীর সংকোচনের কারণে অজ্ঞান হয়ে যাওয়া আক্রমণ যা মস্তিষ্কে রক্ত ​​বহন করে

ID: 2409

Context: থাইরয়েড রোগ

Question: থাইরয়েড রোগ কি অসাধ্য?

Answer:

না, যেকোন রোগের মতো; থাইরয়েডের চিকিৎসাও সম্ভব। থাইরয়েডের চিকিৎসা ওষুধ, সার্জারি ইত্যাদির মাধ্যমে করা যেতে পারে যদি কোন থাইরয়েড রোগের সন্দেহ থাকে তাহলে অবিলম্বে একজন ডাক্তারের সাথে পরামর্শ করা জরুরী।

ID: 2410

Context: থাইরয়েডের ওষুধ খাওয়ার সময়

Question: থাইরয়েডের ওষুধ কখন খাওয়া উচিত?

Answer:

থাইরয়েডের জন্য ট্যাবলেট সকালে খালি পেটে নেওয়া যেতে পারে। এর বাইরে, কিছু লোক খাবারের 50 মিনিট আগে পিলটি খেতে পারে।

ID: 2411

Context: থাইরয়েড হরমোনের স্বাভাবিক মাত্রা

Question: থাইরয়েড হরমোনের স্বাভাবিক মাত্রা কি?

Answer:

TSH- 0 থেকে 5 IU/ml (প্রতি মিলি আন্তর্জাতিক ইউনিট)

T3- 1.2 থেকে 3.1 nmol/l (ন্যানোমোল প্রতি লিটার)

T4- 55 থেকে 150 nmol/l

বিনামূল্যে T3- 3 থেকে 9 nmol/l

বিনামূল্যে T4- 8 থেকে 26 nmol/l

(দ্রষ্টব্য: সাধারণ পরিসীমা ল্যাব থেকে ল্যাবে পরিবর্তিত হয়)

ID: 2412

Context: খালি পেটে থাইরয়েড পরীক্ষা

Question: খালি পেটে থাইরয়েড পরীক্ষা করা হয়?

Answer:

না, থাইরয়েড ফাংশন পরীক্ষার জন্য একজনকে ফাস্টিং করতে হবে না।

ID: 2413

Context: থাইরয়েড রোগ প্রতিরোধ

Question: থাইরয়েড রোগকে মূল থেকে দূর করতে কি করতে হবে?

Answer:

থাইরয়েডকে মূল থেকে নির্মূল করতে আপনার ডাক্তারের দেওয়া নির্দেশাবলী অনুসরণ করুন। এর বাইরেও কিছু ঘরোয়া প্রতিকারের ব্যবহার থাইরয়েডকে মূল থেকে নির্মূল করতে সাহায্য করতে পারে। একটি সুষম খাদ্য বজায় রাখা এবং নিয়মিত ব্যায়াম করার সাথে ডাক্তারের চিকিৎসার পরিপূরক গুরুত্বপূর্ণ। ডাক্তারের পরামর্শ ছাড়া অন্য কোনো ঘরোয়া প্রতিকার বা ওষুধ চেষ্টা করবেন না।

ID: 2414

Context: থাইরয়েড রোগ এ গলা ব্যথা

Question: থাইরয়েড রোগ কি গলা ব্যথা করে?

Answer:

হ্যাঁ, থাইরয়েড রোগ থাইরয়েড গ্রন্থিতে ব্যাঘাতের কারণে হয়। এ ছাড়া; এটি হরমোনের ভারসাম্যহীনতার কারণে হতে পারে, গলা ব্যথা, ফোলা এবং ভারী হওয়ার মতো লক্ষণ দেখা দিতে পারে।

ID: 2415

Context: থাইরয়েড ক্যান্সার

Question: কিভাবে থাইরয়েড ক্যান্সার হয়?

Answer:

থাইরয়েড ক্যান্সারের সঠিক কারণ জানা নেই, কিন্তু একটি বর্ধিত থাইরয়েড গ্রন্থি ক্যান্সারের ঝুঁকি বাড়িয়ে তুলতে পারে। থাইরয়েড গ্রন্থি হৃদস্পন্দন, ওজন এবং হরমোন নিয়ন্ত্রণে সাহায্য করে। থাইরয়েড ক্যান্সার হয় যখন কোষগুলি পরিবর্তন হয়। অস্বাভাবিক কোষগুলি টিউমার তৈরি করতে শুরু করে এবং অস্বাভাবিক কোষগুলি আশেপাশের টিস্যুকে আক্রমণ করতে পারে। এখান থেকে এটি শরীরের অন্যান্য অংশে ছড়িয়ে পড়তে শুরু করে। থাইরয়েড ক্যান্সার টিউমারে পাওয়া কোষের উপর ভিত্তি করে শ্রেণীবদ্ধ করা যায়।

ID: 2416

Context: থাইরয়েড নিরাময়

Question: কত দিনে থাইরয়েড সেরে যায়?

Answer:

সঠিক উপায়ে থাইরয়েডের চিকিৎসা করিয়ে রোগী কয়েক মাসের মধ্যে তা থেকে দ্রুত মুক্তি পেতে পারে। থাইরয়েডের চিকিৎসা রোগীর অবস্থার উপর নির্ভর করে, কারণ কিছু লোককে প্রতিদিন ওষুধ খাওয়ার পরামর্শ দেওয়া হয়। কিছু লোক থাইরয়েড থেকে পুনরুদ্ধার করতে সাহায্য করার জন্য অন্যান্য পরীক্ষার ভিত্তিতে চিকিৎসা করা হয়।

ID: 2417

Context: থাইরয়েড পরীক্ষার জন্য খরচ

Question: থাইরয়েড পরীক্ষার জন্য কত খরচ হয়?

Answer:

থাইরয়েড পরীক্ষার খরচ, সাধারণত টিএসএইচ, টি 3 এবং টি 4 প্যারামিটার নিয়ে গঠিত হয় INR 300- INR 500, কিন্তু এটি কিছু জায়গায় এর চেয়ে কম বা বেশি হতে পারে।

ID: 2418

Context: গর্ভাবস্থায় থাইরয়েড

Question: গর্ভাবস্থায় থাইরয়েড হলে কি হবে?

Answer:

গর্ভাবস্থায় থাইরয়েডের সমস্যা থাকলে অনেক ঝুঁকি থাকে। অস্বাভাবিক থাইরয়েড গ্রন্থির হরমোনের কারণে শিশুর মানসিক ও শারীরিক বিকাশে সমস্যা দেখা দেয়। এ ছাড়া, শিশুর অকাল জন্ম হতে পারে অথবা মায়ের ঘন ঘন গর্ভপাত হতে পারে। সুতরাং, থাইরয়েড পরীক্ষা সাধারণত গর্ভধারণের আগে এবং গর্ভাবস্থায় করা হয়। যদি গর্ভাবস্থায় কেউ থাইরয়েড রোগে আক্রান্ত হয় তবে এটি সাধারণত খুব বড় সমস্যা নয়। অনেক ওষুধ আছে যা গর্ভাবস্থায় ব্যবহারের জন্য নিরাপদ। যদি আরও সুনির্দিষ্ট চিকিৎসার প্রয়োজন হয় তবে প্রসবের আগ পর্যন্ত কেবল নিরাপদ ওষুধ দেওয়া হয়, তার পরে মাকে অস্ত্রোপচার বা রেডিওথেরাপির জন্য নেওয়া যেতে পারে।

ID: 2419

Context: মাল্টিপল স্ক্লেরোসিস (এমএস)

Question: মাল্টিপল স্ক্লেরোসিস (এমএস) কি?

Answer:

এমএস হল একটা দীর্ঘস্থায়ী রোগ যেটা মস্তিষ্ক, স্পাইনাল কর্ড, এবং চোখের স্নায়ুকে প্রভাবিত করে। যেহেতু এই অসুখটি শরীরের রোগ প্রতিরোধ ব্যবস্থা দ্বারা নিজের টিস্যুকেই আক্রান্ত করে তাই এমএসকে অটোইমিউন অসুখও বলা হয়। এই অবস্থায়, শরীর মাইলিনে ক্ষতি সৃষ্টি করে - যেটা হলো একটা চর্বিযুক্ত পদার্থ যা মস্তিষ্ক এবং স্পাইনাল কর্ডে নার্ভ ফাইবার্সকে ঘিরে থাকে। এই হানি অধিকতর হওয়ার ফলে স্নায়ুতন্ত্রের মধ্যে বার্তা সরবরাহ পরিবর্তীত বা বন্ধ হয়ে যায়।

ID: 2420

Context: মাল্টিপল স্ক্লেরোসিস (এমএস) এর প্রধান লক্ষণ ও উপসর্গগুলি

Question: মাল্টিপল স্ক্লেরোসিস (এমএস) এর প্রধান লক্ষণ ও উপসর্গগুলি কি কি?

Answer:

উপসর্গগুলি নিম্নে প্রথম, দ্বিতীয় এবং তৃতীয় পর্যায়ে শ্রেণীবদ্ধ রয়েছে:প্রথম পর্যায়ভুক্ত উপসর্গসাধারণঅসাড়তা ও ঝনঝন করা।

চুলকানি।

জ্বলা।

হাঁটতে অসুবিধা (ক্লান্তি, দুর্বলতা, মাংসপেশীর সমস্যা, ভারসাম্যের অভাব বা কাঁপার কারণে)।

দেখতে অসুবিধা।

কোষ্ঠকাঠিন্য এবং ব্লাডারের অকার্যকারীতা।

মাথা ঘোরা।

যৌন সমস্যা।বিরল উপসর্গগিলতে অসুবিধা।

কথা বলাতে সমস্যা।

শ্বাস নিতে অসুবিধা।

কানে কম শোনা।

খিঁচুনি।

মাথাব্যথা।দ্বিতীয় পর্যায়ভুক্ত উপসর্গইউরিনারী ট্র‍্যাক্টে সংক্রমণ।

শরীরের নিষ্কৃয়তা।

গতিশীলতা হারানো।তৃতীয় পর্যায়ভুক্ত উপসর্গ।সামাজিক দুশ্চিন্তা।

বৃত্তিমূলক জটিলতা।

শিখতে অসুবিধা।

হতাশা।

ID: 2421

Context: মাল্টিপল স্ক্লেরোসিস (এমএস) এর প্রধান কারণগুলি

Question: মাল্টিপল স্ক্লেরোসিস (এমএস) এর প্রধান কারণগুলি কি কি?

Answer:

এমএসের কারণ অজানা। যাইহোক, পরিবেশগত এবং জেনেটিক বিষয়গুলি এই অসুখের জন্য দায়ী হতে পারে।এমএসের জন্য দায়ী ঝুঁকির বিষয়গুলি নিম্নে উল্লেখ করা হল:15 এবং 60 বছরের মানুষেরা সাধারণত আক্রান্ত হয়।

পুরুষদের চেয়ে মহিলাদের বেশী এমএস হতে দেখা যায়।

এমএস এর পারিবারিক ইতিহাস।

ভাইরাস যেমন এপস্টাইন-বার ভাইরাস এমএসে সাথে যুক্ত।

থাইরয়েড, ডায়াবেটিস বা ইনফ্ল্যামাটরি বাওয়েল ডিজিজে ভোগা ব্যক্তিদের আক্রান্ত হওয়ার সম্ভাবনা সবথেকে বেশি।

রক্তে ভিটামিন ডি এর মাত্রা কম হওয়া।

নিরক্ষরেখা থেকে দূরে থাকা।

বেশী ওজন।

ধূমপান।

ID: 2422

Context: মাল্টিপল স্ক্লেরোসিস (এমএস ] নির্ণয় ও চিকিৎসা

Question: মাল্টিপল স্ক্লেরোসিস (এমএস ] কিভাবে নির্ণয় ও চিকিৎসা করা হয়?

Answer:

যেহেতু এমএসের উপসর্গগুলি অন্যান্য স্নায়ুর রোগগুলির অনুকারী হতে পারে তাই এই রোগের নির্ণয় করা কঠিন।চিকিৎসক আপনার মেডিকেল ইতিহাস জানতে চাইতে পারেন এবং আপনার মস্তিষ্ক, স্পাইনাল কর্ড এবং চোখের স্নায়ুর লক্ষণ দেখতে পারেন।নিম্নলিখিত পরীক্ষাগুলো এমএস-এর নির্ণয়ে সাহায্য করতে পারে:একইরকমের উপসর্গ থাকা রোগগুলি বাতিল করতে রক্তপরীক্ষা করা হয়।

ভারসাম্যের মূল্যায়ণ,সমন্বয়, দৃষ্টি, এবং স্নায়ুর কার্যকরীতা নির্ধারণ করতে অন্যান্য ক্রিয়াকলাপ করা হয়।

ম্যাগ্নেটিক রেসোন্যান্স ইমেজিং (এমআরআই) শরীরের কাঠামো দেখার জন্য করা হয়।

প্রোটিনের অস্বাভাবিকতা নির্ণয়ের জন্য সেরেব্রোস্পাইনাল ফ্লুইড ব্যবহার হয়।

আপনার মস্তিষ্কের ইলেক্ট্রিকাল সক্রিয়তা পরিমাপ করার জন্য পরীক্ষা করা হয়।এমএসের কোনো চিকিৎসা নেই, কিন্তু কিছু চিকিৎসা শরীরের ক্রিয়াকলাপ উন্নত করতে পারে। তার মধ্যে রয়েছে:অসুখের গতি কমাতে, আক্রমণ আটকাতে অথবা চিকিৎসা করতে, এবং উপসর্গগুলিকে আরাম দিতে ওষুধ দেওয়া হয়। স্টেরয়েড এমএস আক্রমণের গতি কম করে এবং তীব্রতা কমায়। পেশী রিলাক্সান্টস্ বা ট্র্যাঙ্কুইলাইজারস পেশীর খিঁচুনি শিথিল করে।

ফিজিওথেরাপি শক্তি এবং ভারসাম্য রক্ষা করতে এবং ক্লান্তি ও ব্যথা দূর করতে সাহায্য করে।

একটা লাঠি, ওয়াকার বা ব্রেসেসের সাহায্যে আপনি সহজে হাঁটতে পারবেন।

ক্লান্তিভাব ও চাপ কমাতে ব্যায়াম ও যোগা দরকার।

ID: 2423

Context: মেনিনজাইটিস

Question: মেনিনজাইটিস কাকে বলে?

Answer:

মস্তিস্ক ও সুষুম্নাকাণ্ডের চারপাশে ঘিরে থাকা যে টিস্যু স্তরের আবরণগুলি এদের সুরক্ষিত রাখতে সাহায্য করে সেটি হল মেনিনজেস। এই টিস্যু স্তর ও তার চারিপাশের তরলে সংক্রমণ ঘটলে মস্তিষ্কের প্রদাহ ও ফোলাভাব দেখা দেয়। সময়মত ধরা না পড়লে এবং চিকিৎসা না হলে এই সমস্যার ফলে প্রাণহানি হতে পারে।

ID: 2424

Context: মেনিনজাইটিস এর প্রধান কারণগুলি

Question: মেনিনজাইটিস এর প্রধান কারণগুলি কি?

Answer:

মেনিনজাইটিস রোগটি সংক্রামক অথবা অসংক্রামক হতে পারে ।সংক্রামক মেনিনজাইটিস ঘটায় কিছু জীবাণু যারা রক্তপরিবহনের মাধ্যমে দেহে ছড়িয়ে পড়ে মস্তিস্ক বা সুষুম্নাকান্ডে পৌঁছে যায়। এইসব জীবাণু মেনিনজেস ও চারিপাশের তরলে সংক্রমণ ঘটালে সেখানে প্রদাহ ও ফোলাভাব সৃষ্টি হয়। মেনিনজাইটিসের জন্য দায়ী জীবাণুগুলি হল:ব্যাকটেরিয়া - সট্রেপ্টোকক্কাস নিউমোনি, নিসারিয়া মেনিনজাইটিডিস।

ভাইরাস - ইনফ্লুয়েঞ্জা ভাইরাস, মিসলস (হাম) ভাইরাস, এইচআইভি এবং একোভাইরাস।

ফাঙ্গি বা ছত্রাক - ক্যান্ডিডা এলবিক্যান্স, ক্রিপ্টোকক্কাস নিওফর্মানস এবং হিস্টোপ্লাজমা।অসংক্রামক মেনিনজাইটিসের কারণগুলি হল:ক্যান্সার।

রাসায়নিক প্রতিক্রিয়া।

ড্রাগ এলার্জি।

মাথার আঘাত বা মস্তিষ্কে এবসেস (সীমাবদ্ধ প্রদাহ)।

লুপাস।

ID: 2425

Context: মেনিনজাইটিস নির্ণয় এবং চিকিৎসা

Question: এই রোগ কিভাবে নির্ণয় এবং চিকিৎসা করা হয়?

Answer:

দ্রুত চিহ্নিতকরণ এবং চিকিৎসা করা হলে এই রোগটির ফলে মৃত্যু ও মস্তিষ্কের ক্ষতি এড়ানো সম্ভব।মেনিনজাইটিস নির্ণয় করার জন্য নিম্নোক্ত পরীক্ষাগুলি করা অবশ্য প্রয়োজনীয়:লাম্বার পাংচার - ব্যাকটেরিয়াল মেনিনজাইটিস নিশ্চিত নির্ণয়ের জন্য মস্তিষ্কসুষুম্না তরল সংগ্রহ করে মাইক্রোবিয়াল কালচার, সিবিসি, প্রোটিন ও গ্লুকোজ মাত্রা এবং সি-রিআক্টিভ প্রোটিন (ইনফেকশন মার্কার) প্রভৃতি পরীক্ষা করা হয়।

শ্বেত রক্তকণিকার সংখ্যা বৃদ্ধি।

মাথার সিটি স্ক্যান।

মেনিনজাইটিসের ফুসকুড়ির পজিটিভ গ্লাস টেস্ট।মেনিনজাইটিসের চিকিৎসায় যে পদ্ধতিগুলি ব্যবহৃত হয়:ব্যাকটেরিয়াল মেনিনজাইটিসে ইনট্রাভেনাস এন্টিবায়োটিক প্রয়োগ করা হয় যা শরীর থেকে সংক্রামক ব্যাকটেরিয়া অপসারণে সাহায্য করে।

ফাঙ্গাল মেনিনজাইটিসের চিকিৎসায় এন্টিফাঙ্গাল ওষুধ ব্যবহার হয়।

ভাইরাল মেনিনজাইটিসে ইনট্রাভেনাস এন্টিভাইরাল ওষুধ দেওয়া যেতে পারে, কিন্তু সাধারণত নিজে থেকেই এটির নিরাময় হয়ে যায়।

মেনিঙ্গকক্কাল ভ্যাকসিন এবং হিমোফিলাস ইনফ্লুয়েনজি টাইপ বি ভ্যাকসিনের মত কিছু টীকা মেনিনজাইটিস থেকে সুরক্ষা দিতে পারে।

সুষ্ঠ স্বাস্থ্যবিধি মেনে চলা এবং মেনিনজাইটিসের প্রাদুর্ভাব আছে এরকম অঞ্চলে যাওয়ার আগে প্রয়োজনীয় টীকা নেওয়ার মাধ্যমে এই রোগটিকে এড়ানো সম্ভব।

ID: 2426

Context: মেজ সিনড্রোম

Question: মেজ সিনড্রোম কাকে বলে?

Answer:

মেজ সিনড্রোম হল একপ্রকার ডিসটোনিয়া, এক ধরণের স্নায়বিক রোগ যাতে চোয়াল,জিভ এবং চোখের আশেপাশের পেশীর অনিচ্ছাকৃত সংকোচন বা বিচলন (ব্লেফারোস্প্যাজম) দেখতে পাওয়া যায়।

ID: 2427

Context: মেজ সিনড্রোম এর প্রধান লক্ষণ ও উপসর্গ

Question: মেজ সিনড্রোম এর প্রধান লক্ষণ ও উপসর্গ কি কি?

Answer:

মেজ সিনড্রোমের প্রধান লক্ষণ হল ডিসটোনিয়া (ওরোম্যান্ডিবুলার) এবং ব্লেফারোস্প্যাজম, এগুলিই এই রোগের মূল উপসর্গ।ওরোম্যান্ডিবুলার ডিসটোনিয়া - এই ধরণের ডিসটোনিয়ায় জিহ্বাসহ চোয়ালের পেশীগুলির অনিচ্ছাকৃত এবং প্রবল সংকোচন দেখতে পাওয়া যায়। এর ফলে কথা বলা বা খাওয়ার মতো স্বাভাবিক কাজগুলি করা কষ্টকর হয়ে ওঠে।

ব্লেফারোস্প্যাজম - ব্লেফারোস্প্যাজম হল বারবার অনিচ্ছাকৃত ভাবে চোখের পাতা বন্ধ হয়ে যাওয়া এবং বাতাস ও উজ্জ্বল আলোর মত বাহ্যিক উদ্দীপনার কারণে চোখে অতিরিক্ত অস্বস্তি হয়। এই সমস্যাটি ক্রমবর্ধমান যার ফলে পেশীর টান ও সংকোচনের হার বাড়তে থাকে এবং একসময় রোগীর পক্ষে চোখ খুলে রাখাও কষ্টকর হয়ে দাঁড়াতে পারে। ব্লেফারোস্প্যাজম সাধারণত প্রথমে শুধু একটি চোখকে (ইউনিল্যাটেরাল) এবং পরে অপর চোখটিকে (বাইল্যাটেরাল) আক্রমণ করে।

ID: 2428

Context: মেজ সিনড্রোম এর প্রধান কারণগুলি

Question: মেজ সিনড্রোম এর প্রধান কারণগুলি কি?

Answer:

মেজ সিনড্রোমের কোন নির্দিষ্ট কারণ নেই। যে যে কারণ সম্ভবত এই রোগের জন্য দায়ী বলে মনে করা হয় সেগুলি হল:বেসাল গ্যাংলিয়ার নেটওয়ার্কের ত্রুটি - মস্তিষ্কের বেসাল গ্যাংলিয়া নামক অঞ্চলের যে কোষগুলি চোখের পলক ফেলাসহ বিভিন্ন অনৈচ্ছিক কাজ নিয়ন্ত্রণ করে তাদের মধ্যে ত্রুটি দেখা দিলে মেজ সিনড্রোম হতে পারে।

পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া - পারকিনসন্স রোগের জন্য ব্যবহৃত কিছু ওষুধের নির্দিষ্ট পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া থেকে মেজ সিনড্রোম বিকশিত হতে পারে।

ID: 2429

Context: মেজ সিনড্রোম নির্ণয় এবং চিকিৎসা

Question: মেজ সিনড্রোম কিভাবে নির্ণয় এবং চিকিৎসা করা হয়?

Answer:

মেজ সিনড্রোম অত্যন্ত বিরল একটি রোগ হওয়ার ফলে এর কোন নির্দিষ্ট নির্ণায়ক নেই। তবে একজন স্নায়ুবিশেষজ্ঞ রোগীর শরীরে উপস্থিত উপসর্গ বিশ্লেষণ করে রোগটিকে মেজ সিনড্রোম হিসাবে চিহ্নিত করতে পারেন।এন্টিস্প্যাজম বা সংকোচনরোধী ওষুধের ব্যবহার এই সমস্যায় সাহায্য করতে পারে।ক্লোনাজিপাম, ট্রাইহেক্সিফেনীডাইল, ডায়াজীপাম এবং ব্যাকলোফেন প্রভৃতি ওষুধ মেজ সিনড্রোম বা ব্লেফারোস্প্যাজমের চিকিৎসায় ব্যবহার করা হয়, কিন্তু বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই এদের ফলাফল ক্ষণস্থায়ী বা অসন্তোষজনক। ফুড এন্ড ড্রাগ এডমিনিস্ট্রেশন (এফডিএ)-এর একটি সাম্প্রতিক গবেষণাতে ব্লেফারোস্প্যাজমের চিকিৎসায় বটুলীনম নামক ওষুধের কথা বলা হয়েছে যেটি এই সমস্যার সবথেকে প্রচলিত ওষুধ হিসাবে ব্যবহৃত হয়। যদিও কিছু রোগীর ক্ষেত্রে বোটক্স চিকিৎসায় আশানুরূপ উন্নতি দেখা যায়না।

ID: 2430

Context: কুষ্ঠ রোগ

Question: কুষ্ঠ রোগ কি?

Answer:

কুষ্ঠ বা হ্যানসেন রোগটি ম্যাইকোব্যাকটেরিয়াম লেপরের কারণে সৃষ্ট ত্বক এবং স্নায়ুর সংক্রমণ বিশেষ। এই অবস্থায় ত্বক, শ্লৈষ্মিক ঝিল্লি, পেরিফেরাল স্নায়ু, চোখ এবং শ্বাসযন্ত্র প্রভাবিত হয়।ওয়ার্ল্ড হেলথ অর্গানাইজেশন (ডাব্লুএইচও) অনুসারে, কুষ্ঠ সম্ভবত শ্বাসযন্ত্রের মাধ্যমে এবং পোকামাকড়ের মাধ্যমে ছড়ায়, আবার অন্যদিকে বেশীরভাগ মানুষ মনে করেন সংক্রামিত ব্যক্তির সাথে ঘনিষ্ঠ যোগাযোগের মাধমেও ছড়ায়।স্কিন স্মীয়ার (ত্বকের ক্ষত অংশ থেকে নমুনা নেওয়া হয়) পরীক্ষার ফলের উপর ভিত্তি করে নিম্নলিখিত অবস্থাগুলির শ্রেণীবদ্ধ করা হল:পাউসিবেসিলারি কুষ্ঠ (পিবি) - নেতিবাচক স্মীয়ার।

মালটিবেসিলারি কুষ্ঠ (এমবি) - ইতিবাচক স্মীয়ার।

ID: 2431

Context: কুষ্ঠ রোগ এর প্রধান লক্ষণ ও উপসর্গগুলি

Question: কুষ্ঠ রোগ এর প্রধান লক্ষণ ও উপসর্গগুলি কি কি?

Answer:

এই অবস্থার উপসর্গগুলি স্পষ্ট দেখা যায় যা এই রোগকে সহজে সনাক্ত করতে সাহায্য করে:ফ্যাকাশে দাগ বা ছোপযুক্ত চামড়া, মূলত মসৃণ।

অসার ও বিবর্ণ ক্ষত যা পার্শ্ববর্তী এলাকার তুলনায় হালকা বর্ণের।

চামড়ার উপর ক্ষুদ্র উঁচু ফোঁড়া জাতীয় বস্তু।

শুষ্ক ও শক্ত চামড়া।

পায়ের পাতার নিচের অংশে ঘা।

মুখের বা কানের কিছু অংশ উঁচু হয়ে ফুলে যাওয়া।

চোখের পাতা ও ভ্রূ র সম্পূর্ণ বা আংশিক ক্ষতি বা নষ্ট হয়ে যাওয়া।অন্যান্য উপসর্গের মধ্যে রয়েছে:সংক্রামিত জায়গায় অসারভাব ও ঘাম হওয়া।

পঙ্গু হয়ে যাওয়া।

পেশীতে দুর্বলতা।

নার্ভের বা স্নায়ুর বৃদ্ধি, বিশেষত কনুই ও হাঁটুর চারপাশে।

মুখের নার্ভে বা স্নায়ুতে প্রভাব পরার দরুন অন্ধত্ব।পরবর্তী পর্যায়ে, এটির ফল যা হতে পারে:পা ও হাত অসমর্থ হয়ে যাওয়া।

আঙ্গুল ও পা ছোট হয়ে যাওয়া এবং শুকিয়ে যাওয়া।

পায়ের আলসার বা ঘা ভাল না হওয়া।

নাক বিকৃত হয়ে যাওয়া।

চামড়ায় জ্বালাভাব অনূভব করা।

ব্যথাযুক্ত বা সংবেদনশীল স্নায়ু।

ID: 2432

Context: কুষ্ঠ রোগ এর প্রধান লক্ষণ ও উপসর্গগুলি

Question: কুষ্ঠ রোগ এর প্রধান লক্ষণ ও উপসর্গগুলি কি?

Answer:

কুষ্ঠরোগটি ম্যাইকোব্যাকটেরিয়াম লেপরে নামক ব্যাকটেরিয়ার কারণে হয় যা সাধারণত আমাদের পরিবেশে থাকে। জিনগত পরিবর্তন এবং বৈচিত্র্য কুষ্ঠরোগের সম্ভাবনা বৃদ্ধি করে। একইভাবে, প্রতিরক্ষা পদ্ধতিতে পরিবর্তন এবং প্রদাহের ফলে এটি হওয়ার সম্ভাবনা বৃদ্ধি পায়। রোগটি দীর্ঘস্থায়ী সংক্রামিত ব্যক্তির সাথে দীর্ঘস্থায়ী যোগাযোগের কারণে বা বাতাসে নিঃশ্বাস নেওয়ার সময় নাসারন্দ্রের মাধ্যমে প্রবেশ করা ব্যাকটেরিয়ার কারনেও ছড়াতে পারে।

ID: 2433

Context: ইন্টারস্টিসিয়াল সিস্টাইসিস

Question: ইন্টারস্টিসিয়াল সিস্টাইসিস কি?

Answer:

ইন্টারস্টিসিয়াল সিস্টাইটিস, যা ব্লাডার পেইন সিন্ড্রোম বা মূত্রাশয়ের ব্যথার উপসর্গ হিসাবেও পরিচিত, এটি মূত্রাশয়ের একটি তীব্র প্রদাহজনক অবস্থা। ইন্টারস্টিসিয়াল সিস্টাইটিসের প্রভাবে মূত্রাশয়ের এলাকায় ব্যথা, যন্ত্রণা ও চাপের সৃষ্টি হয়। পুরুষের তুলনায় মহিলাদের মধ্যে এই সিনড্রোমটি বেশি সংঘটিত হয়। যেহেতু মূত্রাশয় উদ্দিপ্ত এবং অতিষ্ট হয়ে পড়ে তাই মূত্রাশয়টি সংবেদনশীল হয়ে যায়। উপরন্তু মূত্রাশয়ের বেষ্টনটি ফুলে যেতে পারে অথবা রক্তপাত হতে পারে।

ID: 2434

Context: ইন্টারস্টিসিয়াল সিস্টাইসিস এর প্রধান লক্ষণ ও উপসর্গগুলি

Question: ইন্টারস্টিসিয়াল সিস্টাইসিস এর প্রধান লক্ষণ ও উপসর্গগুলি কি কি?

Answer:

উপসর্গগুলি খুব হালকা থেকে কম হতে পারে। কিছু রোগীর ক্ষেত্রে, উপসর্গগুলি বিনা চিকিৎসাতেই নিজে থেকে ভালো হয় যেতে পারে।প্রস্রাবের পথ বর্ধিত হওয়া (আরও পড়ুন: বারবার প্রস্রাবের কারণ)

প্রস্রাব করার জরুরী অবস্থা অনুভব করা

প্রস্রাবের লিকিং, প্রতিবার স্বল্প পরিমান মূত্রত্যাগ করা

মহিলাদের যৌনাঙ্গে ব্যথা, যৌনক্রিয়ার সময় ব্যথা হওয়া

পেটের নিচে ব্যথা, ঊরু, কোমরের নিচে, যৌনাঙ্গে বা পেনিলে ব্যথা হওয়া

হরমোনাল পরিবর্তন, মানসিক চাপ, মসলাযুক্ত খাবার খাওয়া এবং অ্যালকোহলযুক্ত পানীয়গুলির জন্য ইন্টারস্টিসিয়াল সিস্টাইটিসের উপসর্গগুলি আরো খারাপ হয়।

ID: 2435

Context: ইন্টারস্টিসিয়াল সিস্টাইসিস এর প্রধান কারণগুলি

Question: ইন্টারস্টিসিয়াল সিস্টাইসিস এর প্রধান কারণগুলি কি কি?

Answer:

ইন্টারস্টিসিয়াল সিস্টাইটিসের মূল কারণ এখনো চিহ্নিত করা যায়নি। তবে নিম্নলিখিত মেডিকেল উপসর্গগুলির সাথে এটি সম্পর্কিত হতে পারে:অটোইমিউন রোগ যেমন ইনফ্লেমেটরি বাওয়েল ডিজিজ, সিস্টেমিক লুপাস এরিথিওসাস এবং এটোপিক অ্যালার্জি

রক্তবাহী শিরার রোগ, যেমন সংবহনতান্ত্রিক ক্ষতের কারণে রক্তনালির ভঙ্গুরতা

মূত্রে ক্যালসিয়াম ফসফেটের মতো অস্বাভাবিক উপাদানের উপস্থিতি

ইউরিয়া যুক্ত ব্যাকটেরিয়ার দ্বারা ঘটিত অনিশ্চিত সংক্রমণ যা ব্যাকটেরিয়াল সংক্রমণও হতে পারে

ID: 2436

Context: ইন্টারস্টিসিয়াল সিস্টাইসিস নির্ণয় ও চিকিৎসা

Question: ইন্টারস্টিসিয়াল সিস্টাইসিস কিভাবে নির্ণয় ও চিকিৎসা করা হয়?

Answer:

ইন্টারস্টিসিয়াল সিস্টাইটিসের নির্ণয়ের জন্য কোনও নির্দিষ্ট পরীক্ষা নেই। তবুও, নিম্নলিখিত পরীক্ষাগুলি এটির নির্ণয়ের জন্য করা হয়:প্রস্রাবের নমুনা পরীক্ষা ও অনুশীলন

ইউরেথ্রা এবং মূত্রাশয়ের বেষ্টনের বায়োপসি

সিস্টোস্কোপিইন্টারস্টিসিয়াল সিস্টাইটিস সম্পূর্ণরূপে নিরাময় করা যায় না। তবে, নিম্নলিখিত চিকিৎসাগুলি এর উপসর্গগুলিকে হ্রাস করতে পারে। একটি ড্রাগ সলিউশনের দ্বারা মূত্রাশয়ের ভিতরকে স্নান করানোমূত্রাশয়ের ইনফ্লেটিং

ওষুধ

খাদ্যাভ্যাস

চিন্তা কমানো

শারীরিক চিকিৎসা

বৈদ্যুতিক পদ্ধতি দ্বারা স্নায়ুর উদ্দীপনা

মূত্রাশয়ের ব্যাপারে প্রশিক্ষণ

অস্ত্রোপচার

ID: 2437

Context: ইন অ্যাপ্রোপ্রিয়েট অ্যান্টি ডিউরেটিক হরমোন সিক্রেশন(এসআইএডিএইচ)

Question: ইন অ্যাপ্রোপ্রিয়েট অ্যান্টি ডিউরেটিক হরমোন সিক্রেশন(এসআইএডিএইচ) কি?

Answer:

হাইপোথ্যালামাস (মস্তিষ্কের একটি অংশ) দ্বারা অ্যান্টি ডিউরেটিক হরমোন (এডিএইচ) সৃষ্ট হয় এবং পিটুইটারি গ্রন্থি (মস্তিষ্কের গোড়াতে অবস্থিত) দ্বারা মুক্ত হয়। এডিএইচ কিডনির দ্বারা মূত্রের সঙ্গে যে জল শরীরের বাইরে বেরিয়ে যায় সেই জলের পরিমাণকে নিয়ন্ত্রণ করে। ইন অ্যাপ্রোপ্রিয়েট অ্যান্টি ডিউরেটিক হরমোন সিক্রেশন (এসআইএডিএইচ) হল এমন একটি উপসর্গ যা প্রচুর পরিমাণে বা মাত্রায় অ্যান্টি ডিউরেটিক হরমোন (এডিএইচ) শরীরে ধরে রাখে। এই রোগ শরীরের মধ্যে অতিরিক্ত জল ধরে রাখে।

ID: 2438

Context: ইন অ্যাপ্রোপ্রিয়েট অ্যান্টি ডিউরেটিক হরমোন সিক্রেশন(এসআইএডিএইচ এর প্রধান লক্ষণ এবং উপসর্গগুলি

Question: ইন অ্যাপ্রোপ্রিয়েট অ্যান্টি ডিউরেটিক হরমোন সিক্রেশন(এসআইএডিএইচ এর প্রধান লক্ষণ এবং উপসর্গগুলি কি কি?

Answer:

এসআইএডিএইচ-এর সাধারণ লক্ষণ ও উপসর্গগুলির মধ্যে রয়েছে:মাথা ব্যথা

বমি বমি ভাব

বমি

মানসিক পরিবর্তন যার মধ্যে রয়েছে

ভেবাচেকা

স্মৃতিশক্তি নিয়ে সমস্যা (বিস্তারিত পড়ুন: স্মৃতিশক্তি হারানোর চিকিৎসা)শরীরের ভারসাম্য বজায় রাখতে না পাড়ার কারণে পড়ে যাওয়া

মারাত্মতার ক্ষেত্রে, এটির কারণে খিঁচুনি বা কোমা পর্যন্ত হতে পারে

ID: 2439

Context: ইন অ্যাপ্রোপ্রিয়েট অ্যান্টি ডিউরেটিক হরমোন সিক্রেশন(এসআইএডিএইচ]র প্রধান কারণগুলি

Question: ইন অ্যাপ্রোপ্রিয়েট অ্যান্টি ডিউরেটিক হরমোন সিক্রেশন(এসআইএডিএইচ]র প্রধান কারণগুলি কি কি?

Answer:

যে কারণগুলি শরীরে এডিএইচ-এর মাত্রা বাড়িয়ে তোলে তা এসআইএডিএইচ সৃষ্টি করতে পারে, এই কারণগুলির মধ্যে হল:ওষুধ, যার মধ্যে এইগুলির জন্য ড্রাগ রয়েছে

হরমোনের ওষুধ (ভ্যাসোপ্রেসিন বা এডিএইচ )।

টাইপ 2 ডায়াবেটিস

খিঁচুনি

অ্যন্টিডিপ্রেসেন্টস

রক্ত চাপ বা হার্টের রোগ সংক্রান্ত

ক্যান্সার

সাধারণ অ্যানাসথেসিয়ার মধ্যে অ্যানাসথেসিয়া বা অপারেশনমস্তিষ্কের রোগ, যার মধ্যে রয়েছে

স্ট্রোক

আঘাত

সংক্রমণফুসফুসের রোগ, যার মধ্যে রয়েছে

ক্রনিক সংক্রমণ

যক্ষ্মারোগ

নিউমোনিয়া

ক্যান্সারমানসিক রোগ

হাইপোথ্যালামাস বা পিটুইটারির রোগ

নিম্নলিখিত অঙ্গ/শরীরে ক্যান্সার

লিউকেমিয়া (রক্তের ক্যান্সার)

অগ্ন্যাশয়

ক্ষুদ্রান্ত্র

মস্তিষ্ক

ID: 2440

Context: ইন অ্যাপ্রোপ্রিয়েট অ্যান্টি ডিউরেটিক হরমোন সিক্রেশন(এসআইএডিএইচ ) নির্ণয় এবং চিকিৎসা

Question: ইন অ্যাপ্রোপ্রিয়েট অ্যান্টি ডিউরেটিক হরমোন সিক্রেশন(এসআইএডিএইচ ) কিভাবে নির্ণয় এবং চিকিৎসা করা হয়?

Answer:

উপসর্গগুলির কারণ খোঁজার জন্য ডাক্তার রোগীর সম্পূর্ণ শারীরিক পরীক্ষা করবেন, অন্তর্নিহিত পরীক্ষাগুলি অনুসরণ করুন:সোডিয়ামের মাত্রা পরিমাপের জন্য রক্ত এবং প্রস্রাব পরীক্ষা

রক্ত এবং প্রস্রাবের অসমোলালিটি মূল্যায়ন করার জন্য পরীক্ষা

বিস্তীর্ণ বিপাকীয় প্যানেল (কম্প্রিহেনসিভ মেটাবলিক প্যানেল) (কিডনি এবং লিভারের কাজ, অ্যাসিড/বেসের ভারসাম্য, ইলেক্ট্রোলাইট, এবং রক্ত শর্করা পরিমাপের পরীক্ষা)এসআইএডির কারণগুলির উপর নির্ভর করে তার চিকিৎসার মধ্যে রয়েছে :কোনোরকম তরল পদার্থ পান করার উপর নিষেধাজ্ঞা। আপনি কত পরিমান তরল পদার্থ পান করতে পারবেন তা ডাক্তার সিদ্ধান্ত নেবেন।

কিডনির উপর এডিএইচ-এর প্রভাব আটকাতে খাবার বা শিরায় প্রদানের জন্য ওষুধ নির্ধারণ করা হতে পারে। যা কিডনির দ্বারা অতিরিক্ত জল বার করতে সাহায্য করবে।

রোগের মূল কারণের চিকিৎসা এই ভাবে হবে:যদি টিউমার হয়ে থাকে তাহলে অপারেশনের প্রয়োজন

যে ওষুধ অস্বাভাবিকভাবে এডিএইচ উৎপাদন করছে তার ডোজ বদলে দেওয়া বা ওষুধটা বদলে দেওয়া।

ID: 2441

Context: হেপাটিক এনসেফালোপ্যাথি

Question: হেপাটিক এনসেফালোপ্যাথি কি?

Answer:

এনসেফালোপ্যাথি কথাটি মস্তিষ্কের কার্যকারিতায় বিশৃঙ্খলা অথবা ক্ষয় পাওয়াকে বোঝায়, যার ফলে মানসিক বিভ্রান্তি বা স্মৃতিশক্তি লোপ পায়। হেপাটিক এনসেফালোপ্যাথিতে, যকৃতের দুরারোগ্য অবস্থা (দীর্ঘকালীন যকৃতের অসুখ) বা যকৃৎ বিকল হয়ে যাওয়ার ফলে মস্তিষ্কের কার্যক্ষমতা হ্রাস পায়। হেপাটিক এনসেফালোপ্যাথি বেশিরভাগ সেই সমস্ত ব্যক্তিদের হতে দেখা যায়, যাঁদের লিভার সিরোসিস (যকৃৎ দীর্ঘদিন দিন ধরে ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ার ফলে যকৃতের ক্ষত আর সারে না এবং যকৃতের কার্যকারিতা হ্রাস পায়) অসুখ রয়েছে।

ID: 2442

Context: হেপাটিক এনসেফালোপ্যাথি প্রধান লক্ষণ ও উপসর্গগুলি

Question: হেপাটিক এনসেফালোপ্যাথি প্রধান লক্ষণ ও উপসর্গগুলি কি কি?

Answer:

হেপাটিক এনসেফালোপ্যাথির সাধারন উপসর্গগুলো নিম্নে উল্লেখ করা হলো:স্মৃতিলোপ

মনোযোগের সমস্য়া

চিড়চিড়েভাব বৃদ্ধি

বিভ্রান্তি

সমন্বয়ে সমস্যা

সতর্কতা হ্রাস

অকারণে মেজাজের পরিবর্তন

সময় এবং স্থান সম্পর্কে দুর্বল ধারণাউপরোক্ত উপসর্গগুলোর সঙ্গে অন্যান্য স্নায়ুবিক উপসর্গ দেখা দিতে পারে:তড়কা বা খিঁচুনি

বাচনভঙ্গির সমস্যা (অপমানজনক মন্তব্য)

থরথর করে কাঁপা

অনৈচ্ছিকভাবে ঝাঁকুনি দিয়ে ওঠা

অনৈচ্ছিকভাবে চোখের নড়াচড়া

পেশীর দুর্বলতাযেহেতু যকৃৎ প্রচণ্ড ক্ষতিগ্রস্ত হয়, সেই কারণে কোনও ব্যক্তি যকৃৎ-এর সমস্যার অন্যান্য উপসর্গও উপলব্ধি করতে পারেন।

ID: 2443

Context: হেপাটিক এনসেফালোপ্যাথি প্রধান কারনগুলি

Question: হেপাটিক এনসেফালোপ্যাথি প্রধান কারনগুলি কি কি?

Answer:

হেপাটিক এনসেফালোপ্যাথির প্রাথমিক কারণ হলো দীর্ঘদিন ধরে চলা যকৃতের বিকলতা। এটি বেশিরভাগ সেই ব্যক্তিদের মধ্যে দেখা যায়, যাঁদের লিভার সিরোসিস আছে বা যাঁদের দীর্ঘদিন ধরে অতিরিক্ত মদ্যপানের ইতিহাস আছে অথবা যাঁরা হেপাটাইটিস বি বা সি দ্বারা সংক্রমিত। এইসব সমস্যার ফলে যকৃৎ শরীর থেকে টক্সিন বার করার মতো তার স্বাভাবিক কাজকর্ম চালাতে অক্ষম হয়ে পড়ে। রক্তে এইসব টক্সিনের মাত্রা বাড়তে থাকলে মস্তিষ্কের ক্রিয়াকলাপে নেতিবাচক প্রভাব পড়ে, যার ফলে মানসিক কার্যবিধিতে পরিবর্তন আসে এবং স্নায়বিক মনোরোগের উপসর্গ দেখা দেয়।হেপাটিক এনসেফালোপ্যাথি বংশগত অসুখ নয়।

ID: 2444

Context: হেপাটিক এনসেফালোপ্যাথি কিভাবে নির্ণয় ও চিকিৎসা

Question: হেপাটিক এনসেফালোপ্যাথি কিভাবে নির্ণয় ও চিকিৎসা করা হয়?

Answer:

হেপাটিক এনসেফালোপ্যাথি রোগ নির্ণয়ের জন্য চিকিৎসক উপসর্গগুলি এবং রোগীর সম্পূর্ণ চিকিৎসা জনিত ইতিহাসের জেনে নেন, যাতে অন্যান্য কারণের সম্ভাবনা দূর হয়। রোগ নির্ণয়ের অন্যান্য পরীক্ষাগুলি হলো:রক্তপরীক্ষা করা হয় টক্সিনের উপস্থিতির যাচাই যাচাই এবং যকৃতের স্বাস্থ্য মূল্যায়নের জন্য।

স্পাইনাল ট্যাপ টেস্ট (লাম্বার পাংচার) পরীক্ষা করা হয় সেরিব্রোস্পাইনাল ফ্লুইড (সিএসএফ)-এ ব্যাকটেরিয়াল ও ভাইরাল সংক্রমণ সনাক্ত করার জন্য।

কম্পিউটেড টোমোগ্রাফি (সিটি) স্ক্যান এবং ম্যাগনেটিক রেসোন্যান্স ইমেজিং (এমআরআই) স্ক্যানের মতো ইমেজিং স্টাডি মস্তিষ্কের সুস্থতা মূল্যায়ন করতে।হেপাটিক এনসেফালোপ্যাথির চিকিৎসা ওষুধ ও খাদ্যাভ্যাস পরিবর্তন করে করা হয়।অনৈচ্ছিকভাবে পেশীর নড়াচড়া ও রক্তে টক্সিনের মাত্রা কম করতে ওষুধ দেওয়া হয়। হেপাটিক এনসেফালোপ্যাথি সারানো যায় এবং সঠিক মেডিক্যাল কাউন্সিলিং এর সাহায্যে পরিবর্তন সম্ভব। যাইহোক, যেহেতু হেপাটিক এনসেফালোপ্যাথি প্রাথমিকভাবে তাঁদেরই হয় যাঁদের যকৃতের দীর্ঘমেয়াদী ক্ষতির সমস্যা রয়েছে, তাই এই রোগ আবার হতে পারে। পুনরায় এই রোগ হওয়া আটকাতে চিকিৎসক প্রোফাইল্যাক্টিক চিকিৎসা করানোর পরামর্শ দিতে পারেন।

ID: 2445

Context: মাথায় আঘাত

Question: মাথায় আঘাত কি?

Answer:

মাথা, স্ক্যাল্প বা মস্তিষ্কের আঘাতকে মাথায় আঘাত হিসাবে উল্লেখ করা হয়। মাথার উপর একটি হালকা আচমকা আঘাত লাগা থেকে জোরে ধাক্কা লাগার একটি তীব্র গঠন অথবা একটি মাথার হাড়ের ফেটে যাওয়া পর্যন্ত মাথায় আঘাত হতে পারে।

ID: 2446

Context: মাথায় আঘাত প্রধান লক্ষণ ও উপসর্গগুলি

Question: মাথায় আঘাত প্রধান লক্ষণ ও উপসর্গগুলি কি কি?

Answer:

আঘাতের প্রভাবের উপর নির্ভর করে, একজন ব্যক্তি উপসর্গগুলির বিভিন্ন মাত্রার সাথে দেখা দিতে পারে, যা হালকা, মাঝারি বা গুরুতর হতে পারে।হালকা আঘাত।

মাথার উপরে আচমকা ঠুকে যাওয়া বা কালশিটে।

স্ক্যাল্পের উপর কেটে যাওয়া।

মাথা ব্যথা।

আলোকাতঙ্ক রোগ (আলোতে সংবেদনশীলতা)।

বমি বমি ভাব।

বিভ্রান্তি।

মাথা হালকা অনুভব করা।

ঘুমের প্যাটার্নের পরিবর্তন।

ঝাপসা দেখা।

মাঝারি আঘাত।

কিছুক্ষনের জন্য চেতনা হারানো।

মাথায় প্রচন্ড ব্যথা।

বমি বমি ভাব ও বমি করা।

ফ্যাকাশে ত্বক।

খিটখিটে ভাব বা আচরণগত পরিবর্তন।

উন্মুক্ত ক্ষত।

গুরুতর আঘাত।

জ্ঞান হারানো।

তন্দ্রালু ভাব।

সিজার্স।

অসংলগ্ন কথা।

বিস্তারিত বা স্থির চক্ষুতারা।

বাইরের বিষয়ে তীক্ষ্ণ মাথা।

প্রগতিহীন অবস্থা।

ID: 2447

Context: মাথায় আঘাত র প্রধান কারণগুলি

Question: মাথায় আঘাত র প্রধান কারণগুলি কি কি?

Answer:

মাথায় আঘাতের কারণ বিভিন্ন হয়। এখানে শিশু ও প্রাপ্তবয়স্কদের মধ্যে কারণের বিভিন্ন প্রস্ত রয়েছে। শিশুদের ক্ষেত্রে, একটি উঁচু থেকে পরে গিয়ে, মারামারি বা খেলাধুলা করতে গিয়ে এটা হতে পারে, যদিও প্রাপ্তবয়স্কদের মধ্যে, রাস্তায় যানবাহন দুর্ঘটনা (গাড়িতে দুর্ঘটনা), শারীরিক নির্যাতন বা হিংসা, পড়ে গিয়ে বা খেলাধুলা করতে গিয়ে আঘাতের কারণে হতে পারে।

ID: 2448

Context: মাথায় আঘাত নির্ণয় ও চিকিৎসা

Question: মাথায় আঘাত কিভাবে নির্ণয় ও চিকিৎসা করা হয়?

Answer:

গ্লাসগো কোমা স্কেলের (জিসিএস) সাথে একটি পুঙ্খানুপুঙ্খ ক্লিনিকাল পরীক্ষা মাথার আঘাত নির্ণয় করতে সাহায্য করে। জিসিএসের কম স্কোর গভীর আঘাত এবং তার বিপরীতকে নির্দেশ করে। কখনও কখনও, আচ্ছন্ন অবস্থার কারণে এটির মেডিকাল ইতিহাস পাওয়া কঠিন। নির্দিষ্ট পরিক্ষাগুলি মস্তিষ্কে কোষগুলির ক্ষতি এবং আঘাতের পরিমাণ পরীক্ষা করার জন্য বাধ্যতামূলক। পরিবেষ্টন করা পরীক্ষাগুলি হল:কম্পিউটেড টোমোগ্রাফি (সিটি) স্ক্যান: এটি মাথার খুলিতে ফাটল, রক্তপাত, এবং টিস্যুর ফোলা নিরীক্ষণ করতে সাহায্য করে।

ম্যাগনেটিক রেসোনেন্স ইমেজিং (এমআরআই) স্ক্যান: সিটি স্ক্যানের থেকেও এটি অধিক গুরুত্বপূর্ণ এবং অধিক যথাযথ।হালকা আঘাতের জন্য পর্যবেক্ষণ অথবা ব্যাথার জন্য সাধারণ বেদনানাশকের (বারবার বরফের প্যাক ব্যবহারের সাথে) ব্যবহার প্রয়োজন, যদিও মাঝারি ও মারাত্মক আঘাতের জন্য সাধারণ ওষুধ থেকে সার্জারি বা কখনও কখনও জরুরী ওয়ার্ডে ভর্তি করে ক্ষণিকের চিকিৎসার প্রয়োজন হয়।মাথায় আঘাতের জন্য চিকিৎসাগুলি হল:এন্টি সিজার্স মেডিকেশন - সিজার্স মাথায় আঘাতের একটি প্রচলিত উপসর্গ এবং এটি মস্তিষ্কের ক্ষতি করতে পারে, এক্ষেত্রে এন্টি-সিজার্স ওষুধগুলি খুবই সাহায্য করে।

ডিউরেটিক্স - মস্তিষ্কের চারপাশ ফুলে যাওয়ার কারণে কিছু ধরনের মাথায় আঘাত হয়; ডিউরেটিক্সের ব্যবহারে ফোলা কমে এবং চাপের উপসর্গগুলি উপশম করতে সহায়তা করে।

কোমা ইনডিউসিং ড্রাগস - যখন মস্তিষ্ক নিজে থেকে আরোগ্যলাভের চেষ্টা করে তখন এটি অতিরিক্ত অক্সিজেনের ব্যবহার শুরু করে। কিন্তু, রক্তবাহগুলি প্রভাবিত থাকার কারণে, এগুলি পর্যাপ্ত পরিমানে অক্সিজেন পায় না, এবং এটি আঘাতকে আরো বাড়িয়ে তোলে এবং মস্তিষ্কের কোষগুলির মৃত্যু ঘটায়। তাই, অধিকতর আঘাতকে রোধ করার জন্য, কোমা-ইনডিউসিং ওষুধগুলি ব্যবহার করে সাময়িকভাবে মস্তিষ্কের কোষগুলির কার্যকারিতা হ্রাস করা হয়।মাথায় আঘাতের অস্ত্রোপচারগত চিকিৎসা হল:মাথার খুলির ফাটলের মেরামত করা।

রক্তাক্ত মস্তিষ্কের ধমনীগুলির সেলাই করা।

মস্তিষ্কের চাপ কমানোর জন্য মাথার খুলিতে ফাঁক তৈরি করা।অস্ত্রোপচার ও ওষুধ ছাড়া, মস্তিষ্কের ক্ষতির কারণে আক্রান্ত মস্তিষ্ক ও অঙ্গগুলির কার্যকারিতা উন্নত করার জন্য পুনর্বাসনের প্রয়োজন। পুনর্বাসনের মধ্যে রয়েছে ফিজিওথেরাপি, অকুপেশনাল থেরাপি, কাউন্সেলিং এবং রিক্রিয়েশনাল থেরাপি।

ID: 2449

Context: হাত কাঁপা

Question: হাত কাঁপা কি?

Answer:

কম্পন হল, কোনো বিশেষ পেশীসমূহের অনৈচ্ছিক নিয়মিত নড়াচড়া। হাত কাঁপা হল হাতের (কব্জি, আঙ্গুল, বুড়ো আঙ্গুল) পেশীসমূহের অনৈচ্ছিক নড়াচড়া, যাকে কম্পমান হাতও বলা হয়। এই অবস্থাটি বয়স্ক মানুষের মধ্যে তুলনামূলকভাবে বেশি সাধারণ এবং এতে তাঁদের রোজের কাজ করতে খুবই অসুবিধা হয়। এটা প্রাণঘাতী অবস্থা নয়, কিন্তু এটা মস্তিষ্কের কোষে ঘটমান একটি পতন প্রক্রিয়ার দিকে নির্দেশ করতে পারে।

ID: 2450

Context: হাত কাঁপা এর প্রধান লক্ষণ ও উপসর্গগুলো

Question: হাত কাঁপা এর প্রধান লক্ষণ ও উপসর্গগুলো কি কি?

Answer:

হাত কাঁপার উপসর্গগুলো খুবই সাধারণ এবং হাতের অনৈচ্ছিক নড়াচড়া স্পষ্টরূপে দেখা যায়। কিন্তু, কখনো কখনো, হাত কাঁপা কিছু উপসর্গের সাথেও জড়িয়ে থাকে যেমন:ধীরে ধীরে একপার্শ্বিক (একদিকে) কাঁপুনি শুরু হয় যেটা অন্য \* \* হাতেও ছড়িয়ে পড়ে (দুটো হাতকেই প্রভাবিত করে)।

হাতের নড়াচড়ার সাথে কাঁপুনির বৃদ্ধি হতে থাকে।

মানসিক চাপ, ক্লান্তি, উত্তেজক পদার্থের ব্যবহার, ইত্যাদির কারণে কাঁপুনির বৃদ্ধি হয়।

অ্যাটাক্সিয়ার সাধারণ উপসর্গগুলি (অস্থির গেইট)।উপসর্গগুলি সমস্যাজনক হয়ে ওঠে যখন একজন রোজের কাজ করতে অসুবিধা বোধ করেন যেমন, কাপড় পরা, গ্লাস বা কাপ ধরা, খাওয়া বা দাড়ি কামানো। এমন কি লিখতেও অসুবিধা হয়, যেটার নৈতিক শাখাবিন্যাস থাকতে পারে।

ID: 2451

Context: হাত কাঁপা এর প্রধান কারণগুলো

Question: হাত কাঁপা এর প্রধান কারণগুলো কি কি?

Answer:

হাত কাঁপা সাধারণত অপরিহার্য কাঁপুনি (স্নায়ুতন্ত্রের পদ্ধতির রোগ) বা পার্কিনসন্স অসুখের কারণে হয়। উভয়ই জিনের রোগ যা জিনের পরিবর্তনের জন্য ঘটে।হাত কাঁপার অন্যান্য কারণগুলোর মধ্যে রয়েছে:হাইপারথাইরয়েডিজম।

মাল্টিপল স্ক্লেরোসিস।

ডায়স্টোনিয়া।

বেশী বয়স।

পেরিফেরাল নিউরোপ্যাথি।

স্ট্রোক।

ID: 2452

Context: হাত কাঁপা নির্ণয় ও চিকিৎসা

Question: হাত কাঁপা কিভাবে নির্ণয় ও চিকিৎসা করা হয়?

Answer:

পারিবারিক ইতিহাসের সাথে একটা বিশদ মেডিকেল ইতিহাস এবং একটা সঠিক চিকিৎসাগত পরীক্ষা হাত কাঁপার নির্ণয় নিশ্চিত করে। কিছু রক্তপরীক্ষা যেমন, সম্পূর্ণ রক্ত গণনা (সিবিসি), ভিটামিন বি 12 এর মাত্রা, এবং রুটিন অনুসন্ধান যেমন, মস্তিষ্কের সিটি স্ক্যান করা যেতে পারে যা কাঁপুনির জন্য দায়ী অন্যান্য বিষয়গুলোকে বের করে।হাত কাঁপার চিকিৎসা পদ্ধতির মধ্যে রয়েছে:হাতের কাঁপুনি সম্পূর্ণ ঠিক হয় না, কিন্তু কিছু চিকিৎসা পদ্ধতি আছে যেগুলো উপসর্গগুলোকে কম করতে সাহায্য করতে পারে:ওষুধ - খাবার ওষুধগুলি যেমন বিটা-ব্লকারস (উদাহরনস্বরূপ, প্রোপ্রানোলোল এবং প্রিমিডোন), অ্যান্টি-সিজার ওষুধ, বোটোক্স এবং দুশ্চিন্তা কমানোর ওষুধ দেওয়া যেতে পারে যা কাঁপুনির তীব্রতা কম করতে সাহায্য করে।

অস্ত্রোপচারগত চিকিৎসা - মস্তিষ্কের গভীর উত্তেজনা এবং থ্যালামোটমি কাঁপুনি কমাতে সাহায্য করে।

শারীরিক থেরাপি - ভর ব্যবহার করা, কব্জিতে স্ট্র্যাপ পরা (কব্জির ভর) এবং চাপমুক্ত বলের ব্যায়ামও কাঁপুনির তীব্রতা কম করতে সাহায্য করে।

ID: 2453

Context: ফ্রেডরিক এটাক্সিয়া

Question: ফ্রেডরিক এটাক্সিয়া কি?

Answer:

ফ্রেডরিক এটাক্সিয়া হল একটি জেনেটিক ব্যাধি যা মস্তিষ্ক এবং স্পাইনাল কর্ডকে প্রভাবিত করে। এটি একটি ব্যক্তির সঠিকভাবে হাঁটার ক্ষমতা দুর্বল করে এবং যা বয়সের সঙ্গে আরো খারাপ হয়ে ওঠে।এটি জেনেটিক পরিবর্তনের দ্বারা ঘটিত এক বিরল ব্যাধি এবং এর নামকরণ এক জার্মান চিকিৎসকের নামে করা হয় যিনি এই রোগের প্রথম আবিষ্কার করেন।

ID: 2454

Context: ফ্রেডরিক এটাক্সিয়া এর প্রধান লক্ষণ এবং উপসর্গগুলি

Question: ফ্রেডরিক এটাক্সিয়া এর প্রধান লক্ষণ এবং উপসর্গগুলি কি কি?

Answer:

ফ্রেডরিক এটাক্সিয়া আগের বা পরের বছরগুলিতে শুরু হতে পারে। আগে-সূত্রপাত হওয়া ফ্রেডরিক এটাক্সিয়া 5 থেকে 10 বছর বয়েসের মধ্যে উপসর্গগুলি দেখাতে শুরু করে, যেখানে পরে-সূত্রপাত হওয়া ফ্রেডরিক এটাক্সিয়া 30-এর শুরুর দিকে আরম্ভ হতে পারে।

প্রাথমিক উপসর্গ হল হাঁটতে অসুবিধা। এটি পায়ের পাতার পেশীর দুর্বলতা এবং অসাড়তার দ্বারা সংসর্গী হতে পারে।

একজন রোগী দৃষ্টি হারাতে পারেন বা দৃষ্টি চলাচলে অসুবিধাও অনুভব করতে পারেন।

এই রোগের অন্যান্য উপসর্গগুলি হল বক্তৃতা এবং শ্রবণে সমস্যা।

মেরুদণ্ডের গঠনে একটি অস্বাভাবিক বক্রতা এবং পায়ের পাতায় অঙ্গবিকৃতি দেখা যায়।

এই অবস্থায় হৃদয় খুব সাধারণভাবে আক্রান্ত হয়, হৃদপিন্ডসম্বন্ধীয় পেশীতে দুর্বলতা দেখা যায়।

ID: 2455

Context: ফ্রেডরিক এটাক্সিয়া নির্ণয় এবং চিকিৎসা

Question: ফ্রেডরিক এটাক্সিয়া এর প্রধান কারণগুলি কি কি?

Answer:

ফ্রেডরিক এটাক্সিয়া এফএক্সএন (FXN) নামক একটি বিশেষ জিনের পরিবর্তনের কারণে ঘটে।

এই জিনের ডিএনএ (DNA) এক অস্বাভাবিক ক্রম দেখায়, যার ফলে এই রোগ হয়।

এটি একটি অটোজোমাল রিসেসিভ ব্যাধি, যার অর্থ বাবা-মা উভয়ই যদি ত্রুটিযুক্ত জিন বহন করে তবে শিশুটির এই রোগ হবে।

ত্রুটিযুক্ত জিন শুধুমাত্র পিতামাতার মধ্যে যেকোন একজনের কাছ থেকে উত্তরাধিকারী হলে, শিশু এই রোগের বাহক হয়ে ওঠে এবং সাধারণত এটির কোনো উপসর্গ দেখায় না।

ID: 2456

Context: ফ্রেডরিক এটাক্সিয়া নির্ণয় এবং চিকিৎসা

Question: ফ্রেডরিক এটাক্সিয়া কিভাবে নির্ণয় এবং চিকিৎসা করা হয় ?

Answer:

উপসর্গগুলির বিস্তারিত তথ্য গ্রহণ করার পর ডাক্তার নিউরোমাস্কুলার সিস্টেমের শারীরিক পরীক্ষা পরিচালনা করেন।এমআরআই, সিটি স্ক্যান বা এক্স-রের দ্বারা মস্তিষ্ক এবং স্পাইনাল কর্ড পরীক্ষা করা হয়।

অন্যান্য পরীক্ষাগুলির মধ্যে রয়েছে পেশীর ক্রিয়া পরীক্ষা করার জন্য একটি ইলেক্ট্রোমিওগ্রাম এবং একটি ইলেক্ট্রোকার্ডিওগ্রামের দ্বারা হৃদয়ের কার্যকলাপ পরীক্ষা করা এবং গ্লুকোজ ও অন্যান্য পরিমিতিগুলির জন্য রক্ত পরীক্ষা।

ত্রুটিপূর্ণ জিনের জন্য জেনেটিক পরীক্ষাগুলির মাধ্যমে চূড়ান্ত নির্ণয় নেওয়া হয়।ফ্রেডরিক এটাক্সিয়ায় চিকিৎসার উদ্দেশ্য হল রোগীকে উপসর্গগুলির মোকাবিলা করতে সাহায্য করা এবং স্বাধীনভাবে বাঁচতে সহায়তা করা, যেহেতু এটি সম্পূর্ণভাবে নিরাময় হয় না।চিকিৎসা কৌশলের অন্তর্ভুক্ত হল শারীরিক পরীক্ষা, পেশীর ব্যায়াম এবং হাঁটার উপকরণ।

বক্তৃতা সমস্যার জন্য, স্পিচ থেরাপি বক্তব্য আদান-প্রদান উন্নত করতে সহায়ক করতে পারে।

বাঁকা মেরুদন্ড বা বিকৃত পায়ের পাতার ক্ষেত্রে অর্থোপেডিক যন্ত্রপাতির সুপারিশ করা হতে পারে।

হৃদরোগ নিয়ন্ত্রণে রাখতে, ওষুধ বা চিকিৎসা দেওয়া হতে পারে। তবে, বয়েসের সাথে অবস্থাটি আরও খারাপ হয়।

ID: 2457

Context: বার বার প্রস্রাব হওয়া

Question: বার বার প্রস্রাব হওয়া কি?

Answer:

যখন আপনি স্বাভাবিকের চেয়ে বেশি বার প্রস্রাব করার প্রয়োজন অনুভব করেন তখন এটি একটি সংক্রমণ বা একটি কিডনিতে পাথরের মত অন্তর্নিহিত রোগের কারণে হতে পারে।বার বার প্রস্রাব হওয়া, অনেক যুক্ত সমস্যার করণ হতে পারে এবং একটি মানুষের রোজকার জীবনকে বিঘ্নিত করতে পারে।

ID: 2458

Context: বার বার প্রস্রাব এর সাথে যুক্ত প্রধান লক্ষণ ও উপসর্গগুলি

Question: বার বার প্রস্রাব এর সাথে যুক্ত প্রধান লক্ষণ ও উপসর্গগুলি কি কি?

Answer:

সাধারণভাবে, বেশীরভাগ মানুষ 24 ঘন্টায় 7 থেকে 8 বার প্রস্রাব করেন। যদিও এটাকে সাধারণকরণ করা যায় না তবে এর থেকে বেশী হলে তা একটি সমস্যা বলে বিবেচিত হতে পারে।

এটা রাতে আরো বেশী হওয়ার সম্ভাবনা থাকতে পারে, আপনার নিয়মিত ঘুমের সূচিতে ব্যাঘাত ঘটাতে পারে এবং এর ফলে পুরো দিন ঝিমুনি ও ঘুমঘুম ভাব লাগতে পারে।· বার বার প্রস্রাব হওয়ার কারণে সাধারণত পিপাসা বেড়ে যায়।কিছু ব্যতিক্রমী উপসর্গগুলির মধ্যে রয়েছে:

জ্বর এবং ঠান্ডা লাগা

পিঠে ব্যথা ও পেটে ব্যথা

প্রস্রাবের সময় অস্বাভাবিক নির্গমন বা স্রাব হওয়া

বমি বমি ভাব

ID: 2459

Context: বার বার প্রস্রাব এর প্রধান কারণগুলি

Question: বার বার প্রস্রাব এর প্রধান কারণগুলি কি কি?

Answer:

বার বার প্রস্রাব হওয়া কোনো স্বাস্থ্যগত পরিবর্তনের জন্য হতে পারে যেমন অত্যধিক তরল পদার্থ গ্রহণ করা বা অত্যধিক ঠান্ডা অবস্থা।

ডায়াবেটিস মেলিটাস বা ডায়াবেটিস ইনসিপিডাসের রোগীরাও বার বার প্রস্রাব হওয়ায় ভোগেন।

ইউরিনারি এলাকায় সংক্রমণ এবং ওভারঅ্যাক্টিভ ব্লাডারের উপসর্গগুলির মধ্যে একটি হল বার বার প্রস্রাব হওয়া।

মহিলাদের মধ্যে, মেনোপজ বা ইস্ট্রোজেনের অসাম্যের জন্যও বার বার প্রস্রাব করার তাড়না হতে পারে।

ইউরিনারি ব্লাডারে পাথর হওয়াও বার বার প্রস্রাব হওয়ার আরেকটা কারণ।

কখনও কখনও, অ্যান্টি-এপিলেপ্টিক্সের মত ওষুধগুলোও এই উপসর্গের কারণ হতে পারে।

ID: 2460

Context: বার বার প্রস্রাব হওয়া কিভাবে নির্ণয় ও চিকিৎসা

Question: বার বার প্রস্রাব হওয়া কিভাবে নির্ণয় ও চিকিৎসা করা হয়?

Answer:

যখন আপনি বার বার প্রস্রাব হওয়ার কথা বলবেন, আপনার চিকিৎসক আরম্ভের ইতিহাস ও উপসর্গের সময়সীমা জানবেন। যদি আপনার বার বার প্রস্রাব হওয়া ছাড়া অন্য কোনো সমস্যা থাকে তাহলে আপনার চিকিৎসককে অবশ্যই সেটা জানানো উচিত।প্রস্রাবে রক্ত, গ্লুকোজ, প্রোটিন বা অন্য অস্বাভাবিকতা আছে কিনা দেখার জন্য ভোরবেলার প্রস্রাব সাধারণত ল্যাবে পরীক্ষা করা হয়।

প্রস্রাবের পরে ব্লাডার সম্পূর্ণ খালি হচ্ছে কিনা দেখার জন্য ব্লাডারের আল্ট্রাসাউন্ড করা হয়। পেলভিসের সিটি স্ক্যান বা এক্স-রেও করা হয়।

যদি চিকিৎসক ডায়াবেটিস মত অন্য কোনো অসুখ সন্দেহ করেন তাহলে প্রাসঙ্গিক পরীক্ষা ও রক্তপরীক্ষা করতে পরামর্শ দেন।বার বার প্রস্রাব হওয়ার জন্য চিকিৎসার প্রকারতা উপসর্গের কারণের উপর নির্ভর করে।যদি বার বার প্রস্রাব হওয়া কোনো সংক্রমণের কারণে হয় তাহলে অ্যান্টিবায়োটিকগুলি সাহায্য করে।

ডায়াবেটিস মেলিটাস ইন্সুলিন থেরাপি অথবা ওষুধের সাহায্যে এবং কিছু জীবনধারার পরিবর্তন করে নিয়ন্ত্রণ করা হয়।

যদি কারণটি ওভারঅ্যাক্টিভ ব্লাডারের জন্য হয় তাহলে ব্লাডারের পেশীকে শিথিল করার জন্য ওষুধগুলি দেওয়া হয়। ব্লাডার প্রশিক্ষণ ব্যায়ামও সাহায্য করে।

ID: 2461

Context: বেহুস বা অজ্ঞান হওয়া

Question: বেহুস বা অজ্ঞান হওয়া কি?

Answer:

বেহুস বা অজ্ঞান হওয়া, চিকিৎসাগতভাবে সিনকোপ নামেও পরিচিত, এটি এমন একটি মেডিকেল শর্ত যেখানে রোগী চেতনার একটি অস্থায়ী ক্ষতি ভোগ করেন। এর সংঘটন হল সাধারণ, এটি বিভিন্ন কারণে সৃষ্টি হতে পারে। বেশিরভাগ ক্ষেত্রে, অজ্ঞান হওয়া হল একটি অন্তর্নিহিত চিকিৎসা অবস্থার নির্দেশক এবং সেই কারণে, হাল্কাভাবে গ্রহণ করা উচিত নয়।অজ্ঞান হওয়ার জন্য প্রাথমিক কারণ হল মস্তিষ্কে রক্ত প্রবাহ কমে যাওয়া যা কয়েক সেকেন্ডের জন্য স্থায়ী হয়। এই বিঘ্নিত রক্ত প্রবাহ বিভিন্ন কারণে হতে পারে। ভাগ্যক্রমে, এটি স্বল্প সময়ের জন্য হয় এবং বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই, এটি বিপজ্জনক হয় না, তবে, এটি একটি অন্তর্নিহিত শর্তের ইঙ্গিত করে যা জীবনের ক্ষেত্রে আশঙ্কাজনক হতে পারে।

ID: 2462

Context: বেহুস বা অজ্ঞান হওয়ার লক্ষণ

Question: বেহুস বা অজ্ঞান হওয়ার সঙ্গে যুক্ত লক্ষণ ও উপসর্গগুলি কি কি?

Answer:

অজ্ঞান হওয়ার সাথে যুক্ত সাধারণ লক্ষণ ও উপসর্গগুলির মধ্যে রয়েছে:ফ্যাকাশে হয়ে যাওয়া

বমি বমি ভাব

মাথা হাল্কা লাগা

হৃদস্পন্দনের ছন্দের পরিবর্তন (আরও পড়ুন: অ্যারিথমিয়ার চিকিৎসা)

ঝাপসা দৃষ্টি অথবা দেখতে অসুবিধা হওয়া

জ্বর

ঠাণ্ডা, ঘাম যুক্ত ত্বক এর প্রধান কারণগুলি কি কি?উপরে বর্ণিত হিসাবে, অজ্ঞান হওয়ার জন্য প্রধান কারণ হল মস্তিষ্কে রক্তপ্রবাহ ব্যাহত হওয়া। এই ব্যাহত হওয়া রক্তপ্রবাহ নানা কারণে ঘটতে পারে, তার মধ্যে কিছু হল:হার্ট অ্যাটাক, হৃদযন্ত্র বিকল হয়ে যাওয়ার কারণে হৃদপিণ্ড আর রক্ত পাম্প করতে পারে না

স্ট্রোকের কারণে মস্তিষ্কে অক্সিজেনের ঘাটতি

পর্যাপ্ত পরিমাণ রক্ত বা তরল পাম্প করতে না পারা (ডিহাইড্রেশন, তীব্র ডায়রিয়া)

মস্তিষ্কে রক্ত পাঠানোর জন্য রক্তবাহিকাতে টোনের ঘাটতিবেহুস হওয়ার জন্য অন্যান্য সাধারণ কারণগুলি হল:একভাবে প্রচণ্ড তাপ লাগলে

অত্যধিক চাপ অথবা খাটুনি

দুর্বলতা অথবা রক্তের অভাব

শরীরে জলের অভাব

অতিরিক্ত অ্যালকোহলের পান

প্রাতরাশ না করার কারণে রক্তে শর্করার মাত্রা হ্রাস

ID: 2463

Context: বেহুস বা অজ্ঞান হওয়া কিভাবে নির্ণয় ও চিকিৎসা

Question: বেহুস বা অজ্ঞান হওয়া কিভাবে নির্ণয় ও চিকিৎসা করা হয়?

Answer:

বেহুস হওয়া হল বিভিন্ন চিকিৎসা অবস্থার একটি বিশিষ্ট এবং সাধারণ উপসর্গ এবং এটি নির্ণয়ের জন্য পরীক্ষার প্রয়োজন হয় না। যাইহোক, অজ্ঞানের সময়, রোগীকে ডাক্তারের কাছে নিয়ে যাওয়া হলে, ডাক্তার রোগীর স্বাস্থ্য পরীক্ষা করবেন এবং অজ্ঞান হওয়া সম্ভাব্য কারণ সনাক্ত করবেন।অজ্ঞান হওয়ার ঘটনার পুনরাবৃত্তি প্রতিরোধ করার জন্য আদেশ অনুসারে, অন্তর্নিহিত কারণের রূপরেখা বের করা গুরুত্বপূর্ণ।শরীরের যথাযথ কার্যাকারিতা পরীক্ষা করার জন্য ডাক্তার আপনাকে নির্দিষ্ট পরীক্ষা করতে পরামর্শ দিতে পারেন। এইগুলি অন্তর্ভুক্ত হতে পারে;হৃদযন্ত্রের কার্যকলাপ পরীক্ষা করতে ইলেক্ট্রোকার্ডিওগ্রাম (ইসিজি/ECG)

অ্যানিমিয়া আছে কি না, তা নিশ্চিত হতে রক্ত পরীক্ষা

ডায়াবেটিস অথবা সংক্রমণ, হরমোনজনিত রোগ, এবং অন্যান্য ব্যাপার জানার জন্য রক্ত পরীক্ষা

প্রয়োজনে মাথার খুলির এক্স-রে অথবা সিটি স্ক্যান করানোচিকিৎসা অন্তর্নিহিত কারণের উপর নির্ভর করে। যদিও বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই অজ্ঞান হওয়া কয়েক সেকেন্ডের জন্য স্থায়ী হতে পারে, যে অজ্ঞান হওয়া দীর্ঘস্থায়ী বা পুনরাবৃত্ত হয় তাদের তাড়াতাড়ি নির্ণয় করা প্রয়োজন। কারণের উপর ভিত্তি করে চিকিৎসা নাটকীয়ভাবে পরিবর্তীত হয়- একটি খাদ্যতালিকাগত পরিবর্তন, হৃদরোগ এবং ডায়াবেটিস নিয়ন্ত্রণ ইত্যাদি।

ID: 2464

Context: ফেসিয়াল প্যারালাইসিস

Question: ফেসিয়াল প্যারালাইসিস (মুখ বেঁকে যাওয়া বা মুখের প্যারালাইসিস) কি?

Answer:

ফেসিয়াল প্যারালাইসিস হল একটি মেডিকাল অবস্থা যা মুখের স্নায়ুর ক্ষতির কারণে সৃষ্ট হয়, যার ফলে, রোগী মুখ নাড়াচাড়া করে খেতে পারে না বা কথা প্রকাশ করতে পারে না।

ID: 2465

Context: ফেসিয়াল প্যারালাইসিস এর প্রধান কারণগুলি

Question: ফেসিয়াল প্যারালাইসিস এর প্রধান কারণগুলি কি কি?

Answer:

ফেসিয়াল প্যারালাইসি হঠাৎ হতে পারে আবার ধীরে ধীরেও হতে পারে। ফেসিয়াল প্যারালাইসিসের সাধারণ কারণগুলির মধ্যে রয়েছে:মুখের স্নায়ুতে সংক্রমণ অথবা প্রদাহ

মাথায় টিউমার

ঘাড়ে বা গলায় টিউমার

স্ট্রোক

মানসিক আঘাত বা মানসিক চাপ

বেলস পালসি (মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে এই ধরনের সমস্যা সচরাচর হয়ে থাকে)এটি অন্যান্য কারণেও ঘটতে পারে; যেমন;মুখে আঘাত লাগা

লাইম রোগ সংক্রমণ (পোকার দ্বারা মানুষের মধ্যে ব্যাকটেরিয়াগত সংক্রমণ ছড়িয়ে পড়ে)

ভাইরাসজনিত সংক্রমণ

ভাস্কুলাইটিসের মতো অটোইমিউন রোগগুলি

ভুলভাবে করা দাঁতের চিকিৎসা যা কিছু মুখের স্নায়ুকে ক্ষতিগ্রস্ত করে

বিরল ক্ষেত্রে, জন্মের সময় শিশুগুলিও মুখের প্যারালাইসিসে আক্রান্ত হতে পারে (যা পরবর্তীকালে সেরে যায়)

ID: 2466

Context: ফেসিয়াল প্যারালাইসিস নির্ণয় ও চিকিৎসা

Question: ফেসিয়াল প্যারালাইসিস কিভাবে নির্ণয় ও চিকিৎসা করা হয়?

Answer:

আপনি যদি উপরের উল্লিখিত লক্ষণ এবং উপসর্গগুলির মধ্যে কোনটি অনুভব করেন তবে আপনাকে অবশ্যই অবিলম্বে আপনার ডাক্তারের সাথে অ্যাপয়েন্টমেন্টটি (সাক্ষাৎ) বুক করতে হবে। মুখে অসাড় অবস্থা এবং দুর্বলতা ফেসিয়াল প্যারালাইসিসের গুরুত্বপূর্ণ প্রাথমিক উপসর্গ হিসাবে বিবেচনা করা যেতে পারে।ডাক্তার আপনার মুখের উভয় দিকের শারীরিক পরীক্ষা করবেন। তিনি আপনাকে আপনার সাম্প্রতিক স্বাস্থ্য সমস্যা এবং আঘাতের বিষয়েও প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করবেন। তারপর তিনি সিদ্ধান্ত নিতে পারেন এবং আপনাকে কিছু গুরুত্বপূর্ণ পরীক্ষা এবং রোগনির্ণয়সংক্রান্ত পদ্ধতি করার জন্য বলতে পারেন। এইগুলি অন্তর্ভুক্ত হতে পারে:রক্ত পরীক্ষা (রক্তে শর্করা বা সুগারের মাত্রা জানার জন্য)

লাইম টেস্ট

স্নায়ু ও পেশীর কাঠামো পরীক্ষা করার জন্য ইলেক্ট্রোমায়োগ্রাফি (ইএমজি)

মাথার সিটি স্ক্যান/এমআরআইরোগের কার্যকর নির্ণয়ের পরে, ডাক্তার বিভিন্ন পরামিতি (যেমন রোগীর বয়স, কারণ এবং রোগের তীব্রতা) বিবেচনা করার পরে আপনাকে প্রাসঙ্গিক চিকিৎসার বিকল্পগুলি উল্লেখ করবেন যা বিস্তৃতভাবে অন্তর্ভুক্ত:ফিজিক্যাল/স্পিচ থেরাপি

মুখের পেশীর প্রশিক্ষণের থেরাপি

মুখের পেশীর ওপর নিয়ন্ত্রণ বৃদ্ধি করতে বায়োফিডব্যাক প্রশিক্ষণ

মুখে শারীরিক ক্ষতি এবং চোখ বন্ধে সাহায্য করার ক্ষেত্রে প্লাস্টিক সার্জারি

উচ্চ রক্তচাপ মত অন্তর্নিহিত কারণের জন্য নির্দিষ্ট ওষুধগুলি খুব প্রয়োজনীয় হতে পারে।

ID: 2467

Context: ই. কোলাই সংক্রমণ

Question: ই. কোলাই সংক্রমণ কি?

Answer:

এশেরিকিয়া কোলাই, সাধারণত ই. কোলাই নামে পরিচিত, এটি আপনার অন্ত্রে প্রাকৃতিকভাবেই থাকে। 1880র দশকের শেষ দিকে আবিষ্কৃত হওয়ার সময় থেকেই, এই ব্যাকটেরিয়া ব্যবহৃত হয়েছে মাইক্রোবাইলোজি এবং বায়োটেকনোলোজির গবেষণায় কারণ এর ব্যবহার সহজ এবং এটি বায়বীয় ও অবায়বীয় দুই অবস্থাতেই বৃদ্ধির ক্ষমতা রাখে। এর 7টি ভিন্ন রোগসম্বন্ধনীয় ধরন রয়েছে, যা একাধিক সংক্রমণের জন্য দায়ী যেমন মূত্রনালীতে সংক্রমণ (ইউটিআই), রক্তে বিষক্রিয়া, মেনিনজাইটিস এবং ডায়রিয়া। ভারতে, প্রতিবছর সাধারণত ই. কোলাই সংক্রমণ দেখা যায়, ডায়রিয়া এবং ইউটিআই এর মধ্যে খুবই সাধারণ।

ID: 2468

Context: ই. কোলাই সংক্রমণ এর প্রধান লক্ষণ এবং উপসর্গগুলি

Question: ই. কোলাই সংক্রমণ এর প্রধান লক্ষণ এবং উপসর্গগুলি কি কি?

Answer:

আপনার অনেকরকম উপসর্গের অভিজ্ঞতা হতে পারে এটির উপর নির্ভর করে যে, কোন ধরনের ই. কোলাই সংক্রমণ আপনার হয়েছে। সংক্রমণের ধরণের উপর ভিত্তি করে, যে সকল লক্ষণ এবং উপসর্গগুলি দেখা যায়:শিশুদের ডায়রিয়া এবং ভ্রমণকারীদের ডায়রিয়া: জলের মতো মলত্যাগ (কখনও কখনও সাথে কফও থাকে) এবং বমি।

রক্তপ্রদাহজনিত কোলাইটিস: রক্তযুক্ত মল।

ক্রোনস রোগের সাথে ই. কোলাই সংক্রমণ: অন্ত্রে অনবরত প্রদাহ, অন্ত্রের দেওয়ালে ক্ষত এবং জলের মতো মলত্যাগ।

ইউটিআই: মূত্রত্যাগের সময় ব্যথা, প্রস্রাবে দুর্গন্ধ এবং প্রচন্ড জ্বর।

নবজাতকের মেনিনজাইটিস: সদ্যোজাতদের প্রচন্ড জ্বরের লক্ষণ।

ID: 2469

Context: ই. কোলাই সংক্রমণ এর প্রধান কারণগুলি

Question: ই. কোলাই সংক্রমণ এর প্রধান কারণগুলি কি কি?

Answer:

সংক্রমণের প্রধান কারণ হল রোগজনক ই. কোলাইয়ের কারণে খাবার এবং জল দূষিত হওয়া। যদিও ই. কোলাই অন্ত্রের ভিতরে বন্ধুত্বপূর্ণ একটি ব্যাকটেরিয়া, তবে এটি রোগজনক প্রজাতির হওয়ার কারণে মানুষের দেহে ব্যাপক ক্ষতি সৃষ্টি করতে পারে। এগুলি এমনকি সুস্থ শরীরেও সংক্রমণ তৈরী করতে এবং ছড়িয়ে পড়তে পারে এই সকল উপায়ে:দূষিত জল পান

দূষিত খাবার খাওয়া

ই. কোলাই দ্বারা দূষিত মাটিতে উৎপন্ন সব্জি খাওয়ার কারণে

অস্বাস্থ্যকর খাদ্যাভ্যাস

হাসপাতালের দূষিত আবর্জনার প্রবাহে থাকা ই. কোলাই

ID: 2470

Context: ই. কোলাই সংক্রমণ নির্ণয় এবং চিকিৎসা

Question: ই. কোলাই সংক্রমণ কিভাবে নির্ণয় এবং এর কিভাবে চিকিৎসা করা হয়?

Answer:

বিভিন্ন ই. কোলাই সংক্রমণ নির্ণয়ের জন্য প্রধানত নমুনায় উপস্থিত ব্যাকটেরিয়া বা তার বিষের পরীক্ষা করা হয়। সংক্রমণের উপর নির্ভর করে, যেসব নির্ণয়কারক পরীক্ষাগুলি করা হয়:ইউটিআই: মূত্র পরীক্ষা এবং মূত্র অনুশীলন।

ডায়রিয়া: মলের নমুনা পরীক্ষা।

নবজাতকের মেনিনজাইটিস: সেরিব্রোস্পাইনাল ফ্লুইড (সিএসএফ) পরীক্ষা এবং অনুশীলন।

ক্রোনস রোগ: অন্ত্রের ক্ষত পরীক্ষার জন্য প্রচলিত রেডিওলজি এবং আলসারেটিভ কোলাইটিস থেকে তাদের আলাদা করা, পাশাপাশি ই. কোলাইয়ের উপস্থিতি নিশ্চিত করার জন্য মলের পরীক্ষা করা হয়।ই. কোলাই যেহেতু অনেকগুলি ওষুধ প্রতিরোধকারী ক্ষমতাযুক্ত, তাই এর চিকিৎসা কঠিন হতে পারে। ই. কোলাই সংক্রমণের চিকিৎসা পদ্ধতিগুলি হল:যুক্তিসঙ্গতভাবে অ্যান্টিবায়োটিকের ব্যবহার

প্রোবায়োটিকস

ব্যাকটেরিওফেজ থেরাপি

অ্যান্টিমাইক্রোবিয়াল পেপ্টাইডওষুধের সাথে, নিজের যত্ন নিতে হবে যেমন পরিমান মতো জল খাওয়া এবং বিশ্রাম নেওয়া উপকারী হতে পারে।প্রতিরোধমূলক ব্যবস্থাগুলি হল সঠিক স্বাস্থ্যবিধি মেনে চলা, সতর্কভাবে খাবার খাওয়ার অভ্যাস এবং পরিস্কার-পরিচ্ছন্ন থাকা।

ID: 2471

Context: ওষুধের অপব্যবহার (ওষুধের ভুল ব্যবহার ]

Question: ওষুধের অপব্যবহার (ওষুধের ভুল ব্যবহার) কি?

Answer:

ওষুধের অপব্যবহার ওষুধের উপর এক ধরণের শারীরিক ও মানসিক নির্ভরশীলতাকে বোঝায়, যাতে কোন একটি ব্যক্তি কোন ওষুধ বারংবার ব্যবহার করতে বাধ্য হয়। সারা বিশ্ব জুড়ে ওষুধের অপব্যবহার বর্তমানে কিশোর ও যুবকদের জন্য সবচেয়ে মারাত্মক সমস্যা। এটা দেখা গেছে যে প্রায় সমস্ত রকম আসক্তি-সৃষ্টিকারী ওষুধ মস্তিষ্কে অধিক উত্তেজনা সৃষ্টি করে এমন কিছু স্নায়ুগত সংকেত প্রেরণ করে যাতে সেই ব্যক্তি একটি আনন্দ-চঞ্চল অবস্থা উপলব্ধি করে ফলে সেই ব্যক্তি বারবার একই ওষুধ গ্রহণ করতে চায়।

ID: 2472

Context: ওষুধের অপব্যবহার প্রধান লক্ষণ ও উপসর্গগুলি

Question: ওষুধের অপব্যবহার প্রধান লক্ষণ ও উপসর্গগুলি কি কি?

Answer:

ওষুধের অপব্যবহার ভারতে একটি অন্যতম সমস্যা এবং এটি সমাজের যেকোনো তলার মানুষদের প্রভাবিত করে। বেশীরভাগ সময়ে, নিজের অজান্তেই, যুবক-যুবতীরা প্রেসক্রিপশন করা বা না করা ওষুধের প্রতি অথবা একটি অবৈধ্য আসক্তিকারী ওষুধজাতীয় বস্তুর প্রতি আকৃষ্ট হয়। ওষুধের অপব্যবহারের উপসর্গগুলি তিন রকমের হয়, শারীরিক, আচরণগত ও জৈবিক।শারীরিক উপসর্গগুলি:বেশি ঘুমানো অথবা অনিদ্রায় ভোগা

চোখ লাল হয়ে যাওয়া

চোখের তারা প্রসারিত বা সংকুচিত হয়ে থাকা

দেহের ওজনে হঠাৎ পরিবর্তন

বমি

ক্ষুধামান্দ্যআচরণগত লক্ষণ: ওষুধের অপব্যবহারে রোগীর কিছু অভ্যাস বা ব্যবহার বদলে যায়। নিম্নের উপসর্গগুলি চিহ্নিত করতে পারলে অবস্থার অবনতি নিয়ন্ত্রণ করা যেতে পারে।সামাজিক যোগাযোগ বদল হওয়া

বিষণ্ণতা

আক্রমণাত্মক ব্যবহার

বিরক্তি বেড়ে যাওয়া

একলা থাকার ইচ্ছা

পরিবার পরিজনকে পরিহার করাজৈবিক উপসর্গগুলি: ওষুধের অপব্যবহার শরীরের মারাত্মক ক্ষতি করে। ওষুধের অপব্যবহারে নিম্নলিখিত জটিলতাগুলি সৃষ্টি হতে পারে:লিভার সিরোসিস

হেপাটাইটিস

এইচআইভি সংক্রমণ

যক্ষ্মারোগ

মুখের ভিতরের স্বাস্থ্যসম্বন্ধনীয় সমস্যা

ID: 2473

Context: ওষুধের অপব্যবহার এর প্রধান কারণগুলি

Question: ওষুধের অপব্যবহার এর প্রধান কারণগুলি কি কি?

Answer:

ওষুধের অপব্যবহার সংক্রান্ত জাতীয় সংস্থা অনুযায়ী, অ্যানাবোলিক স্টেরয়েড, বিনা প্রেসক্রিপশনে কিনতে পারা যায় এরকম ওষুধ, হেরোইন, মেথামফেটামাইন ইত্যাদি অনেক কিছুই অপব্যবহারের ওষুধ হতে পারে। ওষুধের অপব্যবহারের কারণ সামাজিক কিংবা মানসিক হতে পারে। যে যে কারণে কেউ ওষুধের অপব্যবহার করার চেষ্টা করে সেগুলি হলো:কুসঙ্গে পড়ে ওষুধের অপব্যবহারে উৎসাহিত হওয়া

নিজের ভাইবোন কিংবা পরিবারের কেউ যদি আগে থেকেই মাদকাসক্ত হয়

অপব্যবহার করা যাবে এমন জিনিস একেবারেই কৈশোর অবস্থায় হাতে পেয়ে যাওয়া

একাকিত্ব ও বিষণ্ণতা

মা-বাবার দ্বারা সঠিকভাবে রক্ষণাবেক্ষণ না হওয়া কিংবা কোন পারিবারিক সমস্যার মধ্যে দিয়ে চলা

ID: 2474

Context: ওষুধের অপব্যবহার নির্ণয় এবং চিকিৎসা

Question: ওষুধের অপব্যবহার কিভাবে নির্ণয় করা হয় এবং এর চিকিৎসা কি?

Answer:

ব্যক্তির উপসর্গগুলি দেখে ওষুধজাতীয় বস্তুর প্রতি তার আসক্তির বিষয়টি নির্ণয় করা যেতে পারে। বিশদে অনুসন্ধান করে দেখার জন্য এই পরীক্ষাগুলি জরুরি:চিকিৎসকের বিভিন্ন প্রশ্নের সঠিক উত্তর দেওয়া

রক্ত পরীক্ষা

মূত্রের পরীক্ষাওষুধের অপব্যবহার রোগটি সম্পূর্ণ ভাবে সারিয়ে তোলা যায়। সঠিকভাবে প্রস্তুত করা পুনর্বাসন পদ্ধতির মাধ্যমে রোগীকে সম্পূর্ণ ভাবে সারিয়ে তোলা সম্ভব। যে প্রধান দুটি উপায়ে ওষুধের অপব্যবহার রোগটি সারিয়ে তোলা যায় তা হল চিকিৎসকের সাথে পরামর্শ ও নিয়মিত ওষুধ খাওয়া। মানসিক রোগের বিশেষজ্ঞদের সঠিক পরামর্শ ও নিয়মিত ওষুধ খাওয়া বিস্ময়কর ফলদান করতে পারে। ওষুধের অপব্যবহার রোধের জন্য যেসব ওষুধ ব্যবহার করা হয়:বিষণ্ণতা কমানোর ওষুধ

মনোরোগের ওষুধ

অ্যালকোহলের প্রতিষেধক

আফিঙের নেশার প্রতিষেধকজীবনশৈলীর কিছু পরিবর্তন যেমন প্রাত্যহিকভাবে যোগাসন ও ধ্যান মনের শান্তি ফিরিয়ে আনতে পারে যাতে আরো সহজে সেরে ওঠা যায়। যদিও নেশার হাত থেকে সম্পূর্ণ ভাবে নিস্তার পাওয়া একটি দীর্ঘ প্রক্রিয়া, কিন্তু তারপর এক সম্পূর্ণ স্বাভাবিক ও স্বাস্থ্যকর জীবনযাপন করা সম্ভব। নিয়মিত চিকিৎসকের পরামর্শ নেওয়া এবং সঠিক চিকিৎসা পদ্ধতি অনুসরণ করে চলা রোগীকে পুরোপুরি সারিয়ে তোলে। ওষুধের অপব্যবহারকারীর সম্পূর্ণভাবে অভ্যাস ত্যাগ করতে পরিবার পরিজনের সহযোগিতা এক্ষেত্রে খুবই প্রয়োজনীয়।

ID: 2475

Context: ইউরিনারি রিটেনশন বা প্রস্রাব চেপে রাখা

Question: ইউরিনারি রিটেনশন বা প্রস্রাব চেপে রাখা কাকে বলে?

Answer:

ইউরিনারি রিটেনশন বা প্রস্রাব চেপে রাখা বলতে এমন এক অবস্থাকে বোঝায় যেখানে একজন ব্যক্তি সন্তোষজনকভাবে প্রস্রাব করতে পারে না। সেই ব্যক্তি প্রস্রাবের বেগ অনুভব করতে পারে ও তার মূত্রথলি যে পুরো ভর্তি তাও বুঝতে পারে, কিন্তু পুরোপুরি প্রস্রাব করে উঠতে পারে না।তীব্র প্রস্রাব চেপে রাখার সমস্যা হঠাৎ করেই হতে পারে এবং যন্ত্রণাকর উপসর্গ দেখা দিতে পারে, ফলে তাৎক্ষণিক চিকিৎসার প্রয়োজন হয়। যাইহোক, বেশ কয়েক বছর যাবৎ প্রস্রাব চেপে রাখার এই সমস্যা থাকলে এবং কোনও যন্ত্রণাকর উপসর্গ যদি না থাকে, তাহলে সেই ব্যক্তির আস্তে আস্তে মূত্রথলি পুরোপুরি শূন্য করার ক্ষমতা চলে যায়।

ID: 2476

Context: ইউরিনারি রিটেনশন এর প্রধান লক্ষণ ও উপসর্গগুলি

Question: ইউরিনারি রিটেনশন এর প্রধান লক্ষণ ও উপসর্গগুলি কি কি?

Answer:

তীব্র প্রস্রাব চেপে রাখার সমস্যার উপসর্গগুলি নিম্নরূপ:প্রস্রাব করতে না পারা

প্রস্রাবের বেগ অনুভব করা

তলপেটে ব্যাথা

তলপেট স্ফীত হয়ে যাওয়াদীর্ঘকাল যাবৎ প্রস্রাব চেপে রাখার সমস্যার উপসর্গগুলি হল:প্রস্রাব নির্গমণে সমস্যা

প্রস্রাবের অপেক্ষাকৃত সরু ধারা

একবার প্রস্রাব করার পর তাৎক্ষনিকভাবে পুনরায় করার তাগিদ

প্রস্রাব করার পর তলপেটে হালকা অস্বস্তি

ID: 2477

Context: ইউরিনারি রিটেনশন এর প্রধান কারণগুলি

Question: ইউরিনারি রিটেনশন এর প্রধান কারণগুলি কি কি?

Answer:

প্রস্রাব চেপে রাখার সমস্যার অনেকগুলি কারণ আছে এবং এর অন্তর্নিহিত কারণগুলি সূদুর প্রসারী:শ্রোণীচক্র অথবা যৌনাঙ্গে আঘাত

স্নায়ুর সমস্যা

আক্রান্ত স্থানে কোন সাম্প্রতিক সার্জারি

শারীরিক অবস্থা, যেমন, ডায়াবেটিস বা মাল্টিপল স্কেলেরোসিস

মূত্রথলির পেশীগুলির দূর্বলতা

কোষ্ঠকাঠিন্য

কিছু ওষুধের প্রভাবে

মূত্রনালীর সংক্রমণ

মুত্রনালীতে প্রতিবন্ধকতা

ID: 2478

Context: ইউরিনারি রিটেনশন নির্ণয় এবং চিকিৎসা

Question: ইউরিনারি রিটেনশন এর রোগ নির্ণয় ও চিকিৎসা কিভাবে হয়?

Answer:

তীব্র প্রস্রাব চেপে রাখার সমস্যাজনিত রোগ নির্ণয়ের ক্ষেত্রে, ডাক্তার এইসকল পরীক্ষাগুলি করতে পারেনশারীরিক পরীক্ষা

সিস্টোস্কোপি

সিটি স্ক্যান

ইউরোডাইনামিক টেস্ট (যে টেস্টে ধরা পড়ে যে মূত্রথলি ও মূত্রনালী কতটা ভালোভাবে মূত্র সঞ্চিত রাখতে ও মুক্ত করতে পারে)

ইলেক্ট্রোমায়োগ্রাফী (আক্রান্ত স্থানের স্নায়ুর কার্যকলাপ পরিমাপ ও বিশ্লেষণ)ডাক্তার এইসকল পদ্ধতিগুলি অবলম্বন করে প্রস্রাব চেপে রাখার সমস্যার চিকিৎসা করতে পারেন:মুত্রনালীর প্রসারণ (মুত্রনালীর সম্মুখভাগ প্রসারিত করা যাতে প্রস্রাব সঠিকভাবে নিষ্কাশিত হতে পারে)

মূত্রনালীর স্টেন্ট প্রতিস্থাপন (একটি কৃত্রিম নল সন্নিবিষ্ট করে মূত্রনালীর প্রসারণ ঘটানো)

প্রস্টেটের ওষুধ (প্রস্রাব চেপে রাখার উপসর্গগুলি দূর করতে প্রস্টেট গ্রন্থির বৃদ্ধি রোধের ওষুধ দেওয়া হয়)

মূত্রথলির নিষ্কাশন (একটি নল দ্বারা মূত্রথলি খালি করা হয়)

সার্জারি বা শল্যচিকিৎসা

ID: 2479

Context: ডায়াবেটিক নিউরোপ্যাথি

Question: ডায়াবেটিক নিউরোপ্যাথি কি?

Answer:

ডায়াবেটিক নিউরোপ্যাথি হল একটি স্নায়বিক ব্যাধি যা সাধারণত ডায়াবেটিসের জটিলতা হিসাবে দেখা যায়। এটি শুধুমাত্র হাত এবং পায়ের উপসর্গগুলি তৈরি করে। প্রায় 50 শতাংশ ডায়াবেটিক জনগণের ডায়াবেটিক নিউরোপ্যাথি আছে এবং এটি ডায়াবেটিসের দীর্ঘস্থায়ী ক্ষেত্রে বেশি সম্ভাবনাময়। আপনার রক্তের গ্লুকোজ স্তর বজায় রাখলে তা রোগ প্রতিরোধ করতে সাহায্য করবে।ডায়াবেটিক নিউরোপ্যাথি নিম্নলিখিত ধরনগুলির হতে পারে:পেরিফেরাল নিউরোপ্যাথি যা হাত এবং পায়ের টনটনানি, ব্যথা, বা অসাড়তা সৃষ্টি করে

অটোনমাস নিউরোপ্যাথি যা স্নায়ুতন্ত্রকে প্রভাবিত করে আপনার শরীরকে নিয়ন্ত্রণ করে

ফোকাল নিউরোপ্যাথি যা হাত, পা, মাথা এবং ধড়ের একটি একক স্নায়ুকে প্রভাবিত করে

প্রক্সিমাল নিউরোপ্যাথি, এটা পিছন দিকে হয়, যা হিপ, পাছা, বা উরুর স্নায়ুতন্ত্রকে প্রভাবিত করে। এটি শরীরের এক দিককে প্রভাবিত করে এবং কখন কখন অন্য দিককে প্রভাবিত করে। এটি প্রচন্ড যন্ত্রণা দেয় এবং লক্ষণীয় ওজন কমায়।

ID: 2480

Context: ডায়াবেটিক নিউরোপ্যাথি এর প্রধান লক্ষণ এবং উপসর্গগুলি

Question: ডায়াবেটিক নিউরোপ্যাথি এর প্রধান লক্ষণ এবং উপসর্গগুলি কি কি?

Answer:

ডায়াবেটিক নিউরোপ্যাথির উপসর্গগুলি তার ধরনের উপর নির্ভর করে।পেরিফেরাল নিউরোপ্যাথির ক্ষেত্রে, নিম্নলিখিত উপসর্গগুলি দেখা যায়:পায়ের পাতার মধ্যে সংবেদন হারানো বা জ্বলন বা প্রচন্ড ব্যথা

ভারসাম্য বা সমন্বয় হারানো

স্পর্শে সংবেদনশীলতা বর্ধিত হওয়াযেহেতু অটোনমাস নিউরোপ্যাথি অভ্যন্তরীণ অঙ্গগুলির স্নায়ুকে প্রভাবিত করে, তার উপসর্গগুলি হল:হজমে সমস্যা

রক্তচাপ কমা

অসংযম

অজ্ঞান হওয়া এবং মাথা ঘোরা

অতিরিক্ত ঘাম

ব্যথার উপলব্ধি হ্রাসফোকাল নিউরোপ্যাথি একটি একক স্নায়ুকে প্রভাবিত করে এবং সেই স্নায়ুর উপর ভিত্তি করে নিম্নলিখিত উপসর্গগুলি দেখা যায়:উরুর ব্যথা

পিঠের নিচে প্রচন্ড ব্যথা (আরো পড়ুন: পিঠের ব্যথার চিকিৎসা)

বুকের ব্যথা একটি হার্ট অ্যাটাকের লক্ষণ

দৃষ্টির সমস্যা, বিশেষ করে চোখের ফোকাসে

শোনার সমস্যা

ID: 2481

Context: ডায়াবেটিক নিউরোপ্যাথি এর প্রধান কারণগুলি

Question: ডায়াবেটিক নিউরোপ্যাথি এর প্রধান কারণগুলি কি কি?

Answer:

ডায়াবেটিক নিউরোপ্যাথির সঠিক কারণ এখনো পরিষ্কার নয়। যাইহোক, যে কয়েকটি কারণ দায়ী সেগুলি হল:রক্তে গ্লুকোজের মাত্রা বাড়ার ফলে স্নায়ুতে রাসায়নিক পরিবর্তন হয়, ক্ষতিকর স্নায়ু এবং রক্ত ধমনীগুলি যা এই স্নায়ুতে পুষ্টি বহন করে।

ডায়াবেটিক নিউরোপ্যাথির জেনেটিক বৈশিষ্ট্যগুলির কারণে উত্তরাধিকারসূত্রে পাওয়াও হতে পারে।

ID: 2482

Context: ডায়াবেটিক নিউরোপ্যাথি নির্ণয় এবং চিকিৎসা

Question: ডায়াবেটিক নিউরোপ্যাথি কিভাবে নির্ণয় এবং চিকিৎসা করা হয়?

Answer:

সম্পূর্ণ শারীরিক পরীক্ষার পর, আপনার ডাক্তারপেশীর শক্তি এবং প্রতিক্রিয়া চেক করতে পারেন

অবস্থান, কম্পন, তাপমাত্রা, এবং হালকা স্পর্শতে পেশীর সংবেদনশীলতা পরীক্ষা করতে পারেন

যে অতিরিক্ত পরীক্ষাগুলি করার জন্য অনুরোধ করা হয়, তা হল ইলেক্ট্রোমায়োগ্রাফি, নার্ভ সঞ্চালন গবেষণা, আল্ট্রাসাউন্ড, এবং নার্ভ বায়োপসি।চিকিৎসা রোগীর বয়স, স্বাস্থ্য এবং চিকিৎসার ইতিহাসের উপর নির্ভর করে। ব্যথা-উপশমক ওষুধগুলি দিয়ে রোগীর ব্যথা এবং অস্বস্তি সরানো হয়। অ্যান্টিডিপ্রেসেন্ট ওষুধ, টপিকাল ক্রিম, ট্রান্সকিউট্যানিয়াস বৈদ্যুতিক স্নায়ু উদ্দীপনা থেরাপি, রিলাক্সেশন থেরাপি, এবং আকুপাংচার স্নায়ুতে অতিরিক্ত ক্ষতি প্রতিরোধ করতে ব্যবহৃত হয়।

ID: 2483

Context: ডেলিরিয়াম (ভুল বকা)

Question: ডেলিরিয়াম (ভুল বকা) কি?

Answer:

ডেলিরিয়াম হল মস্তিষ্কের ক্রিয়ার হঠাৎ অবক্ষয় যা মানসিক কর্মহীনতা সৃষ্টি করে। ডেলিরিয়ামের অবস্থায়, একজন ব্যক্তি দ্রুত মানসিক অবস্থার পরিবর্তন অনুভব করেন। এটিকে তীব্র বিভ্রান্তিকর অবস্থাও বলা হয়।

ID: 2484

Context: ডেলিরিয়াম প্রধান লক্ষণ এবং উপসর্গগুলি

Question: ডেলিরিয়াম প্রধান লক্ষণ এবং উপসর্গগুলি কি কি?

Answer:

মানসিক অবস্থার দ্রুত পরিবর্তন হয়ে যাওয়াই হল ডেলিরিয়ামের বৈশিষ্ট্য। এর মধ্যে এই পরিবর্তনগুলি দেখা যায়:হঠাৎ ভেবাচেকা (বিভ্রান্তি)

সতর্কতা এবং মন‌োযোগ

অনুভূতি এবং উপলব্ধি

পেশীর সমন্বয়: ডেলিরিয়ামের অবস্থায়, একজন খুব ধীরে ধীরে চলতে পারে (হাইপোঅ্যাক্টিভ) বা অস্থির দেখাতে পারে, উত্তেজিতভাবে চলাফেরা (হাইপারঅ্যাক্টিভ)

ঘুমের ধরন বা সূচি

আবেগ এবং ব্যক্তিত্ব

ঘাঁটান চেতন

জ্ঞানীয় দক্ষতায় হানিঅন্যান্য উপসর্গগুলির মধ্যে রয়েছে:প্রস্রাবে অসংযম

স্বল্প-মেয়াদি স্মৃতি এবং স্মরণ করায় হ্রাসপ্রাপ্তি (আরও পড়ুন: স্মরণশক্তি হারানোর কারণ)

চেতনা অথবা সচেতনতা ঢেকে যাওয়া

মতামত প্রকাশের সময় অসংগঠিত চিন্তাভাবনার প্রকাশ পায়

স্নায়ুতন্ত্রের মধ্যে পরিবর্তনের দ্বারা কম্পনের-মত আন্দোলন প্রকাশ পায়

মনোযোগে অসুবিধা

ID: 2485

Context: ডেলিরিয়াম (ভুল বকা) প্রধান কারণগুলি

Question: ডেলিরিয়াম (ভুল বকা) প্রধান কারণগুলি কি কি ?

Answer:

ডেলিরিয়াম হল একটি বহুবিধ অবস্থা।:গৌণ অবস্থা থেকে প্রধান অবস্থা পর্যন্ত ডেলিরিয়াম হতে পারে, যার মধ্যে রয়েছে:

ডিমেনশিয়া (একটি অপরিবর্তনীয়, ধীর গতির ব্যাধি যা একটি ব্যক্তির স্মৃতিকে প্রভাবিত করে)

স্ট্রোক; স্নায়ুগত সংক্রমণ/প্রদাহের মত জীবন-নাশক রোগগুলি যেমন মেনিনজাইটিস, এনসেফালাইটিস, এবং মস্তিষ্কে অধিমাংস; মস্তিষ্কে টিউমার, মস্তিষ্কে আঘাত

গুরুতর সার্জারি

কিছু সাধারণ, বিপরীত কারণগুলি মধ্যে রয়েছে: (অস্নায়ুবিক কারণ)

রাসায়নিকের ভারসাম্যহীনতা যা স্নায়ুর সংকেতকে প্রেরণ করে।

ড্রাগের অতিরিক্ত মাত্রা, ড্রাগের উল্টো প্রতিক্রিয়া, বা ড্রাগের মিথষ্ক্রিয়া।

মদের অপব্যবহার। যখন একজন অভ্যসগত মদ্যপান ছাড়ার চেষ্টা করেন তখন অপসারণের উপসর্গ হিসাবেও ডেলিরিয়াম হতে পারে।

ইলেকট্রোলাইট ইমব্যালেন্স হরমোনগত রোগ।

পদ্ধতিগত সংক্রমণ, মূত্রনালীর সংক্রমণ, শ্বাসযন্ত্রের অন্ত্র সংক্রমণ।

ID: 2486

Context: ডেলিরিয়াম নির্ণয় এবং চিকিৎসা

Question: ডেলিরিয়াম (ভুল বকা) কিভাবে নির্ণয় এবং চিকিৎসা করা হয়?

Answer:

ডেলিরিয়ামের রোগ নির্ণয়ের জন্য ব্যক্তিটির চিকিৎসার ইতিহাসের পাশাপাশি রোগীর পর্যবেক্ষণ অত্যাবশ্যক।স্নায়ুর কার্যকারিতা মূল্যায়ন করার জন্য আপনার ডাক্তারের আপনাকে কিছু পরীক্ষার ক্রমের মধ্যে দিয়ে নিয়ে যাওয়ারও প্রয়োজন হতে পারে।

জ্ঞানীয় কার্যকারিতার পরীক্ষা

উপলব্ধি এবং গতিদায়ক দক্ষতা মূল্যায়নের জন্য পরীক্ষা।

আপনার ডাক্তার কিছু সহজ এবং বৈশিষ্ট্যসূচক প্রশ্নগুলির সাথে আপনার চিন্তাভাবনার মূল্যায়নও করতে পারেন।

অন্যান্য অনুসন্ধানগুলির মধ্যে রয়েছে:

বুকের এক্সরে

ইইজি(ইলেকট্রোএন্সেফালোগ্রাম)

সেরিব্রোস্পাইনাল ফ্লুইড পরীক্ষা

মস্তিষ্কের এমআরআই অথবা সিটি স্ক্যান

মূত্র পরীক্ষাগুলিডেলিরিয়াম ডিমেনশিয়ার অনুরূপ উপসর্গগুলি দেখায়। ডেলিরিয়ামের আকস্মিক সংঘটন এবং চাক্ষুষ হ্যালুসিনেশন যা ডিমেনশিয়া থেকে এটাকে পার্থক্য করতে সাহায্য করে।ডেলিরিয়ামের জন্য চিকিৎসার নিম্নাবস্থিত কারণসূচক বিষয়গুলি হল:নন-ফার্মাকোলজিকাল পদ্ধতিগুলি হল:

সহায়ক যত্ন: রোগীকে মেডিকেল ও হাসপাতালের যত্ন দেওয়া উচিত, সামাজিক চাহিদায় এবং রোগীর আশেপাশের পরিবেশের দিকে লক্ষ্য দেওয়া প্রয়োজনীয়। একটি স্থিতিশীল এবং সুপরিচিত পরিবেশ তৈরি করে রোগীকে সাহায্য করা যায়।

ঘুমের রুটিন মেনে চলা উচিত। ঘুম সম্পর্কিত সমস্যাগুলি দুধ, ম্যাসেজ বা ভেষজ চায়ের সাথে চিকিৎসা করা উচিত।

ফিজিওথেরাপি এবং প্রতিদিনের হাঁটা, গতিদায়ক দক্ষতাগুলির উন্নতিতে সাহায্য করে।

বাড়িতে একজন পেশাদারী নার্স রাখা সবসময়ের জন্য ভালো।

আচরণ পরিবর্তনের থেরাপি।

ফার্মাকোলজিকাল থেরাপিগুলি হল:

সংক্রমণ, ব্যথা, দীর্ঘস্থায়ী অসুস্থতা এবং অ্যালার্জির মত অন্তর্নিহিত রোগের চিকিৎসার জন্য ওষুধ।

এন্টিসাইকোটিক ড্রাগ।

মাঝে মাঝে, উত্তেজনা এবং অস্থিরতার ক্ষেত্রে হালকা সিডেটিভস্ (ঘুমের ওষুধ) ব্যবহার করা যেতে পারে।

ID: 2487

Context: সিস্টাইটিস

Question: সিস্টাইটিস কি?

Answer:

সিস্টাইটিস হল একটা সাধারণ সংক্রমণ যা ইউরিনারি থলিতে প্রদাহ সৃষ্টি করে। এটা একটা নিম্ন মূত্রনালীর সংক্রমণ এবং এটা সাধারণত পুরুষদের চেয়ে মহিলাদের মধ্যে বেশী দেখা যায়। এটি 25 বছর এবং তার বেশি বয়সের মানুষকে প্রভাবিত করে যার ফলে হাসপাতালে ভর্তি হতে হয়। বিশ্বব্যাপী 20 মিলিয়নের বেশী মানুষের সিস্টাইটিস আছে।

ID: 2488

Context: সিস্টাইটিস এর প্রধান লক্ষণ ও উপসর্গগুলি

Question: সিস্টাইটিস এর প্রধান লক্ষণ ও উপসর্গগুলি কি কি?

Answer:

সাধারণ লক্ষণ এবং উপসর্গগুলি অন্তর্ভুক্ত হতে পারে:প্রস্রাব করার স্থির এবং প্রবল ইচ্ছা (আরো পড়ুন : ঘনঘন প্রস্রাবের কারণ)

প্রস্রাব করার সময় মূত্রনালীর ভেতরে জ্বালা অনুভব

ঘোলাটে ও প্রচন্ড গন্ধযুক্ত প্রস্রাব

পেলভিক (শ্রোণী) স্থানে অস্বস্তি

হাল্কা জ্বর

প্রস্রাবে রক্ত

ID: 2489

Context: সিস্টাইটিস এর প্রধান কারণগুলি

Question: সিস্টাইটিস এর প্রধান কারণগুলি কি কি?

Answer:

এটা প্রায়শই একটা ব্যাকটেরিয়াগত সংক্রমণের কারণে হয়। এর চিকিৎসা না করালে, সংক্রমণটি উপরের অংশে গমন করতে পারে ও পাইলোনেফ্রাইটিসের নেতৃত্বে কিডনিকে প্রভাবিত করে। মহিলাদের তাদের ছোট ইউরেথ্রার (মূত্রনালীর) কারণে পুরুষদের চেয়ে ঘনঘন সংক্রামিত হতে পারে।অন্যান্য কারণগুলি মধ্যে রয়েছে:মূত্রস্থলীর পদ্ধতিতে ত্রুটি।

কোনো বাইরের পদার্থ যেটা মূত্রস্থলীকে উত্তেজিত করে।

মূত্রস্থলীতে স্নায়ুর কর্মহীনতা।

ইমিউন সিস্টেমের ব্যাধির কারণে সিস্টাইটিস হতে পারে।

মূত্রস্থলীতে পাথরকখনও কখনও, এটি মাদকদ্রব্য, রেডিয়েশন থেরাপি অথবা মহিলাদের জন্য হাইজিন স্প্রে-র মত নির্দিষ্ট উত্তেজক অথবা স্পারমিসাইডসের ব্যবহারের ফলে হতে পারে। ক্যাথেটার-যুক্ত মূত্রনালীর সংক্রমণও সাধারণ।

ID: 2490

Context: সিস্টাইটিস

Question: সিস্টাইটিস এর নির্ণয় এবং চিকিৎসা কিভাবে করা হয়?

Answer:

প্রাথমিকভাবে, উপসর্গগুলি, তাদের সময়সীমা, এবং দৈনন্দিন রুটিনের উপর প্রভাব ফেলে অন্যান্য সম্ভাব্য শর্তগুলিকে বাতিল করার জন্য মূল্যায়ন করতে পারে। রোগ নির্ণয়ের মধ্যে রয়েছে:শারীরিক ও স্নায়বিক পরীক্ষা

ব্যথার মূল্যায়ন এবং প্রস্রাব এড়ানোর পরীক্ষা

প্রস্রাব বিশ্লেষণ

প্রস্রাব কালচার

সিস্টোস্কোপি- মূত্রথলির ভিতরটা দেখার জন্য একটি ক্যামেরা-লাগানো টিউব ব্যবহার করা হয়

পেলভিসে (শ্রোণীতে) আল্ট্রাসোনোগ্রাফি ও এক্স-রের মত ইমেজিং পরীক্ষাসিস্টাইটিসের চিকিৎসায় অঙ্গটিকে সমূলে সারানোর জন্য অ্যান্টিবায়োটিকের ব্যবহার করা হয়। হালকা সংক্রমণের জন্য, অ্যান্টিবায়োটিক কোর্স নারীদের জন্য 3 দিন এবং পুরুষদের জন্য 7-14 দিনের বেশি দেওয়া হতে পারে না। এমনকি যদি উপসর্গগুলি আরও ভাল হতে শুরু করে তাহলেও পূর্ণ অ্যান্টিবায়োটিক কোর্স গ্রহণ করা বাধ্যতামূলক। ওভার-দ্য-কাউন্টার ওষুধগুলি এবং অ্যাসকর্বিক অ্যাসিডের মত কিছু অ্যাসিডিক পণ্য আছে যা সংক্রমিত এজেন্টগুলিকে নাশ করে।জীবনধারা পরিবর্তনের মধ্যে রয়েছে:প্রচুর জল খাওয়া

সংক্রমণ প্রতিরোধ করার জন্য অভ্যন্তরীণ এলাকায় সম্পূর্ণ ব্যক্তিগত স্বাস্থ্যবিধি ও পরিচ্ছন্নতা বজায় রাখা

অস্বস্তিকর কারণ হতে পারে যে খাবারগুলি তাদের তালিকা তৈরি করা এবং সেগুলি এড়িয়ে চলা।

মশলাযুক্ত খাবার, চকলেট এবং কফির মত কিছু খাবার এড়িয়ে চলা।

প্রস্রাব করার সময় প্রস্রাব ধরে রাখার চেষ্টা করে মূত্রাশয়ের ক্ষমতা বাড়ান।

প্রস্রাব করার পর, বিশেষতঃ মহিলাদের মলদ্বার থেকে মূত্রনালীর সংক্রমণ ছড়ানো এড়াতে সামনে থেকে পিছনে অবশ্যই মুছে নেবেন।

বাথটাবের বদলে ঝরনার ব্যবহার সংক্রমণ কমাতে পারে।সিস্টাইটিসে যদি সতর্কতা না নেওয়া হয় তবে এটা অস্বস্তিকর হতে পারে, কিন্তু সাধারণত এটি যথাযথ চিকিৎসা করার সাথে সাথে সহজেই এবং কার্যকরভাবে এটা সারিয়ে তোলা যেতে পারে।

ID: 2491

Context: সিস্টিক ফাইব্রোসিস

Question: সিস্টিক ফাইব্রোসিস কি?

Answer:

সিস্টিক ফাইব্রোসিস হল একটা জেনেটিক অসুখ যা ধীরে ধীরে বিভিন্ন অঙ্গকে আক্রান্ত করে, বিশেষ করে ফুসফুসের দ্বারা এখানে মিউকাসের সঞ্চয় হয়। এটা পৌষ্টিক তন্ত্রে এবং জনন তন্ত্রের মধ্যেও প্রকট হতে দেখা যায়। এটা একটা প্রাণঘাতী অবস্থা যাতে বিশ্বময় প্রায় 70,000 লোক আক্রান্ত হয়। জাতিগত দলের মধ্যে, এটা ককেশীয়ানদের মধ্যে ব্যাপকভাবে দেখা যায়। ভারতে 10,000 জন্মগ্রহণকারীর মধ্যে 1 জনের সিস্টিক ফাইব্রোসিস রোগ হতে দেখা যায়।

ID: 2492

Context: সিস্টিক ফাইব্রোসিস এর প্রধান লক্ষণ ও উপসর্গগুলি

Question: সিস্টিক ফাইব্রোসিস এর প্রধান লক্ষণ ও উপসর্গগুলি কি কি?

Answer:

সিস্টিক ফাইব্রোসিসের বেশীরভাগ উপসর্গগুলি শৈশবে দেখা যায় কারণ প্রতি বছর ফুসফুসের কার্যক্রমের অবনতির সাথে শিশুরা অধিক শ্বাসকষ্টে ভোগে। আক্রান্ত ব্যক্তির মধ্যে উপসর্গগুলি শৈশবেই বৃদ্ধি হতে পারে বা তাদের পরবর্তী জীবনেও এটা বৃদ্ধি হতে পারে, যেটার তীব্রতা পরিবর্তিত হতে পারে। উপসর্গগুলি শুরু হবার আগেই, জীবনের প্রথম মাসে নবজাতকের মধ্যে সিস্টিক ফাইব্রোসিস নির্ণয় করা যেতে পারে।ঘন ঘন শ্বাসকষ্টের উপসর্গগুলির মধ্যে রয়েছে:প্রচন্ড কাশি (শুকনো বা মিউকাস সহ)

সাঁ সাঁ করে নিঃশ্বাস ফেলা

বারবার সাইনাস সংক্রমণ

এলার্জিপরিপাক নালীর উপসর্গগুলির মধ্যে রয়েছে:অপ্রীতিকর বৃহৎ, চকচকে অন্ত্র আন্দোলন

যথেষ্ঠ খাওয়ার সত্ত্বেও অস্বাভাবিকভাবে ওজন কমে যাওয়া

মন্দীভূত হওয়া বৃদ্ধি

অন্ত্রের অনিয়ম

ঘনঘন পিপাসা এবং প্রস্রাব পাওয়া (আরো পড়ুন: ঘনঘন প্রস্রাবের কারণ)

ID: 2493

Context: সিস্টিক ফাইব্রোসিস এর প্রধান কারণগুলো

Question: সিস্টিক ফাইব্রোসিস এর প্রধান কারণগুলো কি কি?

Answer:

সিস্টিক ফাইব্রোসিস স্বাভাবিক শারীরিক নিষ্কাশন, যেমন মিউকাস, ঘাম এবং পৌষ্টিক রসকে আক্রান্ত করে। মিউকাস ঘন হয়ে যায় এবং ফুসফুসে প্রবেশ করে শ্বাস প্রশ্বাসে অসুবিধা সৃষ্টি করে। এটা একটা জিনঘটিত সমস্যা, এটা প্রোটিনকে আক্রান্ত করে (সিস্টিক ফাইব্রোসিস ট্র্যান্সমেমব্রান কনডাক্টেন্স রেগুলেটর [সিএফটিআর]) যেটা শরীরের কোষের ভিতরে ও বাইরে লবনের বাড়াকমাকে প্রভাবিত করে। যদি পিতামাতা উভয়েই জিনটির বাহক হয় তবে ত্রুটিপূর্ণ জিন শিশুর কাছে স্থানান্তরিত হয়। যদি পিতামাতার মধ্যে যে কোনো একজনের এই জিন থাকে তবে বাচ্চার মধ্যে সিস্টিক ফাইব্রোসিসের উপসর্গগুলি বৃদ্ধি হতে পারে না, কিন্তু বাহক হতে পারে এবং পরবর্তী প্রজন্মে রোগ ছড়াতে পারে।ঝুঁকির কারণগুলির মধ্যে রয়েছে:জেনেটিক কারণ:

সিএফটিআর প্রোটিনের ক্ষতির মাত্রা অনুযায়ী জিন মিউটেশন নির্ধারিত হয়।

জিন মিউটেশনে, শ্রেণী I, II, এবং III হল প্রচন্ড মারাত্মক, যখন শ্রেণী IV এবং V অপেক্ষাকৃত মৃদু।

জীবনযাপন ও পরিবেশগত কারণ:

ওজন বজায় রাখার জন্য আরো ক্যালোরির প্রয়োজন, যেটা দুর্বহ হতে পারে।

ধূমপান ফুসফুসের কার্যক্ষমতাকে খারাপ করতে পারে।

মদ্যপান লিভারের সমস্যা সৃষ্টি করতে পারে।

বয়সগত কারণ:

বয়সের সাথে উপসর্গগুলি আরো গুরুতর হয়।

ID: 2494

Context: সিস্টিক ফাইব্রোসিস নির্ণয় ও চিকিৎসা

Question: সিস্টিক ফাইব্রোসিস কিভাবে নির্ণয় ও চিকিৎসা করা হয়?

Answer:

নবজাতকদের স্ক্রীনিং এবং ডায়াগনোসিস, এখনকার দিনে খুব দ্রুত সিস্টিক ফাইব্রোসিস সনাক্ত করে।নিম্নলিখিত পরীক্ষাগুলি করা যেতে পারে:রক্ত পরীক্ষা: অগ্নাশয় থেকে ইমুনোরিঅ্যাক্টিভ ট্রিপ্সিনোজেন বা আইআরটি-র মাত্রা পরীক্ষা করা হয়।

জেনেটিক পরীক্ষা: এটি রোগ নিশ্চিত করার জন্য সম্পাদিত হয়।

ঘামের পরীক্ষা: ঘামে লবনের মাত্রা চেক করতে করা হয় (শিশুদের মধ্যে)।পুনরাবৃত্তিমূলক প্যানক্রিয়েটাইটিস, নাসাল পলিপস, এবং দীর্ঘস্থায়ী ফুসফুসের সংক্রমণের জন্য বড় বাচ্চাদের এবং প্রাপ্তবয়স্কদের, উভয় জেনেটিক এবং ঘাম পরীক্ষার সুপারিশ করা হতে পারে।সিস্টিক ফাইব্রোসিসের জন্য চিকিৎসার বিকল্পগুলি দেওয়া হল:ওষুধপ্রয়োগ:

মিউকাস পাতলা করার ওষুধ।

এনজাইম এবং পৌষ্টিক সম্পূরক।

অ্যান্টিবায়োটিক।

প্রদাহ না হওয়ার ওষুধ।

ফিজিওথেরাপি:

হাওয়া যাবার রাস্তা পরিষ্কার করতে সাহায্য করার জন্য ও সাইনাস নিয়ন্ত্রণ উন্নত করার জন্য, ব্যায়াম এবং সম্পূরক ওষুধগুলির প্রয়োজন হতে পারে।

ফুসফুসের ট্রান্সপ্ল্যান্ট।

যদি ওষুধপ্রয়োগ অকার্যকর প্রমাণিত হয় তবে ফুসফুসের ট্রান্সপ্ল্যান্টের নির্বাচিত চিকিৎসা করা হতে পারে।সিস্টিক ফাইব্রোসিস, উত্তরাধিকারী প্রকৃতির কারণে, সম্পূর্ণরূপে নিরাময় করা যাবে না। সেইজন্য, তাড়াতাড়ি নির্ণয় এবং এর চিকিৎসাই হল এটাকে ঠিক করতে এবং আরও মারাত্মকতা এড়ানোর সবচেয়ে ভালো উপায়।

ID: 2495

Context: সারভাইকাল ডাইস্টোনিয়া

Question: সারভাইকাল ডাইস্টোনিয়া কি?

Answer:

সারভাইকাল ডাইস্টোনিয়া (সিডি) হল একটি বিরল স্নায়বিক রোগ যা স্প্যাসমডিক টর্টিকলিস নামেও পরিচিত এবং এটি এক ধরনের ফোকাল ডাইস্টোনিয়া। এটি গলার পেশীর একটি অস্বাভাবিক এবং অনিচ্ছাকৃত সংকোচনের দ্বারা চিহ্নিত করা হয়। এটি আপনার মাথাকে পাশে, পিছনে, বা সামনের দিকে ঝোঁকাতে পারে এবং তার ফলে আপনার কাঁধটি মুচড়েও যেতে পারে। যদিও সিডি সব বয়সের পুরুষ ও মহিলাদের মধ্যে ঘটতে পারে, তবে সবচেয়ে সাধারণভাবে এটি মহিলাদের মধ্যে এবং 40 থেকে 50 বছর বয়সের মানুষের মধ্যে হয়েছে বলে জানা যায়। সিডি দুই ধরনের হতে পারে, প্রাইমারি অথবা আইসলেটেড এবং সেকেন্ডারি।

ID: 2496

Context: সারভাইকাল ডাইস্টোনিয়া এর প্রধান লক্ষণ এবং উপসর্গগুলি

Question: সারভাইকাল ডাইস্টোনিয়া এর প্রধান লক্ষণ এবং উপসর্গগুলি কি কি?

Answer:

সিডির সবচেয়ে সাধারণ লক্ষণ হলো গলার পেশীর অস্বাভাবিক অনিচ্ছাকৃত সংকোচন। পেশীটির ফিক্ ধরা স্থায়ী, ঝাঁকুনিপূর্ণ অথবা উভয়ের সংমিশ্রণ হতে পারে এবং অস্বস্তি, শক্ত হয়ে যাওয়া, এবং ব্যথা হতে পারে। এই সংকোচন বাড়তে পারে এবং কাঁধের পেশীতে ছড়াতে পারে, কিন্তু কাঁধের পরের পেশীগুলিকে প্রভাবিত করতে পারে না।স্থায়ী সংকোচনটি ঘাড় এবং মাথার একটি বেমানান অঙ্গবিন্যাসের কারণ, যেহেতু ঝাঁকুনিপূর্ণ মাথার আন্দোলনের কারণ হল পর্যায়ক্রমে সংকোচনটি। সবচেয়ে সাধারণ বিশ্রী যে অঙ্গভঙ্গিটি দেখা যায় তা হল উভয় দিকে মাথা ঘোরানো যেহেতু থুতনি কাঁধের দিকে বাঁকানো থাকে।

ID: 2497

Context: সারভাইকাল ডাইস্টোনিয়া এর প্রধান কারণগুলি

Question: সারভাইকাল ডাইস্টোনিয়া এর প্রধান কারণগুলি কি কি?

Answer:

বেশিরভাগ ক্ষেত্রে, আইসলেটেড সিডিটির অন্তর্নিহিত কারণ অজানা থাকে, এবং শুধুমাত্র নিউরোলজিক্যাল কারণগুলি এই ঘটনার জন্য দায়ী বলে মনে হয়। প্রাইমারি সিডির কারণগুলি হল:সিডির একটি পরিবারিক ইতিহাস

একাধিক জিনের পরিবর্তন/জিনগত কারণগুলি

পরিবেশগত কারণসেকেন্ডারি সিডির কারণগুলি হল:এন্টিসাইকোটিক ওষুধগুলির ব্যবহার করা

বমি বমি ভাব চিকিৎসা করতে ওষুধগুলির ব্যবহার যা ডোপামিন রিসেপ্টরগুলিকে ব্লক করে

বিষাক্ত পদার্থ

অন্যান্য নিউরোডিজেনেরটিভ রোগগুলির উপস্থিতি

ID: 2498

Context: সারভাইকাল ডাইস্টোনিয়া নির্ণয় এবং চিকিৎসা

Question: সারভাইকাল ডাইস্টোনিয়া কিভাবে নির্ণয় এবং চিকিৎসা করা হয়?

Answer:

বেশিরভাগ পরীক্ষাগারের পরীক্ষাগুলি যেমন ইমেজিং কৌশলগুলি সিডির ক্ষেত্রে স্বাভাবিক। অতএব, রোগ নির্ণয় করার জন্য ক্লিনিকাল পরীক্ষা করা হয়। সিডির নির্ণয়ের ক্ষেত্রে নিচের পদক্ষেপগুলি কার্যকর:ক্লিনিকাল পরীক্ষা এবং সিডি সম্পর্কে জ্ঞান

ব্যক্তির বিস্তারিত চিকিৎসা ইতিহাস

যদি স্পাইনাল কর্ডের সঙ্কোচন সন্দেহ করা হয় তবে ম্যাগনেটিক রেসোনেন্স ইমেজিং সাহায্য করতে পারে

যদি সেখানে স্নায়ুর উত্তেজনার কোন চিহ্ন থাকে তবে ইলেক্ট্রোমায়োগ্রাফি সাহায্য করতে পারেসিডির চিকিৎসা পদ্ধতির কার্যকারিতা প্রত্যেক ব্যক্তির ক্ষেত্রে পৃথক হতে পারে, এবং বেশিরভাগ পদ্ধতিতে উপসর্গগুলি উপশম করা হয়। সিডি এর জন্য উপলব্ধ চিকিৎসা পদ্ধতিগুলি হলো:বটুলিনাম টক্সিন ইনজেকশন

মৌখিক ওষুধ

সার্জারি

শারীরিক চিকিৎসাযদিও সিডির সাথে চাপের কোন সংযোগ নেই তবে এটি উপসর্গগুলিকে খারাপ করে তুলতে পারে। চাপ, উত্তেজনা, বা নির্দিষ্ট অঙ্গবিন্যাসের কারণে উপসর্গগুলি বাড়ে এবং ডিস্টোনিয়া সক্রিয় হতে পারে।মানসিক চাপ কমানো এবং আপনার অঙ্গবিন্যাসগুলির পরিচালনা করা আপনার উপসর্গগুলি ঠিক করতে সাহায্য করতে পারে। মাথা এবং ঘাড়ের বন্ধন ব্যবহার, আপনার ব্যথা এবং অস্বস্তি কম করতেও সাহায্য করতে পারে।

ID: 2499

Context: সেরিব্রাল পালসি

Question: সেরিব্রাল পালসি (মস্তিষ্ক পালসি) কি?

Answer:

সেরিব্রাল পালসি (সিপি) হল একটি অ-প্রগতিশীল স্নায়বিক সমস্যা যা বাচ্চাদের উন্নয়নশীল মস্তিষ্কের আঘাত বা বিকৃতির কারণে ঘটে। এটি গুরুতর শৈশব অক্ষমতার একটি খুব সাধারণ কারণ। এটি প্রধানত নড়াচড়া এবং পেশী সমন্বয়ের ক্ষেত্রে সমস্যার সৃষ্টি করে। ভারতে জন্মগ্রহণ করা 1000 জন জীবিতের মধ্যে আনুমানিক 3 জনের সিপি হবার সম্ভাবনা রয়েছে।

ID: 2500

Context: সেরিব্রাল পালসি এর প্রধান লক্ষণ এবং উপসর্গগুলি

Question: সেরিব্রাল পালসি এর প্রধান লক্ষণ এবং উপসর্গগুলি কি কি?

Answer:

জন্মের সময় থেকে 5 বছর বয়স পর্যন্ত যেসব ধারাবাহিকতার ধাপগুলি অর্জন করার প্রয়োজন, যেমন ঘুরে যাওয়া, বসা এবং হাঁটা তা সিপির ক্ষেত্রে দেরি হতে পারে। এটি মেয়েদের থেকে ছেলেদের মধ্যে বেশি হয়, এবং সাদা মানুষের তুলনায় কালো মানুষের মধ্যে বেশি হয়। বয়স ভিত্তিক উপসর্গগুলি হল:3-6 মাস:বিছানা থেকে বাচ্চা তোলার সময় মাথা নুইয়ে পড়া

সারা শরীরে কঠোরতা

পেশীর ক্ষমতা কমে যাওয়া

কোমর ও ঘাড় বেশি বেড়ে যাওয়া6 মাসের চেয়ে বেশি বয়স:ঘুরে যাওয়ার ক্ষমতা কমে যাওয়া

একসঙ্গে হাত আনতে ব্যর্থতা

মুখে হাত আনতে অসুবিধা10 মাসের থেকে বড়:ভারসাম্যহীন হামাগুড়ি দেওয়া চলন

সাহায্য নিয়ে দাঁড়ানোর অক্ষমতা

ID: 2501

Context: সেরিব্রাল পালসি এর প্রধান কারণগুলি

Question: সেরিব্রাল পালসি এর প্রধান কারণগুলি কি কি?

Answer:

এটি মূলত মস্তিষ্কের পর্যায় গঠনের সময় কোনও আঘাত বা অস্বাভাবিকতার কারণে মস্তিষ্কে কোনো ক্ষতি হলে হয়। এটি পেশীর গঠন, প্রতিক্রিয়া, অঙ্গবিন্যাস, সমন্বয়, আন্দোলন এবং পেশী নিয়ন্ত্রণকে প্রভাবিত করে।মস্তিষ্কের উন্নয়নে সমস্যা করতে পারে এমন অন্যান্য কারণগুলি হল:পরিবর্তন: জিনগত অস্বাভাবিকতা মস্তিষ্কের বিকাশের কারণ হতে পারে।

প্রসবকালীন সংক্রমণ: যে সংক্রমণগুলি রুবেলার মত গর্ভাবস্থায়ের সময় উন্নয়নকে প্রভাবিত করতে পারে।

ভ্রূণে আঘাত: শিশুর মস্তিষ্কে রক্ত প্রবাহ বাঁধা পেলে তা মস্তিষ্কের কাজকর্মকে নষ্ট করতে পারে।

শৈশবে সংক্রমণ: প্রদাহজনক প্রতিক্রিয়া যা মস্তিষ্কসংক্রান্ত এলাকাগুলিকে প্রভাবিত করে।

মানসিক আঘাতের ক্ষত: যানবাহন দুর্ঘটনার ফলে গুরুতর মস্তিষ্কের ক্ষতি হতে পারে।

অক্সিজেন অভাব: কঠিন শ্রম অথবা প্রসবের সময় অক্সিজেনেই অভাব।

ID: 2502

Context: সেরিব্রাল পালসি নির্ণয় এবং চিকিৎসা

Question: সেরিব্রাল পালসি কিভাবে নির্ণয় এবং চিকিৎসা করা হয়?

Answer:

ডাক্তার লক্ষণগুলি বা উপসর্গগুলির পরীক্ষা করে এবং শারীরিক পরীক্ষা করে শিশুর মূল্যায়ন করে। শিশুটিকে একটি শিশুরোগ বিশেষজ্ঞ স্নায়ু চিকিৎসকের কাছে পাঠানো হতে পারে।পরীক্ষাগুলির একটি সিরিজ করার পরামর্শ দেওয়া হতে পারে:মস্তিষ্কের স্ক্যান:ম্যাগনেটিক রেসোনেন্স ইমেজিং (এমআরআই): মস্তিষ্কের কোনও ক্ষত বা অস্বাভাবিকতা সনাক্ত করার জন্য ব্যবহৃত হয়।

ক্রেনিয়াল আল্ট্রাসাউন্ড: মস্তিষ্কের প্রাথমিক মূল্যায়ন; এটা তাড়াতাড়ি হয় এবং সস্তা।

ইলেক্ট্রোএন্সেফালোগ্রাম (ইইজি): মৃগীরোগ সনাক্ত করতে।এছাড়াও অন্যান্য যে পরীক্ষাগুলি করা হয়:দৃষ্টির সমস্যা

কানে শোনায় বিকলতা

কথা বলতে অসুবিধা

বুদ্ধিমত্তার অভাব

নড়াচড়া না করার রোগসিপির চিকিৎসার জন্য শিশুটির দুর্বলতার উপর ভিত্তি করে স্বাস্থ্যসেবা পেশাদারদের একটি দল দীর্ঘমেয়াদী চিকিৎসা করে। ওষুধগুলি মূলত মোটর অক্ষমতা, ব্যথার ব্যবস্থাপনা করা এবং বিচ্ছিন্ন ও সাধারণ স্প্যাস্টিটি-সম্পর্কিত উপসর্গগুলির চিকিৎসা করতে ব্যবহৃত হয়।শিশুর জীবনযাত্রার মান ভালো করতে ওষুধ ছাড়া অন্য ব্যবস্থাগুলি হলো:ফিজিওথেরাপি: পেশী শক্তি এবং নমনীয়তা বাড়ানোর জন্য। ব্রেস বা স্প্লিন্টস ব্যবহার করার পরামর্শ দেওয়া হতে পারে।

অকুপেশনাল থেরাপি: শিশুর অংশগ্রহণ করার দক্ষতা এবং স্বাধীনভাবে কাজকর্ম করা উন্নত করতে।

বক্তৃতা এবং ভাষার থেরাপি: সাইন ভাষার ব্যবহার অথবা কমিউনিকেট ভাষার ব্যবহার বুঝতে।

বিনোদনমূলক থেরাপি: বাইরের কাজে অংশগ্রহণ করতে।

পুষ্টি এবং খাদ্যতালিকাগত থেরাপি: খাবার সমস্যা ঠিক করাতে এবং পর্যাপ্ত পুষ্টি নিশ্চিত করতে।নিজেকে যত্ন করার পরামর্শগুলি হল:বেশিরভাগ ক্ষেত্রে, সিপি প্রতিরোধ করা যায় না, তবে পর্যাপ্ত প্রসবকালীন যত্ন, নিরাপদ প্রসব এবং দুর্ঘটনা এড়ালে অর্জিত সিপির ঝুঁকি কম হতে পারে।

ভ্রমণের সময় হেলমেট এবং প্রতিরক্ষামূলক সিট বেল্ট ব্যবহার করে শিশুর মাথার আঘাত প্রতিরোধ করুন।

শিশুর দৈনন্দিন ক্রিয়াকলাপ নিরীক্ষণ করুন।শিশুটির অবস্থার উন্নতি ও সন্তানের প্রয়োজন অনুযায়ী চিকিৎসা পরিকল্পনা সমন্বয় করার জন্য চিকিৎসক দলের সাথে বাবা-মা/তত্ত্বাবধায়কের সহায়তা ও কাজ করা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। দীর্ঘমেয়াদী মানসিক সমর্থন এবং যত্ন, শিশুর সামগ্রিক স্বাস্থ্য এবং সুস্থতার জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

ID: 2503

Context: সেরিব্রাল ম্যালেরিয়া

Question: সেরিব্রাল ম্যালেরিয়া কি?

Answer:

সেরিব্রাল ম্যালেরিয়া (সিএম), ম্যালেরিয়ার একটি গুরুতর জটিল অবস্থা, যা সিজার্স এবং কোমা নামক স্নায়বিক সিন্ড্রোম বা লক্ষণ দ্বারা চিহ্নিত করা হয়। এটা প্রধানত ম্যালেরিয়া-প্রবণ এলাকায় বসবাস করে এমন অপেক্ষাকৃত বড় বাচ্চা এবং প্রাপ্তবয়স্কদের মধ্যে দেখা যায়।

ID: 2504

Context: সেরিব্রাল ম্যালেরিয়ার প্রধান লক্ষণ এবং উপসর্গগুলি

Question: সেরিব্রাল ম্যালেরিয়ার প্রধান লক্ষণ এবং উপসর্গগুলি কি কি?

Answer:

একটি মশার কামড় খাওয়ার পর 2 সপ্তাহের কম সময়ের মধ্যে এবং 2 থেকে 7 দিন জ্বরের পরে সেরিব্রাল ম্যালেরিয়া দেখা দিতে পারে। এটি অস্বাভাবিক আচরণ, অবচেতন অবস্থা, মৃগীরোগ, কোমা এবং অন্যান্য স্নায়বিক উপসর্গ দ্বারা চিহ্নিত করা যায়। এটি দেখা যায় যে এক্ষেত্রে 14 টি শিশুর মধ্যে 6 জনের মস্তিষ্কের আয়তন বৃদ্ধি পায়। সেরিব্রাল ম্যালেরিয়ার ফলে শিশুদের মধ্যে চলাফেরায় অসুবিধা, কথা বলতে সমস্যা, বধিরতা এবং অন্ধত্ব দেখা দিতে পারে। এর লক্ষণ এবং উপসর্গগুলির মধ্যে রয়েছে:সিজার্স বা খিঁচুনি

রেটিনা ক্ষয়

চেতনার পরিবর্তন

বর্ধিত করোটিসংক্রান্ত চাপ এবং ফোলাভাব

মাথা ব্যথা

পিঠে ব্যথা

বমি বমি ভাব

বমিস্নায়বিক বৈশিষ্ট্যগুলির মধ্যে প্রায়ই গুরুতর বিপাকীয় রক্তে অম্লাধিক্যজনিত বিকার (শরীরের তরলে খুব বেশি অম্লের উপস্থিতি), কম হিমোগ্লোবিন এবং শরীরে চিনির কম মাত্রা থাকে।

ID: 2505

Context: সেরিব্রাল ম্যালেরিয়ার প্রধান কারণগুলি

Question: সেরিব্রাল ম্যালেরিয়ার প্রধান কারণগুলি কি কি?

Answer:

এটি স্ত্রী অ্যানোফেলিস মশার কামড়ের মাধ্যমে ছড়িয়ে পড়ে। চার প্রজাতির প্লাজমোডিয়াম সংক্রমণের জন্য দায়ী, যার মধ্যে পি. ফ্যালসিপেরাম থেকে সবচেয়ে মারাত্মক সংক্রমণ ছড়ায়। সংক্রামিত রক্ত কোষ দ্বারা মস্তিষ্কের সুক্ষ্ম নলে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি হলে সেরিব্রাল ম্যালেরিয়া হয়, যার ফলে মস্তিস্ক ফুলে যায় এবং অবশেষে মস্তিষ্কের ক্ষতিসাধন হয়। ব্লাড-ব্রেন ব্যারিয়ার (বিবিবি), যা বাইরের পদার্থের আক্রমণ থেকে মস্তিষ্ককে রক্ষা করে, এর ফলে ভেঙ্গে যায় এবং ফাইব্রিনোজেন ছিদ্র দেখা যায়। এর ফলস্বরূপ কোমা হতে পারে। অন্যান্য যেসব কারণগুলি এই স্নায়বিক জটিলতার জন্য দায়ী সেগুলি হল:উচ্চ-মাত্রায় জ্বর

ম্যালেরিয়ারোধী ওষুধ

চিনির মাত্রা হ্রাস পাওয়া

সোডিয়ামের মাত্রা হ্রাস পাওয়া

অত্যন্ত কম হিমোগ্লোবিনের মাত্রা

ID: 2506

Context: সেরিব্রাল ম্যালেরিয়া নির্ণয় এবং এর চিকিৎসা

Question: কিভাবে সেরিব্রাল ম্যালেরিয়া নির্ণয় এবং এর চিকিৎসা করা হয়?

Answer:

ম্যালেরিয়া-প্রবণ এলাকায় সাম্প্রতিক কালে ঘুরতে যাওয়া হয়েছে কিনা এবং অন্যান্য চিকিৎসা সংক্রান্ত ইতিহাস শোনেন ডাক্তাররা এবং তার সাথে একটি শারীরিক পরীক্ষাও করেন। ইসকেমিয়া-প্রভাবিত অংশ খুঁজে পেতে ইমেজিং করা হতে পারে।কম্পিউটেড টমোগ্রাফি (সিটি) স্ক্যান: যাতে সবকিছু স্বাভাবিক দেখা যেতে পারে, তবে কিছু বিশেষ বৈশিষ্ট্য পরিলক্ষিত যেমনসেরিব্রাল ওয়েডেমা

বিনষ্টকলার জন্য থ্যালামিক হাইপোঅ্যাটেনুয়েশন

সেরিব্রেলার শ্বেত পদার্থের হাইপো অ্যটেনুয়েশনম্যাগনেটিক রেসোনেন্স ইমেজিং (এমআরআই): রোগ বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে তার সাথে যুক্ত পরিবর্তনগুলি বুঝতে সাহায্য করে।

লাম্বার পাঙ্কচার: চেতনার পরিবর্তিত স্তরের সঙ্গে ফেব্রিলে সিনড্রোমের অন্যান্য কারণগুলিকে পৃথক করতে।সেরিব্রাল ম্যালেরিয়া একটি গুরুতর সমস্যা এবং অবিলম্বে এর চিকিৎসা প্রয়োজন হয়। চিকিৎসায় মূলত রয়েছে:ম্যালেরিয়া-প্রতিরোধী ওষুধ - প্রতিবন্ধকতা এড়াতে মনোথেরাপি বা কম্বিনেশন থেরাপি।

ইলেক্ট্রোলাইট ভারসাম্য সংশোধন করতে ওষুধ।

অ্যান্টি-এপিলেপটিক ওষুধের উপসর্গ অনুযায়ী ব্যবহার।

স্টেরয়েড ডেরিভেটিভস।

অন্যান্য স্নায়বিক জটিলতা সংশোধন করা।

অক্সিজেন থেরাপি শ্বাসকষ্টের ক্ষেত্রে ব্যবহৃত হয়।নিজের যত্ন নেওয়ার উপায়গুলি:প্রাথমিক পর্যায়ে উপসর্গগুলি সনাক্ত করা গেলে সংক্রমণের প্রভাবগুলি এড়ানো যেতে পারে।

জ্বরের ওষুধগুলির অপ্রয়োজনীয় ব্যবহার এড়িয়ে চলতে হবে যদি এটি দীর্ঘস্থায়ী জ্বর উপসমে সাহায্য না করে।

আপনার আশেপাশের জায়গা পরিষ্কার রাখুন এবং মশার প্রজনন ক্ষেত্রগুলিকে বিনষ্ট করুন।যথাযথ চিকিৎসা এবং যত্ন মস্তিষ্কের ক্ষতি এবং ম্যালেরিয়ার জটিলতাগুলি কমাতে সহায়ক হতে পারে।

ID: 2507

Context: মুখের জ্বালা পোড়া

Question: মুখের জ্বালা পোড়া কি?

Answer:

মুখের জ্বালা পোড়া (বিএমএস) বা ঝলসে যাওয়া মুখ হল এমন একটা অবস্থা যেখানে জিভ, টাকরা, এবং ঠোঁটের ওপর একটা মানুষ তীব্র জ্বলন্ত সংবেদন অনুভব করেন।

এটা একটা বিরল অবস্থা এবং উপসর্গ ও কারণগুলো মূলত ব্যক্তি বিশেষে পরিবর্তিত হয়।

ID: 2508

Context: মুখের জ্বালা পোড়ার প্রধান লক্ষণগুলো এবং উপসর্গগুলো

Question: মুখের জ্বালা পোড়ার প্রধান লক্ষণগুলো এবং উপসর্গগুলো কি?

Answer:

মুখের জ্বালা পোড়ার প্রধান লক্ষণগুলো এবং উপসর্গগুলো হল:জিভে একটা জ্বলন্ত সংবেদন, যা বেদনাদায়ক হতে পারে এবং একটা পোড়ানো ক্ষতের মত অনুভব হতে পারে।

গরম চা, বা অ্যাসিডিক পানীয়ের মত বিশেষ পানীয়গুলোতে চুমুক দেওয়া অবস্থাটা গুরুতর করে তুলতে পারে।

একজন ব্যক্তির মুখের ঠোঁট বা কোণেও জ্বলন্ত অনুভূতি হতে পারে।

স্বাদ উপলব্ধি পাল্টে যাওয়ায় খাওয়া কষ্টকর হয়।

কদাচিৎ, একটা রোগী মুখে অসাড় অবস্থার (কিছু না অনুভব করার) অভিযোগও করতে পারে।

ID: 2509

Context: মুখের জ্বালা পোড়ার মূল কারণগুলো

Question: মুখের জ্বালা পোড়ার মূল কারণগুলো কি?

Answer:

বিএমএস -এর প্রধান কারণগুলো অন্তর্ভুক্ত করা হল:প্রাথমিক বিএমএস কোন নির্দিষ্ট অবস্থা বা কারণগুলির সাথে সংযুক্ত নয়। কারণ সচরাচর ইডিওপ্যাথিক, অথবা অজানা থাকে।

দ্বিতীয় শ্রেণীর বিএমএস একটা নির্দিষ্ট বাহক, অথবা নিম্নাবস্থিত রোগের কারণে হয়।

মুখের সংক্রমণ যেমন ক্যান্ডিডা, বা মুখে আলসারের কারণে জ্বলন্ত সংবেদন হতে পারে।

যখন মুখের লালা তৈরি কমে যায় তখন এক্সেরোস্টোমিয়া বা শুষ্ক মুখ দেখা যায়। মুখের শুষ্কতাও বিএমএস সৃষ্টি করে।

যে মানুষের ডায়াবেটিস অথবা থাইরয়েড রোগ আছে তারা প্রায়ই মুখে জ্বালার অভিযোগ করেন। হরমোনের অসামঞ্জস্য এক্সেরোস্টোমিয়ার কারণ, যা জ্বলন্ত সংবেদনের সৃষ্টি করে।

অ্যাসিড রিফ্লাক্স বা জিইআরডি -র মত পাচকস্থলীসংক্রান্ত অবস্থাগুলোও মুখের জ্বালার কারণ হতে পারে।

অ্যাক্রিলিকের তৈরি দাঁতের পাটি যার প্রান্তে ধার থাকে তার ফলেও আলসার হতে পারে এবং গালের ভিতরের ভাগে ও মুখের তলদেশে জ্বালা করে।

ID: 2510

Context: মুখের জ্বালা পোড়া নির্ণয় এবং চিকিৎসা করা

Question: কিভাবে মুখের জ্বালা পোড়া নির্ণয় এবং চিকিৎসা করা যায়?

Answer:

রোগীর উপসর্গ এবং শারীরিক পরীক্ষার উপর ভিত্তি করে বিএমএস এর রোগ নির্ণয় অত্যন্ত সহজ। যাইহোক, কারণ নির্ধারণ করতে কিছু পরীক্ষা করা যেতে পারে।

ডায়াবেটিস, থাইরয়েড রোগগুলোর জন্য রক্ত পরীক্ষা।

লালার পরিমাণ এবং গুণমান নির্ণয়ের জন্য লালা পরীক্ষা।বিএমএস এর চিকিৎসাগুলো হল:প্রাথমিক মুখের জ্বালা পোড়া কোন নিম্নাবস্থিত কারণের সাথে সংযুক্ত নয় এবং জ্বলন্ত সংবেদন উপশমের দ্বারা চিকিৎসা হয়। এটার জন্য, যেমন নির্দিষ্ট খাদ্যতালিকাগত পরিবর্তন করা অপরিহার্য:

মশলাদার খাবার, অ্যাসিডিক (আম্লিক) খাবার এবং অস্বস্তিদায়ক আহার ত্যাগ করুন। ধূমপান এবং মদ্যপানও উপসর্গগুলোকে বাড়াতে পারে, তাই, তাদের ত্যাগ করুন

প্রয়োজনীয় পুষ্টি সমৃদ্ধ একটা ভাল সুষম খাদ্য খান।

দ্বিতীয় শ্রেণীর মুখের জ্বালা পোড়া চিকিৎসার জন্য কারণ চিহ্নিত করুন।

খাদ্যতালিকাগত পরিবর্তন এবং অ্যান্টাসিড ওষুধের দ্বারা অ্যাসিড রিফ্লাক্সের নিয়ন্ত্রণ করা হয়।

ইন্সুলিন, ওষুধ, এবং ব্যায়াম দ্বারা হরমোনাল ব্যাধি নিয়ন্ত্রণ করা যায়।

সংক্রমণের ক্ষেত্রে ফাংগাল ওষুধগুলো এবং অ্যান্টিবায়োটিক কার্যকর হয়।

আইস চিপস চিবানো, ঠান্ডা পানীয় পান অথবা আক্রান্ত এলাকার ওপর অ্যালো ভেরা নির্যাস লাগানোর সাহায্যে বাড়িতে যত্ন করা যায়।

ID: 2511

Context: চোখ জ্বালাপোড়া

Question: চোখ জ্বালাপোড়া কি?

Answer:

চোখ জ্বালাপোড়া হল চোখের মধ্যে চুলকানি, যন্ত্রণা অথবা জ্বালার অনুভূতি। এটা প্রায়ই চোখ থেকে জল নির্গমণের সাথে বারবার ঘটে। ব্লেফারাইটিস, শুকনো চোখ, কনজাঙ্কটিভাইটিস এবং চোখের এলার্জি হল চোখ জ্বালাপোড়ার কিছু সাধারণ কারণ।

ID: 2512

Context: চোখ জ্বালাপোড়ার প্রধান যুক্ত লক্ষণ এবং উপসর্গগুলি

Question: চোখ জ্বালাপোড়ার প্রধান যুক্ত লক্ষণ এবং উপসর্গগুলি কি কি?

Answer:

চোখ জ্বালাপোড়ার সাথে যুক্ত বারবার দেখা সাধারণ উপসর্গগুলি হল:চোখ থেকে জল পড়া

জলপূর্ণ চোখ

চোখের লালভাবের সাথে বেদনাঅন্তর্নিহিত রোগের উপর নির্ভর করে নির্দিষ্ট উপসর্গগুলি হল:ব্লেফারাইটিস: এটি চোখের পাতার একটি জ্বলন যেখানে চোখের পাতার গোড়াটা তৈলাক্ত দেখায়, স্টাইয়ের উপস্থিতির সাথে খুশকির মতো ফ্লেক্সগুলি (লাল, ফুলে যাওয়া, চোখের পাতার কাছে ডেলার উপস্থিতি)

শুকনো চোখ: এটা চোখের মধ্যে যন্ত্রণা এবং বিরক্তিকর অনুভূতি; চোখের লালভাব; চোখের চারপাশে অথবা মধ্যে শ্লেষ্মা স্তরের গঠন; চোখে কিছু আটকে থাকার অনুভূতি চিহ্নিত করে

চোখের অ্যালার্জি বা কনজাংটিভাইটিস: অ্যালার্জি এবং কনজাংটিভের প্রদাহ বেদনা, ফোলাভাব এবং চোখে চুলকানি; অশ্রুসিক্ত চোখ; চুলকানি, বন্ধ নাক এবং হাঁচি হয়ে থাকে

ID: 2513

Context: চোখ জ্বালাপোড়ার প্রধান কারণগুলি

Question: চোখ জ্বালাপোড়ার প্রধান কারণগুলি কি কি?

Answer:

চোখ জ্বালাপোড়ার সাধারণ কারণগুলি হলো:ব্যাকটেরিয়া সংক্রমণ

অশ্রু গ্রন্থি এবং নালীর অকার্যকারীতা

ধুলো এবং পরাগের মতো অস্বস্তিকর পদার্থ চোখের মধ্যে ঢুকে এলার্জির কারণ হতে পারে

অতিবেগুনী রশ্মির আলোকসম্পাতে সানবার্ন হওয়ায়চোখ জ্বালাপোড়ার বিরল কারণগুলি হলো:ধোঁয়া, বায়ু বা খুব শুষ্ক জলবায়ুতে থাকলে

দীর্ঘদিন ধরে কন্টাক্ট লেন্স ব্যবহার করলে

রিউম্যাটয়েড আর্থরাইটিস, থাইরয়েড রোগ এবং লুপাস

ঘুমের ওষুধ, অম্বলের ওষুধের মত কিছু ওষুধ

ID: 2514

Context: চোখ জ্বালাপোড়া নির্ণয় এবং চিকিৎসা করা

Question: চোখ জ্বালাপোড়া কিভাবে নির্ণয় এবং চিকিৎসা করা হয়?

Answer:

চোখ জ্বালাপোড়ার চিকিৎসা করতে ক্রমের মধ্যে অন্তর্নিহিত রোগ নির্ণয় করা খুব গুরুত্বপূর্ণ। ডাক্তার একটি পুঙ্খানুপুঙ্খ চিকিৎসার ইতিহাস নেন, বিশেষ করে কোনো অ্যালার্জি অথবা অস্বস্তিকর এবং সংক্রামক এজেন্টের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত কিনা তা নোট করেন।ফোলাভাব এবং লালচে ভাব পরীক্ষা করার জন্য একটি স্লিট মাইক্রোস্কোপের সাহায্যে শারীরিক পরীক্ষা করা হয়। অশ্রু প্রবাহ এবং অশ্রুর ঘনত্বও পরীক্ষা করা হয়।

চোখ জ্বালাপোড়ার জন্য চিকিৎসা অন্তর্নিহিত অবস্থার উপর নির্ভর করে। সেগুলো হলো:সংক্রমণের ক্ষেত্রে অ্যান্টিবায়োটিক।

বেদনা এবং ফোলা চোখের থেকে মুক্তির জন্য কৃত্রিম অশ্রু বা ডিকঞ্জেস্টেন্ট চোখের ড্রপ এবং গরম ভাপ।

এলার্জির ক্ষেত্রে, ডাক্তার নির্দিষ্ট অ্যালার্জেনের থেকে দূরে থাকার পরামর্শ দেবেন।নিজেকে যত্ন করার পদ্ধতি নিচে দেওয়া হল:ভাল স্বাস্থ্যবিধি বজায় রাখা সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ।

অ্যান্টিবায়োটিক স্প্রে এবং শ্যাম্পু, শিশুদের শ্যাম্পু আপনার চোখের পাতা, চুল এবং স্কাল্প ধোয়ার জন্য ব্যবহার করা যেতে পারে।

সানবার্নের ক্ষেত্রে সূর্যালোকের এক্সপোজার এড়ানোর জন্য সানগ্লাস ব্যবহার করুন।

ধুলো বা অন্য কোন বিরক্তিকর এক্সপোজারের এলার্জেন অপসারণের পরে সালাইন চোখের ড্রপ হল অপরিহার্য।

প্রচুর পরিমাণে জল এবং মাছের তেলের পরিপূরকগুলি চোখের আর্দ্রতা বজায় রাখতে সাহায্য করে।

ID: 2515

Context: বুলিমিয়া নারভোসা (ইটিং ডিসঅর্ডার)

Question: বুলিমিয়া নারভোসা (ইটিং ডিসঅর্ডার) কি?

Answer:

বুলিমিয়া নারভোসা, বা বিঞ্জ ইটিং ডিসঅর্ডার, হল একটি মানসিক অবস্থা যেটি অতিরিক্ত খাবার খেয়ে নেওয়া এবং সেটিকে শরীর থেকে বের করার অতিরিক্ত প্রচেষ্টার মাধ্যমে চিহ্নিত করা যায়। এটি পুরুষ এবং মহিলা উভয়েরই হয় কিন্তু কিশোরী মেয়েদের মধ্যে প্রায় সবচেয়ে বেশি ঘটে। ব্যক্তিটি যে কোনও সময়ে বিঞ্জ ইট (অল্প সময়ের মধ্যে প্রচুর পরিমাণে খাবার আগ্রাসী হয়ে খেতে থাকে) করতে চাইতে পারেন এবং খাওয়ার উপর নিয়ন্ত্রণ হারানোর অনুভূতি থাকে, তারপর হঠাৎ লজ্জায় পড়েন; এই কারণে, ব্যক্তি খেয়ে নেওয়া খাবারটি বার করার প্রচেষ্টা করে নিজেই ক্ষতিপূরণমূলক আচরণ দেখাতে চান, যেমন জোর করে বমি করা, ওজন কমার ওষুধগুলি ব্যবহার করা, জোলাপ এবং মূত্রবর্ধক ওষুধ নেওয়া, অতিরিক্ত ব্যায়াম এবং উপোস করা। মাঝে মাঝে, এই অবস্থাটি জীবনকে আশঙ্কাজনকও করতে পারে।

ID: 2516

Context: বুলিমিয়া নারভোসা (ইটিং ডিসঅর্ডার) এর প্রধান লক্ষণ এবং উপসর্গগুলি

Question: বুলিমিয়া নারভোসা (ইটিং ডিসঅর্ডার) এর প্রধান লক্ষণ এবং উপসর্গগুলি কি কি?

Answer:

এর গুরুত্বপূর্ণ লক্ষণ এবং উপসর্গগুলি হলঅনিয়ন্ত্রিত খাবার খাওয়া, সকলের মাঝে খেতে না চাওয়া

শরীরের আকৃতি এবং ওজনের ব্যাপারে অত্যন্ত সমালোচনা করা

মেজাজ বদলান, উদ্বেগ, এবং বিষণ্নতা

একটি খাবার খাওয়ার পরে ঘন ঘন বাথরুম যাওয়া

বমির গন্ধ

অত্যধিক ব্যায়াম করা

জোলাপ, মূত্রবর্ধক, এবং ওজন কমানোর ওষুধগুলি ব্যবহার করা

ওজন বাড়া কমা হয়, কিন্তু ওই ব্যক্তি সাধারণত একটি স্বাভাবিক ওজন বজায় রাখে। প্রায়শই ডাক্তার এবং কিছু ব্যক্তি মনে করেন যে বুলিমিয়ার ব্যক্তিরা কম ওজনের হয়ে থাকে, এবং তার ফলে বুলিমিয়া অনির্ধারিত হতে পারে বা এটি দীর্ঘ সময়ের জন্য ধরা না পড়তে পারে

হাত এবং পায়ের ফোলাভাব

গাঁটে দাগ অথবা ক্ষত

দাঁতের রং বদলে যাওয়া এবং মাড়ি নষ্ট হয়ে যাওয়া

খেতে অনিচ্ছা এবং কঠোর ডায়েটিং করা

ID: 2517

Context: বুলিমিয়া নারভোসা (ইটিং ডিসঅর্ডার) এর প্রধান কারণগুলি

Question: বুলিমিয়া নারভোসা (ইটিং ডিসঅর্ডার) এর প্রধান কারণগুলি কি কি?

Answer:

বুলিমিয়ার সঠিক কারণ অজানা থেকে গেছে। তবে এই রোগের কিছু কারণ জিনগত, পারিবারিক ইতিহাস, শরীরের ওজনের সম্বন্ধে চিন্তা এবং শরীরের আকৃতি, কম আত্মসম্মান, আবেগপূর্ণ ব্যক্তিত্ব বা পরিপূর্ণ চরিত্র, উদ্বেগ এবং বিষণ্নতা হতে পারে।

ID: 2518

Context: বুলিমিয়া নারভোসা (ইটিং ডিসঅর্ডার) নির্ণয় এবং চিকিৎসা

Question: বুলিমিয়া নারভোসা (ইটিং ডিসঅর্ডার) কিভাবে নির্ণয় এবং চিকিৎসা করা হয়?

Answer:

উপরের লক্ষণ এবং উপসর্গগুলির উপর ভিত্তি করে, ডাক্তার বুলিমিয়া নির্ণয় করতে পারেন খাওয়ার অভ্যাস, ওজন কমানোর পদ্ধতি, এবং শারীরিক উপসর্গগুলির ওপর প্রশ্ন

হৃৎপিণ্ডের কাজ পরিমাপ করার জন্য রক্ত, প্রস্রাব এবং ইলেক্ট্রোকার্ডিওগ্রাম সহ প্রাথমিক পরীক্ষা

ডায়গনিস্টিক এবং পরিসংখ্যানগত মডেল-5 (ডিএসএম-5) টুল রোগ নির্ণয় নিশ্চিত করার জন্যবুলিমিয়া চিকিৎসার জন্য মনোরোগ বিশেষজ্ঞ, চিকিৎসক, এবং ডায়েটিসিয়ান সহ পেশাদারদের একটি দলের প্রয়োজন হয়। মনোবিদ্যাগত পরামর্শ দিয়ে চিকিৎসা শুরু হতে পারে, তবে উপসর্গগুলির তীব্রতার উপর নির্ভর করে, অ্যান্টি-ডিপ্রেসেন্ট ওষুধগুলি দেওয়া যেতে পারে। এফডিএ (FDA) দ্বারা অনুমোদিত ফ্লাক্সিটিন হল একটি অ্যান্টি-ডিপ্রেসেন্টস। কগনেটিভ বিহেভিয়ারাল থেরাপি সাথে সাইকোথেরাপির অন্তর্ভুক্ত চিকিৎসার অন্যান্য উপায়গুলি হল পরিবার-ভিত্তিক চিকিৎসা, আন্তঃব্যক্তিগত সাইকোথেরাপি, পুষ্টি শিক্ষা, এবং হাসপাতালে ভর্তি করা।

বুলিমিয়া কাটানোর জন্য নিয়মিত খাওয়া এবং কোনো খাবার বন্ধ করা উচিত না। কিছু সাহায্য গোষ্ঠী আছে, যাদের রোগীর পছন্দ অনুযায়ী যোগ করা যেতে পারে। চিকিৎসায় সময় লাগলেও, বুলিমিয়া সম্পূর্ণ নিরাময় করা যায়।

ID: 2519

Context: মস্তিষ্কের সংক্রমণ

Question: মস্তিষ্কের সংক্রমণ কি?

Answer:

মস্তিষ্কের সংক্রমণ হল ব্যাপক প্রচলিত একটি পরিভাষা, যা সংক্রমণকে বর্ণনা করতে ব্যবহার করা হয়, যা মাথার বিভিন্ন অংশে প্রভাব ফেলে। মস্তিষ্কের সংক্রমণ মেনিনজাইটিস, ব্রেন অ্যাবসেস এবং এঙ্কেফেলাইটিস এর মতো অবস্থাগুলির পরিচালনা করতে পারে। মেনিনজাইটিস হল মাথার আবরণে প্রদাহ (ফোলা), যেখানে এঙ্কেফেলাইটিস মস্তিষ্কের টিস্যু বা কলায় বৃদ্ধি পায়। মস্তিষ্কের মধ্যে ফোঁড়া হল পূঁজের একটি থলি, যা সংক্রমনের কারণে কলার ভাঙ্গনের ফলে ঘটে।

ID: 2520

Context: মস্তিষ্কের সংক্রমণ এর প্রধান লক্ষণগুলি এবং উপসর্গগুলি

Question: মস্তিষ্কের সংক্রমণ এর সঙ্গে জড়িত প্রধান লক্ষণগুলি এবং উপসর্গগুলি কি?

Answer:

মস্তিষ্কের সংক্রমনের যে সাধারণ উপসর্গগুলি দেখা যায় তা হল:জ্বর।

মাথাব্যথা।

বমি।

ঘাড় শক্ত।

খিঁচুনি।

দুর্বলতা।

ব্যবহারে পরিবর্তন।

দেখার সমস্যা।

কথাবার্তা, শিক্ষা, স্মৃতি এবং একাগ্রতায় অবনতি।

ID: 2521

Context: মস্তিষ্কের সংক্রমণ এর প্রধান কারণ

Question: মস্তিষ্কের সংক্রমণ এর প্রধান কারণ কি?

Answer:

ব্যাকটেরিয়া, ভাইরাস, ছত্রাক, অথবা পরজীবীর কারণে মস্তিষ্কের সংক্রমন হয়। নিম্নলিখিত উপায়ে অণুজীব মাথায় পৌঁছতে পারে:রক্ত দিয়ে- একটি ফুসফুস, হৃদয় এবং দাঁতের সংক্রমণ রক্তের সাহায্যে মাথায় এবং তার কাঠামোয় পৌঁছতে পারে। একটি দুর্বল অনাক্রম্য পদ্ধতির মানুষ বা কোনো রোগ আছে এমন ব্যক্তি অথবা এমন কেউ, যিনি ইমিউনোসাপ্রেসেন্ট ওষুধগুলি নিচ্ছেন, তাদের মস্তিষ্কে সংক্রমণ বাড়ার ঝুঁকি থাকে।

সরাসরি যোগাযোগের দ্বারা- অণুজীব সার্জারির সময় অথবা একটি খোলা ঘা/ক্ষতের মধ্যে দিয়ে মাথায় প্রবেশ করতে পারে।

মস্তিষ্কের কাছাকাছি হয়েছে এমন সংক্রমণের মাধ্যমে যেমন কানের মাঝামাঝি অংশে সংক্রমণ, মাস্টয়েডাইটিস (মাস্টয়েড হাড় ফোলা, যা কানের নিকটে উপস্থিত), এবং সাইনাসের প্রদাহ হয়।অতি পরিচিত জীবাণুগুলি যার ফলে মস্তিষ্ক সংক্রমণের হয়, সেগুলি হল:ছত্রাক যেমন টি. গন্ডি, টি. সোলিয়াম এবং এসপেগিলাস।

ব্যাক্টেরিয়া যেমন এন.মেনিনজাইটিস, এস. নিউমোনিয়া, এইচ. ইনফ্লুয়েঞ্জা এবং অন্যান্য

ভাইরাস যেমন চিকনগুনিয়া ভাইরাস, হারপিস জস্টার এবং সিমপ্লেক্স, সাইটোমেগালোভাইরাস এবং ওয়েস্ট নাইল ভাইরাস।

ID: 2522

Context: মস্তিষ্কের সংক্রমণ নির্ণয় এবং চিকিৎসা

Question: কিভাবে মস্তিষ্কের সংক্রমণ নির্ণয় এবং চিকিৎসা করা যায়?

Answer:

আপনি যেসব লক্ষণ এবং উপসর্গগুলির উপলব্ধি করবেন, তার ভিত্তিতে আপনার চিকিৎসক এমআরআই এবং সিটি স্ক্যানের মতো ডায়েগনস্টিক ইমেজিং পরীক্ষার দ্বারা মস্তিষ্কে অথবা তার আবরণে প্রদাহের উপস্থিতি চিহ্নিত করতে পুঙ্খানুপুঙ্খ শারীরিক পরীক্ষা করবেন। রোগনির্ণয় করতে একটি সংক্রমণ, সেরিব্রোস্পাইনাল ফ্লুয়েড (সিএসএফ) রোগনির্ণয় (কটিদেশীয় ছিদ্র করা) করা হয়, যেখানে সিএসএফ নিম্ন পিঠ থেকে নেওয়া হয় (মেরুদন্ডগত স্তম্ভের কটিদেশীয় স্থানে) এবং অণুজীবের বিশ্লেষণ করা হয়। সাধারণ রক্ত পরীক্ষাগুলিও রোগের কারণসংক্রান্ত জীবাণুগুলির সনাক্ত করতে সক্ষম।মাইক্রোঅর্গ্যানিজম, অ্যান্টিবায়োটিক, এন্টি-ভাইরাল, অথবা এন্টি-ফাঙ্গাল ওষুধগুলির মস্তিষ্কের সংক্রমণের চিকিৎসা করার জন্য দেওয়া হয়। মেডিকেশন ভাইরাস এবং কারণসূচক মাধ্যমটির স্থিতিকালের ওপর নির্ভর করে। প্রাণনাশের ঝুঁকি দেখা দিলে, এমন কিছু নির্দিষ্ট ক্ষেত্রে অস্ত্রোপচার করা হয়।

ID: 2523

Context: মস্তিষ্কে আঘাত

Question: মস্তিষ্কে আঘাত কি?

Answer:

মস্তিষ্কে আঘাত বলতে বোঝায় মস্তিষ্কের কোষগুলির কোনও রকম ক্ষতি হওয়া আর তার থেকে কোষগুলির মৃত্যু অথবা ধ্বংস হওয়া। এটা বাইরের আঘাত অথবা ভিতরের বিষয়গুলির কারণে ঘটতে পারে। যেহেতু মস্তিষ্ক হল সমস্ত শরীরের ক্রিয়াকলাপের নিয়ন্ত্রণ কেন্দ্র, তাই মস্তিষ্কে যেকোন রকম আঘাত শরীরের কার্যকারিতাকে প্রভাবিত করতে পারে। মস্তিষ্কের আঘাতগুলি হালকা, মাঝারি অথবা তীব্র হতে পারে, এবং প্রায়ই মারাত্মক হতে পারে।

ID: 2524

Context: মস্তিষ্কের সংক্রমণ এর প্রধান লক্ষণ এবং উপসর্গগুলি

Question: মস্তিষ্কের সংক্রমণ এর প্রধান লক্ষণ এবং উপসর্গগুলি কি কি?

Answer:

মস্তিষ্কের যে অংশে আঘাত লেগেছে, মস্তিষ্কে আঘাতের লক্ষণগুলি এবং উপসর্গগুলি তার ওপর নির্ভর করে। এই উপসর্গগুলিকে বিস্তৃতভাবে শ্রেণিবিভক্ত করা যেতে পারে - জ্ঞানীয়, আচরণগত, ইন্দ্রিয়লব্ধ এবং শারীরিক।জ্ঞানীয় উপসর্গগুলির মধ্যে যা অন্তর্ভুক্ত:বুঝতে অসুবিধা

ভাবনা এবং চিন্তাধারা প্রকাশে অসুবিধা

মনোযোগের অভাব

সিদ্ধান্ত নেওয়ার অভাব

স্মৃতির হ্রাসআচরণগত উপসর্গগুলি অন্তর্ভুক্ত করা হল:বিরক্তি

উত্তেজিত এবং আগ্রাসী মনোভাব

চাপ কম সহ্য করতে পারা

আলস্য

মানসিক চাঞ্চল্যইন্দ্রিয়লব্ধ উপসর্গগুলি অন্তর্ভুক্ত করা হল:দৃষ্টি, শ্রবণ অথবা স্পর্শের পরিবর্তিত অনুভূতি

চিনতে না পারা

স্বাদ এবং গন্ধের পরিবর্তন

ভারসাম্যের অসুবিধা

ব্যথা সহ্য করার ক্ষমতা হ্রাসশারীরিক উপসর্গগুলি অন্তর্ভুক্ত করা হল:তীব্র এবং একনাগাড়ে মাথাব্যথা

অবসাদ

পক্ষাঘাত

কম্পন (কাঁপা) এবং খিঁচুনি

আলোকাতঙ্ক (আলোর প্রতি সংবেদনশীলতা)

কথাবার্তায় অস্পষ্টতা

চেতনা হারানো

ঘুমের অসুবিধা

ID: 2525

Context: মস্তিষ্কের সংক্রমণ প্রধান কারণ

Question: মস্তিষ্কের সংক্রমণ প্রধান কারণ কি?

Answer:

মাথায় অক্সিজেনের সরাবরাহ বন্ধের কারণে প্রধানত মস্তিষ্কে আঘাত ঘটে, যার ফলাফল হল ব্রেন হাইপোক্সিয়া (কলার মধ্যে কম অক্সিজেন)। কারণগুলি বাহিরের এবং ভিতরের আঘাত হিসাবে শ্রেণিবদ্ধ।বাহিরের আঘাতের কারণগুলি (আঘাতমূলক) অন্তর্ভুক্ত করা হল:পতন

যান-সংক্রান্ত আঘাত

ক্রীড়াঘটিত আঘাত

মাথায় আঘাতভিতরের আঘাতের কারণগুলি অন্তর্ভুক্ত করা হল:স্ট্রোক

টিউমার

অ্যানিউরিজম (মাথার মধ্যে একটি রক্তবাহিকার বিকৃতি)

সংক্রমণ

বিষ প্রয়োগ

ওষুধের অপব্যবহার

স্নায়ুর অসুস্থতা

ID: 2526

Context: মস্তিষ্কের সংক্রমণ নির্ণয় এবং চিকিৎসা

Question: মস্তিষ্কের সংক্রমণ এটা নির্ণয় এবং চিকিৎসা করা হয়?

Answer:

একটি বিশদ রোগ সম্বন্ধীয় ইতিহাস এবং শারীরিক পরীক্ষা মস্তিষ্কে আঘাতের রোগ নির্ণয়ে সাহায্য করে। কিন্তু, আঘাতের ব্যাপ্তি, প্রবলতা এবং আরোগ্য সম্ভাবনা জানতে সুনিশ্চিত অনুসন্ধান দরকার। এই সকল পরীক্ষাগুলি অন্তর্ভুক্ত করা হল:কম্পিউটেড টোমোগ্রাফি (সিটি) স্ক্যান: এটি হল প্রথম রেডিওলজিক্যাল পরীক্ষা যা আশঙ্কা করা মস্তিষ্কে আঘাতের উপর সম্পাদিত হয়। এটি মাথার খুলিতে চিড়, রক্তপাত, হেমাটোমা এবং কলায় ফোলাভাব অনুসন্ধান করায় সাহায্য করে।

ম্যাগনেটিক রিজোনেন্স ইমেজিং (এমআরআই) স্ক্যান: এটি হল সিটি স্ক্যানের তুলনায় অধিক (আরও) যথাযথ এবং আরো গুরুত্বপূর্ণ। এটি মাথা এবং তার বিভিন্ন অংশের একটি বিশদ দর্শন দেয়।চিকিৎসকদের দ্বারা মস্তিষ্কে সংক্রমণের তীব্রতা মূল্যায়নের জন্য গ্লাসগো কোমা স্কেলটি ব্যবহার হয়। সর্বোচ্চ স্কোরগুলি নির্দেশ করে কম তীব্র আঘাতের, যদিও নিম্ন (কম) স্কোরগুলি নির্দেশ করে তীব্র আঘাতের।মস্তিষ্কে আঘাতের চিকিৎসা প্রাথমিক ভাবে নির্ভর করে এটার প্রখরতার ওপর। সাধারণত একটি হালকা আঘাতে কেবলমাত্র উপসর্গগুলির পর্যবেক্ষণ প্রয়োজন এবং কোনও চিকিৎসার প্রয়োজন নেই। অন্যদিকে, মাঝারি এবং তীব্র আঘাতের ক্ষেত্রে ভালভাবে চিকিৎসা করার প্রয়োজন, সাধারণ ওষুধ প্রয়োগ থেকে অস্ত্রোপচার।মস্তিষ্কে আঘাতের ক্ষেত্রে ওষুধজনিত চিকিৎসায় অন্তর্ভুক্ত:অ্যান্টি-সিজার ড্রাগস - মস্তিষ্ক আঘাতের একটি সাধারণ উপসর্গ হল খিঁচুনি ধরা এবং তার থেকে আরও ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে মস্তিষ্ক। এক্ষেত্রে, অ্যান্টি-সিজার ওষুধগুলি চিকিৎসায় দারুন সাহায্য করে।

ডায়ইউরেটিক্স - কিছু ধরণের মস্তিষ্কের সংক্রমণের ফলাফলে মস্তিষ্কের চারিদিকে ফুলে ওঠে। ডায়উউরেটিক্সের ব্যবহার এই ফোলা কমাতে পারে এবং চাপজনিত উপসর্গগুলি প্রশমনে সাহায্য করে।

কোমা ইনডিউসিং ড্রাগস- যখন মাথা নিজেকে পুনরুদ্ধার করার চেষ্টা করছে, এটি বাড়তি অক্সিজেন ব্যবহার করতে শুরু করে। কিন্তু, যদি রক্ত ধমনীগুলো সঙ্কুচিত অথবা ক্ষতিগ্রস্থ হয়, এটি যথেষ্ট অক্সিজেন পায় না, এবং এটি পুনরায় মাথার কোষগুলির আঘাত এবং মৃত্যুর কারণ হয়। ক্রমের মধ্যে এটিকে পরিহার করতে (এড়াতে), অক্সিজেনের প্রয়োজন কমাতে এবং মাথার কোষগুলোকে কার্যকরী করতে কোমা ইনডিউসিং ড্রাগস ব্যবহার করা হয়।মস্তিষ্কে আঘাতের জন্য সার্জারির ভূমিকায় অনেক পদ্ধতি রয়েছে, সাধারণত যেগুলি অন্তর্ভুক্ত:খুলির চিড় মেরামত করা

মাথা থেকে একটি রক্তের ডেলা সরানো

রক্তপাতপূর্ণ ধমনীর সেলাই

মস্তকের (মাথার) মধ্যে চাপ দূর করতে একটি ফাঁক তৈরিসার্জারি এবং ওষুধের একপাশে, মাথার ক্ষতির দ্বারা আক্রান্ত অঙ্গগুলি এবং মাথার কার্যকারীতা ভাল করতে পুনর্বাসন প্রয়োজনীয়। ফিজিওথেরাপি, অকুপেশনাল থেরাপি, কাউন্সেলিং এবং রিক্রিয়েশন থেরাপি পুনর্বাসনের অন্তর্ভুক্ত।

ID: 2527

Context: ব্রেন হ্যামারেজ

Question: ব্রেন হ্যামারেজ কি?

Answer:

ব্রেন হ্যামারেজ হল একটি রক্তপাতের দ্বারা ঘটা অবস্থা এবং যেটি মাথার মধ্যে একটি রক্তের ধমনীর ফেটে যাওয়ার কারণে মাথার চারপাশে প্রধাণত ঘটে থাকে। এটিকে মাথার রক্তপাতও বলা হয়।ব্রেন হ্যামারেজ মাথার মধ্যে চাপ বাড়াতে পারে, অক্সিজেনের সমতা কমায় এবং এইভাবে মাথার কোষগুলিকে হত্যা করে। ব্রেন হ্যামারেজের উপসর্গগুলির অবিলম্বে চিকিৎসা করানোর প্রয়োজন।জায়গার উপরে নির্ভর করে, এখানে চার ধরনের ব্রেন হ্যামারেজ আছে:এপিডিউরাল হ্যামারেজ

সাবডিউরাল হ্যামারেজ

সাবঅ্যারাকনয়েড হ্যামারেজ

ইন্ট্রাসেরিব্রাল হ্যামারেজ

ID: 2528

Context: ব্রেন হ্যামারেজ প্রধান লক্ষণগুলি এবং উপসর্গগুলি

Question: ব্রেন হ্যামারেজ প্রধান লক্ষণগুলি এবং উপসর্গগুলি কি?

Answer:

মস্তিষ্কে মধ্যে যেখানে রক্তপাত হয়, সেখানে মাথাব্যথা অনুভূত হয় না, কারণ মস্তিষ্কের কোষ কোনওরকম অসুবিধা উপলব্ধ করতে পারে না। কিন্তু, যখন রক্তপাত মেনিনজিসের মধ্যে (মাথার আচ্ছাদন) হয়, তখন তীব্র মাথাব্যথা হল সবচেয়ে সাধারণ উপসর্গ। এছাড়া অন্যান্য উপসর্গগুলি হলদুর্বলতা অথবা শিহরণ অথবা অসাড় অবস্থা (একটি দিকের ওপর)

কথা বলায় অসুবিধা

ভারসাম্য হারানো

দৃষ্টি নষ্ট হওয়া

জ্ঞান হারানো

খিঁচুনি

ID: 2529

Context: ব্রেন হ্যামারেজ এর প্রধান কারণ

Question: ব্রেন হ্যামারেজ এর প্রধান কারণ কি?

Answer:

ব্রেন হ্যামারেজ বিভিন্ন কারণে ঘটতে পারে:মস্তিষ্কে মানসিক আঘাত অথবা জখম

মস্তিষ্কের ধমনী দুর্বল হওয়া অথবা ফেটে যাওয়া

প্লেটলেটের অভাবের মত রক্তপাতের রোগ

সিরোসিসের মতো যকৃৎয়ের রোগ

উচ্চ-রক্তচাপ

ব্রেন টিউমাররক্তচাপ বৃদ্ধি ব্রেন হ্যামারেজের সবচেয়ে সাধারণ কারণ। এর ফলে মস্তিষ্কের রক্তবাহিকাগুলি ক্ষতিগ্রস্ত হয় আর তার থেকে স্ট্রোক হতে পারে। 13% স্ট্রোক এর থেকেই হয়।আঘাতের কারণে রক্ত যখন টিস্যু বা কলাকে প্রভাবিত করে, তখন তা ফোলার কারণ হয়। এটিকে সেরিব্রাল ওডেমা বলা হয়। জমা রক্ত হেমাটোমা তৈরি করে, যেটি মস্তিষ্কের কলার কাছে চাপ বাড়ায় এবং মস্তিষ্কের কোষগুলিতে অক্সিজেনের সরাবরাহ কমিয়ে দেয়। আর তার ফলে মস্তিষ্কের কোষগুলির মৃত্যু ঘটে।

ID: 2530

Context: ব্রেন হ্যামারেজ চিকিৎসা

Question: কিভাবে ব্রেন হ্যামারেজ এটি ধরা এবং চিকিৎসা করা যায়?

Answer:

উপসর্গগুলির ভিত্তিতে, চিকিৎসক হ্যামারেজের স্থান সনাক্ত করতে এমআরআই অথবা সিটি স্ক্যান করানোর জন্য বলতে পারেন। এছাড়া অন্যান্য পরীক্ষাগুলি হল:অ্যাঞ্জিওগ্রাম - ফুটো হওয়ার যথাযথ স্থান দেখতে একটি রঞ্জক মাথার ধমনীর মধ্যে ঢোকানো হয়

কম্পিউটেড টোমোগ্রাফি অ্যাঞ্জিওগ্রাফি

সেরিব্রোস্পাইনাল ফ্লুইড এক্সামিনেশন

লাম্বার পাংচারযতক্ষণ না অবস্থা পুরোপুরি স্থিতিশীল হচ্ছে, ততক্ষণ প্রাথমিক কয়েক ঘণ্টা রোগীর নিকট পর্যবেক্ষণ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। রক্তচাপ এবং শ্বাসক্রিয়ার স্থিতিশীল অবস্থায় আনা প্রাথমিক পদক্ষেপ। প্রয়োজন হলে তার পরপরই অস্ত্রোপচারের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়।ব্রেনপ্যাথ সার্জারি হল একটি নতুন পদ্ধতি এবং যা চিরাচরিত সার্জারির তুলনায় কম দাগের এবং দ্রুত আরোগ্যের কারণ হয়।চাপ কমানোর জন্য মাথার চারিদিকে জমে থাকা রক্তকে বের করা হয়।রক্তচাপ, খিঁচুনি এবং মাথাব্যথা নিয়ন্ত্রণ করতে ওষুধ ব্যবহার হয়। হ্যামারেজের উপসর্গগুলির ঠিকমতো পরিচালনার পাশাপাশি তার অন্তর্নিহিত কারণগুলি সংশোধন করাও গুরুত্বপূর্ণ।চিকিৎসাতে সাড়া দেওয়ার তারতম্য নির্ভর করে হ্যামারেজের স্থান এবং ব্যাপ্তির উপর।কখনো কখনো, যথাযথ চিকিৎসা করার পরেও রোগীর মৃত্যু ঘটতে পারে।সামগ্রিকভাবে, আরোগ্য লাভের সম্ভাবনা নির্দিষ্ট নয়। অনেকে ভালোভাবে বেঁচে থাকেন, আবার অনেকে মস্তিষ্কের নির্দিষ্ট স্থানে রক্তপাত অথবা অত্যাধিক পরিমাণে রক্তপাত হওয়ার কারণে মারা যান। কেউ কেউ আবার একনাগাড়ে অথবা দীর্ঘস্থায়ী দুর্বলতা, সংবেদন সমস্যা, খিঁচুনি, মাথাব্যথা অথবা স্মৃতিশক্তির সমস্যা নিয়ে বেঁচে থাকতে পারেন।

ID: 2531

Context: ব্রেন ক্যান্সার

Question: ব্রেন ক্যান্সার কি?

Answer:

ব্রেন ক্যান্সার হল কোষগুলির একটি অনিয়ন্ত্রিত বিভাগ যার ফলে মস্তিষ্কের মধ্যে একটি অস্বাভাবিক বৃদ্ধি হয়। সমস্ত ব্রেন টিউমার ব্রেন ক্যানসারে বর্ধিত হয় না। ব্রেন ক্যান্সার দুই ধরণের হতে পারে:বিনাইন (ক্যান্সারবিহীন) - এটি নিম্ন শ্রেণির (প্রথম অথবা দ্বিতীয়), প্রকৃতির মধ্যে ধীরে বৃদ্ধিমূলক এবং অসাধারণভাবে চিকিৎসার পর সেরে যায়।

মালিগন্যান্ট (ক্যান্সারযুক্ত) - এটি উচ্চ শ্রেণির (তৃতীয় অথবা চতুর্থ), এটি মস্তিষ্কের মধ্যে সৃষ্ট হয় এবং শরীরের অন্যান্য অংশে (প্রাথমিক) ছড়িয়ে পড়ে বা শরীরের অন্য কোথাও শুরু হয় এবং মস্তিষ্কের (দ্বিতীয় পর্যায়ভুক্ত) ছড়িয়ে যায়।ব্রেন ক্যান্সারের স্থান এবং বৃদ্ধির হার নির্ধারণ করে স্নায়বিক পদ্ধতির ক্রিয়ার ওপর তার প্রভাব কিরকম হবে।

ID: 2532

Context: ব্রেন ক্যান্সার প্রধান লক্ষণগুলি এবং উপসর্গগুলি

Question: ব্রেন ক্যান্সার প্রধান লক্ষণগুলি এবং উপসর্গগুলি কি?

Answer:

লক্ষণগুলি মস্তিষ্কের যতটা অংশ প্রভাবিত হয়েছে, তার ওপর নির্ভর করে এর লক্ষণ। নীচে ব্রেন ক্যান্সারের কয়েকটি উপসর্গগুলি দেওয়া হল:মাথাব্যথা প্রায়ই ব্রেন ক্যানসারের প্রথম উপসর্গ হয়, এবং হালকা, তীব্র, স্থির অথবা থেমে-থেমে হওয়া হতে পারে

কথা বলতে অসুবিধা

খিঁচুনি

বমি বমি ভাব, ঝিমুনি এবং বমি

শরীরের একপাশে দুর্বলতা অথবা অসাড়তা ক্রমাগত বাড়া

শব্দগুলি মনে রাখার অসুবিধার মত মানসিক সমস্যা

ভারসাম্য হারানো

দৃষ্টি, শ্রবণ, গন্ধ অথবা স্বাদ নষ্ট হওয়া

ID: 2533

Context: ব্রেন ক্যান্সারের প্রধান কারণগুলি

Question: ব্রেন ক্যান্সারের প্রধান কারণগুলি কি কি?

Answer:

ব্রেন ক্যান্সারের কারণগুলি অজানা এবং অনির্দিষ্ট। কিন্তু, এখানে অনেকগুলি ঝুঁকির বিষয় ব্রেন ক্যান্সারের সাথে যুক্ত আছে যেমন:বয়স - বয়সের সাথে ব্রেন ক্যান্সারের ঝুঁকি বৃদ্ধি পায়।

উচ্চ মাত্রার রশ্মিবিচ্ছুরণ প্রদর্শনেতেও ব্রেন ক্যান্সারের ঝুঁকি বৃদ্ধি পায়।

ক্যান্সারের পূর্ববর্তী ইতিহাস শিশুদের মধ্যে পরের জীবনে ব্রেন ক্যান্সার বাড়ার একটি সর্বাধিক ঝুঁকি রাখে। লিউকিমিয়া অথবা নন-হদ্গ্কিন লিম্ফোমার ইতিহাসের সাথে যুক্ত প্রাপ্তবয়স্কদের ব্রেন ক্যান্সার বৃদ্ধি পাওয়ার সর্বাধিক ঝুঁকি আছে।

একটি ইতিবাচক পারিবারিক ইতিহাস অথবা কিছু জন্মগত অবস্থা ব্রেন ক্যান্সারের ঝুঁকি বৃদ্ধি করতেও পরিচিত।

ID: 2534

Context: ব্রেন ক্যান্সার নির্ণয় এবং চিকিৎসা

Question: কিভাবে ব্রেন ক্যান্সার নির্ণয় এবং চিকিৎসা করা হয়?

Answer:

চিকিৎসক রোগীর গতিদায়ক প্রতিবর্তী ক্রিয়া, পেশি শক্তি এবং সংবেদনশীল প্রতিক্রিয়াগুলির দ্বারা রোগ নির্ণয় নিশ্চিত করেন। টিউমারের দ্বারা মাথার মধ্যে চাপ বৃদ্ধির কারণে দৃষ্টিসংক্রান্ত স্নায়ু স্ফীত হয়।ব্রেন ক্যান্সারের প্রধান রোগনির্ণয়সংক্রান্ত পরীক্ষা হল এমআরআই এবং সিটি স্ক্যান যা সাধারণত একটি পুঙ্খানুপুঙ্খ চোখের অভীক্ষণ এবং পরীক্ষাগুলি অনুসরণ করে যেমন একটি স্লিট-ল্যাম্প চক্ষু পরীক্ষা।অন্য পরীক্ষাগুলি যেগুলি ব্যবহার হতে পারে সেগুলি হল:ম্যাগনেটিক রিজোনেন্স স্পেকট্রোস্কপি

পিইটি স্ক্যান

সিঙ্গল-ফোটন এমিসন সিটি (এসপিইসিটি) স্ক্যান

লাম্বার পাংচারটিউমারের পর্যায় এটার বিকাশের পরিমানের উপর নির্ভর করে। এটি টিউমারের আকার এবং শরীরে কতটা ছড়িয়েছে তা নির্দেশ করে।প্রথম এবং দ্বিতীয় শ্রেণিগুলি হল ধীরে ক্রমবর্ধমান

তৃতীয় এবং চতুর্থ শ্রেণিগুলি হল দ্রুত ক্রমবর্ধমানশ্রেণির উপর ভিত্তি করে, টিউমারের চিকিৎসা হয়:স্টেরয়েড - টিউমারের চারিদিকে প্রদাহ কমাতে

সার্জারি - টিউমার অপসারণ করতে

রেডিওথেরাপি - অস্বাভাবিক কোষগুলির যেকোনও বাকি অংশের অধিকতর চিকিৎসা করতে

কেমোথেরাপি - অস্বাভাবিক কোষগুলিকে মারার চিকিৎসাক্যান্সার না হওয়া টিউমারগুলি একটি ভালোভাবে আরোগ্য লাভের সম্ভাবনার সাথে সফলভাবে চিকিৎসা হয়। সাধারণত, অল্পবয়ষ্ক রোগীদের উত্তম আরোগ্য লাভের সম্ভাবনা আছে।যেহেতু ব্রেন ক্যান্সার বিরল অসুখ, তাই বাঁচার হার গণনা করা কঠিন। আগে থেকে ব্রেন ক্যান্সার ধরা পড়লে গড়ে 15% মানুষ 5 বছর পর্যন্ত তা নিয়ে বেঁচে থাকতে পারেন।

ID: 2535

Context: শরীরে ব্যথা (গায়ে ব্যথা)

Question: শরীরে ব্যথা (গায়ে ব্যথা) কি?

Answer:

শরীরের ব্যথা হল সারা শরীরের একটা অস্বস্তিকর অনুভূতি যা আপনাকে ক্লান্ত এবং অলস উপলব্ধি করায়। এটা হঠাৎ বা কখনো কখনো হতে পারে, এমনকি ধীরে ধীরে এবং একসঙ্গে অনেক দিন ধরেও হয়। এই ধরণের ব্যথা টেন্ডন বা লিগামেন্টগুলির মত নরম টিস্যুতে বা বিভিন্ন পেশীগুলিতে অনুভূত হতে পারে। কখনো কখনো, এটি একটি অন্তর্নিহিত গুরুতর রোগকে নির্দেশ করে, যদিও কখনো কখনো, এটি উদ্বেগ এর একটি অভিব্যক্তিও হতে পারে।

ID: 2536

Context: শরীরে ব্যথা (গায়ে ব্যথা) র লক্ষণ

Question: শরীরে ব্যথা (গায়ে ব্যথা) এর সঙ্গে যুক্ত প্রধান লক্ষণ এবং উপসর্গগুলো কি কি?

Answer:

শারীরিক ব্যথা অ্যাকিউট বা ক্রনিক হতে পারে, তবে কম বেশি, এটা একধরনের উপসর্গগুলো নিয়েই আসে; অ্যাকিউট (কয়েক দিনের জন্য স্থায়ী) বা ক্রনিক (এক মাস ধরে স্থায়ী)। উভয় ধরনের কারণ ভিন্ন ভিন্ন হয়।শরীরের ব্যথার সঙ্গে যুক্ত উপসর্গগুলি হল:শরীরের বিভিন্ন জায়গায় বা এলাকায় ব্যথা।

টেন্ডার পয়েন্ট (এই জায়গাগুলো টিপলে ব্যথার বৃদ্ধি অনুভূত হয়)।

অবসাদ

ভালো ঘুম না হওয়া, সকালে জেগে উঠার পরও সতেজ না হওয়া।

মর্নিং স্টিফনেস (এটি 30 মিনিটের মতো স্থায়ী হয়)।

হাত, পা, বাহু ইত্যাদিতে ঝিঁঝি এবং অসাড় অবস্থা।

মাথা ব্যথা

উদ্বেগ

ID: 2537

Context: শরীরে ব্যথা (গায়ে ব্যথা) এর প্রধান কারণগুলো

Question: শরীরে ব্যথা (গায়ে ব্যথা) এর প্রধান কারণগুলো কি কি?

Answer:

যদিও, আপনার তীব্র, একইসঙ্গে দীর্ঘস্থায়ী শরীরের ব্যথা জন্য একই বা অনুরূপ লক্ষণ এবং উপসর্গ থাকতে পারে।অ্যাকিউট শরীরের ব্যথার কারণগুলো হল:দৈহিক অসুস্থতা অথবা আঘাত

জলশূণ্যতা

হাইপোকালেমিয়া (কম পটাসিয়ামের মাত্রা)

ঘুমের অভাব

তীব্র ভাইরাল বা ব্যাকটেরিয়া সংক্রমণ

অতিরিক্ত শারীরিক পরিশ্রমক্রনিক শরীরের ব্যথার কারণগুলো হল:ফিব্রোমিয়ালগীয়া - শরীরে একাধিক জায়গায় ব্যথা যেগুলো স্পর্শ করলে নমনীয় হয়

মনোবিদ্যাগত কারণ - চাপ, উদ্বেগ বা বিষণ্নতা

পুষ্টির অভাব - ভিটামিন ডি, ভিটামিন বি12, আয়রন

ক্রনিক ফ্যাটিগ সিন্ড্রোম - স্ট্রেস বা অতিরিক্ত শারীরিক কাজ না থাকা সত্ত্বেও দিনের পর দিন অবিরত এবং নিরন্তর ক্লান্তির অনুভূতি

অটোইমিউন রোগ - রিউম্যাটয়েড আর্থ্রাইটিস, মাল্টিপল স্ক্লেরোসিস, লুপাস

ক্রনিক সংক্রমণ - টিউবারকুলোসিস, এইচআইভি, হেপাটাইটিস বি

ID: 2538

Context: শরীরে ব্যথা (গায়ে ব্যথা) নির্ণয় এবং চিকিৎসা

Question: শরীরে ব্যথা (গায়ে ব্যথা) কিভাবে নির্ণয় এবং চিকিৎসা করা হয়?

Answer:

কখনো কখনো, অল্প শরীরের ব্যথার রোগ নির্ণয় করা কঠিন হয়; তবুও, একটি পর্যাপ্ত চিকিৎসার ইতিহাসের সাথে ক্লিনিকাল পরীক্ষা শরীরে ব্যথার কারণ নির্ণয় করতে সাহায্য করে। চিকিৎসার ইতিহাস এবং শারীরিক পরীক্ষার পাশাপাশি শরীরের ব্যথাটির কারণ জানতে কিছু রক্ত পরীক্ষা করা যেতে পারে। এই পরীক্ষাগুলি হল:সম্পূর্ণ রক্ত গণনা - অ্যানিমিয়া নির্ধারণ করতে সাহায্য করে

এরিথ্রোসাইট সেডিমেনটেশন রেট (ইএসআর) এবং সি-রিএক্টিভ প্রোটিন (সিআরপি) - শরীরের উপস্থিত প্রদাহ নির্মূল করতে সাহায্য করে।

আলকালাইন ফসফাটেজের সাথে এ্যাসপার্টেট ট্রান্সামিনেস - পেশী ভাঙনের ঘটনা নিশ্চিত করে।

রহিউমাটোয়েড আর্থ্রাইটিস (আরএ) ফ্যাক্টর - রহিউমাটোয়েড আর্থ্রাইটিসের নির্ণয় নিশ্চিত করার জন্য করা হয়।

অ্যান্টি নিউক্লিয়ার অ্যান্টিবডি - শরীরে ব্যথার যেকোন অটো-ইমিউন কারণ দূর করতে করা হয়।

ভিটামিন বি12 এবং ডি3 লেভেলস - ভিটামিন বি12 এবং ডি3 এর পুষ্টির অভাবকে দূর করতে করা হয়।এমনকি এই পরীক্ষার পরেও, যদি কারণটি জানা না যায়, তবে মানসিক বিশেষজ্ঞ বা কাউন্সেলরের সাথে একটি সেশন, চাপ, উদ্বেগ এবং বিষণ্নতার মত অন্তর্নিহিত মানসিক কারণগুলি নির্ধারণে সাহায্য করতে পারে।একবার কারণ জানা গেলে, তার উপর নির্ভর করে, চিকিৎসা পদ্ধতি নির্ণয় করা হয়। কিছু রোগীর শুধুমাত্র লক্ষণগুলির চিকিৎসা প্রয়োজন হতে পারে, কারোর কাউন্সিলিং সেশনের পাশাপাশি কেবল প্লাসিবোর প্রয়োজন হতে পারে।চিকিৎসার জন্য ব্যবহৃত নির্দিষ্ট ওষুধগুলো হল:এনালজেসিকস - প্যারাসিটামল বা নন-স্টেরয়েডাল এন্টি-ইনফ্ল্যামাটরি ড্রাগস (ডিক্লোফেন্যাকের মতো) ব্যথা উপশম করার জন্য নেওয়া যেতে পারে।

মাসল রিলাক্সান্টস - শারীরিক ব্যথা টানটান পেশীর কারণে হতে পারে; পেশীর রিলাক্সেন্টস নিলে তা শরীরকে ব্যথা মুক্ত করতে সাহায্য করতে পারে।

ভিটামিন সাপ্লিমেন্টস - শরীরের ব্যথা যদি পুষ্টিকর ঘাটতির কারণে হয় তবে ভিটামিন বি12 (বা এমনকি বি কমপ্লেক্স), ভিটামিন ডি -র (ক্যালসিয়াম সহ) গ্রহণ, দ্রুত ব্যথা উপশম করতে পারে।

এঞ্জায়লাইটিক্স বা অ্যান্টি-ডিপ্রেশনস - এইগুলি দোকানে গেলেই পাওয়ার মতো ওষুধ নয়, এবং এগুলো পেতে হলে সাধারণত একজন মনোবৈজ্ঞানিকের প্রেসক্রিপশনের প্রয়োজন হয়, তবে অন্তর্নিহিত কারণটি যদি মানসিক উৎস হয় তবে এই ওষুধগুলি সাহায্য করতে পারে।নির্দিষ্ট ক্ষেত্রে, যখন শরীরের ব্যথা পেশীর টানটান হওয়ার সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত হয়; তখন ফিজিওথেরাপি, আকুপাংচার, ম্যাসেজ, বা অন্যান্য বিকল্প থেরাপি উপসর্গগুলি থেকে ভাল পরিত্রান দিতে পারে।

ID: 2539

Context: শরীরে ব্যথা (গায়ে ব্যথা) কিভাবে নির্ণয় এবং চিকিৎসা

Question: শরীরে ব্যথা (গায়ে ব্যথা) কিভাবে নির্ণয় এবং চিকিৎসা র প্রধান লক্ষণ এবং উপসর্গগুলি কি কি?

Answer:

এটি হওয়ার কারণের উপর নির্ভর করে, ফোস্কার লক্ষণ এবং উপসর্গগুলি বিভিন্ন হয়ে থাকে।ফোস্কাতে সাধারণভাবে ব্যথা এবং লালভাব দেখা যায় (যেমন ভুল মাপের জুতা পরা, পুড়ে যাওয়া, আঘাত, ইত্যাদি)।

পুড়ে যাওয়ার কারণে হওয়া ফোস্কাতে, অটোইমিউন রোগে (এপিডারমলিসিস বুলোসা) লালভাব এবং চামড়া উঠে যেতে দেখা যায়।

ভাইরাসের সংক্রমণের ফলে জ্বর আসার ফলে ঠোঁটের কাছে ফোস্কা হয় (জ্বর ফোস্কা)।

একজিমা, ত্বক সংক্রমণের (চর্মদল) ফলে যে ফোস্কা হয় তাতে চুলকানি হয়ে থাকে।

ফ্রস্টবাইট ফোস্কার ক্ষেত্রে চামড়া সাদা এবং চকচকে হয়ে যায় এবং অসাড়ভাব দেখা দেয়।

রোদে পোড়ার কারণে যে ফোস্কা হয় তাতে চামড়ার উপর বলিরেখা ও তামাটে ভাব দেখা দেয়।

কোঁচ দাদ (হারপেস জস্টার), চিকেন পক্স ইত্যাদিতে ফোস্কায় জ্বালাভাব সাথে যন্ত্রণা হয় ও তার সাথে একটি খোস দেখা দেয়।

ID: 2540

Context: ফোস্কার প্রধান কারণগুলি

Question: ফোস্কার প্রধান কারণগুলি কি কি ?

Answer:

চামড়ার উপর ফোস্কার সৃষ্টির জন্য বিভিন্ন কারণ দায়ী।দীর্ঘদিন ধরে ত্বক ঘর্ষণ বা মার্জন।

তাপের সংস্পর্শে আসার ফলে, রাসায়নিক, অতিবেগুনী রশ্মি, হিমাঙ্কের নীচে তাপমাত্রা ইত্যাদি কারণে আঘাতপ্রাপ্ত হওয়া।

চিকেন পক্স, হারপিস, জস্টার, এবং ত্বক সংক্রমণ প্রভৃতি রোগ।

রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা সংক্রান্ত ব্যাধি যেমন পেমফিগাস, এপিডার্মোলাইসিস বুলোসা ইত্যাদি।

অ্যালার্জির প্রতিক্রিয়া যেমন নির্দিষ্ট কিছু গাছপালার সংস্পর্শে আসা (বিষ আইভি, ওক ইত্যাদি), রাসায়নিক ইত্যাদি।

ID: 2541

Context: ফোস্কা নির্ণয় এবং চিকিৎসা

Question: কিভাবে ফোস্কা নির্ণয় এবং এর চিকিৎসা করা হয়?

Answer:

শারীরিক পরীক্ষা, উপসর্গের ইতিহাস, এবং বিভিন্ন পরীক্ষা ফোস্কা নির্ণয় করতে ডাক্তারদের সাহায্য করে।পরীক্ষা এবং ইতিহাস

অবয়ব - পরিষ্কার তরল, রক্ত, বা পুঁজ দ্বারা ফোস্কা গঠিত হয়

অবস্থান - শরীরের একপাশে বা নির্দিষ্ট অবস্থানে বা পুরো শরীরের উপর ফোস্কা

উপসর্গের ইতিহাস - ফোস্কা ব্যথা, চুলকানি, জ্বর, ইত্যাদির সাথে সম্পর্কিত।

পরীক্ষা

সম্পূর্ণ রক্ত পরীক্ষা

আইজিই স্তর নির্ণয় অ্যালার্জি সনাক্তকরণে, আইজিজি, আইজিএম এবং অন্যান্য উন্নত পরীক্ষাগুলি অটোইমিউন রোগ নির্ণয়ের জন্য।

ফোস্কা থেকে নেওয়া তরলের নমুনায় থাকা ব্যাকটেরিয়ার অনুশীলন করে সনাক্ত করা যায় সংক্রমণের কারণ যে ব্যাকটেরিয়া সেটিকে এবং তার চিকিৎসার জন্য প্রয়োজনীয় অ্যান্টিবায়োটিকটি।

ফোস্কার কারণ যে ব্যাকটেরিয়া বা ভাইরাসটি সেটিকে সনাক্ত করতে পলিমারেজ চেন রিঅ্যাকশন বা পিসিআর করা হয়।

অ্যালার্জির কারণগুলি সনাক্ত করতে রক্তের অ্যালার্জি পরীক্ষা এবং ত্বকের অ্যালার্জি পরীক্ষা করা হয়।

ত্বকের বায়োপসি - ফোস্কার কারণ সনাক্ত করতে এবং অন্যান্য কারণগুলি জানতে অণুবীক্ষণ যন্ত্রের নীচে ত্বকের নমুনা পরীক্ষা করা হয়।

অ্যান্টিজেন এবং অ্যান্টিবডির উপস্থিতি সনাক্ত করতে বিশেষ পরীক্ষাগুলি সম্পন্ন হয় যেটি ফোস্কা গঠনের সাথে সম্পর্কযুক্ত।

বংশগত সমস্যাগুলি সনাক্ত করতে জিনগত পরীক্ষাগুলি করা হয়।ফোস্কা সাধারণত ওষুধ ছাড়া নিজের থেকেই ভাল হয়ে যায়। ওষুধ যেসকল পরিস্থিতিতে ব্যবহার করা হয় তা হল:অ্যান্টিবায়োটিক ব্যবহার করা হয়

ফোস্কা যদি পূঁজ পূর্ণ হয় তবে সংক্রমণের চিকিৎসা করতে

যখন ফোস্কা বার বার হয়

অ্যালার্জি, আলোক-সংবেদনশীলতা, অথবা পুড়ে যাওয়ার কারণে যদি ফোস্কা মারাত্মক আকার ধারণ করে

যদি মুখের ভিতর অথবা অন্য কোন অস্বাভাবিক জায়গায় ফোস্কা হয়

অ্যান্টিভাইরাল বা সংক্রামণরোধী ওষুধ

চিকেনপক্স, হারপিস জোস্টার বা জ্বর ফোস্কার কারণে হওয়া ফোস্কার জন্য।

কর্টিকোস্টেরয়েডস এবং ইমিউনিটি মডিউলেটিং ওষুধ অটোইমিউন রোগের কারণে হওয়া ফোস্কায় ব্যবহৃত হয়।

প্রদাহনাশক ওষুধ ব্যথা কমাতে ব্যবহার করা হয়।

অ্যালার্জিরোধী ওষুধ চুলকানি কমাতে ব্যবহার করা হয়।

সানস্ক্রিন লোশন ত্বককে রোদে পোড়ার হাত থেকে বাঁচাতে ব্যবহার করা হয়।

ফোস্কার অবস্থা মারাত্মক হলে এবং ত্বকে এর কারণে বিকৃতি সৃষ্টি হলে সার্জারি এবং ত্বক গ্রাফটিং প্রয়োজনীয়, বিশেষত অটোইমিউন রোগের ক্ষেত্রে এটি প্রযোজ্য।নিজের যত্নফোস্কাটি ফাটানো এবং সেই স্থানের ত্বক নির্মোচন এড়িয়ে চলতে হবে।

ফেটে যাওয়া ফোস্কা থেকে তরল বের করে দেওয়ার পর এটিকে নরম ড্রেসিং বা আবরণের দ্বারা ঢেকে দিতে হবে।

ফোস্কা হতে পারে এমন ভুল মাপের জুতা ব্যবহার না করা।

বিশেষত পায়ের ফোস্কার ফেটে যাওয়াকে এড়াতে, যথাযথ জুতোর সোল ব্যবহার করতে হবে।

ID: 2542

Context: ব্লাডার ইনফেকসন বা মূত্রথলির সংক্রমণ

Question: ব্লাডার ইনফেকসন বা মূত্রথলির সংক্রমণ কাকে বলে?

Answer:

ব্লাডার ইনফেকসন (সিস্টাইটিস) হল খুব সাধারণ ধরণের মূত্রনালী অঙ্গের সংক্রমণ যা শিশু ও বড়দের সমান ভাবে আক্রান্ত করে। মূত্রনালী অঙ্গের অন্যান্য যে অংশগুলিতে সংক্রমণ ঘটে সেগুলির মধ্যে আছে কিডনি (পাইলোনেফ্রাইটিস) এবং মূত্রনালী (ইউরিথ্রাইটিস)। ছেলেদের চেয়ে মেয়েরা ব্লাডার ইনফেকসনে বেশি ভোগে। ব্লাডার বা মূত্রথলির সংক্রমণে মূত্রত্যাগে জ্বালাভাব এবং বার বার মূত্রত্যাগ খুব সাধারণ উপসর্গ। যদি চিকিৎসা না করানো হয়, তবে মূত্রথলি থেকে সংক্রমণ কিডনিতে এবং/অথবা মূত্রনালীতে ছড়িয়ে পড়ে। ডাক্তার সংক্রমণের থেকে বাঁচার জন্য এবং অস্বস্তিকর উপসর্গগুলি রক্ষা পেতে অ্যান্টিবায়োটিক দেন।

ID: 2543

Context: ব্লাডার ইনফেকসন বা মূত্রথলির সংক্রমণ এর প্রধান লক্ষণ ও উপসর্গগুলি

Question: ব্লাডার ইনফেকসন বা মূত্রথলির সংক্রমণ এর প্রধান লক্ষণ ও উপসর্গগুলি কি কি?

Answer:

মূত্রথলির সংক্রমণের সাথে জড়িত উপসর্গগুলি প্রায়ই পীড়নের সৃষ্টি করে। যার মধ্যে আছে:মূত্রত্যাগের সময় ব্যথা এবং/অথবা জ্বালাভাব। (আরো পড়ুন: মূত্রত্যাগের সময় ব্যথার কারণ)

হঠাৎ হঠাৎ মূত্রত্যাগের তাড়না, মূত্রত্যাগের পরেই আবার মূত্রত্যাগের ইচ্ছা, যা দিনে অথবা রাতে সমানভাবে অনুভুত হয়

মূত্র চেপে রাখতে অপারগতা বা অক্ষম

মূত্রের রঙ পরিবর্তন - ধোঁয়াটে, গাঢ়বর্ণের, প্রভৃতি।

মূত্রে রক্ত আসা, যদি সংক্রমণ খুব বেশি হয়

খুব দুর্গন্ধযুক্ত মূত্র

তলপেটে ব্যথা সাথে সাধারণ দূর্বলতা

জ্বর-এর সাথে হাত পা ঠান্ডা হয়ে যাওয়া, যখন সংক্রমণ খুব বেশি হয়

ID: 2544

Context: ব্লাডার ইনফেকসন বা মূত্রথলির সংক্রমণ এর প্রধান কারণগুলি

Question: ব্লাডার ইনফেকসন বা মূত্রথলির সংক্রমণ এর প্রধান কারণগুলি কি কি?

Answer:

বেশিরভাগ ক্ষেত্রে মূত্রনালীর সংক্রমণ বা মূত্রথলির সংক্রমণ এক ধরণের ব্যাকটেরিয়া দ্বারা সংঘটিত হয়, যাকে বলে

ই. কোলাই.যেসব কারণগুলি সংক্রমণ ঘটার ঝুঁকি বাড়িয়ে দেয়, সেগুলি হলমূত্রথলির সাথে দীর্ঘদিন ক্যাথেটার লাগানো থাকলে

যৌন সংসর্গ, মেনোপজ, গর্ভনিরোধকের প্রতিবন্ধক ব্যবস্থা (মধ্যচ্ছদা), গর্ভধারণ প্রভৃতি সাধারণভাবে মহিলাদের মধ্যে মূত্রথলির সংক্রমণ ঘটায়। মহিলারা মূত্রথলির সংক্রমণের শিকার হন কারণ তাদের মূত্রনালীর দৈর্ঘ্য কম হয় এবং মূত্রদ্বারটি মলদ্বারের কাছে অবস্থান করে

ডায়াবেটিস

প্রোস্টেট গ্রন্থির বেড়ে যাওয়া

বেশি বয়স ও দীর্ঘকালীন অসুস্থতার সাথে দীর্ঘদিন হাঁটতে চলতে না পারা

মূত্রনালীর সার্জারি ও অন্যান্য প্রক্রিয়া

ID: 2545

Context: ব্লাডার ইনফেকসন বা মূত্রথলির সংক্রমণ রোগ নির্ণয় ও চিকিৎসা

Question: ব্লাডার ইনফেকসন বা মূত্রথলির সংক্রমণ রোগ নির্ণয় ও চিকিৎসা কিভাবে করা হয়?

Answer:

ডাক্তার মূত্রথলির সংক্রমণের রোগ নির্ণয় করেন উপসর্গগুলির ও শারীরিক পরীক্ষাগুলির উপর নির্ভর করে। যেসব পরীক্ষা দ্বারা এই রোগ নির্ণয় হয়, সেগুলি হল:মূত্রের বিশ্লেষণসংক্রমণের সময়ে মূত্রে বেড়ে যাওয়া অ্যাসিডের মাত্রা দেখার জন্য ডিপ-স্টিক টেস্ট করা হয়। মূত্রে সংক্রমণ হয়েছে কিনা দেখার জন্য এটি হল খুব সাশ্রয়কর পরীক্ষা।

নাইট্রাইটস এবং লিউকোসাইট এস্টারেস পরীক্ষা সংক্রমণের সময়ে মূত্রে শ্বেত রক্ত কণিকা আছে কিনা সনাক্ত করে।

সংক্রমণ-সৃষ্টিকারী ব্যাকটেরিয়ার বৃদ্ধি দেখার জন্য পরীক্ষাগারে কৃত্রিম উপায়ে মূত্রের নমুনা থেকে, ইউরিন কালচার করা হয়।প্রতিবিম্ব দ্বারা গবেষণাবারবার হওয়া ও উচ্চ-পর্যায়ের সংক্রমণে বিভিন্ন পরীক্ষা করে দেখা হয়, বা যে সংক্রমণে সাধারণ চিকিৎসা দ্বারা সাড়া পাওয়া যাচ্ছে না সেক্ষেত্রে কিছু পরীক্ষা করা হয়। এই পরীক্ষাগুলির মধ্যে আছে:সিস্টোস্কপি

আলট্রাসাউন্ড

এক্স-রে প্রতিবিম্বকরণ

ইন্ট্রাভেনাস পায়েলোগ্রাম (আইভিপি)

কম্পিউটারাইজড টোমোগ্রাফি স্ক্যান (সি টি স্ক্যান)

ম্যাগনেটিক রিজনেন্স ইমেজিং (এম আর আই)

ইউরোডাইনামিক পরীক্ষামূত্রথলির সংক্রমণের চিকিৎসার লক্ষ্য হল সংক্রমণকে সমূলে শেষ করা ও কষ্টকর উপসর্গগুলি থেকে রোগীকে মুক্তি দেওয়া।অ্যান্টিবায়োটিকসসাধারণত 5 দিনের অ্যান্টিবায়োটিকের ক্রমের পরে বড়োদের ক্ষেত্রে এবং 2 থেকে 3 দিনের ক্রমের পরে ছোটোদের ক্ষেত্রে মূত্রথলির সংক্রমণ সেরে যায়।

লম্বা অ্যান্টিবায়োটিকের ক্রম নিলে বারবার সংক্রমণের ফিরে আসাতে বিলম্ব ঘটানো যায়।

খুব বেশি সংক্রমণে, শিরায় প্রয়োগ করার অ্যান্টিবায়োটিক দেওয়া হয়।অন্যান্য ওষুধইউরিন অ্যালকালাইজার হল মূত্রে অ্যাসিডিটি কমানোর এবং জ্বালাভাব কমানোর ওষুধ।নিজ-সুরক্ষাঅনেক পরিমানে জল জাতীয় পানীয় গ্রহণ করা, যাতে বারবার মূত্রত্যাগের মাধ্যমে সংক্রমণ পরিষ্কৃত হয়ে যায়।

মূত্রনালীর সংক্রমণের সময়ে এনএসএআইডি (নন-স্টেরোইডাল অ্যান্টি-ইনফ্লেমেটরি ওষুধ) যেমন ইবুপ্রফেন বা অ্যাস্পিরিন খাওয়া এড়িয়ে চলতে হবে, কারণ এতে জটিলতা বাড়তে পারে।

ক্রানবেরির রস মূত্রথলির সংক্রমণ ফিরে আসা আটকাতে সাহায্য করে।

গরম জলের সেঁক পেটে ব্যথা থেকে মুক্তি পেতে সাহায্য করে।

ID: 2546

Context: ব্লাডার ক্যান্সার বা মূত্রথলির ক্যান্সার

Question: ব্লাডার ক্যান্সার বা মূত্রথলির ক্যান্সার কাকে বলে?

Answer:

ব্লাডার বা মূত্রথলির ক্যান্সার হল একটি সাধারণ ক্যান্সার, যা 50 থেকে 70 বছর বয়েসের মানুষদের মধ্যে দেখা যায়। ভারতে এটি খুব বেশিভাবে দেখা যাওয়া ক্যান্সারগুলির মধ্যে ষষ্ঠ স্থানে আছে। ব্লাডার ক্যান্সার ব্লাডারের ভিতরের আস্তরণে কোষের অস্বাভাবিক বৃদ্ধির ফলে হয়ে থাকে। ক্যান্সারের 15% ক্ষেত্রে তামাকের সেবনের ফলে ব্লাডার ক্যান্সার দেখা যায়। ব্লাডার বা মূত্রথলি থেকে টিউমার বাদ দেওয়ায় (ট্রান্স ইউর‍েথ্রাল রিজেকশন অফ ব্লাডার টিউমার বা টিইউআরবিটি) বেশিরভাগ ব্লাডার ক্যান্সারের ক্ষেত্রে উন্নতি লক্ষ্য করা যায়। যাইহোক, 50%-এর বেশি ক্ষেত্রে ক্যান্সার পুনরায় ফিরে আসে, যার মধ্যে 20% ক্ষেত্রে, ক্যান্সার ব্লাডার সংলগ্ন শরীরকলায় ছড়িয়ে পড়ে (পেশী-আক্রমণকারী ব্লাডার ক্যান্সার)। টিইউআরবিটি, কেমোথেরাপি এবং রেডিয়েশন থেরাপি হল খুব সাধারণভাবে ব্যবহৃত চিকিৎসার বিকল্পগুলি, যা ক্যান্সারের স্তর অনুযায়ী প্রয়োগ করা হয়।

ID: 2547

Context: ব্লাডার ক্যান্সার বা মূত্রথলির ক্যান্সার এর প্রধান লক্ষণ ও উপসর্গগুলি

Question: ব্লাডার ক্যান্সার বা মূত্রথলির ক্যান্সার এর প্রধান লক্ষণ ও উপসর্গগুলি কি কি?

Answer:

এইসব লক্ষণ ও উপসর্গগুলি থাকলে ব্লাডার ক্যান্সার হয়েছে বলে সন্দেহ করা হয়:হেমাচুরিয়া বা মূত্রের সাথে রক্তপাত, সাধারণত এক্ষেত্রে কোন ব্যথা থাকে না। মূত্র মরিচা রঙের বা গাঢ় লাল রঙের হতে পারে

বেশি বার মূত্রত্যাগ আরো পড়ুন: বহু মুত্র রোগের চিকিৎসা

হঠাৎ মূত্রত্যাগের তাড়না অনুভব

মূত্রত্যাগের সময় ব্যথা বা জ্বালা অনুভব করা

পিঠে ব্যথা, হাড়ে ব্যথা, ওডেমা বা পায়ে ফোলাভাব দেখা যায়, যখন ক্যান্সার মুত্রথলি থেকে বাইরে ছড়িয়ে পড়ে

ক্যান্সার ছড়িয়ে পড়ার পর ওজন হ্রাস পায়হেমাচুরিয়ার (মূত্রের সাথে রক্তপাত) অন্যান্য কারণগুলি হল:মূত্রনালীর সংক্রমণ

মাসিক

কিডনিতে পাথর

যৌন সংসর্গ

রক্ত-পাতলা করার ওষুধ (অ্যান্টি-কোয়াগুল্যান্টস)

প্রস্টেট গ্রন্থির বেড়ে যাওয়া

ID: 2548

Context: ব্লাডার ক্যান্সার বা মূত্রথলির ক্যান্সার প্রধান কারণগুলি

Question: ব্লাডার ক্যান্সার বা মূত্রথলির ক্যান্সার প্রধান কারণগুলি কি কি?

Answer:

ব্লাডার ক্যান্সারের ক্রমবিকাশের কারণগুলি হল:তামাক সেবন

অ্যানালিন ডাই এবং বেঞ্জিডাইনের মতো রাসায়নিকের ব্যবহার, যেগুলি ব্যবহার করা হয় রঙ, বস্ত্র, রাবার, প্লাস্টিক প্রভৃতি প্রস্তুতিতে।

রেডিওথেরাপির দ্বারা অন্ত্রের ক্যান্সারের চিকিৎসার ফলে

কেমোথেরাপি চিকিৎসায় ব্যবহৃত ওষুধের ফলে

অন্যান্য আরো কিছু কারণ যেমন ব্লাডারে সংক্রমণের ফলে (সিস্টোসোমাইটিস), ডায়াবেটিস, দীর্ঘকালস্থায়ী ক্যাথারাইজেসন এবং 45 বছর বয়েসের আগে মেনোপজ

ID: 2549

Context: ব্লাডার ক্যান্সার বা মূত্রথলির ক্যান্সার রোগ নির্ণয় ও চিকিৎসা

Question: ব্লাডার ক্যান্সার বা মূত্রথলির ক্যান্সার রোগ নির্ণয় ও চিকিৎসা কিভাবে হয়?

Answer:

পুঙ্খানুপুঙ্খ শারীরিক অবস্থার ইতিহাস এবং শারীরিক পরীক্ষার পরে, এইসব পর্যবেক্ষণগুলির দ্বারা ব্লাডার ক্যান্সারের রোগ নির্ণয় হয়:ব্লাডারের ভিতরের টিউমারটি দেখার জন্য সিস্টোস্কপি করা হয়।

সিস্টোস্কপি করার সময় যে শরীর কলা নেওয়া হয়, তা অনুবীক্ষণ যন্ত্রের নীচে রেখে দেখা হয় কোন স্তরে ও ক্রমে ক্যান্সারটি আছে।

কম্পিউটারাইজড টোমোগ্রাফি স্ক্যান এবং ম্যাগ্নেটিক রিজোনেন্স ইমেজিং দ্বারা টিউমারটির সম্পূর্ণ চিত্র পাওয়া যায়।

ইন্ট্রাভেনাস ইউরোগ্রাম দ্বারা ব্লাডারের এক্স-রে চিত্র নেওয়া হয়, যেখানে মূত্রনালী দিয়ে রঙ বাহিত করে টিউমারটি সনাক্ত করা হয়।

মূত্রের নমুনা অনুবীক্ষণ যন্ত্রের নীচে পরীক্ষা করে তাতে ক্যান্সারের কোষ আছে কিনা দেখা হয়।

টিউমার মার্কার টেস্ট (ব্লাডার টিউমার অ্যান্টিজেন) করা হয় দেখার জন্য যে ক্যান্সার কোষ প্রোটিন বা অ্যান্টিজেন নিঃসৃত করছে কিনা।ব্লাডার ক্যান্সার, যেটি মূত্রথলির সঃম্পূর্ণ ভিতরের আচ্ছাদনে সীমাবদ্ধ থাকে তাকে নন-মাসেল-ইনভেসিভ ব্লাডার ক্যান্সার বলে, কিন্তু যদি ক্যান্সার ব্লাডারের খুব গভীরে ছড়িয়ে পড়ে (পেশীর স্তর দ্বারা, চর্বি এবং সংযোগকারী কলাগুলির দ্বারা) এবং মূত্রথলির আশেপাশের অঙ্গগুলিতে, তখন তাকে পেশী-আক্রমণকর ব্লাডার ক্যান্সার বা মাসেল-ইনভেসিভ ব্লাডার ক্যান্সার বলে। ক্রমবিভাগ দ্বারা ক্যান্সার কতটা ছড়িয়ে পড়েছে, তা জানা যায়। উচ্চ-ক্রমযুক্ত ক্যান্সার নিম্ন-ক্রমযুক্ত ক্যান্সারের চেয়ে বেশি মাত্রায় ছড়ায়।ব্লাডার ক্যান্সারের চিকিৎসা, তার স্তর ও ক্রম ভেদে স্থির করা হয়। এর মধ্যে আছে:টিইউআরবিটি

যদি মূত্রথলিতে ক্যান্সার অগভীর স্তরে সীমাবদ্ধ থাকে, তবে টিউমারটি বাদ দিতে সার্জারি করা হয়। নিম্ন-ক্রমের নন-মাসেল-ইনভেসিভ ব্লাডার ক্যান্সারে সার্জারিতে ইতিবাচক সাড়া পাওয়া যায়।

কেমোথেরাপি: টিইউআরবিটি-র পরে পুনরায় ক্যান্সার না হবার জন্য কেমোথেরাপির ওষুধ ব্লাডারে সরাসরি সূঁচ প্রয়োগের দ্বারা প্রবেশ করানো হয়। ডাক্তার নিম্ন ও মধ্য ঝুঁকিপূর্ণ ক্যান্সারের ক্ষেত্রে কোন স্তরে ক্যান্সার আছে তার উপর নির্ভর করে কেমোথেরাপি নিতে বলেন।

রেডিয়েশন থেরাপি: উচ্চ-ক্রমযুক্ত ব্লাডার ক্যান্সারের ক্ষেত্রে, যেটা ছড়িয়ে পড়েছে তা নিরাময়ের জন্য কেমোথেরাপির সাথে রেডিয়েশন থেরাপিরও প্রয়োজন হয়।

ইমিউনোথেরাপি: কোনো কোনো ক্ষেত্রে ক্যান্সারের প্রথম দিকে চিকিৎসা টিইউআরবিটি-র পরে বিসিজি-র পরিবর্তিত রূপের একটি ওষুধ দ্বারা করা হয় ।

বিসিজি-র চিকিৎসা দ্বারা ক্যান্সারের নিরাময় না হলে মূত্রথলি বা ব্লাডারের একটি অংশ বা পুরোটাই সার্জারির দ্বারা বাদ দেওয়া হয়।

ID: 2550

Context: বেলস পালসি (ফেসিয়াল নার্ভ প্যারালাইসিস)

Question: বেলস পালসি (ফেসিয়াল নার্ভ প্যারালাইসিস) কি?

Answer:

বেলস পালসি (ফেসিয়াল নার্ভ প্যারালাইসিস) এমন একটি অবস্থা যার ফলে মুখের পেশীগুলি দুর্বল হয়ে যায় বা একপাশে পক্ষাঘাতগ্রস্ত হয়। এটি মুখের পেশীর সঙ্গে যুক্ত স্নায়ুগুলি নষ্ট হয়ে যাওয়ার কারণে হয়। তবে, এই পেশীগুলি সাময়িকভাবে আক্রান্ত হয় এবং চিকিৎসার ফলে এই অবস্থা সাধারণত পুরোপুরি নির্মূল হয়ে যায় বা সেরে যায়।

ID: 2551

Context: বেলস পালসি (ফেসিয়াল নার্ভ প্যারালাইসিস)র প্রধান লক্ষণ এবং উপসর্গগুলি

Question: বেলস পালসি (ফেসিয়াল নার্ভ প্যারালাইসিস)র প্রধান লক্ষণ এবং উপসর্গগুলি কি?

Answer:

বেলস পালসির কারণে সাধারণত মুখের এক পাশের পেশী আক্রান্ত হয়। প্রায় 1% ক্ষেত্রে মুখের দু’পাশের পেশী আক্রান্ত হয়।

এই রোগে মুখের স্নায়ু দ্বারা নিয়ন্ত্রিত গতিবিধি বা কাজগুলির উপর প্রভাব পড়ে। রোগী চোখের পাতা নাড়াতে, মুখের যেদিকের অংশ আক্রান্ত হয়েছে তা খুলতে, হাসা এবং চিবানোর ক্ষেত্রে অসুবিধা অনুভব করেন।

মুখের ওই পাশে ব্যথা হতে পারে, বিশেষ করে চোয়াল এবং মাথাতে।

পেশী দুর্বল হয়ে যাওয়ার কারণে চোখের পাতা ঢুলে পড়ে বা বন্ধ হয়ে আসে এবং মুখের এক কোণ থেকে লালা ঝরতে থাকে।

জিভের সামনের অংশের স্বাদের অনুভূতির উপর প্রভাব পড়তে পারে।

ID: 2552

Context: বেলস পালসি হওয়ার প্রধান কারণগুলি

Question: বেলস পালসি হওয়ার প্রধান কারণগুলি কি?

Answer:

বেলস পালসি হওয়ার সঠিক কারণ এখনো পর্যন্ত অজানা রয়েছে; তবে, বলা হয়ে থাকে যে বিভিন্ন রকম ভাইরাল বা বিষাক্ত সংক্রমণের কারণে রোগটি হয়ে থাকে। এর মধ্যে রয়েছে হার্পিস সিমপ্লেক্স, হার্পিস জোস্টার, এইচআইভি, সাইটোমেগালোভাইরাস এবং এপস্টাইন বার ভাইরাস।রোগের ঝুঁকির কারণগুলির মধ্যে রয়েছে:ডায়াবেটিস

গর্ভাবস্থা, বিশেষত তৃতীয় ত্রৈমাসিকের সময়

এই রোগের বিষয়ে পারিবারিক ইতিহাসযেকোনো কারণ, যা মুখের স্নায়ুর উপর কোনোরকম ট্রমা বা আঘাত, জ্বালা বা কোনো ক্ষতি সৃষ্টি করে তাই বেলস পালসি ঘটাতে পারে।

ID: 2553

Context: বেলস পালসি নির্ণয় এবং চিকিৎসা

Question: বেলস পালসি কিভাবে নির্ণয় করা হয় এবং চিকিৎসা করা হয়?

Answer:

এই রোগ নির্ণয়ের জন্য শারীরিক পরীক্ষা, ইমেজিং এবং রক্ত পরীক্ষার প্রয়োজন।উপসর্গগুলির উপর ভিত্তি করে ডাক্তার মুখ পরীক্ষা করবেন, এবং চোখের পাতা ঢুলে যাচ্ছে কি না, লালা ঝরে পড়ছে কি না প্রভৃতি লক্ষণগুলি পরীক্ষা করে দেখবেন।

একটি এমআরআই বা সিটি স্ক্যানের মতো ইমেজিং প্রযুক্তি মুখের স্নায়ুগুলির অবস্থা দেখতে সাহায্য করে।

যদি চিকিৎসক ভাইরাল সংক্রমণ সন্দেহ করেন, তাহলে তা নিশ্চিত করতে একটি রক্ত পরীক্ষাও করা হয়।

স্ট্রোক, লাইম রোগ এবং ব্রেন টিউমারের মতো অবস্থাকে বাদ দেওয়ার উপর এই রোগের নির্ণয় নির্ভর করে।বেলস পালসির চিকিৎসা অনেকটাই চিহ্নিত করা কারণগুলি বা ঝুঁকির কারণগুলির উপর নির্ভর করে।এই অবস্থার চিকিৎসার জন্য কর্টিকোস্টেরয়েডস হলো সবথেকে ভালো ওষুধ। দেখা গেছে যে এই ওষুধ 6 মাস সময়ের ওপর পর্যন্ত আরাম দিয়ে থাকে। তবে, এই অবস্থার জন্য প্রাথমিক পর্যায় থেকেই স্টেরোয়েড দিয়ে চিকিৎসা করা গুরুত্বপূর্ণ।

যদি সন্দেহ করা হয় যে কোনো ভাইরাস এই রোগের কারণ, তাহলে অ্যান্টিভাইরাল ওষুধ দেওয়া হয়।

ওষুধের পাশাপাশি, ফিজিওথেরাপির মাধ্যমে পেশীর ব্যায়াম করার পরামর্শ দেওয়া হয়।

মারাত্মক ক্ষেত্রে, যেখানে ট্রমার কারণে স্নায়ু সঙ্কুচিত হয়ে যায় বা আক্রান্ত হয়, সেক্ষেত্রে অপারেশনের মাধ্যমে এই সমস্যা থেকে মুক্তি পাওয়া যেতে পারে।

এই অবস্থা কয়েক মাসের মধ্যেই কমে যেতে পারে এবং এটি আবার হওয়ার সম্ভাবনা খুবই কম।

ID: 2554

Context: এনাল ফিশার

Question: এনাল ফিশার কি?

Answer:

এনাল ফিশার হল মলদ্বারে ছোট, সংকীর্ণ, ডিম্বাকৃতির কাটা বা ঘা। এইগুলো সাধারণত পায়ু নালীর গায়ে, বিশেষ করে কারোর পেছনের দিকে হয়। পায়ু নালী হল রেকটাম এবং মলদ্বারের মধ্যে অবস্থিত একরকম নলের আকারের অংশ। মলদ্বারের কাছে মোচড় দিয়ে ব্যথা এবং রক্তপাত হল এই রোগের সবচেয়ে সাধারণ উপসর্গ। এটা যে কোনো বয়সে হতে পারে। সাধারণত, এগুলোকে হেমোরইডস (অর্শ) বা পাইলসের সাথে গুলিয়ে ফেলা হয়। ফিশার অ্যাকিউট (তীব্র) বা ক্রনিক (দূরারোগ্য) হতে পারে। অ্যাকিউট ফিশারের ক্ষেত্রে মলদ্বার কাগজ কাটার মতো ফেটে যায়, কিন্তু ক্রনিক ফিশারের ক্ষেত্রে পায়ু নালীর দেওয়ালের ত্বকে পিন্ডের মতো তৈরি হয়।

ID: 2555

Context: এনাল ফিশার প্রধান লক্ষণ এবং উপসর্গগুলো

Question: এনাল ফিশার প্রধান লক্ষণ এবং উপসর্গগুলো কি কি?

Answer:

এই রোগের সাধারণ লক্ষণ হল ব্যথা এবং রক্তপাত। সাধারণত, মলত্যাগ করার সময় ব্যথাটা শুরু হয় এবং প্রায় এক ঘন্টার জন্য থাকতে পারে। এতে চুলকানি এবং ফোলাভাবও অনুভব করা যায়। সাধারনত ব্যথার তীব্রতা সহ্য করা যায়, কিন্তু কখনো কখনো অসহ্য ব্যথাও হতে পারে। পায়খানায়, টিস্যু পেপারে, বা মলদ্বারের চারপাশে লাল রক্তের দাগ দেখা যায়। মলদ্বারের চামড়ায় একটি পাতলা ফাটল দেখা যায়। দুইবার মলত্যাগ করার মাঝে এই লক্ষণগুলো সাধারনত আর দেখা যায় না।

ID: 2556

Context: এনাল ফিশার এর প্রধান কারণগুলো

Question: এনাল ফিশার এর প্রধান কারণগুলো কি কি?

Answer:

প্রধানত কোষ্ঠকাঠিন্যের জন্য পায়ু নালীর মাধ্যমে শক্ত, বড় আকারের মল নামার ফলে এনাল ফিশার হয়। ইনফ্লেমমেটরি বাওয়েল ডিজিজ, যেমন ক্রোহন’স ডিজিজ এর ফলেও ফিশার হতে পারে। গর্ভাবস্থায় এবং সন্তানের জন্মের সময় ফিশার হওয়ার সম্ভাবনা থাকে। এছাড়াও পাতলা পায়খানা এবং স্থায়ী ডায়রিয়াও এই রোগের কারণ হতে পারে।

ID: 2557

Context: এনাল ফিশার নির্ণয় এবং চিকিৎসা

Question: এনাল ফিশার এর কিভাবে নির্ণয় এবং চিকিৎসা করা হয়?

Answer:

ডাক্তারেরা একটি গ্লাভস পড়া আঙ্গুল অথবা একটি এনোস্কোপ (শেষ প্রান্তে ক্যামেরা লাগানো একটি পাতলা নল) ঢুকিয়ে আপনার পায়ু নালী পরীক্ষা করবে। ফিশারের অবস্থান দেখেও এর সম্ভাব্য কারণ সম্বন্ধে জানা যেতে পারে। পিছনে বা সামনের তুলনায় ধারের দিকে অবস্থিত ফিশারগুলি ক্রোহন’স ডিজিজের কারণে হতে পারে। যদি প্রয়োজন হয়, আরও ভালো করে রোগ নির্ণয়ের জন্য বা অন্তর্নিহিত অবস্থা সম্বন্ধে জানার জন্য, ডাক্তার রোগীর অবস্থার উপর ভিত্তি করে নমনীয় সিগময়েডোস্কোপি বা কোলনোস্কোপির ব্যবহার করতে পারেন।এনাল ফিশারগুলির সহজেই চিকিৎসা করা যেতে পারে এবং কয়েক সপ্তাহের মধ্যে নিজেই ঠিক হয়ে যেতে পারে, তবে এটা হওয়ার আসল কারণগুলির চিকিৎসা করা না হলে এই রোগটি আবার হতে পারে। সাধারণত, ফাইবার সমৃদ্ধ খাবার এবং প্রচুর পরিমাণে জল খেলে তা মলকে নরম করতে পারে এবং তা বেশি পরিমানে হতে পারে, যার ফলে আর কোনও ক্ষতি হয় না এবং ফিশার ঠিক হতে থাকে। মলদ্বারের ব্যথা থেকে মুক্তি পাবার জন্য টপিক্যাল অ্যানাস্থেটিক্স ব্যবহার করা যেতে পারে। চিকিৎসায় সাহায্য করার জন্য স্টুল সফ্টনার্সও দেওয়া হয়।দিনে একাধিকবার 10-20 মিনিটের জন্য গরম টাবে স্নান করলে তা মলদ্বারের পেশীকে উপশম করতে এবং শিথিল করতে সাহায্য করবে। নার্কোটিক ব্যথার ঔষধ ব্যবহার করা উচিত নয় কারণ সেগুলি কোষ্ঠকাঠিন্য বাড়ায়। এই রোগের ক্ষেত্রে নাইট্রো-গ্লিসারিন মলম এবং ক্যালসিয়াম চ্যানেল ব্লকার্স ওষুধগুলো ব্যবহার করা হয়। এই রোগের চিকিৎসার জন্য খুব কম অস্ত্রোপচার করা হয়। অস্ত্রোপচারের মাধ্যমে চিকিৎসার মধ্যে বটুলিনাম টক্সিন ইনজেকশন এবং স্ফিঙ্কটেরটমি (মলদ্বারের স্পিঙ্কটারের সার্জারি) রয়েছে। অস্ত্রোপচারের ক্ষেত্রে অন্ত্রের নিয়ন্ত্রণ হারানোর ঝুঁকিটা কম থাকে।

ID: 2558

Context: এএলএস (অ্যামাইটোট্রপিক ল্যাটারাল স্ক্লেরোসিস

Question: এএলএস (অ্যামাইটোট্রপিক ল্যাটারাল স্ক্লেরোসিস ) বা লৌ গেহ্রিগ রোগ?

Answer:

এএলএস, যা লৌ গেহ্রিগ রোগ নামেও পরিচিত, একটি নিউরোলজিক্যাল বা স্নায়ুর রোগ। এটা সময়ের সঙ্গে সঙ্গে খারাপ হয় এবং আরও বেশি কষ্টদায়ক হয়ে ওঠে। এই রোগটি অক্ষমতা সৃষ্টি করে, কারণ এটি নার্ভের কোষগুলিকে ধ্বংস করে দেয়। সামান্য উপসর্গগুলির সাথে রোগটি শুরু হয়, হাঁটা চলা এবং শ্বাস প্রশ্বাসের অক্ষমতার সঙ্গে বাড়তে থাকে। অবশেষে এই রোগটির ফলে মৃত্যু হয়।

ID: 2559

Context: এএলএস-এর প্রধান লক্ষণ এবং উপসর্গগুলি

Question: এএলএস-এর প্রধান লক্ষণ এবং উপসর্গগুলি কি কি?

Answer:

এএলএসএর লক্ষণ প্রাথমিক পর্যায়ে খুবই সামান্য মনে হতে পারে, এবং রোগটি বাড়ার সাথে সাথে আরও খারাপ হতে শুরু করে। সমস্যা হাত এবং পায়ের থেকে শুরু হয়, ধীরে ধীরে শরীরের অন্য অংশগুলিতে ছড়িয়ে যায়। এটি খাবার চেবানো এবং গেলা, শ্বাস এবং কথা বলার ক্ষমতাকে নষ্ট করে। সাধারণ লক্ষণগুলির মধ্যে রয়েছে:ঘন ঘন পড়ে যাওয়া।

পেশীর দূর্বলতা।

অঙ্গ সমন্বয়ের অভাব বিশেষ করে হাত এবং পায়ের।

জবুথবু এবং বেমানান হয়ে যাওয়া।

গোড়ালি এবং পায়ের পাতা, গাঁট বা জয়েন্ট সহ নিম্ন অঙ্গে দুর্বলতা।

অস্পষ্ট উচ্চারণের সঙ্গে কথা বলার ভঙ্গি।

পেশীতে হঠাৎ খিঁচ ধরা।

অঙ্গবিন্যাস বজায় না রাখা বা মাথা তুলে রাখায় অসুবিধা।

গিলতে অসুবিধা।

পেশীতে টান ধরা।

ID: 2560

Context: এএলএসের প্রধান কারণ

Question: এএলএসের প্রধান কারণ কি?

Answer:

সঠিক কারণগুলি সম্পর্কে সামান্য তথ্য পাওয়া যায়। যদিও 10 শতাংশেরও বেশি ক্ষেত্রে উত্তরাধিকারসূত্রে পাওয়া, বাকিদের কারণগুলি এখনও অস্পষ্ট। সম্ভাব্য কিছু কারণের মধ্যে রয়েছে:সংশোধিত বা পরিবর্তিত জিনের গঠন।

গ্লুটামেটের স্তরগুলিতে ভারসাম্যহীনতা (একটি রাসায়নিক যা স্নায়ু থেকে পেশীগুলিতে বার্তা পাঠায়), যা কোষগুলিকে বিষাক্ত হওয়ার দিকে নিয়ে যায়।

নার্ভ কোষগুলিতে অটোইমিউন কার্যকলাপ।

স্নায়ু কোষে প্রোটিনের আকারে অস্বাভাবিকতা বা প্রোটিন জমা হওয়া, যা তাদের ধ্বংসের দিকে নিয়ে যায়।

বিষাক্ত সংগ্রামী পণ্যের দিকে প্রকাশিত হওয়া।

কঠোর শারীরিক পরিশ্রম।

ID: 2561

Context: এএলএস নির্ণয় করা হয় এবং চিকিৎসা

Question: কিভাবে এএলএস নির্ণয় করা হয় এবংচিকিৎ সা করা হয়?

Answer:

এএলএস, তার প্রাথমিক পর্যায়ে, অন্যান্য স্নায়ুর রোগের সঙ্গে গুলিয়ে যেতে পারে। এই রোগ নির্ণয়ের প্রধান চাবিকাঠি হলো অন্য অবস্থার সম্ভাবনাগুলিকে খুঁজে বের করা। রোগটিকে নির্ণয় করতে যে পরীক্ষাগুলিকে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে সেগুলি হল:ইএমজি বা ইলেক্ট্রোমিওোগ্রাম পরীক্ষার দ্বারা অন্যান্য স্নায়ু পেশী বা অন্যান্য পেশীর অবস্থার কার্যকলাপ নির্ণয় করা।

আবেগ বা স্পন্দন পরিচালনা দেখার জন্য স্নায়ু সঞ্চালন পরীক্ষা যেটি স্নায়ুর ক্ষতি বা পেশীজনিত রোগগুলিকে নির্দেশ করতে পারে।

মেরুদণ্ডে বা হার্নিয়েটেড ডিস্কগুলিতে টিউমার আছে কিনা তা দেখার জন্য এমআরআই পরীক্ষা করা।

অন্যান্য অবস্থার জন্য প্রস্রাব ও রক্ত পরীক্ষা করা।

লাম্বার ভেদ করে সেরেব্রোস্পাইনাল তরল সংগ্রহ করে পরীক্ষা করা।

আরও বিশদ জানার জন্য পেশীর বায়োপসি।এএলএস ঠিক করা বা এটিকে রিভার্স করার জন্য চিকিৎসার আর কোনো রূপ উপলব্ধ নেই। যদিও, রোগীকে আরাম দেওয়ার জন্য এবং রোগের অগ্রগতিকে কমাতে চিকিৎসার আরও অনেক পদ্ধতি রয়েছে। পদ্ধতিগুলি হল:চিকিৎসা পদ্ধতি

সাধারণত দুটি প্রধান ওষুধের সুপারিশ করা হয়ে থাকে:

দৈনিক কাজকর্মে কোন বাধা আটকানোর জন্য এডারাভোনে। এতে পার্শপ্রতিক্রিয়া থাকতে পারে যেমন অ্যালার্জি প্রতিক্রিয়া, নিঃশ্বাসে কষ্ট বা ফোলা ভাব।

রিলুজোলে, যা গ্লুটামেটের মাত্রাকে কমানোর এবং রোগ অগ্রগতিতে বাধা দেওয়ার জন্য দেখানো হয়েছে। এর পার্শ্ব প্রতিক্রিয়াগুলির মধ্যে লিভারের কাজে সমস্যা, গ্যাস্ট্রিক সমস্যা এবং মাথা ঘোরা অন্তর্ভুক্ত থাকে।

বিভিন্ন ধরণের লক্ষণ যেমন খিঁচ, কোষ্ঠকাঠিন্য, ক্লান্তি, বিষণ্নতা, অনিদ্রা, ব্যথা এবং মুখ দিয়ে লালা পড়া ইত্যাদির ক্ষেত্রে ওষুধের পরামর্শ দেওয়া হয়।

সহায়ক থেরাপি বা চিকিৎসা পদ্ধতি

কোনো ব্যক্তির অবস্থার ভারসাম্য বজায় রাখা এবং একটি ভাল কার্যকরী অবস্থা বা নিয়ন্ত্রন প্রদান করার জন্য এই পদ্ধতিগুলিকে বেছে নেওয়া হয়। এইগুলি হল:

হাত এবং পায়ের ব্যর্থতা সত্ত্বেও খাওয়া, পোশাক পরা এবং হাঁটা চলার মতো দৈনন্দিন কাজগুলি করতে সহায়তা করার জন্য পেশাগত থেরাপি।

শ্বাস নিতে সাহায্য করার জন্য শ্বাসপ্রশ্বাস কৌশল, বিশেষত রাত্রে এবং ঘুমের সময় রোগটি যখন বেশি বেড়ে যায়। যান্ত্রিক শ্বাস প্রক্রিয়ারও অবশেষে প্রয়োজন হতে পারে।

ব্যথা নিরাময়, ভারসাম্য, গতিশীলতা এবং সমন্বয়ের জন্য শারীরিক পদ্ধতি। এটি শরীরকে শক্তিশালী রাখতে সাহায্য করে, যদিও ব্যক্তিটিকে অবশেষে হুইলচেয়ার ব্যবহার করার জন্য অভ্যস্ত করার প্রয়োজন হতে পারে।

স্পিচ থেরাপি পরিষ্কারভাবে এবং কার্যকরভাবে যোগাযোগ করতে বা কথা বলতে সাহায্য করতে পারে।

সামাজিক এবং মানসিক সমর্থন কারণ একজন ব্যক্তির পক্ষে একা পরিস্থিতিটিকে মোকাবিলা করা অসম্ভব।

ID: 2562

Context: স্মৃতি শক্তি কমে যাওয়ার রোগ

Question: বেশী বয়সে স্মৃতি শক্তি কমে যাওয়ার রোগ কাকে বলে?

Answer:

বয়ষ্কদের মধ্যে একটু দেরী করে সাড়া দেয়ার প্রবণতা থাকে - বিশেষত তাদের চলাফেরার মধ্যে, প্রতিবর্তী ক্রিয়াতে, কাজকর্মে এবং আদান প্রদানের মধ্যে। ওনাদের কোনো কিছু সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হলে সেই তথ্যগুলি মনে করার অক্ষমতা সব থেকে বেশী লক্ষ্য করা যায়। এই তথ্যগুলি হয়তো কোনো ক্ষেত্রে পরে কোনো সময় মনে পড়ে বা কখনো মনে পড়েও না। বয়স বাড়ার সাথে সাথে আমাদের শরীরে কিছু শারীরিক পরিবর্তন হয়, তারমধ্যে অন্যতম হলো মানসিক প্রক্রিয়ার নিম্নগামী হওয়া। বেশীরভাগ ক্ষেত্রেই আমরা ভুলবশতঃ এই নিম্নগামীতাকে বয়সঘটিত স্মৃতিভ্রম বলে ভুল করি। বয়ষ্কদের মধ্যে স্মৃতিশক্তি কমে যাওয়ার সমস্যা হয়ত নিম্নগামী জ্ঞানীয় প্রক্রিয়া, মৃদু জ্ঞানীয় অবনতি বা স্মৃতিভ্রংশ হতে পারে। (স্মৃতিশক্তি এবং চিন্তাশক্তি কমে যাওয়া যা দৈনন্দিন কাজে প্রভাব ফেলে)।

ID: 2563

Context: স্মৃতি শক্তি কমে যাওয়ার প্রধান লক্ষণ ও উপসর্গগুলো

Question: স্মৃতি শক্তি কমে যাওয়ার প্রধান লক্ষণ ও উপসর্গগুলো কি?

Answer:

কোনো ব্যক্তি বা তার সমস্যার তীব্রতার উপর ভিত্তি করে বিভিন্ন উপসর্গগুলো লক্ষ্য করা যায়।বিলম্বিত বা আংশিক তথ্য স্মরণ করা।

কথা বলার সময় সাধারণভাবে ব্যবহৃত শব্দ ভুলে যাওয়া।

সাধারণভাবে ব্যবহৃত শব্দগুলির মধ্যে বিভ্রান্তি।

একই বিষয় নিয়ে বারবার আলোচনা করা অথবা বারবার একই প্রশ্ন করা।

জিনিস ভুল স্থানে রাখা।

একজনের সাথে অন্য ব্যক্তিকে গুলিয়ে ফেলা।

প্রাত্যহিক কাজ করতে বা পরিচিত নির্দেশ অনুসরন করতে অত্যধিক সময় নেওয়া।

রাস্তা খুঁজে পেতে সক্ষম না হওয়া এমনকি পরিচিত রাস্তাও ভুলে যাওয়া।

ID: 2564

Context: স্মৃতি শক্তি কমে যাওয়ার প্রধান কারণগুলি

Question: স্মৃতি শক্তি কমে যাওয়ার প্রধান কারণগুলি কি?

Answer:

বেশীরভাগ ক্ষেত্রেই বয়স-সংক্রান্ত স্মৃতিশক্তি কমে যাওয়া হল মস্তিষ্কের ক্রিয়ার গতি কমে যাওয়ার ফল। এছাড়া অন্যান্য কারণগুলি হল:হিপ্পোক্যাম্পাস (একটি ছোটো অঙ্গ যা মস্তিষ্কের মধ্যে থাকে যা আবেগ এবং বহুদিনের স্মৃতি নিয়ন্ত্রণ করে) এর ক্রমাগত অবনতি।

হরমোনের পরিবর্তন।

মস্তিষ্কের মধ্যে রক্তের প্রবাহ কমে যাওয়া।তাছাড়াও আরো কিছু কারণ এই রোগ হবার ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে, সেগুলো হলো:মাদকাসক্তি।

মস্তিষ্কের রোগ।

ভিটামিন বি12 এর অভাব।

থাইরয়েডের সমস্যা।

আবেগগত সমস্যা, যেমন বিষন্নতা এবং মানসিক চাপ।

মাথায় আঘাত লাগা।

ঘুমের ওষুধ, পেশীর শিথিলতার ওষুধ, অবসাদহীনতার ওষুধ, রক্তচাপ কমানোর ওষুধ বা অন্য কোন ওষুধ সেবন যা কোনো ব্যক্তির মধ্যে অসামঞ্জস্য ও বিভ্রান্তিমূলক আচরণের সৃষ্টি করে।

ID: 2565

Context: স্মৃতি শক্তি কমে যাওয়া নির্ণয় ও চিকিৎসা

Question: স্মৃতি শক্তি কমে যাওয়ার কিভাবে নির্ণয় ও চিকিৎসা করা হয়?

Answer:

এই সমস্যাটি নির্ণয় করার জন্য ডাক্তারি পরামর্শ নেওয়া খুবই জরুরী। এই চিকিৎসাতে প্রায়ই কতগুলি প্রশ্ন তালিকা অন্তর্ভুক্ত থাকে যেগুলো সাধারণত পূর্ববর্তী চিকিৎসার ইতিহাস, ঘুমের ধরন, আবেগপ্রবন অবস্থা এবং পারিবারিক জীবনের সাথে যুক্ত থাকে। তাছাড়া চিকিৎসক ভুলে যাওয়া সংক্রান্ত বিবরণ, স্মৃতিভ্রমের সূত্রপাত এবং ভুলে যাওয়ার প্রকৃতি সম্বন্ধেও জিজ্ঞাসা করতে পারেন। কোনো কোনো ক্ষেত্রে স্নায়ুমনস্তত্ববিদের বা নিউরোসাইকোলজিস্টের পরামর্শ নেওয়া আবশ্যিক হয়ে পড়ে।এই রোগে বেশির ভাগ ক্ষেত্রে কোনো চিকিৎসা করা যায় না এবং রোগটি কমানোও যায় না। এর চিকিৎসার প্রধান পদ্ধতি হল পরিস্থিতি ও ব্যক্তি সাপেক্ষে যতটা সম্ভব ভালভাবে যত্ন করা।বেশিরভাগ বয়ষ্ক ব্যক্তিরা তাদের মানসিক অপ্রাচুর্যতার অনুভব করেন এবং এটা তাদের জন্য খুব চাপ এবং লজ্জাজনক পরিস্থিতির সৃষ্টি করে, প্রধানত তারা যারা একটা প্রানবন্ত জীবনযাপন করেন। তাদের জন্য পরমুখাপেক্ষী হওয়া এবং স্বাধীনভাবে কাজ করতে না পারার অবস্থাটি খুব কঠিন হয়ে দাঁড়াতে পারে। তবে এই ধরণের ব্যক্তিদের জন্য যা প্রয়োজন সেগুলো হল:পারিবারিক সমর্থন এবং যত্ন।

একটি স্থিতিশীল যত্ন নেওয়ার পরিকল্পনা।

তাদের শারীরিক অবস্থা ও সমস্যার চিকিৎসা করা।

সামাজিকীকরণের সুযোগ।

সুষম খাদ্য ও পর্যাপ্ত ঘুম।

উপসর্গগুলির অবনতি রোধ করার জন্য মস্তিষ্কের সাধারণ উদ্দীপনামূলক কার্যকলাপ, যেমন:

ধাঁধা ও শব্দজব্দ (ক্রশওয়ার্ড)।

ম্যাগাজিন পড়া।

মানসিক চ্যালেঞ্জিং কার্যকলাপ করা।

ID: 2566

Context: পেরিফেরাল নিউরোপ্যাথি

Question: পেরিফেরাল নিউরোপ্যাথি কি?

Answer:

পেরিফেরাল স্নায়ুতন্ত্র শরীরের একটা যোগাযোগ পদ্ধতি যেটা কেন্দ্রীয় স্নায়ুতন্ত্রে, মানে মস্তিষ্ক ও মেরুদন্ড এবং শরীরের অন্যান্য অঙ্গে, সংকেত পাঠায়। এই সংকেতগুলো সংজ্ঞাবহ বার্তা হতে পারে, যেমন, ঠান্ডা হাত, পেশীর সংকোচনের জন্য বার্তা যেটা শরীরের নড়াচড়াতে সাহায্য করে এবং আরো অনেক কিছু। পেরিফেরাল স্নায়ুতন্ত্রের ক্ষতি হলে তাকে পেরিফেরাল নিউরোপ্যাথি বলে।

ID: 2567

Context: পেরিফেরাল নিউরোপ্যাথি এর প্রধান লক্ষণ ও উপসর্গগুলো

Question: পেরিফেরাল নিউরোপ্যাথি এর প্রধান লক্ষণ ও উপসর্গগুলো কি কি?

Answer:

লক্ষণ ও উপসর্গগুলো নির্ভর করে কোন স্নায়ু ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে তার উপর।মোটর নার্ভে ক্ষতি

এর কারণে পেশীতে খিঁচুনি, পেশীর দূর্বলতা, পেশীতে ঝাঁকি মারা এবং পেশী কুঁচকে যায়।

সংজ্ঞাবহ নার্ভে ক্ষতি

এর কারণে কোনো সংবেদন অনুভব করতে পারা যায় না, যেমন, স্পর্শ, ব্যথা এবং তাপমাত্রার পরিবর্তন, এবং মোটর সমন্বয়ে অসুবিধা যেমন, হাঁটা, বোতাম আটকানো, ইত্যাদি।

অটোনোমিক নার্ভে ক্ষতি

এর কারণে ঘামে অস্বাভাবিক পরিবর্তন হয়, গরম সহ্য হয় না, এবং শরীরের ভিতরের অঙ্গ সম্পর্কিত অন্যান্য সমস্যা দেখা দেয়।

ID: 2568

Context: পেরিফেরাল নিউরোপ্যাথি এর প্রধান কারণগুলো

Question: পেরিফেরাল নিউরোপ্যাথি এর প্রধান কারণগুলো কি কি?

Answer:

পেরিফেরাল নিউরোপ্যাথির সবচাইতে প্রভাবশালী কারণ হলো ডায়াবিটিস। এর অন্যান্য কারণগুলো নিচে বলা হলো:ভিটামিনের মাত্র কমে যাওয়া।

স্নায়ুতে আঘাত।

মদ্যপানে আসক্তি।

সংক্রমণ যেমন, লাইম অসুখ এবং ডিপথেরিয়া।

রক্তনালীতে প্রদাহ।

ক্রনিক যকৃতের অসুখ।

ক্রনিক কিডনীর অসুখ।

রিউমাটয়েড বাত।

এইচআইভি, হারপিস এবং ভারিসেলা-জোস্টার ভাইরাস সংক্রমণ।

শরীরে অতিরিক্ত বিষাক্ত পদার্থ যেমন, আর্সেনিক, মার্কারী এবং লেড।

ID: 2569

Context: পেরিফেরাল নিউরোপ্যাথি নির্ণয় ও চিকিৎসা

Question: পেরিফেরাল নিউরোপ্যাথি কিভাবে নির্ণয় ও চিকিৎসা করা হয়?

Answer:

নিম্নলিখিত উপায়ে পেরিফেরাল নিউরোপ্যাথি নির্ণয় করা হয়:ডায়াবিটিস বা ভিটামিনের অভাব নির্ণয়ের জন্য রক্তপরীক্ষা।

নার্ভ কন্ডাকসন পরীক্ষ।

ইমেজিং প্রকৃয়া যেমন এক্স-রে, সিটি স্ক্যান এবং ম্যাগনেটিক রেসোনেন্স ইমেজিং (এমআরআই) পরাীক্ষা।

ইলেক্টোমায়োগ্রাফি।

স্নায়ুর বায়োপসি।যে সকল কারণে পেরিফেরাল নিউরোপ্যাথি হয় সেই কারণের চিকিৎসা করে ও উপসর্গগুলো নিয়ন্ত্রণ করে এই রোগের চিকিৎসা করা হয়। নিম্নলিখিত পদ্ধতিতে সাধারণত চিকিৎসা করা হয়:ডায়াবিটিস নিয়ন্ত্রণ ও তার চিকিৎসা।

ভিটামিনের জন্য খাওয়ার ওষুধ বা ইনজেকশন।

যদি কোনো ওষুধের কারণে এই অসুখ হয় তাহলে সেই ওষুধ বন্ধ করা।

কর্টিকোস্টেরয়েডস।

ইমুনোগ্লোবুলিন ইঞ্জেক্সন।

ইমুনোসাপ্রেস্যান্টস।

স্নায়ুর ব্যাথা কমাতে ব্যথা কমানোর ওষুধ।

সংবেদন অনুভুতি কমে যাওয়ার জন্য সবসময় জুতো ও মোজা পরে থাকা উচিত।যাতে পায়ের পাতায় কোনো আঘাত না লাগে।